বদরুদ্দীন উমর

পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ৩

পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি

একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বাদ দিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভাষা আন্দোলন। একে বলা হয় আমাদের আত্মআবিস্কার বা স্বরূপ-অন্বেষার সূচনালগ্ন। অনেকের মতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ এই ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই উপ্ত ছিল। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বা মহত্ব কেবল ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিল-সংগ্রাম ও শহীদদের আত্মদানের ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি নিয়ে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার মানুষ কিংবা তার সচেতন অংশটির মধ্যে ১৯৪৮ কিংবা তারও আগে অর্থাৎ বিভাগপূর্বকালেই চিন্তাভাবনা শুরু হয় একথা যেমন সত্য,তেমনি বা তার চেয়েও বড় সত্য হল, এই আন্দোলনের তাৎপর্য ভাষা বা সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের দাবি ছাড়িয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াইয়ের মধ্যে তার পরিণতি খুঁজেছিল। আপাতদৃষ্টে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা নাগরিক সমাজের আন্দোলন বলে মনে হলেও ব্যাপক গণমানুষের ক্ষোভ-প্রতিবাদের জ্বালামুখ হিসেবে কাজ করেছিল সেদিন ভাষা আন্দোলনের ঘটনাটি। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিচার কিংবা আমাদের জাতীয় জীবনে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বুঝতে হলে সুতরাং আন্দোলনের সামগ্রিক পটভূমি তথা সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই তা করতে হবে। আর এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটিই বদরুদ্দীন উমর করেছেন তিন খণ্ডে সমাপ্ত এবং অজস্র সাক্ষাৎকার, দলিল সমৃদ্ধ তাঁর *'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'* গ্রন্থে। আমাদের জানা মতে ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে লেখা প্রথম গবেষণামূলক গ্রন্থ এটি। আর কোনো তর্ক বা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বোধহয় বলা যায়, অদ্যাবধি কি তথ্য সমাবেশের কি বিশ্লেষণী ক্ষমতার দিক থেকে এই গ্রন্থটিকে অতিক্রম করার যোগ্যতা আর কারো হয়নি। কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্পূর্ণ একক

www.pathagar.com

বা ব্যক্তি উদ্যোগে এ ধরনের বিশাল গবেষণাকর্মের উদাহরণ আমাদের দেশে আর দু-একটিও আছে কি না সন্দেহ। ইংরেজিতে যাকে 'মনুমেন্টাল ওয়ার্ক' বলে লেখকের দীর্ঘ শ্রম এবং একনিষ্ঠ ও গভীর গবেষণার ফসল ভাষা আন্দোলনের এই প্রামাণ্য ইতিহাসটি সম্পর্কে অনায়াসে তা প্রয়োগ করা যায়। ১৯৭০ সালে, অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঠিক প্রাকলগ্নে, এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হতেই, লেখকের পূর্ববর্তী আরও কয়েকটি পুস্তকের মতোই, তা আমাদের চিন্তা চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আমাদের সমাজমানসে যার প্রভাব আজও কমবেশি কার্যকর।

বদরুদ্দীন উমর নানাদিক থেকেই আমাদের দেশের একজন ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী কথাটাকে তার প্রকৃত বা সদর্থে বাংলাদেশে যে-অল্প কয়েকজন মানুষ সম্পর্কে ব্যবহার করা যায় নিঃসন্দেহে তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর মত বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত না হয়েও একথা স্বীকার করতে কারোই দ্বিধা হবার কথা নয়। সত্যি কথা বলতে কী, তিনি যদি আর কিছু নাও করতেন,শুধু তাঁর ভাষা আন্দোলনের এই ইতিহাস গ্রন্থটির জন্যই আমাদের বুদ্ধি ও মননচর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। যদিও এছাড়াও আরও অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি করেছেন। উমরের মতে ইতিহাস ঘটনার বিবরণ মাত্র নয়, তার ব্যাখ্যাও। ফলে ঘটনাক্রম বর্ণনা বা তথ্য জড়ো করাতেই ইতিহাসকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পণ্ডিত হিসেবেও তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। একজন মার্কসবাদী হিসেবে তিনি মনে করেন কোনোকিছুই আসলে শ্রেণিনিরপেক্ষ নয়। ভাষা আন্দোলন, তার পটভূমি ও সমকালীন সমাজ-রাজনীতি বিচারেও স্বভাবতই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু এর ফলে ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। তথ্য সংস্থাপন কিংবা ব্যক্তির ভূমিকার উল্লেখ কোনো ব্যাপারেই তিনি যেমন অতিশয়োক্তি বা আতিশয্যপ্রিয়তার তেমনি খণ্ডদৃষ্টি বা একদেশদর্শিতার পরিচয় দেননি।

দীর্ঘদিন ধরে দুষ্প্রাপ্য এই বইটির নতুন ও নির্ভুল সংস্করণ সুবর্ন প্রকাশ করেছে, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। সবাইকে শুভেচ্ছা।

মোরশেদ শফিউল হাসান

প্রচ্ছদলিপি : হামিদুল ইসলাম ॥ প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

www.pathagar.com

বদরুদ্দীন উমর

পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্ব বাঙলায় শ্রমিক আন্দোলন

১. শ্রমিক ফেডারেশনসমূহের উদ্ভব

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, তারিখে ভারত ও পাকিস্তানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নোতুনভাবে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

> ভারতবর্ষ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার এবং তার থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে পাকিস্তান এলাকার সাথে সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁদেরকে একটি পৃথক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠনের জন্য সাধারণ কাউন্সিল অনুমতি দিচ্ছে এবং নিম্নলিখিতদেরকে নিয়ে একটি অস্থায়ী কমিটি নিয়োগ করে তাঁদেরকে কোঅপ্‌ট করার ও যেভাবে তাঁরা সঠিক মনে করেন সেইভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন পর্যালোচনার ও সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করছে :
>
> পূর্ব বাঙলা-কমরেড্‌স এ.এম. মালেক, ফয়েজ আহমদ, মহম্মদ ইসমাইল, নেপাল নাগ ও দীনেন সেন।
>
> পশ্চিম পাঞ্জাব-কমরেড্‌স ফজল এলাহী কুরবান, মীর্জা ইব্রাহিম ও রমেশ চন্দর।
>
> সিন্ধু-কমরেড্‌স নারায়ণ দাস বেচার, সবো ও জে বোখারী।
>
> সাধারণ কাউন্সিলের এ বিষয়ে আস্থা আছে যে, একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় তাহলে ভারত ও পাকিস্তানের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সাধারণ অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন ও সাধারণ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্যের জন্য একটি সংগঠনের ব্যবস্থা হবে। সাধারণ কাউন্সিল আরও ঘোষণা করছে যে, সিদ্ধান্ত যাই হোক, শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্রের সাধারণ লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকবে এবং দুটি রাষ্ট্রে ভারতবর্ষের বিভক্তি সেই শ্রমিকদের শ্রেণী ঐক্য এবং সংহতিকে আঘাত করবে না যাঁরা AITUC-এর পতাকাতলে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে তুলেছেন স্থায়ী সম্পর্ক।[১]

পূর্ব বাঙলা গ্রুপের একটি সম্মেলন ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, তারিখে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা

www.pathagar.com

নাজিমুদ্দীন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তাতে অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন ডক্টর আব্দুল মোত্তালেব মালেক, মারুফ হোসেন, নেপাল নাগ, দীনেন সেন, সমর ঘোষ, অশ্বিনী দেব, অমৃতেন্দু মুখার্জী, মহম্মদ ইসমাইল, অনিল বসাক, রাধা গোবিন্দ সরকার, সুশীল সরকার, আফতাব আলী, ফয়েজ আহমদ, সুলতান আহমদ এবং অধ্যাপক শিবদাস গাঙ্গুলী।[২]

এই সম্মেলনেই ২৮শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (EPTUF) নামে একটি শ্রমিক ফেডারেশন গঠিত হয় এবং ডক্টর মালেক ও ফয়েজ আহমদ যথাক্রমে এর সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। এছাড়া নির্বাচিত হন সহ-সভাপতি পদে নেপাল নাগ, মহম্মদ ইসমাইল ও মোহন জমাদার এবং সহ-সম্পাদক পদে অনিল মুখার্জী ও গৌর বর্মন।[৩]

এই ফেডারেশনটিই ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব বাঙলার প্রথম শ্রমিক ফেডারেশন। শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের এটাই ছিল সে সময়ে সব থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। দেশ-বিভাগের ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও সেই সাথে পূর্ব বাঙলার কমিউনিষ্ট পার্টি নিজ নিজ সরকারের সাথে সীমিত সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করায়★ শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তারা সেই নীতি অনুসরণ করেন এবং সরকারী শ্রমিক নেতা ও অন্যান্যদের সাথে একত্রে পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করেন। এ জন্যেই নেপাল নাগ, মারুফ হোসেন, দীনেন সেন, মহম্মদ ইসমাইল, অনিল মুখার্জী প্রভৃতি কমিউনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এই ফেডারেশনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তার কর্মকর্তাও নির্বাচিত হন।

পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির প্রথম বৈঠক ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, তারিখে ডক্টর মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশন আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে এই বৈঠকে AITUC-এর থেকে আর্থিক সাহায্যের চেষ্টা করার জন্য আফতাব আলীকে অনুরোধ করা হয়।[৪] এই সময় ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ দিল্লীতে এশীয় দেশগুলির যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে ডক্টর মালেক মনোনীত হন। পাকিস্তান সরকার এই মনোনয়ন গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী ডক্টর মালেক এবং তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে নেপাল নাগ সেই দিল্লী সম্মেলনে যোগদান করেন।[৫] এ সময় আফতাব আলী পূর্ব বাঙলার প্রথম ও একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে I.L.O (আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা), এর গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন।[৬]

ডক্টর মালেক পূর্ব বাঙলা সরকারের শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে ফেডারেশনের

★পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির' প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সভাপতি পদে ইস্তফা দানের পর ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৮, তারিখে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ডক্টর মালেকের ইস্তফাপত্র বিবেচনার সময় কমিটির বামপন্থী সদস্যেরা চরম প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের মন্ত্রীপদ থেকে ডক্টর মালেকের ইস্তফা দাবী করেন। অপরপক্ষে ফয়েজ আহমদ বলেন যে শ্রমিক আন্দোলনের সুবিধের জন্যেই ডক্টর মালেকের শ্রমমন্ত্রী পদে বহাল থাকা প্রয়োজন।

এই মতবিরোধের ফলে ভয়ানক তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং কমিটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোন পক্ষই এ প্রশ্নে কোন রকম আপোষ করতে সম্মত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটি হয় এবং ফয়েজ আহমদরাই স্বল্প ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। এরপর বামপন্থীরা বৈঠক বর্জন করে বেরিয়ে যান।[৭]

১৯৪৯-এর ১৬ই মার্চ কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূর্ব বাঙলা রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কর্তৃক ফেডারেশনের অনুমতি ব্যতীতই ধর্মঘটের নোটিশ দানের জন্যে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নিন্দা করেন। এর ফলে ফেডারেশনের কমিউনিষ্ট সদস্যেরা ফেডারেশন থেকে ইস্তফা দেন। কিন্তু ইস্তফা দিলেও তাঁরা কোন পাল্টা ফেডারেশন গঠন করেন না। অবশেষে ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৯, তারিখে ফেডারেশনের সম্পাদক ফয়েজ আহমদ পূর্ব বাঙলা রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ঢাকা জেলা সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা রিক্সাচালক ইউনিয়ন, বরিশাল বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন ও আভ্যন্তরীণ লঞ্চ শ্রমিক ইউনিয়ন (Inland Steam Navigation Workers Union)-কে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কার করেন।[৮]

এই বহিষ্কৃত ইউনিয়নগুলির প্রত্যেকটিই ছিলো কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপলক্ষ্য যাই হোক, পূর্ব বাঙলা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে কমিউনিষ্টদের এই বিচ্ছেদের মূল কারণ ছিলো ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির মার্চ ১৯৪৮-এ গৃহীত নোতুন রণনীতিগত লাইন ও কর্মসূচী। এই নোতুন লাইনের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের উভয় সরকারের প্রতিই কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় এবং তাঁরা সরকারকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে তার সাথে সকল সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিযুক্ত হন। শুধু তাই নয়। এ সময় তাঁরা সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করায় তাঁদের পক্ষে ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত কোন ফেডারেশনের শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা আর কিছুতেই সম্ভব হয় না।

৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের সভাপতিত্বে করাচীতে ত্রিপক্ষীয় শ্রম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।[৯] এই সম্মেলনের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও পূর্ব-পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের সম্পাদক মাহবুবুল হক★ ডিসেম্বর ১৯৪৮-এ একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,

> শিল্পে উৎপাদন ক্রমাগত নীচের দিকে যাইতেছে। সরকারী অফিসসমূহে, রেলওয়ে, ষ্টীমার, পোষ্ট অফিসসমূহ Efficiency শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। এদিকে পাকিস্তানের চারদিকের রাষ্ট্রসমূহে গণবিপ্লবের মহড়া শুরু হইয়াছে। পাকিস্তানের অধিকাংশ শ্রমিক উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও দু'বেলা দুই মুঠো খাইতে পায় না– তাদের পরনে কাপড় নাই– তাদের রোগে ঔষধ নাই। তাদের ছেলেপিলেদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে মুনাফাখোর মালিকদের ব্যাংকের অংক ফাঁপিয়া উঠিতেছে। শিল্প জাতীয়করণের দিকে কোন লক্ষ্যই নাই। বিদেশী পুঁজিপতিসমূহ একের পর এক পাকিস্তানের সমস্ত শিল্প দখল করিয়া বসিতেছে, বাজারে বিদেশী পণ্যের ছড়াছড়ি। গৃহশিল্প উন্নয়নের কোন প্রোগ্রাম নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন সম্মেলনে নোতুন কর্মধারার সন্ধান পাইতে হইবে।[১০]

গণবিপ্লবের ভয়ে ভীত এবং দরিদ্র শ্রমিকদের দুরবস্থার জন্যে অশ্রুপাতকারী মাহবুবুল হক এরপর সরকারের অনুগত একজন শ্রমিক নেতা হিসেবে শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ঐ একই বিবৃতিতে বলেন,

> পাকিস্তানের বর্তমান শ্রমমন্ত্রী মন্ডল সাহেবকে আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলিয়া জানি। আশা করি আসন্ন সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্যে তিনি লালফিতার বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন।

এই ধরনের শ্রমিক নেতাদের উপস্থিতিতে করাচীতে যে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ফেডারেশনের সম্পাদক ফয়েজ আহমদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের ঐ একই শ্রেণীভুক্ত শ্রমিক নেতারা একটি সারা পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের বিষয় আলাপ করেন।[১১]

১লা ও ২রা মে, ১৯৪৯, তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ডক্টর মালেকের★★ সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। বহু শ্রমিক সদস্য ছাড়াও সম্মেলনে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রায় তিনশো শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে দেবেন সেন, মৃণাল কান্তি বসু এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সন্তোষ কুমার বসু বাণী পাঠান।[১২]

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অমর ব্যানার্জী তাঁর

★ অক্টোবর ১৯৪৮-এ বামপন্থীরা ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠক বর্জন করার পর খুব সম্ভবতঃ মাহবুবুল হক একজন সহ-সভাপতি মনোনীত হন।

★★অক্টোবর ১৯৪৮-এর উপরোল্লিখিত বৈঠকের পর ডক্টর মালিক মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ফেডারেশনের সভাপতির পদেই বহাল থাকেন।

www.pathagar.com

অভিভাষণে[১৩] বলেন, পাকিস্তানে শিল্প সম্ভার অত্যন্ত কম। তার ওপর সমগ্র বাংলার যন্ত্র-শিল্পের মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত। ধান ও পাটের কারবারের লাভে কোটি কোটি টাকা চোরাকারবারী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের পকেটে চলে যাওয়ার ফলে শিল্পের প্রসার সম্ভব হচ্ছে না। শিল্প উন্নয়নের জন্যে বিদেশী মূলধন নিয়োগ করলে পাকিস্তানকে বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রীত এবং অনুগত করে রাখা হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, মূলধন পাকিস্তানেই আছে, সেটা শুধু আদায় ও সংগ্রহ করাই প্রধান কাজ। প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি জাতীয়করণ ও বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী বাজেয়াপ্তকরণকে উচিত কাজ বলে বর্ণনা করে তিনি কারাগারে আটক শ্রমিক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি জানান।

ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির একজন নেতা ও আন্তর্জাতিক যানবাহন শ্রমিক ফেডারেশনের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্পেশাল কমিশনার জর্জ রীড সরকার ও আন্তর্জাতিক পুঁজির সপক্ষে ওকালতির উদ্দেশ্যে এই শ্রমিক সম্মেলনে তাঁর অভিভাষণে[১৪] বলেন যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষকে অযথা বিব্রত না করে শিল্পে শান্তি রক্ষা করাই শ্রমিকদের কর্তব্য। তিনি আরও বলেন যে, কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত দাবী করা উচিত নয়। অতিরিক্ত দাবী আদায়ের জন্যে বেশী চাপ দিতে থাকলে কলকারখানায় কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে এবং তার ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়তে পারেন।

জর্জ রীডের এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রকৃত চরিত্র কি ছিলো। কাজেই তাদের সম্মেলনে যে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে কমিউনিষ্টদের থেকে শ্রমিকদের সতর্ক থাকার উপদেশ দেওয়া হবে সেটাই স্বাভাবিক। এবং বস্তুতঃপক্ষে হয়েছিলও তাই। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ এতো নগ্ন ও নোংরা আকার ধারণ করে যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের গভর্নিং বডির সদস্য আফতাব আলী পর্যন্ত সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[১৫]

আফতাব আলীর বক্তৃতার পর যোগেন্দ্র মণ্ডল, ডক্টর মালেক এবং অন্যান্যেরা সম্মেলনে যে বক্তৃতা করেন তাতে প্রত্যেকেই একদিকে নিজেদেরকে শ্রমিক দরদী হিসেবে বর্ণনা করে অপরদিকে ধর্মঘট না করা এবং কমিউনিষ্ট 'ধোঁকাবাজদের' সঙ্গে হাত না মেলানোর জন্যে শ্রমিকদেরকে উপদেশ প্রদান করেন।[১৬]

ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পাকিস্তান, TUFP নামে একটি নোতুন শ্রমিক ফেডারেশন ১৯৪৮-এর জানুয়ারী মাসে গঠিত হয়। পাকিস্তান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন, পূর্ব বাঙলা দোকান কর্মচারী ফেডারেশন, R.M.S. ও লোয়ার গ্রেড ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন এবং আরও কয়েকটি ইউনিয়ন এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

ও কোষাধ্যক্ষ পদে যথাক্রমে নূরুল হুদা, কমরুদ্দীন আহমদ ও বি.এ. সিদ্দিকী নির্বাচিত হন।[১৭] নূরুল হুদা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের সভাপতি এবং কমরুদ্দীন আহমদ ছিলেন নিখিল পাকিস্তান ডাক ও তার ইউনিয়নের সভাপতি।[১৮]

নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (APTUF) এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পাকিস্তান, (TUFP)-এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর এই দুই ফেডারেশনকে নিয়ে একটি মাত্র ফেডারেশন গঠনের জন্যে ১৯৫০-এর এপ্রিলের গোড়ার দিকে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[১৯] সেই অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ৩০শে এপ্রিল দুটি ফেডারেশন একত্রিত হয় এবং তার নাম নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনই রাখা হয়। এই পরিবর্তনের পর নূরুল হুদা ফেডারেশনের সভাপতি, কমরুদ্দীন আহমদ সহ-সভাপতি, ফয়েজ আহমদ সাধারণ সম্পাদক, আফতাব আলী কোষাধ্যক্ষ এবং আবদুল আউয়াল ও জহুর হোসেন চৌধুরী সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ বিষয়ে সকলে একমত হন যে, কোন শ্রমিক নেতাই এমন কোন ইউনিয়নের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না যে ইউনিয়নের কোন দায়িত্বে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত নন।[২০]

যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল পাকিস্তান পরিত্যাগ করার পর ডক্টর মালেক পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এরপর থেকে তিনি একটি সারা পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন গঠনের জন্যে করাচীর রয়পন্থী খাতিব ও ঢাকার ফয়েজ আহমদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁদেরকে এ ব্যাপারে সম্মত করাতে সক্ষম হন। এরপর খাতিবের নেতৃত্বাধীন পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার ও নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতারা পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে একটি মাত্র সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমে এই সংগঠনটিকে একটি ফেডারেশন আখ্যা দেওয়ার প্রস্তাব হয়। কিন্তু আফতাব আলী ও কমরুদ্দীন আহমদের প্রস্তাব অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত তার নামকরণ হয় নিখিল পাকিস্তান কনফেডারেশন অব লেবার (APCOL)।[২১] খাতিব ও ফয়েজ আহমদ যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২২]

> এই নোতুন সংগঠনটি পশ্চিম পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার ও পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার নামে দুটি পৃথক আঞ্চলিক সংগঠনের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্যে এই দুটি আঞ্চলিক সংগঠনকেই তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবের বামপন্থীদের প্রভাব থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ডক্টর মালেকের নিজস্ব উদ্যোগে এই সারা পাকিস্তান শ্রমিক সংগঠনটির উদ্ভব ঘটে। এর কার্যকরী বোর্ডে মোট ২১ জন সদস্য থাকেন তার মধ্যে ডক্টর মালেকসহ পূর্ব বাঙলার সদস্য সংখ্যা থাকে ১০।[২৩]

www.pathagar.com

১৯৫১ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার-এর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি কমরুদ্দীন আহমদ।[২৪]

পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী ডক্টর মালেক ফেডারেশনের এই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পুঁজি, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর তিন পক্ষেরই উচিত এই সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিজেদের নীতিকে নিয়োজিত রাখা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নর্মদা ব্যানার্জী তাঁর ভাষণে বলেন যে, শ্রমিকরা এখন নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে কাজেই তাঁদেরকে দিয়ে কোন ব্যাপারে জোর করে কিছু করিয়ে নেওয়া শোষকদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে বলেন যে সারা দেশের শ্রমিকরা এখন নিখিল পাকিস্তান কনফেডারেশন অব লেবারের (APCOL) পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।[২৫]

সম্মেলনের সভাপতি কমরুদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে বলেন যে, প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপদানের দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে ন্যস্ত হয়েছে। ৩১শে মার্চ, ১৯৫০, পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব বাঙলায় রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৮০ হলেও তাদের সব কয়টিই পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার-এর সাথে সম্পর্কিত নয় বলে তিনি সম্মেলনকে জানান। এছাড়া আরও অনেক অরেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক ইউনিয়নের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।[২৬]

এরপর কমরুদ্দীন আহমদ সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ব বাঙলার শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রমিকদের মজুরী খুবই কম এবং তাঁরা দারুণভাবে ঋণগ্রস্ত। কলকারখানায় বিশেষত চা বাগান ও সুতাকলগুলিতে শ্রমিকদের বাসস্থানের দুরবস্থা, পানীয় জলের অভাব এবং অন্যান্য বহু অসুবিধের কথা তিনি উল্লেখ করেন। রেল শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের বাসস্থানের মোটামুটি ব্যবস্থা থাকলেও অন্যদের কোনই ব্যবস্থা নেই। দেশ বিভাগের পর মোহাজেরদের বিপুল সংখ্যায় পূর্ব বাঙলা আগমনের ফলে এদিক দিয়ে পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। পাকিস্তানে নাবিকদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ বলে তিনি জানান। এঁদের এক-তৃতীয়াংশ সব সময়ে জাহাজেই থাকেন। এঁদের শতকরা ৮০ জনই পূর্ব বাঙলার লোক। এই পাকিস্তানী নাবিকরা ভারতের কলকাতা ও বোম্বাই বন্দরে চাকুরি লাভ করেন এবং তাঁরা এখন বিদেশী হিসেবেই গণ্য। পাকিস্তানী নাবিকদের চাকুরি ভারতীয় বন্দরের পরিবর্তে পাকিস্তানী বন্দরে হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

পাকিস্তানী নাবিকদের ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরেট করাচী থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা এবং চট্টগ্রাম ও চালনার জন্য পৃথক পৃথক কল্যাণ কমিটি গঠনের সুপারিশও তিনি করেন। কৃষি শ্রমিকদের দুরবস্থা বর্ণনা করে তাঁদের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ে যাওয়ার আহ্বানও কমরুদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে জ্ঞাপন করেন।[২৭]

পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার-এর এই বার্ষিক সম্মেলনের একটি প্রস্তাবে ডক্টর মালেককে পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করার জন্যে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবটিতে আশা প্রকাশ করা হয় যে, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সর্বশেষ ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনের ১৩টি সর্বসম্মত বিল কার্যকর করার জন্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, কায়েদে আজমের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারের বর্তমান নেতৃবৃন্দ ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করার যে নীতি অনুসরণ করছেন সে বিষয়ে সংগঠিত শ্রমিকরা নিশ্চুপ দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। শ্রমিক উপদেষ্টা বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার জন্যে অপর একটি প্রস্তাবে পূর্ব বাঙলা সরকারকে বলা হয়।[২৮]

সরকারী তত্ত্বাবধানে অর্জিত বুর্জোয়া শ্রমিক নেতাদের এই ঐক্য অল্প দিনই স্থায়ী হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের এই এপ্রিল সম্মেলনের পর ফয়েজ আহমদ ও নূরুল হুদার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব একটা চরম পর্যায়ে ওঠার পর নূরুল হুদার নেতৃত্বে ঐ বৎসরই জুন মাসে পাকিস্তান লেবার ফেডারেশন নামে একটি নোতুন ফেডারেশন গঠিত হয়।[২৯] নূরুল হুদা, নাজির মুস্তফা ও এ. আর. সুন্নামাত যথাক্রমে এই ফেডারেশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই নোতুন ফেডারেশন গঠিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ, টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন ও দোকান কর্মচারী সমিতি পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার থেকে বেরিয়ে আসে।[৩০]

২. রেল শ্রমিক

পূর্ব পাকিস্তান রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ছিলো কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত একটি সংগঠন। কমিউনিষ্টদের সহযোগিতায় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে যখন পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয় তখন এই ইউনিয়নটিও তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পূর্ব বাঙলার কমিউনিষ্ট পার্টি যেহেতু তখনো পর্যন্ত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সাংগঠনিক দিক দিয়ে

www.pathagar.com

সম্পর্কিত ছিল তাই পূর্ব পাকিস্তান রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নও ভারতীয় রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাথে অনুরূপভাবে সম্পর্কিত ছিলো।

এই সম্পর্কের জন্যেই ভারতীয় ইউনিয়ন কর্তৃক, ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ সারা ভারত রেল শ্রমিকদের যে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিলো তার সমর্থনে পূর্ব বাঙলাতেও রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ধর্মঘটের একটি ঘোষণা দেন। পূর্ব বাঙলার এই ধর্মঘট তাই মূলত ছিলো একটি ভ্রাতৃত্বমূলক সংগ্রাম।[১]

এই ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়ার সময় রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে কোন পরামর্শ করার অথবা তাদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। ফেডারেশনের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতিগত বিরোধ এবং তাঁদের দ্বারা ভারতীয় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের লাইন অনুসরণের ফলে তাঁরা ইতিপূর্বেই অন্যান্যদের থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়ার পরই পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ এবং তাদের ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পাকিস্তান, ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান রেলকর্মচারী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক আবদুল হাই রেল ধর্মঘট সম্পর্কে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :

> রেল শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া নিয়া পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগ প্রথম হইতেই সরকারের সহিত লড়াই করিয়া আসিতেছে এবং গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী লীগের লালমনিরহাটের বিশেষ অধিবেশনে এই লড়াই সফল করার জন্যে শেষ কর্মপন্থা হিসাবে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অধিবেশনের পরেই কর্তৃপক্ষের দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য ৪৫ দিনের সময় দিয়া চরমপত্র দেওয়া হইয়াছে। কোন্ দিন হইতে ধর্মঘট শুরু করা হইবে তাহা আগামী ১৯শে ও ২০শে মার্চ ঢাকায় লীগের যে বার্ষিক অধিবেশন হইবে সেখানে স্থির করা হইবে।
>
> ইতিমধ্যে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রচারিত হইতেছে যে আগামী ৯ই মার্চ হিন্দুস্থানের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রেল শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিবে। রাষ্ট্রের ধ্বংসকামী কম্যুনিষ্টরা রেল শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য এই প্রচার করিতেছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিতে চাই যে, এইরূপ বেআইনী ধর্মঘটের সহিত পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের কোন সম্পর্ক নাই। উপরন্তু আমরা সকল রেল কর্মচারীদিগকে এই কম্যুনিষ্ট প্ররোচিত ধর্মঘটে যোগদান না করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। এই ধর্মঘটে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহারা নিজেদের সংহতি নষ্ট করিয়া নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিবেন।[২]

৯ই মার্চে আহূত রেল ধর্মঘটের বিরোধিতা করে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক কমরুদ্দীন আহমদ সংবাদ-পত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :

> খবরের কাগজে প্রকাশিত ৯ই মার্চ তারিখে রেলওয়ে ধর্মঘট সম্পর্কে একটি

www.pathagar.com

খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে বিশেষ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত "রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন" এই ধর্মঘট চালনা করিতেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে এ তারিখেই হিন্দুস্থানের ধর্মঘট একই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইবে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান যে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রাষ্ট্র এই কথাটি কম্যুনিষ্ট দল যে আজো স্বীকার করিয়া লয় নাই ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ।

আমি একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মনে রাখিয়াই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই ধর্মঘটের নোটিশ দিয়া ইষ্টার্ন পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের ধর্মঘটের যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সাবোটাশ করা হইতেছে। দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় যে এই প্রকার ধর্মঘট দ্বারা সমস্ত রেলওয়ে কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ এবং বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস হইতেছে।

আমি সমস্ত রেলওয়ে শ্রমিকদের নিকট আন্তরিকভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন ৯ই মার্চ তারিখের ধর্মঘটে যোগ না দেন এবং যারা বিভ্রান্ত হইতেছে তাহাদের সঠিক পথে চালিত করেন। পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মন্ত্রী ডক্টর মালেক ও সম্পাদক ফয়েজ আহমদ সাহেবের নিকটও আমি আবেদন জানাইতেছি যেন তাঁহারা তাঁহাদের ফেডারেশনে এফিলিয়েটেড, "রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন"-কে এই ভ্রান্ত পথে চালিত না করিয়া রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য, শ্রমিক মঙ্গলের জন্য সঠিক পথে চালিত করেন।[৩]

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকারী ও সরকার সমর্থক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলি যে প্রচারণা ইতিপূর্বে চালিয়ে যাচ্ছিলো ৯ই মার্চের ধর্মঘটের ঘোষণা সেই প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদের জন্যে এক বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি করে। এই সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে যে তারা কোন গাফলতি করেনি তার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত দুটি বিবৃতি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে রেল কর্মচারীদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা খুব বেশী না হলেও তাঁদের ওপর পার্টির যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে জ্যোতি বসু রেল কর্মচারীদের প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিষ্ট পার্টির টিকিটেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাঙলা থেকে হাজার হাজার রেল কর্মচারীর ভারত গমন এবং ভারত থেকে হাজার হাজার রেল কর্মচারীর পূর্ব বাঙলা আগমনের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার ফলে রেল কর্মচারীদের ওপর কমিউনিষ্ট প্রভাব অনেকখানি কমে আসে। পার্টি সদস্যদের অধিকাংশও পূর্ব বাঙলা ত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়ার ফলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এরপর আসে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের নোতুন রাজনৈতিক লাইন। এ সবের পরিণতিতে কমিউনিষ্ট পার্টির অনেক সদস্য

www.pathagar.com

গ্রেফতার হন এবং জনগণের সকল অংশ থেকেই পার্টি দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতেই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত “রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন” ১৯৪৯-এর ৯ই মার্চ ভারতীয় রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সাথে একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি ভ্রাতৃত্বমূলক ধর্মঘটের ঘোষণা প্রদান করে।

জনগণের থেকে, বিশেষত রেল শ্রমিকদের থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে মূলত পূর্ব বাঙলার রেল শ্রমিকদের নিজস্ব দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট আহ্বান না করে এককভাবে শুধুমাত্র ভারতের রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সাথে একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট আহ্বানের যা স্বাভাবিক পরিণতি তাই ঘটেছিলো। ৯ই মার্চের ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে তুলেছিলো।

ধর্মঘট যে ব্যর্থ হবে সেটা ধর্মঘটের আহ্বায়করাও ৯ই মার্চের পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু রেলের চাকা বন্ধ করতেও তাঁরা ছিলেন বদ্ধপরিকর। সে অবস্থায় সন্ত্রাসবাদী লাইন অনুসরণকারী পার্টির পক্ষে যা স্বাভাবিক ছিলো তাই তাঁরা করেছিলেন। রেল বন্ধের মোক্ষম পদ্ধতি হিসেবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রেল লাইন উপড়ে ফেলার।[৪]

এই সিদ্ধান্ত অবশ্য তাঁরা কার্যকর করতে পেরেছিলেন মাত্র একটি জায়গায়–জয়দেবপুর ও টঙ্গীর মাঝামাঝি খইলকইর গ্রাম এলাকায়। এই গ্রামাঞ্চলের নেতা ছিলেন রেল শ্রমিক নেতা আব্দুল বারী। তিনি এই সময়ে ‘উগ্রপন্থী’ পার্টি ইউনিয়নের নেতা নির্বাচিত হন। রেলে অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি রেল লাইন তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিজের এলাকায় কার্যকর করেছিলেন।[৫]

৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের মোকাবেলা করার জন্যে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছিলো। সিলেটের নানকার আন্দোলনের এলাকা থেকে পর্যন্ত পুলিশ প্রত্যাহার করে ধর্মঘট বন্ধের জন্যে তারা সেই সমস্ত পুলিশকে মোতায়েন করেছিলো।[৬]

ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়া এবং খইলকইরে রেল লাইন উপড়ে ফেলার পর সরকার খইলকইর গ্রামাঞ্চলে হিংস্রভাবে শারীরিক নির্যাতন, গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে এক ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। আব্দুল বারী* নিজে

*আব্দুল বারী দীর্ঘকাল কারাগারে ছিলেন। পরে তিনি মুক্তি পান কিন্তু মুক্তির কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

www.pathagar.com

গ্রেফতার হন ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে। ঢাকা রেল ষ্টেশনে যে কমিউনিষ্ট নেতা ধর্মঘটের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তিনি কেরানী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বেই তিনি আরও অনেক সহকর্মীর সাথে গ্রেফতার হয়ে যান।**

১৯৪৯ সালের গোড়া থেকেই পাকিস্তান সরকার কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তার নেতৃত্বাধীন সমস্ত গণ-সংগঠন ও শ্রেণী সংগঠনের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক অভিযান চালায় তারই অঙ্গ হিসেবে ডক্টর মালেকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ কাউন্সিল ১৯৪৯ সালের ৩০শে আগস্ট রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে বহিষ্কার করে।[৮]

৯ই মার্চের ধর্মঘট ঘোষণা এবং ৩০শে আগষ্টের এই বহিষ্কারের পর রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কার্যত ১৯৪৯ সালের শেষ দিকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাথে সাথে একই সময়ে ঢাকা জেলার সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা রিক্সা চালক ইউনিয়ন, বরিশাল বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আভ্যন্তরীণ নৌযান শ্রমিক ইউনিয়নকেও পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৯] বলাই বাহুল্য এই শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রত্যেকটিই তৎকালে ছিলো কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে এই শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অবস্থাও দাঁড়ায় রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মতোই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাঙলায় রেল শ্রমিকদের একটি নোতুন সংগঠন গড়ার জন্যে ঢাকাকে কেন্দ্র করে একটি অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির উদ্যোগে ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭, তারিখে ঢাকায় রেল মজদুরদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনেই এডভোকেট নূরুল হুদার নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ' নামে একটি নোতুন সংগঠনের জন্ম হয়।[১০] এরপর থেকে এই সংগঠনটিই রেল কর্মচারীদের সব থেকে বড়ো এবং সংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

১৯৪৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর লালমনিরহাটে রেল কর্মচারী লীগের উদ্যোগে রেল শ্রমিকদের একটি বিরাট সভা হয়। এই সভায় বিভিন্ন শ্রমিক সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক এম.এস. হক ও রেল কর্মচারী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হাই বক্তৃতা করেন। সভায়

**কেরানী সাহেব নামে পরিচিত এই কমিউনিষ্ট রেল শ্রমিক নেতা ১৯৫১-৫২ সালে মুক্তি পেয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরই টাইফয়েড রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের ছাঁটাই নীতি, রেশন বণ্টন নীতির সমালোচনা, বেতন-কমিশনের রায় কার্যকরী করার ব্যাপারে গাফলতি ও পার্বতীপুরের রেল কর্মচারীদের ওপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ করা হয়। একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে কর্মচারীদের বাসস্থানের দাবী করা হয়।[১১]

এরপর লালমনিরহাটে রেল শ্রমিকদের আর একটি সভা হয় ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৮।[১২] লালমনিরহাট ১নং রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণ থেকে রেলওয়ে শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল বের হয়। রেলওয়ে কলোনীর বিভিন্ন রাস্তা ও স্থানীয় বাজারের মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভকারীরা "জুলুমবাজী বন্ধ কর", "ছাঁটাই বন্ধ কর", "খুদী চাউল বন্ধ কর" ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে শান্তভাবে সমস্ত রাস্তা পরিভ্রমণ করে। এরপর সন্ধ্যা ৬টার সময় ইনষ্টিটিউট হলে রেল শ্রমিকদের একটি সভা হয়। সেই সভায় রেল কর্মচারী লীগের সভ্য সি. কে. কুটি, এম. আর. খাদেম, আব্দুল জব্বার, মহম্মদ নাসিম খান ও কেন্দ্রীয় পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হাই বক্তৃতা করেন।

কর্তৃপক্ষের ছাঁটাই নীতির সমালোচনা করে আবদুল হাই বলেন যে, রেল কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার জন্যেই হাজার হাজার রেল কর্মচারী আজ ছাঁটাইয়ের মুখে। গ্রেনশপের দুরবস্থার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, অচিরে রেল কর্মচারীদেরকে গ্রেনশপ থেকে রেশন সরবরাহ না দিলে তাঁদের স্বাস্থ্য কিছুতেই রক্ষা হবে না। রেল কমিশনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বলেন যে কর্তৃপক্ষ রেল কর্মচারীদের দাবী দাওয়া উপেক্ষা করে চললে তাঁদের মধ্যে 'উচ্ছৃঙ্খলা' দেখা দেবে।

১৯৪৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হলে পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের ময়মনসিংহ শাখার এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সাপ্তাহিক সৈনিকের সম্পাদক এনামুল হক। রেল কর্তৃপক্ষ বারো হাজার নিম্নপদস্থ কর্মচারী ছাঁটাইয়ের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রতিবাদে আহূত এই সভায় প্রায় দুই হাজার স্থানীয় রেল কর্মচারী যোগদান করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তানের যুগ্ম-সম্পাদক ও পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক এম.এস. হক, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হাই, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তানের প্রচার সম্পাদক আতিয়ার রহমান এবং ডাক ও তার ইউনিয়নের সম্পাদক আলী আহমদ এই রেল কর্মচারী সমাবেশে যোগদান করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ শাখা রেল কর্মচারী লীগের প্রচার সম্পাদক এম.ই. খান বলেন,

www.pathagar.com

ই. বি. রেলের জেনারেল ম্যানেজার বার হাজার রেল শ্রমিকের প্রতি ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছেন। আজকের এই দুর্দিনে ছাঁটাই হওয়া যে কি ভয়াবহ ব্যাপার তা কর্তৃপক্ষ ছাড়া বোধ হয় আর সকলেই বোঝেন। তাছাড়া এই ছাঁটাইয়ের লিষ্টের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁরা ১৯২২ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অনেকেরই পেনশনের সময় হয়ে এসেছে, বুড়ো হয়ে গেছে– এই সময় তাদের পথে বসানোর ব্যবস্থা হল।

সিরাজ আলী ও আবদুল জব্বার গ্রেনশপ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অবহেলার সমালোচনা করেন। তাঁরা এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, গ্রেনশপ থেকে তেলের নামে হোয়াইট অয়েল ও চালের নামে খুদ সরবরাহ করা হয় এবং তাও নেহাত অপর্যাপ্ত। এই অখাদ্য খেয়ে শ্রমিকদের দিন দিন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে।

আব্দুল হাই তিনটি রেল শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকার তুলনামূলক বিচার করে বলেন যে, একমাত্র রেল কর্মচারী লীগই বিভেদ সৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠে কর্তৃপক্ষের দমন নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তিনি রেল কর্মচারী লীগের পতাকাতলে সকল রেল শ্রমিককে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন আতিয়ার রহমান, এম.এস. হক ও সভার সভাপতি এনামুল হক।

এম.এস. হক সভাশেষে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে কর্তৃপক্ষকে ছাঁটাইয়ের বিষয়টি আবার বিবেচনা করতে অনুরোধ জানানো হয় এবং উদ্বৃত্ত কর্মচারীদেরকে কিভাবে কর্তৃপক্ষ কাজে নিয়োগ করতে পারেন তার কতকগুলো পথ নির্দেশ করা হয়। একটি প্রস্তাবে অখাদ্য রেশনের পরিবর্তে ভাল রেশন সরবরাহের দাবী করা হয় এবং অপর একটি প্রস্তাবে ময়মনসিংহ শাখার সুযোগ্য সভাপতি সাইদুল হককে বদলী করে কর্তৃপক্ষ যে দমননীতির পরিচয় দিয়েছেন তার নিন্দা করে তাঁর বদলী বাতিল করার অনুরোধ জানানো হয়।

সমবেত রেল শ্রমিকরা রেল কর্মচারী লীগের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে লীগের নির্দেশে নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে যাবেন বলে সভাস্থলেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

২০শে মার্চ, ১৯৪৯, তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়।[১৪] এই অধিবেশনে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত অনেক রেল শ্রমিক যোগদান করেন। এছাড়া ডাক বিভাগের শ্রমিকসহ অপরাপর প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরাও এই সম্মেলনে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তানের সভাপতি নূরুল হুদা।

www.pathagar.com

কোরান তেলাওয়াতের পর সম্মেলনের কাজ শুরু করে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান আজিজুল ইসলাম বলেন যে, যে রাষ্ট্র ইসলামী হবে সে রাষ্ট্রের সম্পদে প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। শ্রমিকরা যাতে অন্তত সামান্য কিছু পায় তার জন্যে তিনি ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে বিলাসিতা কমানোর আহ্বান জানান। মোহাম্মদ আলী চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় শ্রমিকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের চট্টগ্রাম হেড কোয়ার্টারের সম্পাদক ইসহাক বলেন,

> আমরা যখন খাওয়া পরা, বাসস্থানের দাবী তুলি, তখনই আমাদের কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই আমরা কম্যুনিষ্ট নই। আমরা পাকিস্তানী, মুসলমান। কিন্তু সত্যিকার মুসলমানী কি আমাদের সমাজে আছে? লম্বা প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিলাস যা আমাদের নেতাদের প্রধান কাম্য তাহা মুসলমানী নয়। দেশের শতকরা ৯০ জনের জীবনযাত্রার সঙ্গে মুষ্টিমেয় লোকের জীবনযাত্রার মানের অন্যায় পার্থক্য যত শীঘ্র তিরোহিত হইয়া যায় ততই মঙ্গল।

মহাম্মদ আক্রামও এই প্রসঙ্গে বলেন,

> যারা আমাদিগকে কম্যুনিষ্ট বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই এইভাবে কম্যুনিষ্টদের আদর্শ প্রচার করিতেছে। পেটে যাহাদের ভাত নাই, রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে যাহাদের এতটুকু মূল্য নাই, তাহাদের কাছে এভাবে কম্যুনিজমের বুলি আওড়াইয়া প্রকারান্তরে কর্তৃপক্ষই আজ দেশে কম্যুনিজমের বিস্তারে সাহায্য করিতেছেন।

রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের ঢাকা শাখার সম্পাদক আবদুর রউফ শ্রমিকদের দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন,

> গেজেটেড অফিসারদের মত ছুটি উপভোগ হইতেও আমরা বঞ্চিত। ...বর্তমানের রেলওয়ে অফিসাররা শাসন চালাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই অক্ষম অফিসাররাই আজ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিকতা আনয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সংগঠনের ভৈরব শাখার সম্পাদক আব্দুল হালিম বলেন,

> আমরা ভৌগোলিক স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু অর্থনৈতিক পরাধীনতা আমাদের এখনো কাটে নাই। চার কোটি মজলুম মানুষের আর্থিক ও আত্মিক উন্নতি ব্যতীত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতি হইতে পারে না। গ্লাস ওয়ার্কার ইউনিয়নের প্রতিনিধি গাঙ্গুলী বলেন, রেলওয়ে শ্রমিকদের মত অন্যান্য শ্রমিকদের অবস্থাও আজ ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। আজ তাই সকলের একত্রিত হইয়া আন্দোলন করিতে হইবে। বর্তমানে চুপ করিয়া থাকার অর্থ অনিবার্য ধ্বংস।

সম্মেলনে দোকান কর্মচারী সংঘের পক্ষে প্রহ্লাদ চন্দ্র দাশ এবং ডাক ও তার ইউনিয়নের সভাপতি বি. সিদ্দিকী বক্তৃতা করেন। সিদ্দিকী তাঁর বক্তৃতায়

www.pathagar.com

বলেন,

> গরীবের রক্তস্নাত হইয়া কায়েম হইয়াছে পাকিস্তান। কিন্তু পরিণামে এই দুর্ভাগারা আজ একমুঠি খাইতে পারিতেছে না, দেশের সম্পদের ন্যায্য বন্টন হইতেছে না। কতিপয় সুবিধাবাদী নেতা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই আজ দেশের সমস্ত সম্পদ লুট করিতেছে। কিন্তু এই অন্যায় আমরা বরদাস্ত করিব না। আমাদের গভর্ণমেন্ট কোনরূপ সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না। গভর্ণমেন্টকে সমালোচনার অধিকার ইসলামের একটা মৌলিক অবদান। অথচ তাঁরা সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁরা প্রমাণ করিতেছেন যে, তাঁরাই "স্তালিন"। কারণ স্তালিনের রাজ্যেই কাহারও সমালোচনার অধিকার নাই।

সম্মেলনের বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য থেকে, বিশেষত সিদ্দিকীর বক্তৃতায় স্ট্যালিনের এই উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের নেতৃত্বসহ তৎকালীন অপরাপর শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কমিউনিষ্ট বিরোধী ও বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন ছিলো। সরকারের সমালোচনা করলেও এই সব নেতৃবৃন্দ শুধু যে কমিউনিষ্ট বিরোধিতার ক্ষেত্রেই সরকারের সহযোগী ছিলো তাই নয়, শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রে তারা ছিলো তৎকালীন সরকারের সহযোগী। তাদের এই চরিত্র অবশ্য সাধারণ শ্রমিকদের কাছে ধরা পড়তে অনেক দেরী হয়েছিলো।

সর্বশেষে সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগুলিতে ক্ষমতার কামড়া-কামড়ির নিন্দা করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণে নিয়োজিত রাখার সংকল্প জানানো হয়। প্রস্তাবে পে কমিশন, গ্রেনশপ ও ছাঁটাই সম্পর্কে যদি একটা সন্তোষজনক মীমাংসা না হয় এবং তার ফলে কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান এমপ্লয়ীজ লীগ দায়ী থাকবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। শেষোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে গিয়ে শ্রমিক নেতা চেরাগ খান বলেন যে, "দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা আছে রেলওয়ে কর্মচারীদের হাতে। আমাদিগকে কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাহিলে ফল হইবে না।"

সম্মেলনে পরবর্তী বৎসরের জন্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন :

সভাপতি– মহম্মদ নূরুল হুদা,
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি– চেরাগ খান,
সম্পাদক– মাহবুবুল হক,
যুগ্ম সম্পাদক– আবদুল হাই, এম.এস. হক।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী সরদার আব্দুর রব নিশতার পূর্ব বাঙলা সফরে আসেন। এই উপলক্ষে ৬ই এপ্রিল ঢাকা ডি.টি.এস অফিস প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের ঢাকা

www.pathagar.com

শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।[১৫] এই সভায় রেল কর্মচারীসহ প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক যোগদান করেন।

শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া উল্লেখ করে ঢাকা শাখা রেল শ্রমিক লীগের সম্পাদক খন্দকার আব্দুল হাই একটি মানপত্র পাঠ করেন। তাতে বলা হয়,

> ছাঁটাই, গ্রেনশপ, বাসস্থান ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এই চারটি এখন পূর্ব পাক রেল শ্রমিকদের সামনে বড় সমস্যা।... পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর জনসাধারণ, বিশেষ করে শ্রমিকগণ বড় আশা পোষণ করেছিলো যে, ইসলামের সুমহান আদর্শেই পাক রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এবং তার ফলে শ্রমিকগণ "রিজকুলকারিন" উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শী ছাঁটাই নীতিতে তাদের সে আশা ভেঙে যাচ্ছে। ...গ্রেনশপে দুর্নীতি যথেষ্ট ছিল একথা অস্বীকার করবার যো নেই। সেইজন্য এই দুর্নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার উদ্দেশ্যে যখন "গাজদার কমিটি" নিয়োগ করা হয় তখন আমরাই একে মোবারকবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু গ্রেনশপ তুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের রুজি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যে বন্দোবস্ত হচ্ছে তাতে আমরা স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হয়েছি। তারপর বাসস্থানের কথা। মালগাড়ী ও পচা খুপরীতে রেল শ্রমিকগণ বাস করার নামে যেভাবে পচ্ছে তাতে বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও সেই গুহাবাসীদের কথাই মনে পড়ে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিষয় উল্লেখ করে মানপত্রটিতে বলা হয়, ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা এই মহান আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে, এ রকম আশ্বাস আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপ ব্যবহারের দ্বারা রেল কর্তৃপক্ষ এসব আশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানে বাক্ স্বাধীনতা ও সংগঠন স্বাধীনতাকে প্রগতির প্রাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকার এই সব ওয়াদা খেলাপ করে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে পিষে মারার সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেছেন। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের একতা ভাঙবার জন্য কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ তাদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষ ও প্রাদেশিকতার বীজ ঢুকাবার চেষ্টা পেয়েছেন। বৃটিশ আমলাদের অনুসৃত এই ভেদ নীতি কিছুতেই ইসলাম সম্মত হতে পারে না।

মানপত্র পাঠের পর রেল কর্মচারী লীগের প্রচার সম্পাদক এম.আই. খান শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে উর্দুতে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন যে, এনকোয়ারী কমিটির রায় ব্যতীত যেন শ্রমিক ছাঁটাই না হয় এবং গ্রেনশপের সুবিধার বদলে যেন উপযুক্ত ভাতার বন্দোবস্ত করা হয়। বাসস্থানের সমস্যার প্রতি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তিনি শ্রমিক আন্দোলনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। এরপর তিনি বলেন যে, পাকিস্তানে সুখে বাস করার আশাতেই শ্রমিকরা লড়েছিল কিন্তু এই লড়াইয়ের বদলে আজ তারা খাওয়া পরা, এমনকি কথা বলার হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদের বিক্ষোভ দূর করে পাকিস্তানের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে তিনি রেলমন্ত্রীকে আহ্বান জানান। উচ্চ কর্মচারীরা এখনো আগেকার ঢঙে নিম্ন কর্মচারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে চলেছে এই অভিযোগ করে তিনি বলেন, এসবের দ্বারা

www.pathagar.com

কর্মচারীদের যোগ্যতাই খাটো হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন যে, উচ্চ কর্মচারীরা নিম্ন কর্মচারীদেরকে যখন ইসলামের নীতি অনুযায়ী ভাই হিসেবে মনে করতে পারবে একমাত্র তখনই তারা পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও হেফাজতের জন্য সর্বস্ব কোরবান করতে এগিয়ে আসবে।

পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক ও সভাপতি নূরুল হুদা তাঁদের বক্তৃতা শেষ করার পর সরদার নিশতার তাঁর বক্তৃতা প্রদান করেন। তাতে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তদন্ত কমিটির রায়ের ভিত্তিতেই ছাঁটাই করা হবে এবং বাড়তি কর্মচারী ছাঁটাই হলে তাঁদেরকে অন্য বিভাগে কাজ দেওয়া হবে। বাসস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই অব্যবস্থার জন্যে তিনি খুবই লজ্জিত এবং শীঘ্রই এই সমস্যার একটা প্রতিকার তাঁরা করবেন। পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব জনগণেরই, এই উক্তির পর তিনি বলেন যে, মোটরের ড্রাইভার বদল করতে গিয়ে মোটর যেন ভাঙা না হয় সেদিকে প্রতিটি বাসিন্দারই লক্ষ্য থাকা দরকার। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, রেল কর্মচারী লীগের প্রতিনিধিদের সাথে শ্রমিক সমস্যার বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি কি কি করতে পারেন সে বিষয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁদেরকে জানাবেন।

উপরে উল্লিখিত মানপত্রে গ্রেনশপ তুলে দেওয়া সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছিল মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করে, তা এড়িয়ে যাওয়ায় এবং অন্যান্য কতকগুলি দাবী দাওয়া ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করায় সভার শেষে সমবেত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়।

এরপর ঢাকা থেকে সরদার নিশতার ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম গমন করেন। পথে ভৈরব, আখাউড়া, পাহাড়তলী প্রভৃতি প্রত্যেকটি ষ্টেশনে হাজার হাজার রেলশ্রমিকের উপস্থিতিতে রেল কর্মচারী লীগের স্থানীয় শাখাসমূহের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।[১৬]

চট্টগ্রামে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রেল কর্তৃপক্ষ রেলওয়ে দালানের সামনে একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় অল্প কিছু সংখ্যক শ্রমিক সমবেত হলেও রেল কর্মচারী লীগের আহ্বানে হাজার হাজার রেল শ্রমিক ঐ একই সময়ে পোলো গ্রাউন্ডে সমবেত হন। সাধারণ শ্রমিকরা সরকারী তত্ত্বাবধানে আয়োজিত কোন সভায় মন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবী দাওয়া পেশ করতে আপত্তি জানান। এই পরিস্থিতির ফলে সরদার নিশতার নিজে পোলো গ্রাউন্ডে এসে সেখানে সমবেত শ্রমিকদেরকে রেলওয়ে দালানের সামনে নিয়ে যান।[১৭]

www.pathagar.com

এরপর রেল কর্মচারী লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবী দাওয়া পেশের উদ্দেশ্যে সরদার নিশতারের কাছে একটি ডেপুটেশন যায়। তাতে থাকেন পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের সভাপতি নূরুল হুদা, কার্যকরী সভাপতি চেরাগ আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম. আর. খাদেম এবং সামছুল হোসেন (ড্রাইভার)সহ অন্য একজন ড্রাইভার। সরদার নিশতার ডেপুটেশনকে কোন বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[১৮]

সরকারের সাথে আপোষকারী ও দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার ও তাদের নিয়ন্ত্রিত রেল কর্তৃপক্ষের শ্রমিক নির্যাতন ও শোষণের মুখে এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ সরকার বিরোধী হয়ে উঠতে থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকরা সরকারের ও রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তরভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকার ফলে রেল কর্মচারী লীগের নেতৃবৃন্দও এই বিক্ষোভের সাথে তাল রেখে সরকারের কাছে নানান দাবী দাওয়া পেশ করতে থাকেন এবং শ্রমিক বিক্ষোভে শামিল হতে বাধ্য হন। কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চের ধর্মঘটের পর লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এই পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগই হয়ে দাঁড়ায় পূর্ব বাঙলায় রেল শ্রমিকদের সব থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন।

চট্টগ্রাম, সিলেট এবং উত্তর বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রেল শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে সভা, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন।[১৯] পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে কর্মচারী লীগের প্রভাব রেল শ্রমিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পূর্ব বাঙলায় রেল শ্রমিকরা কি নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন তা ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত রিপোর্টটি[২০] থেকে বোঝা যাবে,

> পূর্ব পাকিস্তানের রেল শিল্প তথা এই প্রদেশের প্রাণকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছে সেই রেল মজদুরগণ আজ চরম অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছে। বাসস্থান সমস্যা হয়েছে সবচেয়ে প্রবল। গত দু'বছরে রেল কর্তৃপক্ষ প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করেছেন শ্রমিকদের বাসস্থান তৈরির নামে। কিন্তু এখনও হাজার হাজার রেল কর্মচারী মালগাড়ীতে, খোলা বারান্দায় বা অপরের দুয়ারে অতি জঘন্য অবস্থায় অপরিসীম দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করছে।
>
> বর্ষাকাল এসে গেছে। পুরানো ঘরগুলির মেরামত না হওয়ায় ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি পড়ে ভেতরে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সারা রাত ঘরের এক কোণায় গুটি মেরে বসে থাকতে হয়। ঝড়ে চালা উড়ে যাওয়ায় দিনের পর দিন খোলা আকাশের সঙ্গে

www.pathagar.com

মিতালী করে চলতে হয়। প্রায় বাড়ীরই হয় পায়খানা নেই, নয় তার দরজা নেই। আবরুর মাথা খেয়ে নির্লজ্জভাবে মেয়েছেলেদের তারই মধ্যে দিন গুজরান করতে হয়।...এক কোটি টাকা ব্যয় করে যে ঘর দুয়ার রেল শ্রমিকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে তার বাস্তব চেহারাটা হলো এই।

পে-কমিশন সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয়,

পে-কমিশন বস্তুটি এমন যে শ্রমিকরা তার নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে। এর রায় সাধারণভাবে শ্রমিকদের জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে নি। কারণ গ্রেনশপ তুলে দেওয়ার ফলে এর থেকে যে সুবিধা আশা করা গিয়েছিল তা একেবারেই মিথ্যা হয়ে গেছে।

ইচ্ছামত স্কেল বেঁধে দেওয়া এবং কতকগুলি শ্রেণীর বেতন কমিয়ে দেওয়ার ফলে অবস্থাটা আরো গুরুতর হয়েছে। অনেক উদাহরণ দেখানো যেতে পারে যেখানে পে-কমিশনের রায় কার্যকরী করার পরেও একজন শ্রমিক ১৯৩৯ সালে যে বেতন পেত তার চেয়েও অনেক কম পাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিশেষ মাগ্গীস্বরূপ যে ৬ টাকা দেওয়া হয়েছে তা শ্রমিকরা অপমানকর বোধ করে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় এখানকার জীবনযাত্রার ব্যয় অনেকগুণে বেশী। এর কারণ সম্ভবত এই যে, পে কমিশনে কোন শ্রমিক প্রতিনিধি নেওয়া হয় নি এবং এর সভ্যরা এই প্রদেশে এসে নিজেদের চক্ষে আসল ব্যাপারটা কখনও দেখবার তকলীফ স্বীকার করেন নি।

গত বাজেট সেশনে মাননীয় যোগাযোগ সচিব পাক পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, পে কমিশনের রায়ের গলদ সংশোধন করার জন্য সরকার শীঘ্রই একটা কমিটি নিয়োগ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ চার মাস পরেও সেই কমিটি নিয়োগের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এমনিভাবে সরকার শ্রমিকদের জীবন নিয়ে বিনা দ্বিধায় ছিনিমিনি খেলছেন।

ছাঁটাই ও অপরাপর সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয়,

ছাঁটাই কর্তৃপক্ষের একটা খেয়াল খুশীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৯ সনে একবার কয়েক হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হলো, কিন্তু কিছুদিন পরেই কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন এই ছাঁটাইয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না এবং ফলে সমস্ত ছাঁটাই কর্মচারীদের আবার কাজে নিয়োগ করা হলো, এমনকি বাইরের থেকেও লোক নিয়োগ করা হলো।

হঠাৎ আবার কর্তৃপক্ষ ছাঁটাইয়ের কথা ভাবছেন। খামখেয়ালী ছাঁটাইয়ের ফলে গরীব শ্রমিকদের যে কি দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় তা কর্তৃপক্ষের নিশ্চয় স্মরণ থাকে না। গত বছরের ছাঁটাইয়ে যে সব ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও শেষ হয় নি। এর মধ্যে নোতুন ছাঁটাইয়ের হুমকি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। দক্ষতার শাসন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রেলের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। ভুয়া অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে যদি ছাঁটাই শুরু করা হয় তাহলে সারা রেলওয়েতে যে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে তা রুখবার

www.pathagar.com

ক্ষমতা হয়ত রেল কর্তৃপক্ষের থাকবে না। সর্বস্ব কোরবান করে যারা পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছিল, ছাঁটাইয়ের অর্থ হবে তাদেরকে আবার হিন্দুস্থানে প্রেরণ করা।

কথায় কথায় আজকাল শ্রমিকদের চাকরি যায়–কর্তৃপক্ষ তার কারণ দর্শানো বা কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেন না। চাকুরির নিরাপত্তা নেই, কথায় কথায় চার্জশীট, সাসপেনসন। দু'বছরেও একটা কেস ফয়সালা হয় না। কোর্ট থেকে মুক্তি পেলেও চাকুরি পেতে দু'বছর আড়াই বছর লাগে। প্রমোশন, বদলী সব কিছু উপরওয়ালার খেয়াল খুশীমত চলে। স্বজনপ্রীতি খুব বেপরোয়াভাবে চলছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোন হিসাব নিকাশ নেই। চাকুরি থেকে অবসর নিলে পাঁচ বছরেও টাকা পাওয়া যায় না। তারা কি খেয়ে বেঁচে থাকে তার কোন বিবেচনা নেই। রেলের ক্লাবে মজুরদের জায়গা নেই, তারা অস্পৃশ্য। তাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর কোন ব্যবস্থাই নেই। সমবায় প্রথার বা Social Insurance-এর কোন স্কিম নেই। অথচ শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে হলে এসব স্কীমের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করবে?

এসব বাধা বিপত্তির মধ্যে আজকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শ্রমিকদের একতা এবং পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতা। একতাবদ্ধ শ্রমিকদের সংগ্রামের সম্মুখে কোন জুলুমবাজ দালালই দাঁড়াতে পারবে না।

১৯৫১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকাতে পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২১] এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নূরুল হুদা।

পরবর্তী বৎসরের জন্যে এই সম্মেলনে যাঁরা রেল কর্মচারী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন :

সভাপতি–নূরুল হুদা, কার্যনির্বাহক সভাপতি–চেরাগ আলী, মাহবুবুল হক, সহকারী সভাপতি–এম.এস. হক, এস.সি.এইচ. ডক্টর এম রহমান, সি. গ্যানসিলিভিস, সাধারণ সম্পাদক–এম.এ হাই।

ভাষা আন্দোলনের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের মধ্যে একটা নোতুন বিন্যাস ঘটে। বেশ কিছু প্রগতিশীল জঙ্গী কর্মী ও নেতা এর মধ্যে দিয়ে তখন গড়ে ওঠেন। চট্টগ্রামের চৌধুরী হারুনুর রশীদ ও এম.এস. হক এঁদের অন্যতম। চৌধুরী হারুনুর রশীদ ভাষা আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন। জসিমউদ্দীনসহ উত্তর বাঙলার কমিউনিষ্ট পার্টিভুক্ত রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অপরাপর নেতারা পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগের এই নোতুন বিন্যাসে সহায়তা করেন।[২২]

www.pathagar.com

৩. ডাক ও তার শ্রমিক

৬ই মার্চ, ১৯৪৯, তারিখে ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে পাকিস্তান পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এই অধিবেশনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি, আর.এম.এস-এর নেতৃবৃন্দ এবং পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। প্রতিনিধিরা ডাক ও তার কর্মচারীদের দুরবস্থার অনেক বর্ণনা দেন। বগুড়া ও কুমিল্লার উপরস্থ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারের ও জমি পত্তনের ব্যাপারে দুর্নীতির বিবরণ শুনে উপস্থিত প্রতিনিধি এবং ডাক ও তার কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

পিয়ন ইউনিয়নের প্রতিনিধি পিয়নদের অবস্থা ও পে-কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করেন। নারায়ণগঞ্জ টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ইউনিয়নে ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বক্তৃতা দেন।

এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে বেতন বৃদ্ধি, মফস্বলে গ্রেনশপের ব্যবস্থা, দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারপরায়ণ অফিসারদের অপসারণ, নিম্নতম দাবীগুলি মেনে না নিলে ধর্মঘটের ব্যালট গ্রহণ ও পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে যোগদান সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বি. সিদ্দিকীকে সভাপতি ও আবু তাহেরকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ডাক ও তার শ্রমিক ইউনিয়নের একটি নোতুন কমিটিও এই বার্ষিক অধিবেশনে গঠিত হয়।

১৯৫০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সিলেটের জিন্না হলে নিখিল পাকিস্তান পোষ্টম্যান ও লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ ইউনিয়ন (আর.এম.এস. সংযোজিত) এর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২] এতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি নূরুল হুদা। সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোপীকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁর অভিভাষণে নিম্নতম ডাক কর্মচারীদের দুঃখ দুর্দশার অনেক বর্ণনা দেন। সম্মেলনের সভাপতি নূরুল হুদা তাঁর অভিভাষণে বলেন,

> যে সকল দরিদ্র ডাক কর্মচারী জনসাধারণের খেদমত করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমাদের সরকারের কর্তব্য। একজন কর্মচারী ৩০ টাকা পাইবে এবং অপর জন ৩০০০ টাকা পাইবে এই প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবধান আমরা বরদাস্ত করিব না। সাম্যের ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়িয়া উঠিবে। ইহা ইসলামের মূল নীতি। প্রতিক্রিয়াশীলেরা আপনার কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য যাহারা জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার কথা জনসাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছেন

www.pathagar.com

অথবা তাহা লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন তাহাদিগকে পঞ্চম বাহিনী, কম্যুনিষ্ট, দেশদ্রোহী বলিয়া আখ্যা দিতে লজ্জাবোধ করিতেছেন না।

১৯৫০ সালের ৩রা ডিসেম্বর সিলেটের দুর্গাকুমার পাঠশালায় পাকিস্তান পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের সিলেট জেলা শাখার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৩] নওবেলাল পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ আলী এতে সভাপতিত্ব করেন। ইউনিয়নের প্রাদেশিক সম্পাদক গোলাম মুর্তজা সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমান সরকারের সাথে আপোষনীতিতে আর কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। তাঁহারা সকল প্রকার আপোষের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আসন্ন সংগ্রামের জন্যে ইউনিয়নের সভ্যদের প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনের সভাপতিসহ অপর যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁরা হলেন, লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ ইউনিয়নের সভাপতি গোপীকৃষ্ণ চৌধুরী, সম্পাদক আখতার, পোষ্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের বিদায়ী সম্পাদক ডি. এ. চৌধুরী এবং এম. চৌধুরী। পরবর্তী বৎসরের জন্যে মাহমুদ আলী সভাপতি এবং দবীরউদ্দীন আহমদ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

চট্টগ্রামের ডাক ও তার কর্মচারীরা ১৯৫০ সালের শেষ দিকে এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রতীক ধর্মঘট করবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে ৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করেন।[৪] এই প্রতীক ধর্মঘটের মাধ্যমে তাঁদের দাবী দাওয়া পূরণের কোন সম্ভাবনা না থাকায় ডাক ও তার কর্মচারীরা ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এপ্রিলের ২ তারিখ থেকে তাঁরা সাধারণ ধর্মঘট শুরু করবেন।[৫]

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ডাক ও তার কর্মচারীদেরকে ধর্মঘট আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দেখে একটি প্রেসনোট জারি করেন। এই প্রেসনোটের জবাবে ডাক ও তার কর্মচারীরা তাঁদের আন্দোলনে জনগণের সহযোগিতা প্রার্থনা করে একটি আবেদন প্রচার করেন।[৬] নিম্নলিখিত এই আবেদনটিতে ডাক ও তার কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আন্দোলনের সাধারণ পরিস্থিতি কিছুটা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

> আমরা টেলিগ্রাম ও টেলিফোন কর্মচারীরা সারা পাকিস্তানের জনগণের প্রতি নিবেদন করছি যে, আমরা বার বার আমাদের ন্যূনতম দাবী-মূল বেতন বাড়ানোর জন্য পাক সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল পাচ্ছি না।
>
> আপনারা জানেন পাকিস্তান সরকার পে-কমিশনের রায়ে যে মূল বেতন ঘোষণা করেছেন, তদ্দ্বারা আজকের এই দুর্মূল্যের দিনে মানুষের চতুর্মুখী অভাবের লেলিহান ক্ষুধার এক অংশও পূরণ করা যায় না।

www.pathagar.com

আজকের দিনে একজন নিম্নপদস্থ অর্থাৎ চতুর্থ গ্রেড কর্মচারীর মূল বেতন কমপক্ষে হওয়া উচিত ৬০ টাকা। সে জায়গায় পে-কমিশনের রায়ে দেওয়া হয়েছে ৩৮ টাকা। তাও এটা দেওয়া হয়েছে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীকে এবং নিম্নশ্রেণীকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৬/১৭ টাকা।

সেই জন্যেই পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হতেই আমরা এর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছি এবং ঠিক রিপোর্ট বের হবার পর থেকেই প্রায় ৬ মাস আমরা 'ধীরে চল'–আন্দোলন চালিয়েছি। তারপর কিছুকাল হতে অসন্তোষের নমুনাস্বরূপ প্রতি মাসের ৫ তারিখে ১ ঘন্টা করে প্রতীক ধর্মঘট চালিয়েছি এবং এরপর হতে গত কয়েক মাস যাবত ১ ঘন্টার স্থলে ২ ঘন্টা করে প্রতীক ধর্মঘট করি। এসব সত্ত্বেও সরকার আমাদের দাবি দাওয়া কোনরূপ বিবেচনা করেন নি, উপরন্তু হুমকি দেখিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছেন।

কিন্তু এতেও টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কর্মচারীদের মনোবল এতটুকু নষ্ট হয় নি বরং আমরা আমাদের দাবীর প্রতি অটল রয়েছি এবং আমাদের একতা দিন দিন দৃঢ়তর হয়ে চলেছে।

গত জানুয়ারী মাস হতে আমাদের প্রতীক ধর্মঘট ২ ঘন্টার স্থলে ৪ ঘন্টার নোটিশ দেওয়া হয়; তখনই আমাদের মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর আমাদের এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সম্পাদককে করাচী ডেকে পাঠান এবং তিন চার দিন আলোচনার পর একটা বিকল্প প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে রয়েছে কেরানী, টেলিগ্রাফিষ্ট এবং টেলিফোন অপারেটরদের জন্য ৩৫-৬০ টাকা বেতন।

পি.এম.জি বাহাদুর এই কেরানী, টেলিগ্রাফিষ্ট এবং টেলিফোন অপারেটরদের বেতন অর্থাৎ ৬৪-৪-১০০-৫-২০০/ এর সঙ্গে হিন্দুস্থানের তার কর্মীদের বেতনের তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, সেখানে সেই একই কাজের জন্য ৬০-১৭০/ টাকা দেওয়া হয়। আর নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কথাটা ইচ্ছা করেই চেপে গ্যাছেন। এর দ্বারা পি.এম.জি. বাহাদুর জনসাধারণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, তাঁরা এখানকার তার কর্মীদের হিন্দুস্থানের তার কর্মীদের অপেক্ষা বেশী দিতে আগ্রহী কিন্তু তার কর্মীদের গুয়ারতুমীর ফলেই কোন মীমাংসায় আসা যাচ্ছে না।

পি. এম. জি. বাহাদুর যা বলেছেন তা সবই সত্য। কিন্তু কয়জন কর্মচারীর ভাগ্যে এই ২০০/ টাকা পর্যন্ত পৌছান সম্ভব হবে সেটা হিসেব করে দেখান নি। কারণ এই ৬৪-৪-১০০-৫-২০০/ টাকা হারে কোন বেতন ভোগীকে ২০০/ টাকা পর্যন্ত পৌছাতে হলে যদি সে জীবনে কোন দিন ছুটি না নেয় (বিশেষ করে অস্থায়ী অবস্থায়) তা হলে তার লাগবে ২৯ বৎসর এবং যে এফিসিয়েন্সি বার দেখান হয়েছে তাতে যদি আটকা না থাকে। অথচ সিভিল সার্ভিস আইনে রয়েছে, ২৫ বৎসর চাকরি হলে আর কোন রকম ইনক্রিমেন্ট কোন কর্মচারীকেই দেওয়া হবে না। যুক্ত ভারত, অধুনা ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাসে এমন কোন পে-কমিশনের নজির নাই যাতে বেতন হারের শেষ অঙ্কে পৌছাতে ২৯ বৎসর লাগে।

তারপর পি.এম.জি বাহাদুর যে প্রেসনোট দিয়েছেন তার দ্বারা এই মনে হয় যে, টেলিগ্রাফিষ্টরাই এই ধর্মঘট করছে (পাক অবজারভার ১৬-২-৫১)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মোটেই সত্য নয়। আমাদের মানুষের মত বাঁচার দাবিতে আমরা

www.pathagar.com

সমস্ত কর্মচারীরাই অংশগ্রহণ করছি। কেরানী, টেলিগ্রাফিষ্ট, টেলিফোন অপারেটর থেকে পিয়ন, লাইনম্যান, কেবলম্যান, কুলি ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি সকলেই। আর আমরা সরকারের কাছে প্রতিটি শ্রেণীর কর্মচারীর বেতনের হার বাড়ানোর দাবী জানিয়েছি।

তিনি আরও বলেছেন যে, টেলিগ্রাফিষ্টরা সকলেই ম্যাট্রিকুলেট– আর তারা যে বেতনের হার দাবী করছেন, সে হারে (অর্থাৎ ৮৫-২৫৫) গ্রাজুয়েট কর্মচারীদের পাক সরকার বেতন দিচ্ছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমরা তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, তাঁর খাস দফতরে কয়জন গ্রাজুয়েট আছেন? আমাদের ধারণা–শতকরা দশজনও আছেন কিনা সন্দেহ।

তিনি আরও বলেছেন যে, তারা যে কাজ করে সেটা কেবল পুনরাবৃত্তি করা মাত্র। একথাটা একেবারেই অর্থহীন, আর যদি তা হয়, তাহলে দুনিয়ার কোন দফতরের কাজ পুনরাবৃত্তি নয়? আবার তিনি অন্যান্য দফতরের কর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে কয়েকটি কথা বলেছেন। এখানে আমরা অন্য কয়েকটি দফতরের কর্মচারীর সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা দেখাতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রেলওয়ে দফতরের তুলনা দেখাচ্ছি : প্রথমেই কাজের সময়ের কথা ধরুন। প্রাদেশিক সরকারের এবং রেলের কতকাংশের কর্মচারীদের কাজের সময় অনিয়মিত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোন সময়ে তার রাত দিন সকাল সন্ধ্যা কিছুই নাই এবং এই নিয়ম বৎসরের সকল ঋতুতেই চলতে থাকে–তা সে ঝড় পানিতে দুনিয়া ভেসে যাক আর শীতের দাপটে বুকের রক্ত জমে যাক। তারপর তারা সপ্তাহের মধ্যে একদিন অর্ধ এবং একদিন পুরা বিশ্রাম ভোগ করেন। আর ক্যাজুয়েল লিভ বলে যে একটি জিনিস আছে তা যে কোন দফতরের কর্মচারীরাই সহজেই ভোগ করতে পারেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এটাও পুরোপুরি ভোগ করা হয়ে ওঠে না। আমাদেরকে সাধারণত, ছুটি নিতে হলেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগে। প্রাদেশিক সরকারের কর্মচারীদের কথাই উঠে না যাদের বার মাসে তের পার্বণের ছুটি মিলে।

দ্বিতীয়ত, অপরাপর দফতরের কর্মচারীরা যেখানেই বদলি হয়ে যান না কেন সেইখানে প্রায়ই তাঁদের বাড়ীর বন্দোবস্ত থাকে। কিন্তু আমাদের বেলায় এসবের কোন বালাই নাই। কোন জায়গায় বদলী হলেই আমাদের চিন্তা-গিয়ে উঠব কোথায়? এমনও হয় যে, কয়েক মাস হয়ত অফিসের বারান্দায় পড়েই কাটাতে হয়। তৃতীয়ত, রেলের কর্মচারীরা বিনা পয়সায় চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ পান। এসব কথা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। চতুর্থত, রেলের কর্মচারীরা গমনাগমনের জন্য কয়েক রকমের ফ্রি পাশ এবং অল্প দামে টিকিট পান। আমাদের এসব ভাবলে বিস্ময় জাগে। পঞ্চমত, রেলের কর্মীদের নিকট হতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের দরুন যে টাকা কাটা হয়, সরকার পক্ষ হতে আরও তত টাকা তাদেরকে দেওয়া হয় এবং এ দুয়ের যোগফলের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের বেলায়– শুধু আমাদের থেকে যেটুকু কাটা হয় সেটা এবং তারই সুদ দেওয়া হয়। তার উপর তারা আবার যত বৎসর চাকুরি করেন তত মাসের বেতন গ্রাচুয়েইটি স্বরূপ পান। আমাদের দাবীও তাই, অবসর আমাদের দরকার নাই। এত অসুবিধা সত্ত্বেও সরকার বাহাদুর আমাদেরকে ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করার জন্য কত রকম ধারা উপধারার সৃষ্টি করে রেখেছেন তার ইয়ত্তা

www.pathagar.com

নেই। দেখানো হয়েছে– এই দফতর বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকার ঘাটতির মধ্য দিয়ে চালিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমরা জানতে চাই, এর জন্য উপরওয়ালাদের অপরিনামদর্শিতা এবং কর্মদক্ষতার অভাবই দায়ী নয় কি? তাই আমরা তার কর্মচারীরা আপনাদের কাছে, আপনাদের ভাই ও পুত্রের অধিকার বলে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারাই এর সঠিক বিচার করুন এবং আমাদের পথ বাতলে দিন। কারণ আমরা যদি অভুক্ত থাকি, তাহলে আপনাদেরই অংশ অভুক্ত থাকবে। আমরা যদি উলঙ্গ থাকি আপনাদেরই অঙ্গ উলঙ্গ থাকবে। কারণ আমরা আপনাদেরই অংশ মাত্র। আমাদের উপরই নির্ভর করছেন লক্ষ লক্ষ আপনারাই। তাই আমরা আপনাদের নিকট আবেদন করছি আপনারা আমাদের বাঁচার দাবীকে সমর্থন করুন এবং সরকারকে আমাদের ন্যায্য দাবী মানতে বাধ্য করুন।

৪. চা শ্রমিক আন্দোলন

বৃটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে চা উৎপাদনকারী এলাকা ছিলো তার মধ্যে একমাত্র সিলেটই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিলেটের চা বাগানগুলিতে যে শ্রমিকরা কাজ করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত। ভারতের বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, সাঁওতাল পরগনা ইত্যাদি থেকে এসে তাঁরা চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং তারপর থেকে নিজেদের দেশের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ক্রমশ ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা চা বাগান এলাকাতেই ঘরবাড়ি বেঁধে সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হন। দেশ বিভাগের সময় সিলেটের এই চা বাগানগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো এক লক্ষেরও বেশী।

যে বাগানে চা শ্রমিকরা কাজ করতেন সেই বাগানের এলাকাতেই তাঁরা বসবাস করতেন এবং শুধু পুরুষরাই নয়, পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুরাও বাগানের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। চায়ের পাতা ছেঁড়ার কাজটি স্ত্রী শ্রমিকরাই করতেন। অপরাপর কাজও তারা ভালভাবেই করতে পারতেন। কিন্তু পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় তাঁরা মজুরী পেতেন কম। পুরুষদের দিন মজুরী যেখানে ছিলো ৪৪ পয়সা, সেখানে তাঁদের দেওয়া হতো ৩৭ পয়সা।[১]

শ্রমিকদের এই সমস্ত চা বাগানে দুই ধরনের কাজ দেওয়া হতো। এর একটির নাম 'হাজিরা' এবং অপরটির নাম 'টিক্কা'। সাধারণত নিযুক্ত শ্রমিকদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হতো এবং সেটা শেষ করার পর তাঁরা তাঁদের নিয়মিত ও নির্ধারিত দিন মজুরী পেতেন। এই নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার পর শ্রমিকদের যদি অন্য কাজের সময় থাকতো এবং কর্তৃপক্ষ যদি তাঁদেরকে অপর কোন কাজ দিতে পারতো তাহলে তাঁরা সেই কাজ করতেন। এই দ্বিতীয় ধরনের কাজকে বলা হতো 'টিক্কা'। এই 'টিক্কা'কে ঠিক ওভারটাইম বলা চলে না। কারণ এক্ষেত্রে 'হাজিরা' থেকে ছোটখাটো কাজ

www.pathagar.com

দেওয়া হতো এবং তার জন্য শ্রকিরা মজুরীও পেতেন 'হাজিরার' তুলনায় কম।[২]

১৯৪৫ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) অধীনে এই চা শ্রমিকদের মধ্যে 'শ্রীহট্ট জেলা চা শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠিত হয়। এই ইউনিয়ন দেশভাগের পূর্বে কমিউনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত হতো। তবে ১৯৪৭ সালের পর থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির নোতুন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনের ফলে এর মধ্যে কমিউনিষ্টদের প্রভাব দ্রুত কমে আসে এবং কংগ্রেসী পরিষদ সদস্য (এম.এল.এ) পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের নেতৃত্ব চা বাগান শ্রমিকদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সিলেটের চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির যথেষ্ট তৎপরতা ছিলো। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের লেবার কমিশনার ইস্ট পাকিস্তান লেবার জার্নাল-এ এ সম্পর্কে লেখেন।

> শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষতঃ চা বাগান শ্রমিক ও সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিরা চক্র ও উপদল গঠনে তৎপর রয়েছে। সশস্ত্র কার্যকলাপ সমর্থন করে আপত্তিজনক ইস্তাহার বিলি এবং শ্রমিকদেরকে চীন ও বার্মার উদাহরণের পরামর্শ থেকে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত গ্রুপসমূহের অস্তিত্ব বোঝা যায়।[৪]

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত চা বাগান মালিকরা শ্রমিকদেরকে চাল সরবরাহ করতো। কিন্তু তারপর সারা পূর্ব বাঙলায় চালের দর ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে সরকার চা বাগান মালিকদেরকে জানিয়ে দেন যে তাঁরা আর তাঁদেরকে পূর্বের মত চাল সরবরাহ করতে পারবেন না। এই সরকারী সিদ্ধান্তের পর ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সুরমা উপত্যকা শাখার (১৯৪৮ সালেই এর নাম হয় 'পাকিস্তান টি অ্যাসোসিয়েশন') এক সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাগানের শ্রমিকদেরকে আর চাল সরবরাহ করা হবে না এবং তার পরিবর্তে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমিককে মাগগী ভাতার অতিরিক্ত তিন আনা করে দৈনিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এইভাবে চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের জন্যে চাল সরবরাহ সরকার ও বাগান মালিকদের দ্বারা বন্ধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সেখানে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়।[৫]

৯ই জুন, ১৯৪৮, তারিখে সিলেট থেকে প্রকাশিত 'জনশক্তি' পত্রিকায় বাগানের শ্রমিকদের 'রেশন' শীর্ষক একটি সংবাদে চা শ্রমিকদের রেশন সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ করে সিরাজনগর বাগান সম্পর্কে বলা হয় যে, এই বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের চাল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাঁদেরকে উচ্চ মূল্যে বাজার থেকে চাল কিনতে বাধ্য করছে এবং তার ফলে শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শ্রমিকরা এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় কর্তৃপক্ষ

www.pathagar.com

পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করে।

এই সংবাদের প্রতিবাদ করে সিরাজনগর চা বাগানের মালিক কয়সর রশীদ চৌধুরী সাপ্তাহিক নওবেলালে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন,

> কোন এক রাজনৈতিক দলের কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের প্ররোচনায় ৪ঠা জুন তারিখে শ্রমিকগণ বাগানের কাজে বাহির হইতে অস্বীকার করে। সেই জন্য একটা অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি না করার জন্য আমরা ৫ই তারিখ কাজ বন্ধ রাখি। পরের দিন অল্পসংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা কাজ আরম্ভ হয়। ঐ দিনই বিকেলবেলা পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডের সালারে-ই-সুবা, কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এবং গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর বাগানে উপস্থিত হন। শ্রমিকদের সঙ্গে যথারীতি আলোচনার ফলে তাঁহারা তাহাদের মন হইতে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা অতি সহজেই পাকিস্তান এলাকার অন্তর্গত চা বাগানে নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টির কাজে লিপ্ত একদল অসৎ লোকের সন্ধান পান।[৬]

বিঘ্ন সৃষ্টির কাজে লিপ্ত এই "অসৎ" লোকরা যে কমিউনিষ্ট অথবা কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে যুক্ত লোক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং ঠিক এ জন্যেই চা বাগান শ্রমিকদের বিক্ষোভ দমনের উদ্দেশ্যে বাগানের মালিক পুলিশ, ন্যাশনাল গার্ড, গোয়েন্দা বিভাগের লোক ইত্যাদিকে খবর দিয়ে বিক্ষোভ দমন করতে যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় প্রদান করেন।

চাল সরবরাহ বন্ধের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সিলেটের চা বাগানগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকায় সরকার চা বাগানে চাল সরবরাহের সুবিধার জন্যে চা বাগানের ম্যানেজারদেরকে ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে ষ্টোরিং ও প্রোকিওরিং এজেন্ট নিযুক্ত করেন। এর ফলে চা বাগান শ্রমিকদেরকে চাল সরবরাহের একটা ব্যবস্থা হলেও ম্যানেজারদেরকে চাল সংগ্রহের এজেন্ট নিযুক্ত করায় এই কাজে নিয়োজিত ধান চালের ব্যবসায়ী ও তাদের অধীনস্থ কর্মচারী ও মজুরসহ প্রায় ৫০০ জন লোক বেকার হয়ে পড়ে। ফলে এই সরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে কিছু বিক্ষোভ দেখা দেয়।[৭]

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে সিলেটে পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে পাকিস্তান চা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী তখন পাকিস্তানে চা বাগানের সংখ্যা ছিলো ১৩৩ এবং এগুলিতে আবাদী জমির পরিমাণ ছিলো ৭৪,১০৮ একর।

চা শিল্পের ক্ষেত্রে বাধা বিঘ্ন দূর করার জন্যে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সম্মেলন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সম্মেলনে ৬টি সাব কমিটির রিপোর্ট ও প্রস্তাবাদি বিবেচনা করা হয়। এই সাব কমিটির প্রত্যেকটিতে ইস্পাহানীদের নাম থাকায় চা শিল্প মালিক মুসলিম লীগের পরিষদ সদস্য মোদাব্বের হোসেন চৌধুরী আপত্তি করা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি

www.pathagar.com

সাব কমিটিতেই তাদের নাম বহাল থাকে। ইস্পাহানী কোম্পানী এ সময়ে খুব বড়ো আকারে চা শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করতে শুরু করে।

চা বাগান শ্রমিকদের জন্য চাল সরবরাহ সম্পর্কে সম্মেলনে একটি সুপারিশ করা হয়। তাতে বলা হয় যে, সরকারের উচিত শ্রমিকদেরকে সপ্তাহে মাথাপিছু চার সের চাল বরাদ্দ করা।

এই সময় সরকারের পক্ষ থেকে চা বাগান কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দাবী দাওয়া পেশ করার ব্যাপারে একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই উদ্দেশ্যে গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান চা বাগান মুসলিম কর্মচারী সংঘের' ১৯৪৯ সালের বার্ষিক সম্মেলন ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমঙ্গল টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বাঙলা সরকারের চীফ হুইপ খাজা নসরুল্লাহ। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ওপর নিম্নলিখিত রিপোর্টটি 'নওবেলালে' প্রকাশিত হয়।

> পূর্ব পাকিস্তানের চা বাগানসমূহে প্রায় ১৩০০ শত কর্মচারী আছেন। তন্মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১৪৮। চা শিল্পে মুসলমানের ন্যায্য দাবী পূরণার্থে পুনঃপুন প্রতিশ্রুত হইয়াও শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারগণ সে বিষয়ে নিতান্ত উদাসীনতার পরিচয় দিতেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের চা বাগানে প্রত্যেক ৩০০ একর জমির অনুপাতে একজন করিয়া মুসলিম শিক্ষানবিশ রাখিতে ভবিষ্যতের সকল শূন্য পদগুলিতে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করিয়া মুসলমানের ন্যায্য অংশ ৭০% পূর্ণ করিতে ও এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগের বেলায় মুসলমানকে পূর্ণ সুযোগ দিতে দাবি জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৮]

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে 'শ্রীহট্ট জেলা চা শ্রমিক ইউনিয়নের' সম্পাদক তিন সপ্তাহকাল সিলেটের বিভিন্ন চা বাগান সফর করে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দেন।[৯] তাতে তিনি জানান যে অধিকাংশ বাগানেই রেশনে চাল আবার দেওয়া হলেও সে চাল একেবারেই খারাপ। তাতে ধান ও কুড়ার পরিমাণ খুব বেশী এবং তাদেরকে প্রতি সের ৭ আনা দরে কিনতে হয়। তেলিয়াপাড়া চা বাগানে তিন দিনের বেশী কেউ জ্বরে ভুগলে তাকে রোগী ভাতা দেওয়া হয় না। কেজুরী ডিভিশনে যে তেল দিয়েছিলো তা নিতান্ত খারাপ বলে এবং ফুলছড়া বাগানের জন্য যে ডাল দিয়েছিলো তা গন্ধযুক্ত বলে শ্রমিকরা তা কিনতে অস্বীকৃতি জানান। এর ফলে কেজুরী ডিভিশনের খারাপ তেল কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন করে ভাল তেল সরবরাহ করে।

চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির যে প্রভাব ছিলো তা ১৯৫০ সালের দিকেই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের (কংগ্রেস) নেতৃত্বে 'শ্রীহট্ট জেলা চা শ্রমিক ইউনিয়নে'র কাজকর্ম চলতে থাকলেও শ্রমিকদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে হয় নি। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার এবং চা বাগান মালিকেরা শ্রমিকদের

www.pathagar.com

ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি করে।

১৯৫১ সালের ২২শে জুলাই কুলাউড়ায় পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে শ্রীহট্ট জেলা চা শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে দেড়শোরও বেশী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক প্রতিনিধিরা বাগানে নির্ধারিত হারে রেশন না দেওয়া, খারাপ রেশন দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ করেন। পুরো রেশন না দেওয়ায় ঘাটতি পূরণের জন্যে শ্রমিকদেরকে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি থেকে চাল কিনে আনতে হয় এবং এইভাবে প্রয়োজনীয় চাল আনতে আনসাররা বাধা প্রদান করে বলে প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন। এর ফলে প্রয়োজনীয় চাল সরবরাহের অভাবে শ্রমিকদের কষ্ট অনেক বৃদ্ধি পায়।

যে কয়েকটি প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (১) নারী শ্রমিকদের কাজের সময় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিশু সদনের ব্যবস্থা করা। (২) বহু বাগানে কোদাল, চাকু ইত্যাদি হাতিয়ার পত্র বহু পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ায় কাজের অসুবিধা হয় ও বেশী সময় লাগে। এ জন্যে নোতুন চাকু কোদাল ইত্যাদি সরবরাহ করা। (৩) পাতা তোলার জন্য মেয়েদের কাপড়ের টুকরা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মেয়েদের নিজেদের কাপড়ের ক্ষতি হয়। এজন্যে পূর্ব নিয়ম মতো টুকরো কাপড় আবার সরবরাহ করা।

পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তকে সভাপতি নির্বাচিত করে সম্মেলনে শ্রীহট্ট জেলা চা শ্রমিক ইউনিয়নকে পুনর্গঠিত করা হয়।

৫. সূতাকল শ্রমিক

১৯২৭ সালে গোপাল বসাক ১ নং ঢাকেশ্বরী মিলে শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করেন। সেই সময়ে তিনি সেখানে শ্রমিকদের ধর্মঘট করান এবং তার জন্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে জড়ানো হয়। গোপাল বসাকের এই প্রাথমিক ভূমিকার জন্যে তাঁর ওপর ঢাকেশ্বরী মিল কর্তৃপক্ষের বরাবরই একটা জাতক্রোধ ছিলো।[১]

গোপাল বসাকের গ্রেফতারের পর ঢাকেশ্বরী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাথমিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটা সাধারণ প্রভাব সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিলো। সেই প্রভাবকে অবলম্বন করে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, ১৯৩৫-৩৭ সালে নারায়ণগঞ্জ শহরের কাছাকাছি শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে প্রথমে ১ নং ঢাকেশ্বরী ও পরে লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলে এবং তারপর চিত্তরঞ্জন মিল ও ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে সূতাকল শ্রমিকদের

www.pathagar.com

ইউনিয়ন গড়ে ওঠে।[২]

দুটি তাগিদকে নিয়ে এই সময় ঢাকায় স্থাপিত গোপন কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। এর একটি হলো, নিয়মিতভাবে নির্ধারিত মজুরী প্রদান ও মিলে কাজ করার নিম্নতম সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি। অপরটি হলো, জবার (Jobber) ও লাইন সর্দারদের জুলুম ও জবরদস্তি বন্ধ করা। শ্রমিকরা এই দুই দাবীতে মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চাইলে তার জন্যে সংগঠন অর্থাৎ ইউনিয়নের প্রয়োজন এই কথাটিই শ্রমিকদেরকে প্রথমে বোঝানো হয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিক ব্যারাকে ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে প্রচারও করা হয়। এইভাবে ১৯৩৫-৩৬ সালে লাইন সরদারদের নজর এড়িয়ে মিলের ভিতরে গোপনে ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর লেখা ইস্তাহার ছড়িয়ে এবং মিল এলাকার বাইরে সভা করে ১নং ঢাকেশ্বরী মিলে নোতুনভাবে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ১৯৩৫-৩৭ সালে লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলের ভিতরেই কয়েকজন কমিউনিষ্ট কর্মী ও সহযোগীর সহায়তায় ছোট ছোট দাবী আদায়ের জন্যে সমবেত প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এই সময় লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলে শ্রমিকদের মজুরি ছিলো অনিয়মিত। এই দুটি ইউনিয়নই ঢাকা থেকে যোগাযোগকারী কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে গড়ে ওঠে। তবে পার্টি তখন পর্যন্ত এগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে নি। ইউনিয়ন দুটির চরিত্র ছিলো মূলত ট্রেড ইউনিয়নের।[৩]

সে সময় বাঙলাদেশে সূতাকল শ্রমিকদের (সূতা ও বস্ত্র) সব থেকে জঙ্গী সংগঠন ছিলো 'বেঙ্গল টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়ন'। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলে এই শ্রমিক ইউনিয়নের পতাকাতলে নিয়মিত মজুরী ও নিয়মিত কাজের দাবীতে তখন ছোট খাট আন্দোলন প্রায়ই চলতে থাকে। বেঙ্গল টেক্সটাইলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ চৌধুরী ১৯৩৭ সালে ঢাকায় এসে সূতাকল শ্রমিক, বিশেষত লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলের শ্রমিক ইউনিয়নকে একটা শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেন। সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দীরা জেলখানা থেকেই কমিউনিষ্ট হয়ে ১৯৩৮ সালে বেরিয়ে এসে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। এই সময় নারায়ণগঞ্জের আশেপাশের সূতাকলগুলিতে পার্টি নোতুনভাবে সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োগ করে। এর ফলে ১৯৩৫-৩৭ সালে শ্রমিক ইউনিয়নের যে ভিত্তি এই অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিলো তা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। পার্টি প্রভাব ও সংগঠন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ব্যাপক শ্রমিক সমাবেশ ঘটে। এইভাবে ১৯৩৮-৪০ সালে ২নং ঢাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন এবং ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে ঢাকা কটন মিলে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠে। স্থায়ী কর্মসূচি ও কাজের নির্দিষ্ট ধারা ও পদ্ধতির ভিত্তিতে সংগঠিত হয় 'ঢাকা জেলা সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন।'[৪]

www.pathagar.com

এ সময়ে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলও (আর.এস.পি) ১নং ও ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে একটি সমান্তরাল ইউনিয়নের পত্তন করে।[৫] শ্রমিক থেকে শুরু করে কেরানী, অফিসার সকলেই সেই ইউনিয়নের সভ্য ছিলেন। ফলে তাতে অফিসারদেরই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব ছিলো এবং তার নীতি ছিলো মালিকদের সাথে সহযোগিতার নীতি। এজন্যে মিল কর্তৃপক্ষের কাছে তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতো এবং অফিসাররা তাদেরকে সাহায্য করতো। শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে শ্রমিকদেরকে তাঁদের নিজস্ব দাবী দাওয়া ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত করার পরিবর্তে কেরানী এবং বিশেষত অফিসারদের স্বার্থ রক্ষার দিকেই সেই ইউনিয়নের নজর ছিলো বেশী। এবং এই কারণেই তার ওপর সাধারণ শ্রমিকদের বিশেষ কোন আস্থা ছিলো না। আর.এস.পির এই ইউনিয়নটিকে মিল কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই সুনজরে দেখতো এবং কমিউনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত ইউনিয়নটির ব্যাপারে সব সময়েই খুব সজাগ ও সতর্ক থাকতো।[৬] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কারামুক্ত আর.এস.পি. নেতৃবৃন্দ তাঁদের পরিচালনাধীন সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন ও প্রভাবকে নির্মূল করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি।[৭]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ ও নিরন্তর কাজের মধ্যে দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সূতাকল শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও আন্দোলন বলিষ্ঠভাবে সংগঠিত হয়। সে সময় শুধু ঢাকা জেলাতেই নয়, সারা বাঙলাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টির সব চেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী সংগঠন ছিলো সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন। ঢাকা জেলায় সূতাকল শ্রমিকরাই পার্টির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের ভিত্তিতেই এই সময় নারায়ণগঞ্জে কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তিশালী ইউনিট গড়ে উঠেছিলো। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় মার্চ থেকে মে পর্যন্ত পার্টির নেতৃত্বে সূতাকলগুলিতে যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট চলে তাতেই প্রমাণিত হয় কমিউনিষ্ট পার্টি সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছিলো।[৮]

সারা উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কংগ্রেস লীগ কর্তৃক শ্রমিক আন্দোলনে বাধা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং পরিশেষে দেশ বিভক্তির প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই সুতাকল শ্রমিকদের ওপরও পড়ে। ইতিপূর্বে ধর্মঘটের সময় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনাকে অবলম্বন করে মালিক পক্ষ ও সরকার অনেক ইউনিয়ন কর্মী ও নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেছিলো। এর ফলে পার্টি এক অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো।[৯]

www.pathagar.com

দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে ইউনিয়নের প্রায় ৪ শত কর্মী ছাটাই হয়ে যান। ঐ সময় বেশ কিছুসংখ্যক শ্রমিক দেশত্যাগও করেন। তবে এ সব সত্ত্বেও পার্টির প্রভাব ও পরিচালনায় ইউনিয়ন সক্রিয় থাকে। এর ফলে ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে নারায়ণগঞ্জে যে পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয় তাতে শুধু যে রেল, চা বাগান ও অন্যান্য শিল্পে কমিউনিষ্টদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাল অবস্থান রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাই নয়। সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নও সে ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বিশেষ শক্তি জোগায়। সূতাকল শ্রমিকদের অবিসংবাদী নেতা নেপাল নাগ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন অনিল মুখার্জী।[১০]

অনিল মুখার্জীর বিরুদ্ধে সে সময় এক মিথ্যা খুনের মামলা থাকায় তিনি প্রকাশ্যে তাঁর কাজে যোগ দিতে পারতেন না। নেপাল নাগই বস্তুতপক্ষে তখন ফেডারেশনের প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরই আসে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের নোতুন রণনীতি। এই নোতুন লাইনে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিই প্রাধান্যে আসে এবং তার প্রতিক্রিয়া সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নসহ সকল প্রকার শ্রেণী সংগঠন ও গণ সংগঠনের মধ্যে দেখা দেয়। অপরদিকে পাকিস্তানের শাসক চক্র কমিউনিষ্ট পরিচালিত ইউনিয়নগুলি ভেঙে ফেলার জন্যে সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নসহ অন্যান্য ইউনিয়নগুলির ওপর পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক ও নির্মম নির্যাতন শুরু করে। এই পর্যায়ে রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মতো ঢাকা জেলা সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নও ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত হয়। ফয়েজ আহমদের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সূতাকল এলাকায় তাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্যে সূতাকল শ্রমিকদের ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। দালালরা বেশ কিছু শ্রমিককে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়। অনেক শ্রমিক মিল পরিত্যাগ করে চলে যান।[১১]

পাকিস্তান সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা না করলেও পার্টি তখন বস্তুতপক্ষে নিষিদ্ধই হয়ে গিয়েছিলো। প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্মী ও নেতারা গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নে খোলাখুলি কাজতো বটেই, এমনকি গোপন কাজও স্থগিত হয়ে গিয়েছিলো। প্রথম দিকে বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে যেটুকু কাজ হচ্ছিলো ১৯৪৯-এর শেষ দিকে সেটাও কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা আর সম্ভব ছিলো না।[১২]

চট্টগ্রাম ন্যাশনাল কটন মিলে যে শ্রমিক ইউনিয়ন ছিলো সেটিকে ফয়েজ আহমদ ১৯৫১ সাল পর্যন্ত নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনতে পারেন নি। এ জন্যে সেই ইউনিয়নটির বিরুদ্ধে সরকারের সহায়তায় তাঁরা নানান চক্রান্তে লিপ্ত হন। ৪ঠা মে, ১৯৫১, তারিখে নারায়ণগঞ্জে সরকার পূর্ব বাঙলার

www.pathagar.com

সূতাকলগুলিতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার জন্যে একটি ত্রিদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। চট্টগ্রাম ন্যাশনাল কটন মিল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সতীশ চন্দ্র ভদ্র সেই বৈঠকে যোগদান করার উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জ গেলে সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এ সম্পর্কে ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও সহ-সম্পাদক মখলজ রহমান একটি বিবৃতিতে[১৩] বলেন যে, ১৯৫০ সালের জানুয়ারী থেকে সতীশ চন্দ্র ভদ্র ও মখলজ রহমানের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের ৬০০ সূতাকল শ্রমিক নিম্নতম বেতন ৩০\ টাকা, মাগ্গী ভাতা ৩০\ টাকা এবং ওভারটাইম ও বোনাসের জন্যে আন্দোলন করে আসছিলেন। দুই একজন দালাল ব্যতীত শতকরা ৯৯ জন শ্রমিক এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় সতীশ চন্দ্র ভদ্র ও মখলজ রহমান ত্রিদলীয় বৈঠকে উপস্থিত থাকলে তাঁরা চট্টগ্রাম ন্যাশনাল কটন মিলের পক্ষ থেকে সরকার ও তাঁদের দালাল ফয়েজ আহমদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নেবেন না, এ জন্যেই সতীশ ভদ্রকে নারায়ণগঞ্জে গ্রেফতার করা হয়। মখলজ রহমান সেই বৈঠকে যোগ দিতে না যাওয়ার কারণে তাঁকে তখন গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ত্রিদলীয় সম্মেলন চলাকালে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ বারবার তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে থাকে।

বিবৃতিটিতে আরও বলা হয় যে, তাঁরা ফয়েজ আহমদের দালালী সম্পর্কে খুব সচেতন থাকার ফলে ত্রিদলীয় বৈঠকের পূর্বেই সমস্ত সূতাকল শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক ডাকার জন্যে চট্টগ্রাম সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ফয়েজ আহমদের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই বৈঠকেই ত্রিদলীয় সম্মেলনে পেশ করার জন্যে দাবী নির্ধারণ ও প্রতিনিধি নির্বাচন করার কথা সেই প্রস্তাবে বলা হয়। তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবে ফয়েজ আহমদকে জানিয়ে দেন যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে যদি ১৯৪৯ সালের মতো শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কোন চুক্তি করা হয় তাহলে সেই ত্রিদলীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত চট্টগ্রাম কটন মিল শ্রমিক ইউনিয়ন মেনে নিতে বাধ্য থাকবে না।

সর্বশেষে বিবৃতিটিতে তাঁরা ঘোষণা করেন যে, তাঁদের ইউনিয়ন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, তাঁদের দাবী আদায়ের জন্যে এবং ইউনিয়ন সম্পাদক সতীশ ভদ্রকে মুক্তির দাবীতে ৭ই মে, ১৯৫১, তারিখ থেকে তাঁরা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।*

সরকার ও তাদের অনুগত পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন কমিউনিষ্ট পরিচালিত ও তাদের বিরোধী সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলির

---

*এর পর কোন শ্রমিক ধর্মঘট চট্টগ্রাম কটন মিলে হয়েছিলো কিনা সে সম্পর্কে আর কোন রিপোর্ট কোথাও পাওয়া যায় নি।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে সূতাকল শ্রমিকদের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস করে দেয়।

৬. সিমেন্ট শ্রমিক

সিলেট জেলার ছাতকে অবস্থিত 'আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ফ্যাক্টরী' ছিলো অবিভক্ত বাঙলাদেশের একমাত্র সিমেন্ট কারখানা। দেশ বিভাগের পর ছাতক পূর্ব বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সিমেন্ট কারখানাটি পূর্ব বাঙলায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার মালিকানা তখন ছিলো ভারতীয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অক্টোবর আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট করেন।[১] তৎকালে ভারতবর্ষ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও দেশ বিভাগের ফলে যে বিশেষ অবস্থা প্রথমদিকে বিরাজ করছিলো তাতে পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় মালিকানাধীন এই ফ্যাক্টরীর সমস্ত কিছুই, এমনকি শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক পর্যন্ত, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলো আসাম সরকারের তত্ত্বাবধানে। এ জন্যে ১৫ই অক্টোবরের ধর্মঘটের পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রমিকদের দাবী মীমাংসার জন্যে আসাম সরকার এ্যাডজুডিকেটর (সালিশ) নিযুক্ত করেন।[২]

সিমেন্ট কারখানার শ্রমিকদের দাবী ছিলো- বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ ; সর্বনিম্ন বেতন ৩৫\ টাকা ধার্য ; সকলের জন্যে মাগগী ভাতা ৪৫\টাকা ; প্রচলিত গ্রেড প্রথার সংশোধন ; দিন মজুরী প্রথার বদলে মাসিক বেতন প্রথার প্রবর্তন ; সকলের জন্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ; বেতন-সহ সাপ্তাহিক ছুটি ; সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় বার্ষিক ছুটির ব্যবস্থা ; ৫ টাকা হারে সাধারণ মজুরী বৃদ্ধি ; চিকিৎসার পুরোপুরি ব্যবস্থা; কুমার বড়ছড়া প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর স্থানে বিশেষ স্বাস্থ্য ভাতা ; সকলের জন্য পাকা কোয়ার্টার ও পূর্বহারে কোয়ার্টার ভাড়া ; প্রয়োজন মতো রেশন ; ছাঁটাই বন্ধ করা ; ইউনিয়নকে স্বীকার করা ইত্যাদি। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর এ্যাডজুডিকেটরদের রায় প্রকাশিত হয়। তাতে সর্বনিম্ন বেতন, মজুরী বৃদ্ধি, মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদির কোন কথাই ছিলো না। বিচারকরা মালিকের শ্রমিক ছাঁটাইয়ের একতরফা অধিকার স্বীকার করেন, কাজেই ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের কথাই ওঠে না। এমনকি ইউনিয়নকে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত একথা নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও ইউনিয়নের বাস্তব স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের এই সম্পর্কিত আইনের উল্লেখ করে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট রায় দানে বিরত থাকেন। আসাম সরকার নিযুক্ত সালিশের এই রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়।[৩]

www.pathagar.com

১৬ই মার্চ, ১৯৪৯, তারিখে এই সিমেন্ট কোম্পানী শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির সভ্য এবং ইউনিয়নের বিশিষ্ট কর্মী দ্বিজেন সোমকে হঠাৎ গ্রেফতার করা হয়। কোম্পানী, কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কয়েকজন চোরাকারবারী এই গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করে। দ্বিজেন সোমকে এইভাবে গ্রেফতার করায় সিমেন্ট কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৯শে মার্চ এই ঘটনার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় সরকারের দমন নীতির নিন্দা করে এবং দ্বিজেন সোমের মুক্তির দাবী জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয়। সভায় উপস্থিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো ১৫০ জন।[৪]

১৯৫১ সালের ২২শে এপ্রিল ছাতকে আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়নের নবম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৫] এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অবিভক্ত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী।

২২শে এপ্রিলের অধিবেশনে নিম্নলিখিত যে প্রস্তাবগুলি পাশ হয় সেগুলির মধ্যেই ছাতক সিমেন্ট কারখানার শ্রমিকদের তৎকালীন অবস্থার একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় :

> আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানীর শ্রমিকরা বর্তমানে যে হারে বেতন পাইতেছেন তাহা দ্বারা ক্রম-বর্ধমান দুর্মূল্যতার মধ্যে জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য দ্রব্য, কাপড় ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে বাড়িয়াছে। বর্তমানে একজনের শুধু খাওয়া খরচ কমপক্ষে ৩৫ টাকা লাগে তদুপরি অন্যান্য খরচও আছে। অর্থাৎ একজনের খরচের জন্য অন্তত ৫০ টাকার প্রয়োজন। অথচ একজন সিমেন্ট শ্রমিক সর্বনিম্ন মাসিক নগদ ডি.এ.সহ ৪৫ টাকা পান এবং সস্তা মূল্যে রেশন পান। যে পরিমাণ রেশন দেওয়া হয় তাহাতে প্রয়োজন পূরণ হয় না। তদুপরি যাহাদের পরিবার সঙ্গে থাকেন না তাহারা শুধু নিজের রেশন পান। পরিবারের জন্য কোন রেশন দেওয়া হয় না। ছুটির সময়ও রেশন দেওয়া হয় না। শুধু চাউল, তৈল, লবণ, মরিচ, হলদি ও চিনি রেশন হিসাবে সুবিধা মূল্যে দেওয়া হয়। অন্যান্য সমস্ত জিনিসই বাজার মূল্যে কিনিতে হয়। এই অবস্থায় গড়ে ৪ জনের একটি পরিবারের বর্তমান আয়ে মাসের পনেরো দিনও চলে না। ফলে অর্ধ উপবাসী থাকিতে হয় এবং সকলেই ঋণগ্রস্ত। এই আয়ও সকল সময় পুরোপুরি হয় না। ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটিলে শ্রমিকরা কোন ক্ষতিপূরণও পান না, আবার যে কয়দিন কাজে অনুপস্থিত থাকিতে হয় তাহার জন্য কোন বেতনও পান না। ক্ষতিপূরক ছুটি দেওয়া হয় অথচ দিন মজুরী প্রথায় নিযুক্ত শ্রমিকরা এই ছুটির জন্য কোন বেতন পান না।
>
> অন্যদিকে শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ বাড়িয়াছে। যাহারা গত কয় বৎসরে নানা কারণে সিমেন্ট কোম্পানী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন অথবা বরখাস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের স্থলে নূতন লোক নিযুক্ত করা হয় নাই। কোয়ার্টারের জন্য অনেক শ্রমিক অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু অতি ধীর গতিতে কোয়ার্টার

www.pathagar.com

তৈরি করা হইতেছে। তদুপরি কোয়ার্টারের জন্য এই আয় হইতেই ভাড়া দিতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের অর্ধদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতার তুলনায় অত্যন্ত কম বেতন দেওয়া হইতেছে। কোম্পানী প্রতিষ্ঠাকালে দুর্মূল্যতার পূর্বেই একজন ক্রেইন ড্রাইভার ৮৫ টাকা বেতন পাইতেন এখন পান ৪০ টাকা। একজন বার্ণার ১২৫ টাকা পাইতেন অথচ বর্তমানে একজন বার্ণারকে ৫০ টাকা দেওয়া হইতেছে। একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ৯০ টাকা পাইতেন সেইস্থলে এখন একজনকে ৬০ টাকা দেওয়া হইতেছে। এই অবস্থা সমস্ত ডিপার্টমেন্টেই বিদ্যমান। কোম্পানীতে প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক কন্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করেন। ইঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইঁহাদের ভাগ্যে কাজ ও সুযোগের অভাব। অথচ ইঁহারা যে কাজ করেন তাহা সব সময়ই কোম্পানীর প্রয়োজন। তাহা সত্ত্বেও কোম্পানী সোজাসুজি ইঁহাদের উপর নির্মম শোষণ চালাইতেছেন। গত তিন চার বৎসরে সিমেন্টের বিক্রয়মূল্যও প্রচুর বাড়িয়াছে। অথচ বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার প্রতি কোম্পানী উদাসীন রহিয়াছেন। শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানী লেবার ইউনিয়ন আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ন্যায়সঙ্গত সর্বনিম্ন দাবী জানাইয়াছে এবং আশা করিতেছে যে, কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে দাবীপূরণ করিয়া শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিকার করিবেন।

দাবীসমূহ :

১। সর্বনিম্ন মাসিক মূল বেতন ৫৫ টাকা।

২। নগদ মাগগী ভাতা মাসিক ৩৫ টাকা ও বর্তমান মূল্যে প্রয়োজন অনুযায়ী রেশন এবং ছুটির সময়ের পুরা রেশন দিতে হইবে।

৩। সর্বনিম্ন বেতন যে হারে বাড়িবে সেই হারে সকলের মূল বেতন বৃদ্ধি।

৪। যে সকল শ্রমিক ও কর্মচারীর মূল বেতন দক্ষতার তুলনায় অল্প দেওয়া হইতেছে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি।

৫। বেতনসহ ক্ষতিপূরক ছুটী।

৬। দিন মজুরী প্রথা অবসান করিয়া সকলকে মাসিক প্রথায় নিয়োগ করিতে হইবে।

৭। সকলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বিনা ভাড়ায় কোয়ার্টার অথবা কোয়ার্টার এলাওয়েন্স দিতে হইবে।

৮। প্রভিডেন্ট ফান্ডে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর দেয় অর্থের উপর শ্রমিকদের পুরা অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

৯। বৎসরে বেতনসহ ২১ দিন প্রিভিলেজ লীভ, ১০ দিন ক্যাজুয়েল।

১০। দৈনিক উৎপাদন ২০০ টনের উপর হইলে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদন বোনাস হিসাবে সকলকে দিতে হইবে।

১১। কন্ট্রাক্টরের অধীনে শ্রমিকদের সোজাসুজি কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগ করিতে হইবে।

১২। ক) প্রত্যেক মজুরকে ফ্রি ঔষধ কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে। (খ) কোন মজুর কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহাকে কোম্পানী কর্তৃক

www.pathagar.com

কোম্পানীর খরচে অন্যত্র পাঠাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (গ) কোম্পানী কর্তৃক নিয়োজিত ডাক্তার কম্পাউন্ডারের ভিজিট তুলিয়া দিতে হইবে।

১৩। শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য কোম্পানীর পক্ষ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফিল্টারের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৪। বিনা বেতনে স্কুলের নিজস্ব গৃহে প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সিলেট মুসলিম লীগের কয়েকজন নেতা এই অধিবেশনে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে বক্তৃতা করেন মাহমুদ আলী, নূরুর রহমান, মতসির আলী ও হাসান আলী। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের পূর্ববর্তী সভাপতি আব্দুল বারী চৌধুরীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্থানে মাহমুদ আলী পরবর্তী বৎসরের জন্য ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া মতসির আলী সম্পাদক, কৃপাসিন্ধু রায় চৌধুরী ও সমরু মিয়া সহ-সভাপতি এবং সুরেন্দ্র কুমার চৌধুরী ও রইছ মিয়াকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।

১৯৫১ সালের ১৪ই ও ১৫ই জুন ছাতকে মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহক কমিটির পর পর তিনটি বৈঠক হয়।[৬] কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নানা ছুতায় শ্রমিকদের সরাসরি বরখাস্ত, সাময়িকভাবে অপসারণ ও শাস্তিমূলক সতর্কীকরণের যে নীতি গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে পাকিস্তান সরকারের শ্রমমন্ত্রী ও পূর্ব বাঙলা সরকারের লেবার কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, সব রকম আইন কানুনের খেলাফ করে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে যেভাবে শ্রমিক নির্যাতন করেছেন তা বন্ধ না করলে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে এবং তার জন্যে একমাত্র কোম্পানী কর্তৃপক্ষই দায়ী থাকবেন।

১৫ই জুন মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনিয়ার শেফারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল শ্রমিকদের যে সমস্ত অভাব অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন তার মধ্যে ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্যান্টিন, গ্রোসারীশীপ, চিনি, কেরাসিন প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় তার যথাসম্ভব প্রতিকারের আশ্বাস দেন। যে কয়েকজন শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন পুনর্বিবেচনা করতে তিনি নিজের অক্ষমতা জানান।

ঐ দিন বিকেলেই মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে সিমেন্ট শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সম্পাদক মতসির আলী, নূরুর রহমান, হাবিবুর রহমান, সমরু মিয়া, রইস মিয়া ও গোস্বামী সেই সভায় বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক বক্তাই শ্রমিক ঐক্যের ওপর জোর দেন এবং মাহমুদ

www.pathagar.com

আলী বলেন যে, শ্রমিকরা যদি একতাবদ্ধ হতে না পারেন তাহলে তাঁদের উচিত ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেওয়া।

১২ই নভেম্বর, ১৯৫১, তারিখে ছাতকে সিমেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের একটি সাধারণ সভা মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[৭] চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় আচরণ ও ধারাবাহিকভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করে সভায় বক্তৃতা করেন ইউনিয়ন সম্পাদক মতসির আলী। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে সমরু মিয়া, ব্রহ্মচারী, গোস্বামী, ভট্টাচার্য,★ রইস মিয়া, ইন্তাজ আলী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। শ্রমিক বক্তারা প্রত্যেকেই কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেন যে, সেগুলির প্রতিকারের জন্যে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেছেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। কারণ কর্তৃপক্ষ বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিশ্রুতিই তাঁরা রাখেন নি। নিরুপায় হয়ে অবশেষে তাঁরা পূর্ব বাঙলা সরকারের লেবার কমিশনারের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ জানিয়ে তার প্রতিকারের আবেদন জানিয়েছেন। সভায় শ্রমিকরা ঘোষণা করেন যে তাঁদের দাবিসমূহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। মতসির আলী আন্দোলন জোরদার করার জন্যে প্রত্যেক শ্রমিককে একদিনের বেতন ইউনিয়ন তহবিলে জমা দেওয়ার আবেদন জানান এবং শ্রমিকরা সকলেই তাতে সম্মত হন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছাতক সিমেন্ট কারখানার শ্রমিক ইউনিয়ন কোন সত্যিকার আন্দোলনই শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত করতে সক্ষম হয় নি। ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় পূর্ব বাঙলা সরকারের লেবার কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৮] এই প্রতিনিধি দলে থাকেন ইউনিয়নের সভাপতি মাহমুদ আলী, সম্পাদক মতসির আলী, মুনিরউদ্দীন আহমদ এবং আরও দুইজন। তাঁরা তিনটি বিষয়ে লেবার কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিষয়গুলি হলো: সিমেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে পেশকৃত শ্রমিকদের নিম্নতম দাবী ; শ্রমিকদের ওপর কোম্পানীর ষ্ট্যান্ডিং অর্ডার ; এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেপরোয়া শ্রমিক বরখাস্ত। প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনার পর লেবার কমিশনার শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করবেন বলে যথারীতি আশ্বাস প্রদান করেন।

ছাতকে অবস্থিত আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নে কমিউনিষ্টদের কোন প্রভাব না থাকায় এবং তখনকার দিনে অপর কোন সরকার বিরোধী শক্তিশালী সংগঠন সারা পূর্ব বাঙলায় না থাকায় সিলেট মুসলিম লীগের

★এই তিন জনের পুরো নাম পত্রিকা রিপোর্টে নেই।

www.pathagar.com

নেতারাই এই শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে এই ইউনিয়নটির যাবতীয় কাজ পরিচালিত হতো। এই মুসলিম লীগভুক্ত ও মুসলিম লীগপন্থী শ্রমিক নেতারা সরকারের কিছু কিছু সমালোচনা ক্ষেত্রবিশেষে করলেও তাঁরা মোটামুটিভাবে ছিলেন সরকারের সাথে আপোষপন্থী। তাছাড়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার কোন প্রকৃত তাগিদও তাঁদের মধ্যে ছিলো না। এজন্যে শ্রমিকদের দুরবস্থা, তাঁদের ওপর নির্মম শোষণ ও নির্যাতন সত্ত্বেও সিমেন্ট শ্রমিকদের কোন প্রতিরোধ আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না। কাজেই মাঝে মাঝে শ্রমিক সভা আহ্বান করে সেখানে জোর গলায় কিছু বক্তৃতা প্রদান এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ ও সরকারী লেবার কমিশনারের কাছে আবেদন নিবেদন ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় নি।

৭. ডক শ্রমিক

চট্টগ্রাম বন্দরের হাজার হাজার ডক শ্রমিক চরম দুরবস্থার মধ্যে থাকলেও তাঁদের কোন সুসংগঠিত ও জঙ্গী ইউনিয়ন না থাকায় তাঁদের ওপর শোষণের মাত্রা অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো।

এই ডক শ্রমিকেরা কোন নির্দিষ্ট কোম্পানীর দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে শ্রমিকদেরকে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত করার মতো কোন কোম্পানী সে সময় চট্টগ্রাম বন্দরে ছিলো না। কাজেই ডক শ্রমিকরা তখন ঠিকাদারদের দ্বারা দৈনিক ভিত্তিতে দিন মজুরের মতো মজুরী পেতেন। সেই অবস্থায় তাঁদের নিয়মিত মজুরী, কাজের নিশ্চয়তা অথবা অন্যান্য কোন অধিকারই শ্রমিক হিসেবে ছিলো না।

১৯৪৯ সালের ১৪ই আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দরের এই ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।[১] এর পূর্বে তিন মাস ধরে ঠিকাদাররা তাঁদেরকে নিয়মিত মজুরী দিচ্ছিলো না। তার ওপর ১২ই ও ১৩ই আগস্ট সারা দিন কাজ করার পর ঠিকাদাররা শ্রমিকদেরকে বেতন না দেওয়ায় ৫ হাজার শ্রমিক সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত ধর্মঘট করেন। ধর্মঘট চলাকালে জেটি সুপারিন্টেডেন্ট শ্রমিকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, পুনরায় কাজে যোগদান করলে তাঁদের পাওনা মজুরী মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু শ্রমিকরা কাজে যোগদানের পর তাঁদের মজুরী তো মিটিয়ে দেওয়া হলোই না, উপরন্তু তাঁদেরকে আদেশ দেওয়া হলো ১৪ই আগষ্ট তারিখেও কাজ করে যাওয়ার। জেটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা স্বাধীনতা দিবসে উপবাস থেকে কাজ করতে সম্মত হলেন না এবং সেদিন থেকেই আবার ধর্মঘট শুরু করলেন। এরপর তাঁরা মিছিল করে গিয়ে

www.pathagar.com

সুপারিন্টেডেন্টের বাসার চারিদিকে পিকেটিং করে, শ্লোগান দিতে থাকলেন : 'পাকিস্তানের দুশমন, ধ্বংস হউক', 'বাকী টাকা আদায় করো', 'বেঈমানরা নিপাত হউক', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।

এইভাবে ঘেরাও হয়ে জেটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করেন এবং ম্যানেজার পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ শ্রমিকদেরকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার জন্যে তাকে নির্দেশ দেন। এইভাবে শ্রমিকরা নিজেদের পাওনা মজুরী আদায় করার পর জেটি কন্ট্রাক্টররা শ্রমিকদেরকে এই মর্মে ভয় দেখায় যে তাঁরা যদি আবার ধর্মঘট করেন তাহলে তারা পাকিস্তানের বাইরে থেকে শ্রমিক আমদানী করবে।

১৯৫০ সালের জানুয়ারীর শেষ দিকে চট্টগ্রামের ডক শ্রমিকরা জহুর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের (Mariners and Employers Union) একটি সভায় শ্রমিকদের দাবী পূরণ না করলে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন।[২] কিন্তু ধর্মঘটকে কার্যকর করতে না পারার ফলে তাঁদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। এজন্যে ঐ বৎসরই আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম বন্দরের ১০ হাজার ডক শ্রমিক পূর্ব বাঙলা সরকারের শ্রমমন্ত্রী ও লেবার কমিশনারের কাছে একটি খোলা চিঠি দেন।[৩] তাতে তাঁরা বলেন–

> আমরা চট্টগ্রাম জেটি ও পোর্ট অঞ্চলের ১০ হাজার মজলুম ডক মজুর নিছক পেটের দায়ে স্ত্রী পুত্র লইয়া জান বাঁচাইবার প্রয়োজনে আপনাদের নিকট বাধ্য হইয়া এই চিঠি লিখিতেছি। আমাদের বিনীত আরজ– আমরা যে কিভাবে আছি তাহা স্বচক্ষে একবার দেখিয়া যাইবেন।
>
> প্রথমত, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডকের দশ হাজার মজুর শতকরা ১০০ জনই মুসলমান। ব্রিটিশ আমল হইতে যে সব দেশী বিদেশী স্টীমার কোম্পানী ও তাদের এজেন্টরা এবং স্টীভেডোর ও লেবার কন্ট্রাক্টর গোষ্ঠী যে জুলুম ও শোষণ আমাদের উপর চালাইতেছিল তাহা এখনও বিদ্যমান। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে বেশী হইয়াছে।
>
> দ্বিতীয়ত, না আছে ধন দৌলত না আছে জায়গা জমি। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ ও সর্বনাশী দাঙ্গায় আমরা ক্ষতবিক্ষত ও রিক্ত। মেহনত বিক্রয় করা আমাদের একমাত্র পেশা। অথচ মাসের মধ্যে ১৫ দিনও কাজ পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় বৌ ছেলেমেয়ে লইয়া অর্ধাহার ও অনাহারই আমাদের চিরসঙ্গী।
>
> আমরা কাহার কাজ করি, আমাদের মনিব কে, তাঁহাকে আমরা চিনি না। মনিবও আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখে না। অথচ দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি পোর্টেই বিভিন্ন কোম্পানীর স্থায়ী মজুর রেজিষ্টার আছে। পাকিস্তানে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?
>
> সমস্ত পোর্টেই বিশেষ করিয়া কলিকাতা পোর্টে কেলেন, বি.আই. ইলিয়াজ ইত্যাদি কোম্পানী দিনে ২।০ টাকা রাতে ৫৷০ ও প্রতি ঘণ্টায় অতিরিক্ত কাজের জন্য ৷০ হিসাবে দিতে বাধ্য হইয়াছে। অথচ সেই একই কোম্পানী একই কাজের জন্য আমাদিগকে দিয়া থাকে ১৷/০ আনা ও ২ টাকা। ইহা কোন দেশী

www.pathagar.com

বিচার ?

দুনিয়ার সমস্ত পোর্টে ৭/৮ ঘন্টার বেশী কাজ নাই। কাজে হাজির হইলে কাজ হউক আর না হউক তলব পাইয়া থাকে। অথচ আমাদের উপর চাপান হইয়াছে ৯ ঘন্টা খাটুনী। কাজে হাজির থাকিলেও কাজ না হইলে গর হাজিরা বা আধা বা থ্রী কোয়াটার তলব দেওয়া হয়।

জখমী ও অসুস্থ মজুরের জন্য না আছে চিকিৎসা ব্যবস্থা না আছে কোন ন্যায্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। এমনকি ৫/৬ পয়সা খরচ করিয়া বসন্ত কলেরার টিকা দেওয়া হয় না। আমাদের জানের দাম কি ৫/৬ পয়সার চেয়েও কম? অথচ চট্টগ্রাম পোর্টের মত এত দুর্ঘটনা অন্য কোন পোর্টে হয় না। এমন কোন দিন বা রাত্রি নেই ২/৪ জন জখম অথবা মারা না যাইতেছে। এই জঘন্য অত্যাচারকেও কি পাকিস্তানের আইন বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে?

কয়লা সিমেন্ট প্রভৃতি ময়লা জিনিসের কাজ করিয়া গোসল করিবার জন্য সমস্ত জেটি অঞ্চলে কোন পানির ব্যবস্থা নেই। এমনকি খাইবার পানিরও কোন ব্যবস্থা নাই। বস্তির নালা ডোবার ময়লা পানি খাইয়া নানা ব্যারামে মরিতেছি। কুলি বলিয়া আমরা খাইবার পানি হইতেও বঞ্চিত থাকিব ?

ঘরের অভাবে আমরা অর্ধেকেরও বেশী থাকি খোলা মাঠে। জনের ভাগ পড়ে সোয়া হাত হইতে দেড় হাত জায়গা। এইটুকু জায়গায় মালিকদের বিড়াল কুকুরেরাও কি থাকিতে পারিবে ?

কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া জেটি ও গুদাম তৈরী হইতেছে। অথচ সেই জেটিকে যাহারা চালু রাখিবে সেই মজুরদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁইও নাই। আমরা খুব ভাল করিয়া জানি যে, আমাদের মেহনতের বদৌলতে দেশী বিদেশী মুষ্টিমেয় ধনী মালিকগোষ্ঠী কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটিয়া কোরমা-পোলাও খাইয়া গাড়ী হাঁকাইতেছে। আর আমরা যারা পূর্ব পাকিস্তানের মেরুদণ্ড, যাহারা একদিন কাজ বন্ধ করিলে তামাম পূর্ব পাকিস্তান অচল হইয়া যাইবে তাহাদের কপালে দু'বেলা ভাতও জুটে না। তাই সেই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আপনাদের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ যাহাতে আমাদের ন্যায্য দাবীগুলি পূরণ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আশা করি আমাদের আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

পূর্ব বাঙলার শ্রম মন্ত্রী ও লেবার কমিশনারের কাছে পাঠানো চট্টগ্রাম বন্দরের ডক শ্রমিকদের এই চিঠির ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট সরকার কোন পদক্ষেপই গ্রহণ না করায় শ্রমিকদের অবস্থার বিন্দুমাত্র কোন পরিবর্তন হয় না। তাঁরা সে সময়ে এতই দুর্বল এবং অসংগঠিত ছিলেন যে তাঁদের দ্বারা কোন ধর্মঘটও সম্ভব ছিলো না।★ এই অবস্থা আরও এক বৎসর চলার পর ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে ডক শ্রমিকরা চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে একটি চরমপত্র প্রদান করেন। তাতে তাঁরা বলেন যে,

★শ্রমিকদের পক্ষে ধর্মঘট সম্ভব না হলেও ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় ৯ ও ১০ই নভেম্বর, ১৯৫০, তারিখে ধর্মঘট করে। দুই দিন ধর্মঘটের পর ১১ই তারিখে ব্যবসায়ী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার পর ধর্মঘটের অবসান ঘটে এবং কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদের অভাব অভিযোগ দূর করবেন বলে আশ্বাস দেন।[৪]

www.pathagar.com

পে কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে শ্রমিকদেরকে ভাঁওতা দেওয়া চলবে না, উর্ধ্বতন পোর্ট কর্মচারীদের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, সকল শ্রমিকের জন্যে বাসস্থান চাই, চট্টগ্রাম ডক শ্রমিকদের জন্যে করাচীর ডক শ্রমিকদের সমান মজুরী দিতে হবে। এই দাবীগুলি পূরণ করা না হলে তাঁরা ধর্মঘট করবেন বলেও চরমপত্রটিতে ঘোষণা করেন।[৫]

এই সময় চট্টগ্রাম পোর্ট মেরিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম ডক শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভা হয়।[৬] এই সভায় ডক শ্রমিকদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ ও সমস্যাবলীর আলোচনা করে ডক শ্রমিকদের প্রতি পোর্ট কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়। বিশেষ করে উপযুক্তভাবে শ্রমিকদের বেতন না বাড়াবার মতলবে উর্ধ্বতন কর্মচারীরা পে-কমিশনের রিপোর্টের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা যেভাবে করেছেন তার সংশোধনের জন্যে পোর্ট কমিশনারের কাছে দাবী জানানো হয়। করাচীর ডক শ্রমিকরা এবং চট্টগ্রামের আর.এস.এন, কোম্পানী লিমিটেড, আই.জি.এন রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড, বার্মা অয়েল কোম্পানী (পি.টি.) লিমিটেড প্রভৃতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা তাঁদের থেকে যে বেশী বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করছেন তার প্রতি পোর্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

উর্ধ্বতন কর্মচারীগণ কর্তৃক ব্যক্তিগত স্বার্থে বেতন ভোগী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, বদলি ও নিয়োগ সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশাবলী গোপন রাখা, শ্রমিকদের বার্ষিক বর্ধিত ভাতা অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ করে দেওয়া, এক বৎসরের মতো কাজ করার পরও তাদের জন্যে চাকরির স্থায়ী বন্দোবস্ত না করা, উর্ধ্বতন কর্মচারীগণ কর্তৃক সব সময়েই পিছনের দরজা দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ করা উর্ধ্বতন কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করে সভায় প্রস্তাব পাশ করা হয়।

তিন মাইল ও তার থেকেও বেশী দূরবর্তী স্থান থেকে এসে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের জন্যে বিশেষ ভাতার বন্দোবস্ত করা হলেও Floating crafts কর্মচারীদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাঁরাও অনুরূপ ভাতা দাবী করলে অফিসাররা তা অগ্রাহ্য করে। সেজন্যে এই বিভাগের কর্মচারীদের জন্যেও এই সভায় অনুরূপ ভাতা দাবী করা হয়। এই প্রসঙ্গে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পোর্ট কমিশনের চেয়ারম্যান এবং জহুর আহমদ চৌধুরী যৌথভাবে একবার উপরোক্ত বিভাগের দারোয়ান, খালাসী ও অপরাপর কর্মচারীদের বস্তি এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁদের বাসস্থান ও সাধারণভাবে বস্তি এলাকার বিপর্যস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চেয়ারম্যান নিজে তার সুব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু Hanser Boat staff-দের জন্যে

www.pathagar.com

আবাসের ব্যবস্থা করলেও দারোয়ান, খালাসী প্রভৃতি নিগৃহীত কর্মচারীদের জন্যে কোন ব্যবস্থাই তাঁরা করেন নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীরা প্রায় সমান হারে বেতন ও ভাতা ভোগ করেন। কাজেই চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্যে সেই একই নীতি অনুযায়ী বেতন ও ভাতা দেওয়ার দাবী জানানো হয়। ডক শ্রমিকদের সাধারণ সভা ও পোর্ট মেরিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সভায় উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবীগুলি জানানো হয় এবং বলা হয় যে, কর্তৃপক্ষ ওপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলির আশু সমাধান না করলে শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্যে সর্বাত্মক ধর্মঘট করতে বাধ্য হবেন।

তৎকালীন পূর্ব বাঙলার শ্রমিকদের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের ডক শ্রমিকরা তুলনায় অনেকের থেকে বেশী শোষিত ও নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও বলিষ্ঠ ও জঙ্গী ইউনিয়নের অভাবে এবং ধর্মঘটসহ অন্যান্য সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে অক্ষম হওয়ার জন্যে তাঁদের দাবী দাওয়া পূরণের ক্ষেত্রে পোর্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকার স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশী অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে। এই অবজ্ঞা ও অবহেলার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ক্রমাগত তীব্রতর হয়।

৮. তৈল শ্রমিক

দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাঙলায় তৈল শিল্প বলতে কিছুই ছিলো না। বার্মা অয়েল কোম্পানী (বি.ও.সি.) বিদেশ থেকে তৈল আমদানী করে পূর্ব বাঙলায় বিতরণ করতো। এই তৈল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র ছিলো চট্টগ্রাম। সেখানে বি.ও.সি. শ্রমিক ইউনিয়ন নামে বি.ও.সি.তে কর্মরত শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন ছিলো। তিন বৎসর ধরে বি.ও.সি. কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিম্নতম দাবী দাওয়ার প্রতি কর্ণপাত না করে অনমনীয় থাকায় শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে ১৯৫১ সালের ১৫ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের ডবলমুরিং ময়দানে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সহস্রাধিক বি.ও.সি. শ্রমিক উপস্থিত থাকেন এবং সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী।[১]

সভার শুরুতে বি.ও.সি. শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক আবদুল হাই শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ ও দাবী দাওয়া সম্পর্কে বলেন,

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য ৩ মাসের বোনাস, ভাতা, বৎসরে ২৭ দিন (পাকিস্তান দিবস সহ) বেতনসহ সাধারণ ছুটি, চিকিৎসার ব্যবস্থা, শ্রমিক বদলী ও বরখাস্ত ইউনিয়নের মারফত করা, অসুখের

www.pathagar.com

ছুটি ও ছাঁটাইয়ের সময় ছাঁটাইকৃত শ্রমিককে এক বৎসরের পুরো বেতন দেবার দাবী পূর্বক বি.ও.সি. কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে। তাছাড়া বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ায় শ্রমিকদের বর্তমান দৈনিক মজুরী ১॥. আনার স্থলে ১.৷৷ মাসিক ভাতা ৪২৷৷ টাকার স্থলে ৪৫ ও ঘর ভাড়া বাবদ ৫ টাকা দেওয়ার দাবী করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এসব দাবীকে কোন আমল দেয়নি। অথচ বিভাগপূর্ব সময়ে পেট্রোলের দর যখন ১॥. ছিল তখনও শ্রমিকদের উপরোক্ত হারে বেতন দেওয়া হতো, আর আজ যখন পেট্রোলের দর প্রতি গ্যালন ৪॥ তখনও শ্রমিকদের বেতনের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় নি, অথচ এই বিদেশী বেনিয়া ব্রিটিশ দালালরা শ্রমিকদের শোষণে শোষণে নিষ্পেষিত করে অতিরিক্ত তৈল বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে বিলেত পাঠিয়ে দিচ্ছে। বি.ও.সি. লেবার ইউনিয়ন কিছুদিন পূর্বে উপরোক্ত দাবী দাওয়াগুলো লেবার কমিশনের কাছে জানায়। তখন লেবার কমিশনার মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হিসেবে দৈনিক মজুরী ১।. এলাউন্স ৫৪ টাকা ও ঘর ভাড়া ৫ টাকা সাব্যস্ত করেন, কিন্তু তাও বি.ও.সি. বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর অনুমতি সাপেক্ষে।

সম্প্রতি বি.ও.সি' র ম্যানেজার জানিয়ে দিয়েছে যে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস তা স্বীকার করে নি। এইভাবে তিন বৎসর যাবত দালাল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু তাদের দাবী দাওয়ার কোন সুরাহা করে নি। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষ গোপনে কতিপয় ভাড়াটিয়া দালাল সৃষ্টি করে শ্রমিক ইউনিয়নের সংহতিকে বিলোপ সাধনের অপকৌশল করছে।

দুনিয়ার সবখানেই শ্রমিকরা রোববার ছুটি পায়। কিন্তু বি.ও.সি. কোম্পানীর শ্রমিকরা রোববারে ছুটি পায় না– যদিও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বেতনসহ ছুটি পায়। শুধু তাই নয় আজাদী দিবসেও বি.ও.সি. শ্রমিকদের ছুটি হয় না। পাকিস্তানী শ্রমিকদের পাকিস্তানের আজাদী দিবসে ছুটি না দেওয়া প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা।...

বি.ও.সি. শ্রমিকদের সাধারণ অবস্থা আবদুল হাই এইভাবে বর্ণনা করার পর ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১, থেকে সুনির্দিষ্টকালের জন্যে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করেন। এরপর অন্যান্য বক্তারা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা করেন এবং সব রকমের সাহায্য দিয়ে আন্দোলনকে জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেন।

চট্টগ্রাম তমদ্দুন মজলিশের দুইজন কর্মী মকছুদুর রহমান ও আজিজুর রহমান বি.ও.সি. শ্রমিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিশের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা এম.এ. আজিজ। বি.ও.সি. কর্তৃপক্ষের বর্বর নীতি এবং পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের নিষ্ক্রয়তার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এই বৃটিশ দালালরা শ্রমিকদেরকে দুই এক আনা বেশী দৈনিক মজুরী দিতে নারাজ অথচ তারা নিজেদের কুকুরের জন্যে দৈনিক ব্যয় করে ৫॥.। এই অবস্থা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

পাকিস্তানের দালাল নেতারা বিদেশে বলে বেড়ায়, 'পাকিস্তানের লোকেরা বেশ আরামে আছে।' বি.ও.সি.র শ্রমিক বাজন মিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিজের জীবনের দুর্বিষহ অবস্থার যে বিবরণ দেন তার মাধ্যমে শ্রমিকদের সাধারণ অবস্থার নিদারুণ এক চিত্রই উন্মোচিত হয়। সব শেষে বক্তৃতা করেন সভার সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী। তিনি পাকিস্তান সরকারের শ্রমনীতি এবং বৃটিশ সৃষ্ট ঘৃণ্য কারখানা আইনের তীব্র নিন্দা করেন ও তার উচ্ছেদ দাবী করেন।

বি.ও.সি. কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবী না মানলে পরবর্তী ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন বলে ১৫ই জানুয়ারীর এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বি.ও.সি. কর্তৃক শ্রমিকদের দাবীগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনে না নেওয়ায় তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১, থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। ঐক্যবদ্ধভাবে ও দৃঢ়তার সাথে দুই সপ্তাহের মতো ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রায় সমস্ত মূল দাবীগুলিই স্বীকার করতে বাধ্য হয়।[২] এর ফলে নিম্নস্তরের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ১।. আনা থেকে হয় ১৷. আনা ; মাগগী ভাতাসহ প্রতিমাসে বেতন হয় ৮৬৷ ; প্রতি বৎসরে ১৭ দিনের স্থলে ছুটি হয় ২৭ দিন ; পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ছুটি ঘোষিত হয়; কোম্পানীর এলাকার বাইরে শ্রমিকদের সভা করার অধিকার স্বীকৃত হয় ; ১৯৪৯-৫০ সালের জন্যে ১ মাসের বোনাস দেওয়া হয়। এছাড়া আরও কতগুলি ছোটখাট দাবী কোম্পানী কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে।

এ পর্যন্ত পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন কলকারখানায় ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের যে কিছু আন্দোলন ও ধর্মঘট হয়েছিলো তার মধ্যে সব থেকে সাফল্যজনক ছিলো বি.ও.সি. শ্রমিকদের এই ধর্মঘট।

৯. বাটা শ্রমিক

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা★ হয় তারপর বাটা কোম্পানীর এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে পূর্ব বাঙলায় চলে আসেন। এই সমস্ত শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের জন্যে পূর্ব বাঙলা সরকার ও বাটা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা বহু আবেদন নিবেদন করেন। কিন্তু এই আবেদন নিবেদনের প্রতি সরকার অথবা বাটা কোম্পানী কর্তৃপক্ষ একেবারেই ভ্রূক্ষেপ না করায় তাঁরা কতকগুলি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের সময় বাটা শ্রমিকরা ২০শে জানুয়ারী, ১৯৫১,

---

★বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির' দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তারিখে মুসলিম লীগ দলের কাছে নিজেদের দাবী দাওয়া পেশের উদ্দেশ্যে ঢাকার মুকুল সিনেমায় সেই সময় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় মিছিল সহকারে উপস্থিত হন। শ্রমিকরা আশা করেছিলেন যে, মুসলিম লীগ সরকার তাঁদের বক্তব্য সহানুভূতির সাথে শুনবেন ও দাবী দাওয়াগুলি সম্পর্কে বাটা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে মুসলিম লীগ সেই শ্রমিক মিছিলটির ওপর নিজেদের পালিত গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিককে অমানুষিকভাবে প্রহার করে এবং মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[১]

এই সম্পর্কে এস-হক নামক এক ব্যক্তি★ একটি লিখিত প্রবন্ধে বলেন যে,

> মুসলিম লীগ অসহায় বাটা শ্রমিকদের উপর নির্মম প্রহার চালিয়ে আর একটা কলঙ্কিত ইতিহাসের সৃষ্টি করলো। মুসলিম লীগ তার বীভৎস মূর্তি আবার দেশবাসীকে দেখালো। ভালই হলো, বাটা শ্রমিক দেখলো, আমরা দেখলাম, দেশবাসী দেখলো বুঝলো, আর একবার, মুসলিম লীগ জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়— মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জন্য যারা ত্যাগ করেছে তাদের উপর লাঠি চালায়। মুকুল সিনেমা হলের সামনে বাটা শ্রমিকদের রক্ত কেবল ব্যর্থ হয় নি। তাদের রক্তক্ষরণে তাদের সঙ্গে আরো অগণিত শ্রমিক, কিষাণ, মধ্যবিত্তের মুক্তিপথের নির্দেশনামা লিখিত হয়ে গেছে।[২]

নিজেদের দাবী দাওয়া আদায় ও অবস্থার প্রতিকারের অন্য কোন উপায় না দেখে হাজার হাজার কর্মচ্যুত বাটা শ্রমিক ১৯৫১ সালের ২০শে এপ্রিল থেকে "বাটার জুতো বয়কটের" আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ যুব লীগের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন,

> ফেব্রুয়ারী হাঙ্গামার সময় ৩,৫০০ জন বাটা শ্রমিককে উদ্বাস্তু হিসেবে ভারত ত্যাগ করতে হয় এবং তাঁরা কর্মচ্যুত হয়ে পড়েন। খবর পাওয়া গেছে যে আয়ের কোন সংস্থান না থাকায় এই বাটা শ্রমিকরা নিজেদের পরিবারের হাজার হাজার সদস্যসহ অনাহারে রয়েছেন। এই অবস্থা চলছে বিগত ১৪ মাস ধরে।
>
> জানা গেছে যে, ৫০ শতাংশেরও বেশী কর্মচ্যুত বাটা শ্রমিক এখনো পর্যন্ত বাটা কর্তৃপক্ষের থেকে কোন টাকা পয়সা পান নি।
>
> যাতে অন্তত কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয় তার জন্য বাটা শ্রমিকরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি বাটা জুতো কারখানা দাবী করেছিলেন। আমরা মনে করি এটা একটা ন্যায়সঙ্গত দাবী। কিন্তু তার সাথে আমরা এটাও দাবী করি যে, সরকার তাদের কাগুজে পরিকল্পনা বাদ দিয়ে দেশের শিল্পোন্নয়নের দিকে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন। সরকারের উচিত এখনই জুতো কারখানা স্থাপন করা যাতে করে কর্মচ্যুত বাটা শ্রমিকরাসহ এই বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন অন্যান্যরাও তাদের জীবিকার একটা উপায়ের সন্ধান পেতে পারে।
>
> দুঃখের বিষয়, এ লাইনে বাটা কর্তৃপক্ষ কোন বাস্তব পদক্ষেপ তো এখনও গ্রহণ

★খুব সম্ভবতঃ ইনি একজন বাটা শ্রমিক।

www.pathagar.com

করেনইনি, এমনকি এ সম্পর্কে কোন ইচ্ছাও তাঁরা প্রকাশ করেননি। এর ফলে বাটা শ্রমিকরা বাধ্য হয়েছেন নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য ২০শে এপ্রিল থেকে 'বাটার জুতো বয়কট' আন্দোলন শুরু করতে। এই আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে সর্বান্তঃকরণে সাহায্যের জন্য আমরা সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।[৩]

বাটার জুতো বয়কটের আন্দোলন বেশ কিছু দিন স্থায়ী হয়। কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর ১৯৫১ সালে ২৯শে অক্টোবর ভারত থেকে আগত কর্মচ্যুত বাটা শ্রমিকরা জোরে শোরে আবার বাটার জুতো বয়কট আন্দোলন শুরু করে জনগণের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানান। ঢাকায় বাটা শ্রমিকরা 'বাটার জুতা ক্রয় বন্ধ করুন' এই ব্যাজ গায়ে ঝুলিয়ে বাটার দোকানগুলির সামনে পিকেটিং শুরু করেন। খরিদ্দারদেরকে তাঁরা কর্মচ্যুত বাটা শ্রমিকদের অবস্থা বোঝান এবং বাটার জুতো না কেনার জন্য তাঁদেরকে অনুরোধ জানান। এর ফলে খরিদ্দাররা বাটা শ্রমিকদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং বাটার জুতো না কিনেই ফেরত যান।[৪]

একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালের ১০ই নভেম্বর থেকে চাঁদপুরে বাটা শ্রমিকরা স্থানীয় বাটার দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু করেন এবং যতদিন না বাটা কোম্পানী পূর্ব বাঙলায় নিজেদের কারখানা স্থাপন করছে ততদিন বাটার জুতো বয়কটের জন্যে জনগণকে অনুরোধ জানান। এর ফলে চাঁদপুরে বাটার জুতো কেনা ঐ সময় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় হোটেল মালিকরা ধর্মঘটী বাটা শ্রমিকদেরকে আহার দেন বলেও রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়।[৫]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১. শিক্ষা সমস্যা

বৃটিশ আমলে পূর্ব বাঙলাসহ সারা ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো তাতে মেহনতী জনগণ, বিশেষত শ্রমিক কৃষকের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিলো না। ঔপনিবেশিক শাসনে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বৃটিশ ভারতীয় সরকার নিজেদের আমলে এদেশে একটি মধ্য শ্রেণী সৃষ্টি করে সেই শ্রেণীকে নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এক নোতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রায় সোয়া এক শতাব্দী সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের অতি অল্প সংখ্যক মানুষই শিক্ষা লাভে সমর্থ হন এবং অশিক্ষিতের হার প্রকৃতপক্ষে ৯০ শতাংশেরও বেশী থাকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের কোন উদ্যোগ তো দেখাই যায় না, উপরন্তু বৃটিশ আমলে শিক্ষার যে কাঠামোটুকু ছিলো সেটাও নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত সব স্তরেই ভেঙে পড়তে থাকে। এর ফলে মধ্যশ্রেণীভুক্ত পরিবারের যে সব ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার কিছু কিছু সুযোগ লাভ করেন তাঁদেরও শিক্ষার মান দ্রুতগতিতে নেমে যেতে থাকে। শুধু তাই নয়, তাঁদের সংখ্যাও বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস হয়ে চলে। স্কুল কলেজ বন্ধ হতে থাকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকরা ছাঁটাই হতে থাকেন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরও সংখ্যা ও যোগ্যতার মান কমে আসে। এই পরিস্থিতিতে সারা দেশব্যাপী ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যাপক ও গভীর বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে এবং ছাত্র ও শিক্ষক আন্দোলনের মধ্যে তার অভিব্যক্তি ঘটে। পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাও শিক্ষা ব্যবস্থার এই ক্রমবর্ধমান অবনতি ও ভেঙে পড়তে থাকা অবস্থায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। শিক্ষা সমস্যার ওপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান আলোচনা সভার আয়োজন করতে থাকেন। পত্রপত্রিকাতেও এ বিষয়ে কিছু কিছু লেখালেখি শুরু হয়।

www.pathagar.com

২. শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান ও তার প্রতি গণসমর্থন

১৯৫০ সালের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় একটি ছাত্র কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১] শিক্ষা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অলি আহাদ এবং সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন,

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আজ চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে দাঁড়াইয়া যেমন প্রতিটি মানুষ প্রশ্ন করিতেছে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি কতটুকু আগাইয়া গেছে, তেমনি প্রতিটি ছাত্র, প্রতিটি শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীও আজ প্রশ্ন করিতেছে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য আজ কোন দিকে। যে শিক্ষা মানুষের সাধারণ বুদ্ধিশক্তি ও সর্বাঙ্গীন প্রতিভা বিকাশে আবহমানকাল ধরিয়া সাহায্য করিয়া আসিতেছে ও ভবিষ্যতেও যাহা কাজ করিয়া যাইবে তার ভবিষ্যৎ রূপ নির্ধারণ করিবার সুকঠিন দায়িত্ব আসিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রতিটি মনন শক্তির নিকট।
>
> পূর্ববঙ্গে আজ শতকরা ৩০ ভাগ প্রাইমারী স্কুল উঠিয়া যাইতেছে, সরকারী অবহেলায় হাই স্কুলগুলির চরম ধ্বংস অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কলেজগুলির স্বাভাবিক অবস্থা আজ আর নেই ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী ইচ্ছাকৃত কার্পণ্যে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তা যে কোন স্বাধীন (?) দেশের পক্ষে লজ্জাকর। অপরদিকে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করিয়া, পরীক্ষার ফি বাড়াইয়া ও আরবী হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা করিয়া সরকার যে শিক্ষা সংকোচ নীতির পরিচয় দিয়া যাইতেছে তা আরও ভয়াবহ।
>
> এমনিভাবে যে বিবিধ শিক্ষা সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের সামনে তার শুধু বিশ্লেষণ ও সঠিক সমাধানের পথ নির্ধারণ করা আজিকার দিনে ঐতিহাসিক কর্তব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আগামী সেপ্টেম্বরের (১৯৫০ সাল) ১৫ই ও ১৬ই ঢাকায় "নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন" আহ্বান করিয়াছি। সক্রিয় সমর্থন জানাইয়া এই সম্মেলনকে সার্থক করিবার জন্য আমরা দেশের প্রতিটি চিন্তাশীলের নিকট আহ্বান জানাইতেছি। আমরা বিভিন্ন জেলায় অবিলম্বে কর্মী পাঠাইতেছি। ১৭/১২ রেনকিন ষ্ট্রীট (মিনার অফিস) পোঃ অঃ ওয়ারী, ঢাকা এই ঠিকানায় সংযোগ স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।[২]

ছাত্রদের দ্বারা আহূত এই শিক্ষা সম্মেলনের সমর্থনে ও তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানিয়ে ২৮শে আগস্ট তারিখে পাকিস্তান অবজার্ভার সম্পাদক আবদুস সালাম, ইনসাফ সম্পাদক মহীউদ্দীন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, কাজী মহম্মদ ইদ্রিস (ইনসাফ), দৈনিক সম্পাদক শাহেদ আলী ও সৈয়দ নূরুদ্দীন (পাকিস্তান অবজারভার) একটি বিবৃতিতে বলেন,

> ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকাতে একটি নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠানের যে সিদ্ধান্ত ঢাকার ছাত্রেরা গ্রহণ করেছেন তা সময়োচিত ও বিজ্ঞজনোচিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাকে অধিকতর অবনতির

www.pathagar.com

হাত থেকে রক্ষার জন্য সাধারণভাবে জনগণের ও বিশেষভাবে ছাত্রদের উদ্বেগেই প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষা সম্মেলনে বর্তমান শিক্ষা সঙ্কটের যে বিশ্লেষণ সম্ভব হবে সেটাই হবে অন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্ববর্তী পদক্ষেপ। সেজন্য আমরা সর্বান্তঃকরণে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি এবং সম্মেলনের সংগঠকদের সক্রিয় সমর্থন দানের জন্য পূর্ব বাঙলার সচেতন জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।[৩]

এছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি নূরুল হুদা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের সভাপতি কমরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক এম.এল.এ. খয়রাত হোসেন এম.এল.এ. আনোয়ারা খাতুন এম.এল.এ. শামসুদ্দীন আহমদ, এম.এল.এ. আলী আহমদ এম.এল.এ. নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার আলমাস আলী, পূর্ব পাকিস্তান বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সঙ্ঘের আলী তাহেরও সম্মেলনকে সমর্থন দান করে একটি বিবৃতি দেন এবং তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করতে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান।[৪]

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের ওদুদ ও হালিম, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আবদুস সামাদ, পাকিস্তান ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের আমিনুল ইসলাম, ছাত্র ফেডারেশনের এ. জামান, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহ-সভাপতি মুস্তফা নূরুল ইসলাম ও নারায়ণগঞ্জ মুসলিম কলেজ ইউনিয়নের মফিজউদ্দিন একটি যুক্ত বিবৃতিতে জনগণ ও সাধারণ ছাত্রদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন,

> আমরা জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র সমাজের প্রতি বিনীত আবেদন জানাইতেছি যে, ঢাকায় আসন্ন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে আপনাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া উক্ত সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আমাদের আরব্জ সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করুন।[৫]

জনগণ ও ছাত্র সাধারণের কাছে আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে শিক্ষা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি এই সময় বেশ কয়েকটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন।

ছাত্র নেতাদের উপরোক্ত বিবৃতি থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এই পর্যায়ে শিক্ষা সঙ্কট এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো এবং ছাত্রদের ওপর নানান নির্যাতন এমনভাবে জারী হয়েছিলো যাতে ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন এবং তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে প্রেরিত ও নওবেলালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয় :

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবনের উপর সরকারী আঘাত যে আজ ছাত্র সমাজকে কত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের নূতন রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে। পুরাতন সকল দলাদলি ভুলিয়া গিয়া নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র এসোসিয়েশন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি সব ছাত্র প্রতিষ্ঠানই ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলিয়াছে শিক্ষা সংকোচন চলিবে না, এবং আগামী শিক্ষা সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে মিলিতভাবে অগ্রসর হইতেছে।[৬]

শিক্ষা সম্মেলনের সমর্থনে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সিলেটে ছাত্র ছাত্রীদের একটি মিছিল হয়।[৭] এরপরই নওবেলাল 'শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বলেন,

শীঘ্রই ঢাকা মহানগরীতে পাকিস্তানের শিক্ষাবিদগণ একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন।... এই সমস্যা শুধু বিদ্যার্থীদের সমস্যা নহে-এই সমস্যাটি দেশের প্রত্যেকটি নরনারীর।... আমরা মনে করি না দেশের এত বড় সমস্যা সমাধানের একমাত্র দায়িত্ব ছাত্র সমাজের। ছাত্র সমাজের অভিভাবকগণ আজও যদি নির্লিপ্ত হইয়া এই সমস্যাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন তবে তাহাদের ভবিষ্যত বংশধরকে পুনরায় মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক যুগের দিকে ঠেলিয়া দিবেন। শিক্ষার পরিধি আঞ্চলিক পরিধির উর্ধ্বে, এখানে সাম্প্রদায়িক ছোঁয়াচ লাগিতে পারে না।[৮]

সেপ্টেম্বরের শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে এই সময় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'সরকারের শিক্ষা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন' নামে এই ধরনের একটি প্রবন্ধে[৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র নেতা (ছাত্র ফেডারেশন) সৈয়দ মোহাম্মদ আলী বলেন,

গত তিন বছরের ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই আসন্ন শিক্ষা সম্মেলনের গুরুত্ব বিচার করতে হবে। এই শিক্ষা সম্মেলনের প্রতি আমাদের সমর্থন জানিয়ে আমরা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা ধরনের খণ্ড আন্দোলনের পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে সরাসরি প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাতে হবে। এই প্রস্তুতির জন্য আমাদের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে প্রদেশব্যাপী সংগ্রামী ঐক্য। এই ঐক্যের জোরে আমরা শুধু সামগ্রিকভাবে আমাদের আন্দোলনকে জোরালো করে তুলব তা নয় সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে বিভিন্ন দুর্বল ঘাঁটিকে কর্মচঞ্চল করে তুলতে পারব।

সর্বোপরি এই প্রদেশব্যাপী ঐক্যের জোরে আন্দোলনের নেতৃত্বকেও কোন বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দেব আন্দোলনের স্তরে স্তরে শহরে গ্রামে নগরে প্রান্তরে। দলীয় ও স্থানীয় স্বার্থ মিলেমিশে এক হয়ে যাবে সামগ্রিক ও সাধারণ স্বার্থে জেগে উঠবে যা এতদিন আমরা গড়তে পারি নি Basic leadership'.

শিক্ষা সম্মেলনের পরে প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য আমরা কোন পথ বেছে নেবো তা নির্ভর করছে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উপর তবে যে পথ আমরা বেছে নেই না কেন সে পথে আপোষ ও নিষ্ক্রিয়তার স্থান নেই। আর নেতৃত্ব সরাসরি থাকবে সেই গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজের হাতেই যারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রক্ত রাঙা পথে এক সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেছিলো। গড়ে তুলে

www.pathagar.com

ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতন কর্মচারীর সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস।

আপোষ নয়, আঘাত করবো, নিষ্ক্রয়তা নয়, এগিয়ে যাব, আমাদের গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যে হামলাই আসুক না কেন– আমরা সবাই মিলে আরো জোর গলায় আওয়াজ তুলবো– "শিক্ষার প্রসার চাই, জাতীয় শিক্ষাকে রাষ্ট্রনায়কের জুলুমবাজীর হাত থেকে বাঁচাব।"

ঢাকাতে শিক্ষা সম্মেলন শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে নওবেলাল 'শিক্ষা-সঙ্কট' শীর্ষক আর একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। তাতে শিক্ষার তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্রিকাটি মন্তব্য করেন,

প্রাক-আজাদী যুগে ইংরেজ শাসনের আমলে যে বিদ্যায়তনগুলি দেশীয় আমলা প্রস্তুতির জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল সেই পল্লী ও সহরের পর্ণ কুটীরগুলিও ঝড়ের মুখে উড়িয়ে যাইতেছে। পল্লীর অসহায় প্রাথমিক শিক্ষক ও সহরের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণ ঝড়ের মুখে হাল ছাড়িতে বাধ্য হইতেছেন। পল্লীর শিক্ষায়তনগুলি আজ প্রেতপুরীতে পরিণত হইয়াছে। কংকালসার শিক্ষকেরা ধীরে ধীরে তাহাদের জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন। আগত সমাজের মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। বহু শিক্ষক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন– তাহা পূরণের কোন সক্রিয় চেষ্টা শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে আজও হয় নি। আজ সরকারের শিক্ষা প্রসারের কোন পরিকল্পনা দেখা যাইতেছে না। যে সকল ব্যক্তিবর্গের অতীত জীবনে কোন মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই তাহারাই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার ভার লইয়াছেন। শিক্ষা জগতে যদি দেখা দেয় রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতা তবে বাস্তবিক তাহা জাতীয় দুর্দিন বলিতে হইবে। পূর্ব বাংলার নিজস্ব ভাষা বাংলা ভাষার উপর জোর করিয়া অপর এক ভাষা চাপিয়া দিতে চাহিতেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই নির্লজ্জভাবে গভীর ষড়যন্ত্র করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। বাঙালীর বহু যুগের নিজস্ব সত্বার ভিত্তিতে যে বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল– যে ভাষার বৈভব পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে– যে ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হইবে তাহাকে সমুদ্রের তলতল গর্ভে নিমজ্জিত করিবার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকগণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে মুখ্য স্থান না দিয়া দেশ রক্ষার অজুহাতে বিদ্যাকেন্দ্রগুলি হুকুম দখল করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না।[১০]

৩. নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ তারিখে বেলা ১টায় ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে।[১] পূর্ব বাঙলার সমস্ত এলাকা থেকে প্রায় ২৫০ জন ছাত্র প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এছাড়া ঢাকার শিক্ষা কেন্দ্রগুলির বহুসংখ্যক ছাত্রও এই প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন।

www.pathagar.com

অধিবেশনের প্রথমেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অলি আহাদ শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন।[২] জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ের অবস্থা সম্পর্কে বলেন,

> জাতীয় শিক্ষার গোড়ায় সুপরিকল্পিত হামলার অধ্যায় শুরু হলো, শুরু হলো নয়া রাষ্ট্রের পত্তনের নামে শিক্ষার খরচ কমানো। শুরু হলো সরকারী অফিস ও ঊর্ধ্বতন অফিসারদের জন্য স্কুল কলেজ বিল্ডিং রিকুইজিশন। শুরু এক এক করে বা সাময়িকভাবে স্কুল কলেজের দ্বার বন্ধ করা।...
>
> সরকারী স্কুল কলেজগুলির সংস্কারের প্রশ্ন তুলতেই সরকার তা ধামাচাপা দিতে একটি বড় ওজর তুলেছে- 'শিক্ষক পাওয়া যায় না।' কিন্তু সঠিক খবর নিলে জানা যাবে যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজগুলি থেকে এলাউন্স কেটে নেওয়া নিয়ম মোতাবেক বর্ধিত বেতন মঞ্জুর না করা ইত্যাদি, পরোক্ষ শিক্ষক ছাঁটাই নীতির চাপে, এমনকি সরাসরি চাকুরিতে জবাব পেয়ে বেকারত্ব বরণ করেছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য নয়। সরকারী স্কুল কলেজগুলিতে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষককেও যতদিন খুশী অস্থায়ী পদবাচ্য করে রাখা হয়েছে ও হচ্ছে। অনেক সময় তিন চার মাস ধরে গরীব শিক্ষকদের মাইনে বাকী ফেলে রাখা হয়েছে। এই অবহেলার দরুন সর্বত্র সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজগুলি ভেঙ্গে পড়তে লাগল, হিন্দু শিক্ষকগণ অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর সরকারী আক্রমণ সম্পর্কে অলি আহাদ তাঁর অভিভাষণে বলেন,

> এ দেশের গণশিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থের আন্দোলনের মহীরুহ সমূলে উৎপাটনের অভিসন্ধি নিয়ে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলবার চক্রান্ত আঁটা হল। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আক্রমণ এল বাংলা ভাষার উপর। চক্রান্ত করা হল ভবিষ্যতের বাঙালীকে মূক করে দেবার-যাতে সে মুখ ফুটে শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে না পারে, যাতে সে ভুলে যায় তার জাতীয় ও সামাজিক অস্তিত্বের মর্যাদা, ভুলে যায় তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।
>
> অনেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী পূর্ব বাংলার বলিষ্ঠ ছাত্র সমাজও আক্রমণ চোখ বুজে বরদাস্ত করবে না। যে ভাষা এ দেশের লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও ভাবনার ঐতিহাসিক পরিণতি ও ঐতিহ্যকে বহন করছে, যে ভাষায় বাংলার প্রতিটি শিশুর প্রথম বুলি ও প্রথম পাঠ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে, সরকারী পরিভাষা হিসেবে "আজাদ বাংলা" কেন তাকে পাবে না? চারদিকে আওয়াজ উঠল-"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" মিছিলের মুখে তথাকথিত গদিনশীন নেতাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জবাবদিহি তলব করা হল। সমগ্র প্রদেশজুড়ে পূর্ব বাঙলার বৃহত্তম ছাত্র ও গণ আন্দোলন গড়ে উঠল।

শিক্ষা সম্মেলনের পটভূমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ গোপনীয় সরকারী সার্কুলারের উল্লেখ করে অলি আহাদ বলেন,

> স্পষ্টতই এই কালা নির্দেশের ভিত্তিতে ছাত্রদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার

www.pathagar.com

সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা সরকার ও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ চালিয়ে যেতে কসুর করেন নি। শিক্ষকদের স্বাধীন গতিবিধির তো প্রশ্নই ওঠে না, কেউ তার ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া পেশ করলেই তাকে রাষ্ট্রের শত্রু, ইছলামের শত্রু আখ্যা দিয়ে দমন নীতির প্রকোপে ফেলে দেওয়া হয়। এই কালা কানুনের প্রকাশ্য ও গোপন প্রকোপে জরিমানা, বহিষ্কার ও গ্রেফতারের ঝড় বয়ে গেছে ছাত্র সমাজের বুকের ওপর দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বগুড়ার অধ্যাপক গোলাম রছুল সাহেব, গাইবান্ধা ও নড়াইলের কয়েকজন শিক্ষকের বহিষ্কার, মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্রের বহিষ্কার, বিশিষ্ট ছাত্রকর্মীর কারাবাসের ইতিহাস কারও অজানা নাই। এছাড়া কথায় কথায় স্কুল কলেজে পুলিশ পিকেট বসিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কয়েদখানায় পরিণত করা হয়েছে। তবু ছাত্র আন্দোলন দমে নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন★ দমননীতি ও ছাত্র বহিষ্কারের বিরুদ্ধে। তার পরে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নয়া চক্রান্ত পাকানো হল– আরবী হরফে বাংলা লেখার চক্রান্ত।★ ঢাকা ও মফস্বল ছাত্রদের ধ্বনি চক্রান্তকারীদের হকচকিয়ে দিয়েছিল। তারপর এল সর্বশেষ ব্যাপক আক্রমণ স্কুল কলেজে বেতন বৃদ্ধি। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে সক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে দিয়েই আজ আমরা এই শিক্ষা সম্মেলনের দ্বারে এসে পৌঁছেছি।

সরকারী প্রয়োজনে পূর্ব বাঙলা সরকার স্কুল কলেজের বাড়ীঘর দখল করে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো সে বিষয়ে অলি আহাদ বলেন,

একমাত্র ঢাকাতেই : ইডেন কলেজ–এখন সেক্রেটারিয়েট ; কলেজিয়েট স্কুল-ষ্টেট ব্যাংক ; জগন্নাথ হল-এসেমব্লী হাউস ; ইডেন গার্লস স্কুল ও কামরুন্নেছা স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নবকুমার হাই স্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির, প্রিয় নাথ হাইস্কুল, সলিমুল্লাহ কলেজ, আরমানীটোলা গার্লস স্কুল ও জগন্নাথ কলেজ রিকুইজিশন করে মাসাধিককাল বন্ধ রাখা হয়।

সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ, সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা, মুরারীচাঁদ কলেজ হোষ্টেল এবং আরো কয়েকটী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুকুম দখল করা হয়। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও অন্যান্য জেলাতেও নির্বিচার অনুরূপ হুকুম দখলের বিরুদ্ধে ছাত্র প্রতিরোধের নজীর হিসেবে অল্পদিন পূর্বে সিলেটের ছাত্রছাত্রীর সার্থক হুকুম দখল প্রতিবাদ ও মেয়ে কলেজ আন্দোলন, ঢাকায় কামরুন্নেছা স্কুলের ছাত্রীদের আন্দোলন ও কুষ্টিয়ার হোষ্টেল আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল এবং ময়মনসিংহের ভটপুরা ও অন্যান্য কয়েকটি বিদ্যালয় আজও মিলিটারীর কবলে। এমনি করেই মিলিটারীর খাতিরে শিক্ষাকে বলি দেওয়া হচ্ছে।

কতগুলো ভাঙ্গা চোরা বাড়ীতে ঢাকা কলেজের প্রাণ প্রদীপ মিট মিট করে জ্বলছে। গত '৪৮ সনের নভেম্বরে উক্ত কলেজের ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট ও

★পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।
★★ঐ একই।

www.pathagar.com

প্রবল আন্দোলনের★ চাপে সরকার অবিলম্বে উপযুক্ত স্থানে উক্ত কলেজ স্থানান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। আর্টস স্কুলের ছাত্ররা স্কুল বিল্ডিং-এর সংস্কারের বা স্থান পরিবর্তনের জন্য বহুদিন ধরে আবেদন নিবেদন করে আসছে। প্রত্যুত্তরে এসব প্রশ্ন তো ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছেই উপরন্তু ইস্পাহানীর জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল বিল্ডিং হুকুম দখলের নির্লজ্জ প্রস্তাব তোলা হচ্ছে।

এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে অলি আহাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থার কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তাঁদের ওপর বিভিন্ন রকমের সরকারী হামলা ও তার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির উল্লেখ করেন।★ এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষা ও মেডিকেল স্কুল কলেজের অবস্থা সম্পর্কেও এই ভাষণে উল্লেখ করা হয়। মোহাজের ছাত্রদের সমস্যা, নারী শিক্ষার সমস্যা, ছাত্রাবাস সমস্যা, বেতন বৃদ্ধি, সরকারী দমন নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার পর অলি আহাদ পূর্ব বাঙলায় 'শিক্ষাকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করে তাঁর ভাষণ শেষ করেন,

> বাংলা ভাষা বিরোধী চক্রান্ত আজ চারিদিক থেকে পাকিয়ে তোলা হয়েছে। ১-নম্বর ঢাকা রেডিও "মাহে নও"-এর মারফত মীজানুর রহমান পরিকল্পিত উর্দু মিশ্রিত এক বিকৃত বাংলার প্রচলন। এ এক অভিনব ফন্দী। বাঙালীর কৃষ্টি, বাঙালীর রুচিবোধকে পিষে মারতে ভাষার ওপর ছুরি চালানোর এ-এক জঘন্য অত্যাচারের অস্ত্র। ২ নম্বর-আরবী হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র। বাংলা ভাষার অস্তিত্বের গোড়াটিতে আঘাত হানতে সরকার অবিচলভাবে সুনির্দিষ্ট পথে এ ঘৃণ্য পরিকল্পনা কার্যকর করার দিকে এগিয়ে চলছে। জনসাধারণের টাকা এভাবে অপব্যয় করে খরচ যোগান হচ্ছে আরবী হরফে লেখার ১৭টি পরীক্ষামূলক কেন্দ্রের। বিশেষজ্ঞ কমিটি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অবিলম্বে চালু করার যে সুপারিশ দাখিল করেছিল তাও কেন্দ্র থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।
>
> প্রাদেশিক সরকারের বাজেটের চেহারা দেখলে এই আক্রমণের অর্থ আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। বাজেটের শতকরা মাত্র ৫.২৬ ভাগ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে, আর মিলিটারী ও পুলিশ খাতে গিয়েছে ৭২ ভাগ।
>
> এই বিভিন্নমুখী আক্রমণ ব্যর্থ করে শিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে হলে আমাদের গড়ে তুলতে হবে লৌহ দৃঢ় ছাত্র ঐক্য এবং ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবী ও সকল দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সম্মিলিত জাতীয় প্রতিরোধ দুর্গ।

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের কিছু সংখ্যক সদস্য সরকারী এজেন্ট হিসেবে প্রথম থেকেই শিক্ষা সম্মেলনের বিরোধিতা করে আসছিলো। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অলি আহাদের বক্তৃতার পর আবু হেনা মহসীন ও আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে এরা সম্মেলন কক্ষে গণ্ডগোলের সূত্রপাত করে।[৩] গোলযোগকারীরা সভাপতির টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে

★বিস্তৃত বিবরণের জন্যে এ বইয়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

থাকে কিন্তু দারুণ গোলমালের ফলে তাদের কোন বক্তব্য উপস্থিত কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। এই গণ্ডগোলের ফলে সভাপতির অভিভাষণের পর সম্মেলনের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অধিবেশন তখনকার মতো ভেঙ্গে দেওয়া হয়।[৪]

সন্ধ্যার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মিলনায়তনে সম্মেলনের কাজ আবার শুরু হয়।[৫]

পরদিন শনিবার ১৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮-৩০ মিনিটে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ফজলুল হক হল মিলনায়তনেই যথারীতি শুরু হয়। পূর্ব দিন সন্ধ্যার এবং এই দিনের অধিবেশনে প্রতিটি জেলার ছাত্র প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জেলার শিক্ষা সম্পর্কীয় রিপোর্ট পেশ করেন। এই ছাত্র প্রতিনিধিদের একজন তাঁর রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করেন :

> রিলিফ কাজের জন্যে আমাকে একবার সুখানপুকুর (বগুড়া) যেতে হয়েছিল। সেখানে ঘটনাক্রমে একজন প্রাইমারী শিক্ষকের সঙ্গে পরিচিত হই। যখন তাঁকে দেখি তখন বেলা ১২টা। স্কুলের সময় অথচ তাঁকে ক্ষেতে লাঙ্গল ঠেলতে দেখে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম :
>
> আপনার স্কুল নেই ?
> : আছে।
> : তবে এখানে কেন ?
>
> ভদ্রলোক তাঁর চাষ রেখে অনেক কিছুই বলে গেলেন। তিনি বললেন : ত্যারো টাকা মাইনে, তাও পাই নি আজ ৯ মাস। উপায় কি ?
>
> আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর পরনে ছিল পাতলা ছেঁড়া গামছা আর দেহ নগ্ন। মনে রাখতে হবে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্রের একজন শিক্ষক এবং ভদ্রলোক।
>
> জিজ্ঞেস করলাম : স্কুল কখন করেন ?
> স্কুল ?
> তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল।
>
> : সে ত কবে ফক্কা। ছাত্ররা ত' বোনার পাড়ায় কুলিগিরি করে। কেউবা হয়েছে ছিঁচকে চোর।[৬]

বিভিন্ন জেলার ছাত্র প্রতিনিধিরা রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন কিভাবে কর্তৃপক্ষের অবহেলা, দলাদলি ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের হামলায় শিক্ষার দ্রুত অবনতি হয়েছে এবং ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায় নিপীড়িত হয়েছেন। সরকারী দমন নীতির কবলে পড়ে সংগ্রামী ছাত্র নেতৃবৃন্দের কারাবরণ, ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনা রিপোর্টগুলিতে উল্লেখ করা হয় তার ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারটিই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রিপোর্টগুলিতে সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতিরও তীব্র সমালোচনা করা হয়।[৭]

www.pathagar.com

১৬ তারিখের অধিবেশন পাঁচ ঘণ্টাকাল চলার পর একটি মূল প্রস্তাব এবং কতকগুলি দাবী দাওয়া উত্থাপন করে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব পাশ করা হয়। এই সমস্ত দাবীদাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে সম্মেলনে ছাত্র-প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে 'গণশিক্ষা পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের সেক্রেটারিয়েট ঢাকায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ৯ সদস্য বিশিষ্ট এই সেক্রেটারিয়েটের কনভেনার নির্বাচিত হন মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে এই গণশিক্ষা পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম পরিষদের সহযোগিতায় কাজ করতে অনুরোধ জানানো হয়।[৮]

১৬ই সেপ্টেম্বর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে যে মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা হলো এই :

> সর্বপ্রথমে এই সম্মেলন গত তিন বৎসরব্যাপী ছাত্রসমাজ শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছে সেইজন্য ছাত্র সমাজকে অভিনন্দন জানাইতেছে।
>
> পূর্ব বাংলার ছাত্র প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র জীবনে বিরাট সঙ্কট নামিয়া আসিয়াছে।
>
> নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে অভিভাবকদের আয় বৃদ্ধি না হওয়ায় হাজার হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এক বিরাট আর্থিক সঙ্কট যেমন ছাত্র জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে সরকারের অবহেলায় আর্থিক সাহায্যের অভাবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাইতেছে। যে অল্প সংখ্যক যুবক ডিগ্রী লইয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখেও বেকারী অভাব অনটনের এক মর্মন্তুদ ভবিষ্যত ছাড়া আর কিছু নাই। দেখা যায় যে সরকারী হিসাবে ১৯৫০ সালে মাত্র ফেব্রুয়ারী মাসেই Pakistan Employment Exchange এ ১৬,৮১১ জন ও নারায়ণগঞ্জ Employment Exchange-এ উক্ত সনের শুধু মার্চ মাসেই ৫,৪৬১ জন বেকারের নাম রেজিষ্ট্রি করা হয়। সম্মেলন মনে করে যে বেতন ও আনুষঙ্গিক শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমাইবার একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা।
>
> তাই এই ধরনের চরম আর্থিক সঙ্কটের সময় কর্তৃপক্ষ সারা প্রদেশের স্কুল কলেজের যে শতকরা ২৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়াছে তাহার প্রতিবাদ ও প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে। পরীক্ষার ফিস সিটভাড়া ইত্যাদি বাড়ানো হইয়াছে। ইহার পরিষ্কার অর্থ– আরো হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষার দুয়ার চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া।
>
> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে দেশের ছাত্র সমাজ শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে যে উন্নততর বলিষ্ঠ জীবনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা আজ ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লীগ নেতারা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির মর্যাদা তাঁহারা রক্ষা করেন নাই।
>
> সম্মেলন লক্ষ্য করিতেছে যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট হইতে আজ পর্যন্ত এই

www.pathagar.com

তিন বৎসর এই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবল ভাঙ্গন আসিয়াছে। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা তো দূরের কথা, ১৯৪৮ সালেই শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ প্রাথমিক স্কুল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু শিক্ষায়তন সরকারী অফিস এবং বড় বড় আমলার বাসভবনে রূপান্তরিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আপামর দেশবাসীকে শিক্ষার আলো হইতে দূরে রাখিয়া স্বীয় শোষণ ও শাসনযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য কেবল মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানদের শিক্ষিত করিয়া তোলার যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা নীতি গত ৩ বছর চালু আছে সরকার সেই সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা নীতিই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয়। ব্রিটিশ আমলে লড়াই করিয়া দেশবাসী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা অর্জন করিয়াছিল সরকার উহাও একটার পর একটা করিয়া কাড়িয়া লইতেছে। মুখে ইসলামী শিক্ষার বুলি আওড়াইয়া সরকার শিক্ষা সংকোচ নীতি অনুসরণ করিতেছে।

সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ করিতেছে গত কেন্দ্রীয় বাজেটের দিকে তাকাইলেই তাহা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই বাজেটে ৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে মিলিটারী, পুলিশ, জেল ইত্যাদি বিভাগে। আর শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা।

সম্মেলন এই পুলিশী বাজেটের নিন্দা করিতেছে এবং দাবী করিতেছে যে, আই.বি.ও. পুলিশ খাতে টাকা কমাইয়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের বরাদ্দ বাড়ানো হউক।

সম্মেলন মনে করে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আক্রমণের আর একদিক হইল যে, শিক্ষকদের ভদ্রভাবে বাঁচিবার মতো বেতন দিতে অস্বীকার করা। সম্মেলন দাবী করিতেছে যে, শিক্ষকদের সকল দাবী মানিয়া লওয়া হউক। সম্মেলন দাবী করিতেছে যে, বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করিয়া, শিক্ষা, শিল্প ও স্বাস্থ্যের খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হউক। সমস্ত প্রাথমিক স্কুল চালু করা হউক। কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।

সম্মেলন মোহাজের ছাত্রদের অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের উপেক্ষার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং দাবী করিতেছে মোহাজের ছাত্রদের পুনর্বসতি ও শিক্ষার সকল সুযোগ দিতে অবিলম্বে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সম্মেলন সরকার কর্তৃক নারী শিক্ষার অবরোধের নিন্দা করিতেছে এবং নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের দাবী জানাইতেছে।

এই সম্মেলন দাবী করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্রের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকার করা হউক, পূর্ব বাংলার আইন আদালতে একমাত্র ভাষা হিসেবে কার্যে পরিণত করা হউক, আরবী হরফে বাংলা লিখা ও উর্দু বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হউক।[৯]

এই মূল প্রস্তাবটি ছাড়াও সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ১৬টি দফা সম্বলিত নিম্নলিখিত দাবীনামা সরকারের কাছে পেশ করা হয় :

১। পুলিশ, আই.বি. ইত্যাদির খাতে টাকা কমাইয়া মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভাতা কমাইয়া শিক্ষা খাতে টাকা বাড়ানো। অবিলম্বে বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া, প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি সমভাবে বন্টন করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা কর E.P.T. ও ব্যবসা কর B.P.T. বসাইয়া ঐ সকল

www.pathagar.com

অর্থ শিক্ষার কাজে লাগাইতে হইবে।

২। (ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজের ঘাটতি বাজেট সম্পূর্ণ পূরণ এবং উহাদের সংস্কারের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য মনজুর করিয়া একদিকে ছাত্রদের বেতনের হার কমাইতে হইবে, অন্যদিকে শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(খ) স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির নোটিশ প্রত্যাহার করিতে হইবে। উপরন্তু পূর্বতন হারেরও ২৫% বেতন হ্রাস করিতে হইবে।

৩। (ক) অবিলম্বে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং প্রাইমারী শিক্ষকগণের সম্মানজনকভাবে বেতন ও ভাতা দিতে হইবে ও উঠিয়ে দেওয়া প্রাইমারী স্কুলগুলি পুনরায় চালু করিতে হইবে।

(খ) একজন প্রাথমিক শিক্ষকের নিম্নতম বেতনের হার মাসিক ৫০-৬০ টাকার কম হইলে চলিবে না।

(গ) প্রতিটি শহরের মহল্লায় মহল্লায় এবং প্রতিটি গ্রামে প্রাপ্ত বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। (ক) মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সংস্কার করিয়া গণতান্ত্রিক উপায়ে পুনর্গঠন করিতে হইবে।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিম্নতম বেতনের হার ১৫০ টাকার কম হইলে চলিবে না এবং সরকারী ভাতার পরিমাণ ২৫% বাড়াইয়া জীবনযাত্রার ব্যয় মানের সহিত সমতারক্ষা করিতে হইবে।

(গ) চারিটি ভাষা শিক্ষার দুঃসাধ্য বোঝা চাপানো বোর্ডের বিবেচনাশূন্য কারিকুলাম ও সিলেবাসের সংশোধন করিতে হইবে– বিশেষত উর্দুকে স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য বাধ্যতামূলক করা চলিবে না।

৫। (ক) মফস্বল কলেজগুলিতে দুই বৎসরে অনার্স কোর্স খুলিতে হইবে।

(খ) সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর পরিবর্ধন ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ অর্থ মনজুর করিতে হইবে।

(গ) বেসরকারী কলেজগুলিরও অধ্যাপকদের নিম্নতম প্রাথমিক মাহিনার হার ৩০০/- টাকার কম হইলে চলিবে না।

(ঘ) অবিলম্বে সরকারী বেসরকারী কলেজগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্টাফ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য সরকারকে বিশেষ সাহায্য (আর্থিক ও পরিকল্পনামূলক উভয় প্রকার) ও অতিরিক্ত শিক্ষাভাতা মঞ্জুর করিতে হইবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সংস্কারের জন্য ছাত্র-ছাত্রীগণ যে সকল দাবী করিয়াছে, তাহা মানিতে হইবে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ দাবীও মানিতে হইবে।

৬। কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়া অবিলম্বে চালু করিতে হইবে।

(ক) মেডিকেল স্কুলগুলিকে কলেজে পরিণত করিতে হইবে এবং অটোমেশনের অবসান ও কারিকুলামের সংস্কার করিতে হইবে।

www.pathagar.com

(খ) ঢাকার এম.বি. ডিগ্রী এবং বেসরকারী মেডিকেল স্কুলগুলির ডিগ্রীর সরকারী অনুমোদন চাই।

(গ) কনডেন্সড্ এম.বি.ও বি.ই. কোর্স যথাক্রমে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলিতে প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ-এর যথোপযুক্ত সংস্কার ও সরঞ্জাম চাই। এই জন্য যথোপযুক্ত টাকা মঞ্জুরী ও সেই টাকা সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা তাহার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(ঙ) সপ্তম মান হইতেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের 'ভোকেশনাল' কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। প্রবৃত্তি অনুসারে (aptitude) শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হউক।

৭। অবিলম্বে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য আগামী বৎসরের মধ্যে–

(ক) প্রত্যেক শহরে বালিকা বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন মেয়ে হোষ্টেল স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) উক্ত পরিকল্পনার কাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা মনজুর করিতে হইবে এবং উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা তাহা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। মোহাজের ছাত্রদের শিক্ষার সকল সুযোগ দানের জন্য–

(ক) গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত একটি নির্ভরযোগ্য বোর্ডের সাহায্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে কাজ শুরু করিয়া দিতে হইবে।

(খ) উক্ত পরিকল্পনার কাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা মনজুর করিতে হইবে– এবং উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা তাহা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) পরীক্ষার্থী মোহাজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফি মওকুফ, বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহারা সার্টিফিকেট লইয়া আসিতে পারে নাই তাহাদের পরীক্ষার সাময়িক অনুমতি দিতে হইবে।

৯। অবিলম্বে ছাত্রাবাস সমস্যার প্রতিকারার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা মনজুর করিতে হইবে।

১০। হুকুম দখলীকৃত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসগুলির দখল আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

১১। (ক) বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক।

(খ) বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় জনতার মিছিলের মুখে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সকল প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে পরিপূর্ণ করিতে হইবে এবং কেন তাহা এতদিনেও পালন করা হইল না তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে।

(গ) শিক্ষার উর্দ্ধতম মান পর্যন্ত মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে চালু করার আইন অবিলম্বে কার্যকরী করিতে হইবে।

(ঘ) আরবী হরফে বাংলা লেখার ১৭টি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র অবিলম্বে তুলিয়া দিতে হইবে এবং ঐ ধরনের কোন প্রকার সরকারী প্রচেষ্টা করা চলিবে না।

(ঙ) পাকিস্তান রেডিয়োর উর্দু মিশ্রিত বিকৃত বাংলার প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করিতে

www.pathagar.com

হইবে। পাক রেডিয়ো প্রোগ্রামের শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলা থাকিতে হইবে। বাংলার খ্যাতনামা যে সকল ব্যক্তিকে ঢাকা রেডিয়ো হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে ও অবিলম্বে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

১২। (ক) ছাত্রদের ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রামে যোগদান করায় এ পর্যন্ত যতজনের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের সকলের উপর হইতে বহিষ্কার আদেশ ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিনা সর্তে অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(খ) স্কুল কলেজে মিটিং ইত্যাদির গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে এবং কোন কারণেই স্কুল কলেজে পুলিশের হস্তক্ষেপ চলিবে না।

(গ) সমস্ত ছাত্রবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি অথবা প্রকাশ্য আদালতে বিচার দিতে হইবে।

১৩। জাতিসংঘের 'মানবিক অধিকার বিলের' সর্বস্বীকৃত আদর্শের খাতিরেও শিশু শ্রম (Child labour) রদ করার এবং ছাত্র ও যুব সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অবিলম্বে একটি স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। (ক) পূর্ব পাকিস্তানে একটি সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(খ) সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার্থে অবিলম্বে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

১৫। সরকারী নীতির ফলে উদ্ভূত শিক্ষা সংকোচের কারণ ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণের জন্য ছাত্র প্রতিনিধি সম্বলিত বেসরকারী কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

১৬। পূর্ববঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর দমননীতি চালাইবার জন্য যে গোপন সার্কুলার (Memo no, 300 G.A.C.) দিয়াছেন অবিলম্বে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।[১০]

শিক্ষা সম্মেলনের মূল কাজ ১৬ই সেপ্টেম্বর সকালের অধিবেশনেই শেষ হয়। এর পর ঐদিনই বিকেল পাঁচটায় আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন ও জনসভা। এই জনসভার পর ১৬ তারিখেই দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।[১১]

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের যে মূল প্রস্তাব ও দাবীসমূহ বিস্তারিতভাবে ওপরে উদ্ধৃত হলো তার থেকে শুধু যে ছাত্রদের কতকগুলি দাবী দাওয়ারই বিবরণ পাওয়া যায় তাই নয়। এই প্রস্তাব ও দাবী নামার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়েরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ছাত্রদের দ্বারা আহূত ও সংগঠিত এই শিক্ষা সম্মেলনে ছাত্ররা নিজেদেরকে সমাজের অপরাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে নিজেদের সমস্যাসমূহকে তৎকালীন সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেই

www.pathagar.com

বিচার করেছেন এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষকদের জীবিকার সন্তোষজনক সমাধান, ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরকারী চক্রান্ত ও হামলা প্রতিরোধ, মতামত প্রকাশের অধিকার, পুলিশ ও আই.বি.কে ছাত্র শিক্ষকদের থেকে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে যে বক্তব্য ও দাবীসমূহ ঐ সম্মেলনে ছাত্রেরা উপস্থিত করেন তার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয় যে, এই পর্যায়ে সামন্তবাদী সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমলা মুৎসুদ্দী শ্রেণীর শোষণ শাসনের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে ছাত্রেরা সচেতন হতে শুরু করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে এক নোতুন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই শিক্ষা সম্মেলনের পর পূর্ব বাঙলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন ও যুব আন্দোলন এক নোতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। তৎকালীন শোষক শাসক শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে ছাত্র ও যুব সমাজের গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ আন্দোলন পরিগ্রহ করেছিলো পূর্বের থেকে অনেক বেশী সংগঠিত চরিত্র।

৪. গণশিক্ষা পরিষদ

১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষা আন্দোলনকে সংগঠিত করা ও এগিয়ে নেওয়ার জন্যে 'গণশিক্ষা পরিষদ' নামে যে সংস্থাটি গঠিত হয় তার পক্ষ থেকে শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে পরবর্তী নভেম্বর মাসে প্রদেশব্যাপী 'শিক্ষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই দিবসটি পালনের জন্য সেপ্টেম্বরের ২১শে তারিখে গণশিক্ষা পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলী একটি বিবৃতির মাধ্যমে দেশের সকল ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান।[১]*

গণশিক্ষা পরিষদের দ্বারা অবশ্য শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব হয় নাই। ১৯৫১ সালের জানুয়ারীর শেষ দিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিশেষত প্রাপ্ত বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে পরিষদ কর্তৃক সরকারের কাছে প্রদত্ত একটি স্মারকলিপি[২] থেকে দেখা যায় যে, এই পরিষদে সরকার সমর্থক ও আধা-সরকারী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছে এবং সরকারের কাছে গণশিক্ষার জন্যে আবেদন জানিয়ে তাঁরা এক লক্ষ টাকা

* গণশিক্ষা পরিষদ কর্তৃক আহূত এই 'শিক্ষা দিবস' শেষ পর্যন্ত পালিত হয় নাই। খুব সম্ভবত ১৯৫০ সালের এই সময়ে একদিকে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট এবং অন্যদিকে সংবিধানের মূল নীতি বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠায় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং গণশিক্ষা পরিষদের কর্মকর্তারা সেই আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে 'শিক্ষা দিবস'-এর কাজে আত্মনিয়োগ করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় না।

www.pathagar.com

সাহায্য প্রার্থনা করছেন। গণশিক্ষা পরিষদের এই পরিণতি সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের বিভিন্ন আন্দোলনে শিক্ষা সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অবশ্য অন্য রকম ছিলো।

৫. পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে বুদ্ধিজীবীদের স্মারকলিপি

১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খান ও কাজী মোতাহার হোসেনসহ বহু সংখ্যক পূর্ব বাঙলা পরিষদ সদস্য, গণপরিষদ সদস্য, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ব্যবহারজীবী, সরকারী কর্মচারী, লেখক, শিল্পী, ছাত্র ও পুস্তকপ্রণেতারা পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে বাংলা ভাষাকে পরবর্তী ১লা এপ্রিল থেকে সরকারী ভাষা রূপে চালু করার জন্যে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।[১] এই স্মারকলিপিটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করার সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর শহীদুল্লাহ, ইব্রাহিম খান ও কাজী মোতাহার হোসেন অন্যতম। স্মারকলিপিটির মূল বক্তব্য হল,

> পূর্ব বাংলার জনসাধারণ শতকরা একশত ভাগই বাংলা ভাষাভাষি এবং এই ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রায় ৫ কোটি জনসাধারণ যাহারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই হিন্দু এবং এই মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং পূর্ব বঙ্গ সরকার যদি বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে এতদিনে গ্রহণ করিয়া লইতেন তবে আরও বহু উন্নতি সাধন করিত।
>
> ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পূর্ববঙ্গ পরিষদে বিনা বাধায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু তাহা কার্যকর হয় নাই।
>
> আগামী ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের কার্যাদি বাংলা ভাষায় শুরু হউক। কারণ বাংলা ভাষায় সুচারুভাবে তাহাদের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবে। যে সকল কর্মচারী বাংলা ভাষাভাষী নহেন তাঁহারা একটা নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ইংরাজীতে কার্যাদি করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা এক বৎসরের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া ফেলিতে হইবে।
>
> সরকারী কর্মচারীরা চলতি বাংলা ভাষা অথবা পূর্ব বাঙলার সংস্কার করা সহজ বাংলা যে কোন একটি বর্তমানে ব্যবহার করিতে পারিবেন। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে সংস্কার সাধিত 'সহজ বাংলায়' সহজেই টাইপ রাইটার তৈরী করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

এই স্মারকলিপি প্রদানকারীরা বলেন যে, বাংলার জনসাধারণের নিজস্ব ভাষা বাংলাতে সরকারী কাজকর্ম শুরু হলে দেশবাসীর মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এই জন্যেই তাঁরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্মারকলিপিটি পেশ করছেন।[২]

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন স্মারকলিপি পেশ করার সময় উপস্থিত বুদ্ধিজীবীদেরকে বলেন যে, বহু সরকারী কর্মচারী আছেন যাঁদের পক্ষে বাংলায় নোট দিতে অসুবিধা হতে পারে। এর জবাবে স্মারকলিপিকারদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় সরকারী নোট দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করা হোক তবে এই সময়ের মধ্যে বাংলা না জানা সরকারী কর্মচারীদেরকে বাংলা শিখে নিয়ে এক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা দূর করতে হবে।[৩]

নূরুল আমীন এই আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন যে, পূর্ব বাঙলায় সরকারী কর্মচারীদের কাজের জন্যে যদি বাংলা অবিলম্বে প্রবর্তন করতে হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়, সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, জেলা বোর্ড ইত্যাদিতে বাংলা প্রবর্তন শুরু করা হয় না কেন? এর জবাবে সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইব্রাহিম খান নূরুল আমীনকে জানান যে, উক্ত বোর্ডকে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় নোট দেওয়ার জন্যে অবিলম্বে নির্দেশ দেওয়া হবে।[৪]

৬. পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন

১৯৫১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি চট্টগ্রামে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম শওকত ওসমান ও সয়ীদুল হাসান পূর্ব বাঙলার শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদেরকে সম্মেলনে যোগদান ও তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতির মাধ্যমে আবেদন জানান।[১] এই আবেদন প্রসঙ্গে বিবৃতিটিতে তাঁরা বলেন,

পাকিস্তানের শিল্পী সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতি সেবীদের একত্রিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের পেছনে যে তাগিদ অনুভব করেছি, আমাদের বিশ্বাস কল্যাণকামী পাকিস্তানের সকল সংস্কৃতিসেবীদের, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, অন্তরে একই তাগিদ রয়েছে।

> আমাদের যে সুপ্রাচীন ও সুমহান সংস্কৃতি আলাওল, দৌলত কাজীর কাব্য-সুষমা থেকে শুরু করে, ভাটিয়ালী, বাউল, কীর্তন এবং সুফী দরবেশের সঙ্গীত ধারায় সিঞ্চিত হয়ে, গ্রাম্যগাথা এবং লোক সংস্কৃতির প্রাণ রসে বেড়ে উঠেছিল, যে ধারার ছায়ায় জন্ম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের—তারই ঐতিহ্যবহনকারী উত্তরাধিকারী আমরা।

এই বিবৃতিতে তাঁরা জানান যে ১৯৫১ সালের ১৬ থেকে ১৯শে মার্চ এই চারদিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে সফল করার জন্যে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং সেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবুল ফজল। সম্মেলনের মূল সভাপতি হিসেবে কার্য পরিচালনা করবেন প্রবীণ সাহিত্যিক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সম্মেলনকে যে কয়টি বিভাগে ভাগ করার কথা বিবৃতিতে বলা হয় সেগুলি হলো : কথা সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, লোক-সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংবাদপত্র। এছাড়া শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথাও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

ঘোষণা অনুযায়ী সম্মেলন ১৬ই মার্চ তারিখে চট্টগ্রামে শুরু হয়। ঢাকার কয়েকটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধ প্রচারণা সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। কলকাতা থেকে দৈনিক সত্যযুগের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও রবিউদ্দীন আহমদ, সিলেটের নওবেলাল পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ আলী এবং ঢাকা থেকে বেগম সুফিয়া কামাল, আলাউদ্দীন আল আজাদসহ অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিক কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং অংশগ্রহণ করেন।[২]

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল। এই উপলক্ষে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,

> আজ বিশ্ব সাহিত্য তথা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ঢেউ আমাদের চিত্তেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এই সবই ভাল কথা। বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী দূর হবে ; ফলে আমাদের সাহিত্যও হবে সুদূরপ্রসারী ও বহু বিস্তৃত। কিন্তু মানুষ তো ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে নেই– একটা দেশের মাটিতে তার জন্ম হয়েছে, একটা পরিবেষ্টনের মধ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে,– তার দেহ ও মন খোরাক সংগ্রহ করেছে এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থান থেকে। কাজেই সেখানকার ভাষা, সেখানকার সাহিত্য, সেখানকার ঐতিহ্য, তার মনের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে; তাই সেই সবকে বাদ দিয়ে তার মনের কখনো বিকাশ হতে পারে না, মনের ভাবে কোন ফুলই ফুটতে পারে না। এ কে না জানে, মনের বিকাশ ও প্রকাশই হচ্ছে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি। তাই আগে দেশের ভাষাকে, দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে,–এক কথায় যে খোরাক গ্রহণ করে মন ও অন্তর বেড়ে উঠে তারি আবিষ্কার করতে হবে। সর্বাগ্রে নিজের অন্তরকে যদি আবিষ্কার করতে পারেন, তবে আন্তর্জাতিক হতে আপনার এতটুকু বেগ পেতে হয় না। নিজেকে না জেনে, নিজের মনকে না জেনে, হঠাৎ আন্তর্জাতিক হতে যাওয়া, লম্ফ দিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘনেরই মত হাস্যাস্পদ কাণ্ড নয় কি? মানুষ বিচিত্র কিন্তু তার মন এক, –এদেশে, বিদেশে, কন্টিনেন্টে সর্বত্রই মানুষের চিরন্তন মনই সৃষ্টি করেছে সাহিত্য ও শিল্প। ঘরকে আগে জানুন, তারপর বাহির আপনার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। নিজের দেশের দিকে তাকান, দেশের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেশবাসীর সুখ দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হউন, তাদের ভালবাসুন, তবেই তাদের হাসি-অশ্রুময় জীবন আপনার লেখনী মুখে ধরা দেবে। সৃষ্টির জন্যে ভালবাসার চেয়ে যাদুমন্ত্র আর নেই। ঘৃণা করে, বিদ্বেষ করে, হিংসা পোষণ করে এবং তা দিয়ে সাহিত্য বা

www.pathagar.com

শিল্প কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। ভালবাসার সহস্র স্রোত বেয়ে সাহিত্য ও শিল্পের সহস্র পথ আপনার চোখের সামনে খুলে যাবে। তাই, ফের বলছি– ভালবাসুন, দেশকে ভালবাসুন, দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালবাসুন, আজকের দিনে আমার মতে সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক এক কথায় বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবানদের সামনে এই ভালবাসার মন্ত্র ছাড়া কোন মন্ত্র নেই, এই ভালবাসার শপথ ছাড়া কোন শপথ নেই। দেশের মানুষকে যে ভালবাসতে পারে, একমাত্র সেই বিদেশের মানুষকে ভালবাসতে পারে–বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্ব মানুষের ভ্রাতৃত্ব একমাত্র তার মুখেই শোভা পায়। নদী যদি একবার তার গতিপথের সন্ধান পায়, তবে তার সাগরে গিয়ে পড়তে বেশী আর দেরী লাগে না।[৩]

বেগম সুফিয়া কামালের এই উল্লেখযোগ্য ভাষণটিতে দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সাথে দেশীয় জাতীয় সংস্কৃতির যোগসূত্র সম্পর্কে, দেশপ্রেম ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করা হয় তার মধ্যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সারা পূর্ব বাঙলাব্যাপী যে একটি নোতুন সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটছিলো সেই চেতনাই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

বেগম সুফিয়া কামালের উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রথম দিনের অধিবেশনে সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন।[৪] পুঁথি সাহিত্যের ওপর গবেষণাকালে ঐতিহ্য সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে তিনি ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে নোতুন সাহিত্য সৃষ্টির আহ্বান জানান। ইসলামী সংস্কৃতির নামে যাঁরা দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও দমন করতে নিযুক্ত তাঁদের উদ্দেশ্যে সাহিত্যবিশারদ তাঁর অভিভাষণে বলেন,

ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয়– এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমন বিশেষণই আরোপ করা চলে। সমাজ জীবনেও দেখিবেন ইহারা পরভোজী। মানবতার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। জনসাধারণের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দিনাতিপাত করেন। এই জাতীয় ব্যক্তিদের উপদেশ কোন দিন গ্রহণ করিবেন না।

জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন,

ভুলিয়া যাইবেন না, অতীত আমাদের ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোকে আমাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্য ঐতিহ্যের কথা বার বার স্মরণ রাখা দরকার।

ঐতিহ্যহীন কোন কিছু গড়িতে গেলে আপনারা ভুল করিবেন। সাধনা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অথবা জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। এই কথা আমি বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কারণ অনেকেই এই সোজা কথা হৃদয়ঙ্গম

www.pathagar.com

করতে পারেন না। হঠাৎ নোতুন কিছু করার প্রয়াস অথবা স্বার্থসিদ্ধি তাহাদের এষণার মূলে থাক না কেন, এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। ঐতিহ্য হইতে তাহারা দূরে সরিয়া যাইতে বলে। মনে রাখিবেন, ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ পাঠশালার বালকও জানে–মৃত্যু।

ঐতিহ্যের সহিত দেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, বায়ু, গাছপালা, এমনকি তরুলতা পর্যন্ত জড়িত। বুকে দেশপ্রেম না থাকিলে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া মুশকিল। অনেকে সবগুলি মানেন না। দেশের কোন একটি বিশেষ অঙ্গের উপর জোর দেন। এমন ক্ষেত্রে দেশ অঙ্গস্ফীতি পীড়ায় ভুগিবে। কোন একটি অঙ্গের উপর জোর দিলে তা হয়ত মোটা দেখাইতে পারে– অন্যগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়–স্বাস্থ্যের অভাবের লক্ষণ।

ইসলামী সংস্কৃতির সরকারী ধারক বাহকরা বাঙলাদেশের জনগণের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে বস্তুতপক্ষে এদেশকে বিদেশ মনে করে যেভাবে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি পূর্ব বাঙলায় গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন,

অনেকে ঐরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া দেশের মাটিকে পর্যন্ত অস্বীকার করেন। ইহা বাতুলতা। অবশ্য এমন বাতুলেরা সাময়িকভাবে জাতীয় জীবনের বিকাশ পথে নানা অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। উদাহরণ দেয়া যাক। ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ বা অ্যাংলোইন্ডিয়ান সমাজ অবিভক্ত ভারতে দেড়শত বৎসর আমাদের সহিত বাস করিয়া আসিতেছিল। তাহারা কোন কৃষ্টি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। দেড় শত বৎসর একটি সমাজের পক্ষে কম সময় নয়। ইহার কারণ, তাহারা এই দেশকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করে নাই। তাহারা মনে করিত, তাহাদের জন্মভূমি ইংলান্ড। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাদের পিতামহী কি মাতামহী। দেশের জলবায়ু ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গমন করিলে সংস্কৃতির এমনই দুর্দশা ঘটে। সুধীগণের নিকট এ ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের ঐতিহ্য চেতনা ও সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে তিনি বলেন,

মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। তিনি কোন দিন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নাই। তাই বিশিষ্ট কবি রূপে নয়, বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তকরূপে বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর ও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন। বলা বাহুল্য, দেবতা নয় মানুষই তাঁর কাব্যের উপজীব্য হয় প্রথম। সাহিত্যের স্বর্গ হইতে এই মর্তে অবতরণ মধ্যযুগে এক বিরাট অগ্রগতি। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব আছে। ইহা লজ্জার বিষয় নয়। দেশের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করিতে গেলে ঐতিহ্যের নিয়ম পালন করিতে হয়। এইভাবেই নূতন ধারার বিকাশ লাভ ঘটে।

পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী কর্তৃক ভাষা নিপীড়ন ও বাঙলাদেশের জনগণের সংস্কৃতি দমন নীতি এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসকদের উদারনীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন,

শাসকদেরও এ ঐতিহ্য হইতে শিক্ষণীয় কিছু ছিল। হুসেন শাহ, পরাগন খাঁ,

www.pathagar.com

ছুটি খাঁ ও অন্যান্য বহু খান-খানান, পাঠান নৃপতিগণ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে রাজত্ব স্থায়ী করিতে হইলে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। ভাষার নিপীড়ন আরম্ভ করেন নাই, অন্য ভাষা চাপাইয়া দেওয়ার নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেন নাই। এমন নিপীড়ন চালাইলে পাঠান মোগল শাসন অনেক আগেই ধ্বংস হইয়া যাইত–কয়েক শতাব্দী তার অস্তিত্ব থাকিত না।

ভাষা নিপীড়নকারী শাসক শ্রেণীর ধ্বংস যে অনিবার্য এই বক্তব্যটি ঐতিহাসিক তুলনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার পর সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পর্কে সাহিত্যবিশারদ বলেন,

ঐতিহ্যের এমনই শক্তি। ইহার শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বীকার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহা হইবে গতানুগতিকতা। আর গতানুগতিকতার অর্থ শিল্প সংস্কৃতির মৃত্যু। ঐতিহ্যকে স্বীকারের পর তার প্রবাহকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। সংস্কৃতির বিকাশের সার্থকতা সেইখানে।... ঐতিহ্যকে একদিকে স্বীকার ও অন্যদিকে অস্বীকার এই টানাপোড়নেই সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্ভব।

সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতির দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটিকে অপূর্ব নৈপুণ্যের সাথে এইভাবে বর্ণনা করার পর শিল্পীর সমাজ চেতনা সম্পর্কে নিজের বক্তব্যকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

বিদ্যাপতি খুব বড় কবি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আরো নানা কবি ও নানা রকমের কবিতার সৃষ্টি না হইলে, এতদিন কাব্য লক্ষ্মীর মৃত্যু ঘটিত। কারণ গতানুগতিকতার অর্থ শিল্প সংস্কৃতির মৃত্যু।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমি কঙ্কালের ব্যবসায়ী, পুরাতন পুঁথি কঙ্কালেরই মত। কিন্তু আমি তার ভেতর যুগ-যুগান্তরের রক্ত ধমনী ও নিঃশ্বাসের প্রবাহ ধ্বনি শুনিয়াছি। আমার বিশ্বাস সে যুগের শিল্প-স্রষ্টাদের পক্ষে যা সত্য ছিল, আজ তার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই জন্য কয়েকটি কথা বলা দরকার।

প্রাচীন মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্যরীতির সাধকদের মূল প্রেরণা ছিল সমাজ। দৈনন্দিন জীবনই ছিল রসের উৎসব ক্ষেত্র। তাই কোথাও দেখা যায়, কবি দেবতার ছবি আঁকিতেছেন কিন্তু অজ্ঞাতসারে তা তদানীন্তন বাংলার সমাজচিত্র হইয়া গিয়াছে। আপনারা ইহাকে শিল্পীর কৌশল বলিতে পারেন। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য, সমাজের দিকে তাঁরা চোখ খোলা রাখিয়াছিলেন বলিয়া এমন অঙ্কন দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তার আস্বাদ যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া আজও অবিকৃত অম্লান রহিয়াছে। আপনারা পূর্বসুরীদের এই কৌশল বা দক্ষতা যাই বলুন– আজও অবহেলা করিতে পারেন না। সমাজেই জীবন। জীবনের শিল্পী কি সমাজকে অস্বীকার করিতে পারে?

'জীবনের শিল্পী কি সমাজকে অস্বীকার করিতে পারে?' এই বলে একদিকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল এক শ্রেণীর কলা-কৈবল্যবাদীদের বক্তব্য এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতির প্রবক্তাদের

www.pathagar.com

বক্তব্যকে আশ্চর্য দক্ষতার সাথে খণ্ডন করতে গিয়ে সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর ভাষণে আরও বলেন,

> যুগে যুগে সমাজে নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক যুগের শিল্পরীতি দিয়া অন্য যুগের সমাজকে আঁকা চলে না। রীতিও তেমন পরিবর্তিত হইয়াছে। নক্ষত্রের গতিশীলতা দেখিয়া জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর গতিশীলতা স্থির করিয়াছেন। আমরা শিল্পরীতি দেখিয়া সমাজের গতিশীলতা বুঝিতে পারি। আবার সমাজের কলেবর দর্শনেও শিল্পরীতির গতিশীলতা অনায়াসে ধরা পড়ে। প্রাচীন শিল্পীগণ তাহা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমাজের দিকে দৃষ্টি ছিল বলিয়া মধ্যযুগের সার্থক কবিগণ লোক সংস্কৃতি অগ্রাহ্য করেন নাই। মঙ্গল কাব্যগুলি সাধারণত দরবারী, রাজসভা ঘেঁষা। কিন্তু ইহার ভেতরও পল্লী জীবনের ঝঙ্কার স্পষ্ট। 'বারমাস্যার' সুর কেহই বাদ দেন নাই। প্রকৃত কবি মানবতার দুঃখ বেদনার শরীক, তাহা বাদ দিতে পারে না। আবার স্থান বিশেষে তদানীন্তন রাজসভা ও পল্লীর আসর–দুই জায়গার কাজ দুই রকম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু দুইয়ের ভিতর মিতালী স্পষ্ট। চৈতন্য মঙ্গল চৈতন্য ভগবত ইত্যাদি মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব কবিতা–দুয়ের সুরের রূপ আলাদা, যদিও দুয়ের রচনার অনুপ্রেরণা এক জায়গা হইতে আসিয়াছে। এইভাবে স্থান কাল ভেদে সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্তনশীল। ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।
>
> সেইজন্য দৃষ্টিশক্তির সাধনার প্রয়োজন আছে। প্রাচীন কবিরা তারও পথ দেখাইয়াছেন। তাহা একটি শব্দে বলা যায়– উদারতা। যে যত উদার, তার দৃষ্টি তত স্বচ্ছ। কারণ হৃদয়ও দর্শনের মত স্বচ্ছ হইয়া আসে। ইহার উপরই তো সমাজের প্রতিবিম্ব পড়ে। দর্শনের স্বচ্ছতার উপর প্রতিবিম্বের স্পষ্টতা নির্ভর করে। এখানে শিল্পী কোন চাতুরীর প্রশ্রয় লইতে পারে না। বাংলার প্রাচীন গাথা ময়মনসিংহ গীতিকার ভেতর যে সৌন্দর্য্য লালায়িত তা কি উদার হৃদয়ের বীণা-ধ্বনি নয়? আউল বাউল মুর্শিদ্যা গানের ভেতর বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত যে রূপের আলোকচ্ছটা তা কি উদার প্রাণের পৃথিবী গ্রাসী দর্শনের (ফিলজফীর) সুর নিকেতন নয়?

এরপর নিজের অভিভাষণের শেষ দিকে মধ্যযুগীয় কবিদের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও তাঁদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান শাস্ত্রকারদের আক্রমণের সাথে সমসাময়িক কালের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি চর্চার প্রচেষ্টা ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের তুলনা করতে গিয়ে সাহিত্য বিশারদ বলেন,

> 'আমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
> ওরে ও পরম গুরু সাঁই
> তোর পথ দেখতে না পাই
> আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরসেদে'
>
> প্রাচীন বাউল কবির মুখে সহজেই এই মনোহারিণী বাণীর উদয় হইয়াছিল। অশিক্ষিত, অজ্ঞাতকুলশীল কবির হৃদয়ের আর্তনাদ আজও কানে আসে। মানুষে মানুষে ঐক্যের প্রচেষ্টা ছিল তাঁহাদের সাধনা। উদারতার এই এক অদ্বিতীয় সংজ্ঞা। কিন্তু প্রাচীন কবির বাণী আজও সার্থক হয় নাই। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, হানাহানি,

www.pathagar.com

> লোভ, জিঘাংসা, রিপুর অন্যান্য জঘন্য চিত্র আজও আমাদের দৈনন্দিন ঘটনার পটভূমি। সাম্প্রদায়িকতা মহামারী-বীজের মত শত শত গ্রাম মানুষের নীড় ধ্বংস করিয়াছে। তাই এই জাতীয় দুর্দিনে সেই প্রাচীন সাধক কবিদের পথের হদিস ভালরূপে জানা দরকার আছে। মানুষে মানুষে বিভেদ আছে সত্য। এই বিভেদকে জয় করাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ঐক্যের বাহন, বিভেদের চামুণ্ডা নয়।

নিজের মূল বক্তব্যকে এইভাবে উপস্থিত করার পর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সংস্কৃতিসেবী ও সুধীবৃন্দের প্রতি এক আবেগপূর্ণ আহ্বান জানিয়ে বলেন,

> প্রগলভতা, বৃদ্ধজনের নিন্দার শেরোপা। আপনাদের সময় বৃথা নষ্ট করিব না। শুধু আর একবার বলিতে চাই, তরুণ বন্ধুগণ, অগ্রসর হউন। সর্ব মানবের সংস্কৃতি আপনারা গড়িয়া তুলুন। মধ্যযুগের কবি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তার সার্থক রূপায়নে অগ্রসর হউন। তাহাদের পথে বাধা ছিল অনেক। জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনাদের সহায়। আপনারা সফল হইবেন। চারশ বছরের সংস্কৃতির সম্পদে আজ আপনারা ঐশ্বর্য্যশালী। আপনারা সফল হইবেন। অগ্রসর হউন। জোর কদম।
>
> আমার কদমে আজ জোর নাই। আমার শারীরিক উপস্থিতি দিতে পারিব না। আমার মন আপনাদের সঙ্গী। বয়স্ক গৃহস্থ যেমন বাতায়ন পাশে বসিয়া দূরাভিসারী সৈনিকের কুচকাওয়াজের দিকে চাহিয়া থাকে, আমিও তেমনি অরুণোদয় কাফেলার দিকে চাহিয়া থাকিব।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের এই অমূল্য ভাষণটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সংস্কৃতি সম্মেলনের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সম্মেলনের উপর একটি প্রতিবেদনমূলক প্রবন্ধে বলেন যে, 'সভাপতির ভাষণের সময় বিপুল জনতা তাদের অর্ধ শতাব্দীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই জ্ঞান বৃদ্ধের বাণী অন্তরে অন্তরে সঞ্জীবিত করছিল। একটি জীবন্ত অস্তমান মানুষ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সম্পদ তাঁর উত্তরাধিকারী জনতার সামনে তুলে ধরলেন। আর জনতা তাঁকে আপন জন বলে গ্রহণ করে তার নিজের চলবার পথ বেগবান করলো।'[৫]

১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চের পরবর্তী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রত্যক্ষদর্শীর এই প্রতিবেদনের সত্যতাই আশ্চর্যভাবে প্রতিভাত হয়। চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনের পর থেকে পূর্ব বাঙলায় বিশ বৎসরকাল ধরে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের এই অভিভাষণকে সেই আন্দোলনের ঘোষণা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।★

১৬ই মার্চ অর্থাৎ সম্মেলনের প্রথম দিনেই সন্ধ্যার পর চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নিয়াজ মহম্মদ খান সম্মেলনের দ্বারা আয়োজিত একটি চারু শিল্প

★চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের অল্পকাল পরই সাহিত্য বিশারদের মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে, ইসলাম চিত্র শিল্পের বিরোধী বলে যারা প্রচার করে তিনি তাদের নিন্দা করেন।[৬] আবেদীন, শফিউদ্দীন আহমদ, কামরুল হাসান, আমিনুল ইসলাম, ইকরামুল হক, জামাল আখতার, আমিনুর রহমান, সফিক আহমদ প্রভৃতির চিত্র এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়।[৭]

এই একই দিন সন্ধ্যায় একই প্যাণ্ডেলে নিয়াজ মহম্মদ খান পূর্ব পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মিলনীরও উদ্বোধন করেন এবং নিজের উদ্বোধনী ভাষণে সঙ্গীত চর্চা প্রসারের জন্যে পূর্ণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিসেস ফরিদা হাসান ও তাঁর দল।[৮]

১৭ই মার্চের অধিবেশনে কলকাতা থেকে আগত দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন মজুমদার একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ করে বলেন যে, সে পথে দেশের কোন কল্যাণ নেই। কলকাতা থেকে যে সমস্ত শিল্পী অতিথিরা এসেছিলেন তাঁরা শান্তি ও সাম্প্রদায়িক মিলনের ওপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সম্মেলনের শেষ দিন অর্থাৎ ১৯শে মার্চ চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর দল আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের উপর কবি গান করেন।[৯]

চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১০] জনগণের বাস্তব জীবনের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক বিষয়ক মূল প্রস্তাবটিতে বলা হয়,

> মানুষের ভাল করার, মানুষের মঙ্গল করার সদিচ্ছাকে অঙ্গীভূত করে যে সাহিত্য শোষণের বিরুদ্ধে, এক দেশের উপর আর এক দেশের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, মানুষের উপর মানুষের জুলুমের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমরা মতবাদ নির্বিশেষে মানবতার নামে সে সাহিত্যেরই অনুসারী। আমরা বিশ্বাস করি আজ এ সাহিত্যেই জনসাধারণের একমাত্র কাম্য।
>
> আমরা বিশ্বাস করি– সাহিত্য জীবনের নিছক প্রতিফলন নয়, সাহিত্য সমাজ উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন, ক্ষুধা, বেকারী এবং অশান্তির হাত থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করা তার গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজ শিল্পী সাহিত্যিকের। দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের ৩৫ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু, গত মহাযুদ্ধে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাঙন–যে ধ্বংস, আজকের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে অর্থনৈতিক সঙ্কট– অভাব অনটন– জীবনের এই যে বাস্তব সত্য-তাকে বাদ দিয়ে সমস্যাকে এড়িয়ে কোন সাহিত্যই মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। অতএব বিভিন্ন মতবাদের শিল্পী সাহিত্যিকের এ সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করছি– মানুষের কল্যাণের জন্য যে সাহিত্য–সমাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সাহিত্য আমরা সে সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল।

শান্তি ও সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবে বলা হয়,

www.pathagar.com

নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ব্যতীত কোন দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়, মাত্র কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া দলমত নির্বিশেষে যুদ্ধ প্রত্যেক মানুষেরই স্বার্থ বিরোধী। গত যুদ্ধের ধ্বংস ভয়াবহতা যারা প্রত্যক্ষ করেছে, যারা দেখেছে কচি কচি ছেলে মেয়েদের বোমার আঘাতে রক্তাক্ত দেহ ঢলে পড়তে তারা কোন দিনই আর একটি মহাযুদ্ধ চায় না। অতএব শান্তিকামী শিল্পী সাহিত্যিকের এই সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করি–ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধকেই আমরা বরদাস্ত করবো না। আক্রমণকারী যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আমরা জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়াব এবং সকল প্রকার যুদ্ধ প্রচারণাকে আমরা মানবতা বিরোধী জঘন্য কাজ হিসেবে নিন্দা করবো।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাবে বলা হয়,

তিন বছর আগে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান গভর্নর জেনারেল মাননীয় খাজা নাজিমুদ্দীন জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে। এই তিন বছরের মধ্যে উক্ত প্রতিশ্রুতিকে কার্যকরী করার কোন চেষ্টাই অবলম্বন করা হচ্ছে না দেখে আমরা উৎকণ্ঠায় আছি। অধিকন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অক্ষর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষার মূলে আঘাত করার যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টে বাংলা ভাষার দাবীকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেওয়া হয় নি দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দাবী করছি অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হোক।

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়,

আমরা বিশ্বাস করি খুনী বাংলা-বাংলাদেশের আসল পরিচয় নয়। বিগত দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভাইয়ের হাত কলুষিত হতে দেখে প্রত্যেক শিল্পী সাহিত্যিকই অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছেন, কারণ এটা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের উপর চরম কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে। তাঁরা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাই শিল্পী সাহিত্যিকদের এ সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করছি– যে সাম্প্রদায়িকতা সকল প্রকার সংস্কৃতি বিরোধী, যে সাম্প্রদায়িকতা সমাজের গতিশীলতাকে আটকে দেয়, যে সাম্প্রদায়িকতা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বিরোধী–মানবতা বিরোধী– আমরা শিল্পী সাহিত্যিকরা তার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক অভিযান চালিয়ে যাবো, এ সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত সদবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনশিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে বলা হয়,

সংস্কৃতির মূল উৎস শিক্ষা, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতির মান উন্নয়ন অসম্ভব। এই দেশের গরীব শিক্ষকদের বাঁচার ন্যূনতম দাবীকে অস্বীকার করে জন শিক্ষার প্রসার কোন মতেই হতে পারে না। অতএব এ সম্মেলন সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে মাতৃভাষায় জন শিক্ষার প্রসার করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

চিন্তার স্বাধীনতা দাবী করে অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়,

www.pathagar.com

সংস্কৃতি বিকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে কোন জাতি ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অবদানগুলোর উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা সাধন না হলে জাতীয় জীবনের কোন প্রকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আজ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। এ না হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হবে, কুসংস্কারের নাগপাশে আমরা চিরদিন জড়িত হয়ে থাকব, মানবতামুখী কোন নোতুন চিন্তাধারাকে আমাদের মহান জাতীয় ঐতিহ্যের রসে সঞ্জীবিত করে গ্রহণ করার মত মানসিক ঔদার্য্য আমরা হারিয়ে ফেলব, নোতুনকে পরিহার করে পুরাতনের জীর্ণতার আবর্জনা স্তূপে আমরা নিমগ্ন হয়ে পড়ব। তাই আজ গতিশীল জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন সংস্কৃতি বিকাশের স্বাধীনতা। অতএব শিল্পী সাহিত্যিকদের এ সম্মেলন দাবী করে– যাবতীয় সৃষ্টিশীল কল্যাণধর্মী শিল্প সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের, পুস্তক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের, সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের এবং সকল নোতুন চিন্তাধারার ব্যাপক আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বাধীন সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ দাবী করে প্রস্তাব করা হয়,

দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনগুলি সংস্কৃতির অন্যতম বাহনরূপে কাজ করে। কিন্তু আমরা দেখেছি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে, আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সংস্কৃতি প্রচেষ্টায় অবাধ অংশগ্রহণ করার সুযোগ থেকে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে। এতে জাতিকে হয়ত শিক্ষিত করে তোলা হয় কিন্তু সভ্য করে তোলা হয় না। অতএব শিল্পী সাহিত্যিকদের এ সম্মেলন প্রস্তাব করে– সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের এই অধিকার ও সুযোগ প্রদান করা হোক যেন তারা আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

এই প্রস্তাবগুলি ছাড়া কবি নজরুল ইসলামকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য ও তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৭-৪৮ সালে (৩১শে ডিসেম্বর-১লা জানুয়ারী) সরকারী তত্ত্বাবধানে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলনের★ পর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনই হলো পাকিস্তান উত্তর পূর্ব বাঙলার দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন। কিন্তু চরিত্রগত দিক দিয়ে প্রথম সম্মেলনটির সাথে এই চট্টগ্রাম সম্মেলনের ছিলো মূলগত পার্থক্য। ঢাকার সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মূলত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন এবং সম্মেলনকে যথাসম্ভব সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫১ সালের চট্টগ্রাম সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পূর্ব বাঙলায় একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গঠন করে তাকে বেগবান করার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী সম্মেলনের কর্মসূচীকে

★ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। এ জন্যে এই সম্মেলনের বক্তব্যসমূহই যে শুধু তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিলো তাই নয় নোতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ অনেক ছাত্র-যুবকের সমাবেশও এতে ঘটেছিলো। এই ধরনের ছাত্র যুবকেরাই পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

৭. পূর্ববঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলন

১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ কুমিল্লায় পূর্ব বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পরিবর্তে উর্দু প্রবর্তনের চেষ্টা সে সময় পূর্ব বাঙলার ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই ধ্বনি করে ডক্টর শহীদুল্লাহ শিক্ষকদের এই সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন,

> শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পূর্ব বঙ্গের ছাত্রদের উপর বাংলা ভাষা ব্যতীত যদি অন্য কোন ভাষা আরোপ করা হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো আমাদের উচিত। এমনকি প্রয়োজন হইলে ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব। নতুন ভাষা আরোপ করা পূর্ববঙ্গে গণহত্যারই শামিল হইবে।

স্কুল ও কলেজে শিক্ষার মাধ্যম যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজী হওয়ার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে অসঙ্গতি দেখা দেয় সে বিষয়ে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন,

> আমাদের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য তালিকাও পরিবর্তিত হইবে। তবে আগামী ১০-২০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ইংরেজী রাখিতে হইবে। শিক্ষার মাধ্যম ও অধ্যয়ন সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমাদের দেশে বর্তমানে স্কুলসমূহে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা এবং উহা বেশ ভালভাবেই চলিতেছে। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে কলেজের যে তফাৎ রহিয়াছে তাহা খুবই বেশী। ইহার ফলে অধিকাংশ ছেলের ভবিষ্যতই পঙ্গু হইয়া যায়। কারণ স্কুলে বহুদিন পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া করিয়া ছেলেগণ হঠাৎ যখন কলেজে আসিয়া ইংরেজী মাধ্যমের সম্মুখীন হয়, তখন অধিকাংশ ছেলের ভবিষ্যত পঙ্গু হইয়া যায়।

দুই শিক্ষা মাধ্যমের টানাপোড়েনে পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক ছাত্রের অকৃতকার্যতা এবং বেকার সমস্যা এড়ানোর উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের অনুপযুক্ত তাহাদিগকে কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা উচিত। আর এতদুদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র অধিক সংখ্যক কারিগরী বা বৃত্তিমূলক স্কুল বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিকে এখন সরকার ও

www.pathagar.com

জনসাধারণের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর দেশকে শিল্পায়িত করিয়া এই সকল কারিগরকে চাকরি প্রদানের ব্যবস্থা করা সরকারের উচিত। এই সম্পর্কে আর একটি প্রস্তাব করা যাইতে পারে যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা যায়, তবেও এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত এ কথা বলে তিনি প্রস্তাব করেন যে, স্কুল কলেজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠকে বাধ্যতামূলক করা উচিত। শিক্ষক ব্যতীত অন্য কাউকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে না দেওয়ার নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরকে পরীক্ষা দেওয়ার সমান অধিকার প্রদান করা দরকার। সাধারণ মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে অভিযান পরিচালনার জন্যে ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপরও ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁর ভাষণে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন।

৮. পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি

পূর্ব বাঙলা সরকার ১৯৫১ সালে প্রদেশের ২৩ জন শিক্ষাবিদকে নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি' নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিযুক্ত করেন।[১] মৌলানা মহম্মদ আকরাম খান এই কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন। পূর্ব বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদানই এই কমিটির মুখ্য দায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

সরকারের কাছে কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে যে সুপারিশ করেন তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছাত্র ছাত্রীদেরকে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দানের জন্যে সুপারিশ করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছাত্র ছাত্রীদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলা সরকার আরবী হরফ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মুসলমান শিশুদের শিক্ষার হাতে খড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। নোতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থির হয় যে, শিশুরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরবী অক্ষর পরিচয় শিক্ষা করবে, তৃতীয় শ্রেণীতে তাদেরকে আমপারা (কোরআনের প্রথম অধ্যায়) শিক্ষা দেওয়া হবে এবং চতুর্থ শ্রেণী ও তার ওপরের শ্রেণীগুলিতে তাদেরকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে উর্দু পড়ানো হবে।[২]

www.pathagar.com

পূর্ব বাঙলা সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও নিন্দা করে 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটির' চেয়ারম্যান মৌলানা আকরাম খান একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকার তাঁদের কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।[৩]

৯. সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নোতুন ধারা

১৯৫১ সালে পূর্ব বাঙলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নোতুন প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পর সারা পূর্ব বাঙলায় নববর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, ইকবালের মৃত্যুবার্ষিকী, সুকান্তের মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষে একের পর এক বহু সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই ধরনের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই আবৃত্তি ও গান বাজনার জলসা অনুষ্ঠানগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এই সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিরোধিতা, বাংলা ভাষার ওপর গুরুত্ব আরোপ ও বাঙালীর হাজার বৎসরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা।

এই সময় থেকে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে থাকে সেগুলির অধিকাংশই ছাত্র ও যুবকদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হলেও এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন সর্বাপেক্ষা সংগঠিতরূপে, নির্দিষ্ট দিক ও গতি লাভ করে নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের মাধ্যমে।

---

৩ পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পূর্ব বাঙলায় প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট

১. জনৈক প্রাথমিক শিক্ষকের কাহিনী

আমি মিউনিসিপ্যাল কে. বি. মিঞা মক্তবের প্রধান শিক্ষক। গত ১০ বৎসর যাবৎ আমি শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী আছি। বিগত ১৯৪৭ ইংরেজীর এপ্রিল মাসে আসাম প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের পর হইতে আমরা অনিয়মিতভাবে মাসিক মাহিনা পাইতেছি।

মূল বেতন ১৫ টাকা আর মাগগী ভাতা ৮ টাকা মোট ২৩ টাকা আমার মাসিক প্রাপ্য। ইহাই আমার সংসারের ব্যয় নির্বাহের প্রধান উপজীবিকা। ধানের জমি মাত্র চার কেদার। অতএব মাসিক মাহিনা আজ এই আর্থিক সঙ্কটের দিনে উপজীবিকা নয়, ইহাই জীবিকার প্রধানতম পথ।

গত অক্টোবর মাস হইতে মাহিনা পাইতেছি না (সেপ্টেম্বরে পাইয়াছিলাম সাত মাস অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর)। যখন চালের দর ২৮ টাকা হইতে ৪০ টাকার মধ্যে তখন কিভাবে যে এই অনিয়মিত বেতন প্রাপ্তিতে আমাদের কাটাইতে হয় তাহা একমাত্র আমার মত দুঃস্থরাই জানেন আর জানেন খোদা।

চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট গেলেই শুনিতে হয় ভাণ্ডার নাকি শূন্য। এই হাই হাই রবের মধ্যে আমরা তো আমাদের অস্তিত্বকে নাই বলিতে পারি না কারণ ক্ষুধা বার বারই অস্তিত্বকে মনে করাইয়া দিতেছে। গ্রামে আমার মত অনেক আছে যাহাদের অবস্থা আমারই মত। সরকারও তাহাদের অভুক্ত পেটে এক মুষ্টি দানা দিবার ব্যবস্থা করেন নাই।

যখন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডও আমাকে দেন না, সরকারও গ্রামের দুঃস্থদের খাদ্য দিবার দায়িত্ব নেন না, তখন বাধ্য হইয়া নিজেদের দিকেই ফিরিয়া চাহিলাম, বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, বাঁচিবার স্বাভাবিক তাগিদে। চাহিয়া দেখিলাম গ্রামের জমিদার বিপিন চন্দ্র পাল, অবস্থাপন্ন কৃষক হাতিমউল্লাহ, কানাইরাম পাল, বঙ্কবিহারী পাল ; অচিন্ত্যপুরের ইয়াকুব উল্লা, ইসব উল্লা, সফর আলী, আজিজ উল্লা মড়ল, রাজার গাঁওয়ের মহিদউল্লাহ, ইমান আলী প্রভৃতি রোজই ধান বিক্রি করিতেছে। গ্রামে আরো ধান মজুদ ছিল, এই ধানের মালিক লক্ষণশ্রী গ্রামের বড় জোতদার মতসিন আলী।

www.pathagar.com

গ্রামবাসীদের একটি সভা হইল। সভাপতিত্ব করিলেন– আবদুল করিম, সভাস্থল–আজিজউল্লা মোড়লের বাড়ী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হইল তিনটি গ্রামের দুঃস্থদের জন্য ধান সংগ্রহ আমাদের উল্লিখিত তিনটি গ্রামের অবস্থাপন্নদের নিকট হইতে কর্জ হিসাবে নিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তদনুসারে পরদিন আমাদের কয়েকজন বিপিনবাবু প্রভৃতিকে জানাই। ইহা ছাড়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও জমিদারদের অতিলোভী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও গ্রামে আলাপ আলোচনা হয়– যাহাতে চিরস্থায়ীভাবে জমি কৃষকদের হাতে আসে এবং দুর্ভিক্ষের হাত হইতে চিরতরে রক্ষা পাইতে পারি।

পাকিস্তান গড়নের পূর্বে এবং নির্বাচনের সময় আমরা শিক্ষকরাও গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়াছি ভোট দিলে আমরা জিতিব ; আর জিতিলে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ করা হইবে, কৃষক মজুর রাজ কায়েম হইবে।

আমি কয়েকদিন আগে ২৮শে ফেব্রুয়ারী বোর্ড অফিসে মাহিনার জন্য লোক পাঠাই। সে ফিরিয়া আসিলে শুনিতে পাইলাম চেয়ারম্যান সাহেব নাকি 'পে-চেকে' নাম সহি করিতে রাজী হন নাই এবং বলেন, "একে বেতন দেওয়া যায় না, তাহার চাকুরি যাইবে। সে ১০৭ ধারার আসামী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী কমিউনিষ্ট।"

আমার অপরাধ কি? খাদ্য আর জমির সমস্যা নিয়া কি আমাদের কোন কথা বলার অধিকার নাই? তবে কি নির্বাচনের সময় সাহেবদের ভোটের বাক্স পূর্ণ করার জন্যই কেবল গ্রামের সরলপ্রাণ কৃষকদিগকে ঠকানোর জন্য বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উঠানোর আওয়াজ তোলা হয়? এখন কি খাদ্য আর জমির কথা বলিলেই কমিউনিষ্ট হইতে হইবে?

আমরা পাকিস্তান কাহাদের জন্য এবং কি জন্য গড়িয়াছি? না খাইয়া মরার জন্য ? শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য ? জমি হইতে উচ্ছেদ হওয়ার জন্য ?

আমি আশা করি দেশবাসী এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবেন। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের নিকট এই কথাই বলিতে চাই, যাহারা আমাদের মাসিক মাহিনা দিতে আজ অপারগ তাহারা কিভাবে চাকরি হইতে বরখাস্ত এত তাড়াতাড়ি করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আজ আমার উপর যে অবিচার হইতেছে কাল আপনাদের উপরও হইবে।

গণতন্ত্রের প্রতিটি দুর্গকে আজ আমাদের সকলের সম্মিলিতভাবেই রক্ষা করিতে হইবে। সকলের প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হোক।

ইতি

তারিখ
৬/৩/৪৯ইং

মোহাম্মদ আবুল মজহর খান
গ্রাম-বৈঠাখালী

www.pathagar.com

জনৈক প্রাথমিক শিক্ষকের কাহিনী[১] এই শিরোনামায় প্রকাশিত ওপরে উদ্ধৃত সিলেট জেলার একজন প্রাথমিক শিক্ষকের এই পত্রটি থেকে শুধু যে প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতির বিষয়েই জানা যায় তাই নয়। কৃষক সমাজের সাথে পূর্ব বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবনের নিবিড় সংযোগ, কৃষকদের জমি ও ফসলের আন্দোলনের সাথে তাঁদের একাত্মতা এবং তাঁদের ওপর সরকারী নিপীড়নের বিষয়ে বক্তব্যের দিক থেকেও পত্রটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে ১৯৪৮ সাল থেকেই সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হয়, প্রাথমিক শিক্ষকরা পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় সভা সমিতি করেন এবং তাঁরা নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করে পত্র-পত্রিকায় অনেক চিঠিপত্র দেন। এই চিঠিপত্রগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকরা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা খুব স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেন। সেজন্যে এই চিঠিপত্রগুলিই হলো তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে সব থেকে নির্ভরযোগ্য দলিল।

২. প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন, ১৯৪৯

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু সভা সমিতি করে নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে নিজেদের দুর্দশার অবসানের দাবী জানাতে থাকেন। কিন্তু পূর্ব বাঙলা সরকার শিক্ষকদের এই সব দাবী দাওয়ার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করেন না। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থার কোন উন্নতি না হয়ে দিন দিন তার অবনতিই ঘটতে থাকে।

প্রাইমারী শিক্ষকদের অবস্থা এবং সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের ১৫ই অক্টোবর পাবনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক আহমেদ হুসেন একটি বিবৃতিতে[১] বলেন,

> নূতন স্কীম চিজটি কি তাহা খুলিয়া বলিলেই থলি হইতে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িত। আসলে ডি.পি. আই-এর নির্দেশ ছিল যে, ১৯৪১ সালের আদম শুমারীর হিসাব মত প্রতি দুই হাজার লোকের জন্য একটি স্কুল উঠাইয়া দিতে হইবে। এই হিসাব মত সিরাজগঞ্জ মহকুমায় মোট স্কুলের সংখ্যা থাকিবে ৪৯৩। বর্তমানে স্কুল বোর্ড পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ৬৪১। ইহার পর সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, বালিকা স্কুল, এম.ই. স্কুল এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রাইমারী বিভাগের সংখ্যা মোটামুটি ১৩৭। সুতরাং সরকারী নির্দেশ মত ২৭৫টি স্কুল তুলিয়া দিতে হইবে।
>
> মোটামুটি উপরোক্ত স্কীমের দৌলতে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ প্রাথমিক স্কুল তুলে দেওয়া হয়। একমাত্র নাটোর মহকুমায় ৪০০।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হিসাব থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কত হাজার প্রাইমারী শিক্ষক বেকার হয়ে পথে দাঁড়ান। অপরদিকে প্রাইমারী শিক্ষকের বেতনের হার: তৃতীয় শিক্ষক, মাসিক ১৯৷৹ ; ২য় শিক্ষক, মাসিক ২৭ টাকা; প্রথম শিক্ষক, মাসিক ২৯ টাকা।

প্রাইমারী শিক্ষকদের প্রতি সরকারের এই চূড়ান্ত অবহেলার প্রত্যক্ষ ফল চট্টগ্রামের ঈদগাঁও স্কুলের শিক্ষক নাজিমউদ্দীনের অনাহারে হাসপাতালে মৃত্যু। মৃত্যুকালে তাঁর তিন মাসের মাহিনা বাকী ছিল। ঐ জেলাতেই অনুরূপ কারণে আরো ৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের মৃত্যু ২ জনের আত্মহত্যা।

এই অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ২৭শে মার্চ ঢাকায় পূর্ব বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সম্মেলন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মৌলানা মহম্মদ আকরাম খান এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন আবদুর রহমান খাঁ। পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় আড়াই হাজার প্রাথমিক শিক্ষক এই সম্মেলনে যোগদান করেন।[২]

সম্মেলনে সভাপতি আবদুর রহমান খাঁ তাঁর অভিভাষণে বলেন,

আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার কৃতকার্যতা নির্ভর করবে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর। উপযুক্ত শিক্ষক পেতে হলে উপযুক্ত বেতন দিতে হবে।... আজকাল সাধারণ কুলিও দৈনিক দুই টাকা উপার্জন করে। না করলে তার সংসার চলে না। প্রাথমিক শিক্ষককেও অন্যূন তা দেওয়া উচিত।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল ফজল তার নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী উপস্থিত শিক্ষকদের সামনে পেশ করেন :

গত দুর্ভিক্ষে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পল্লীর বহু প্রাথমিক শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ২০ হাজারেরও অধিক পল্লী শিক্ষক একেবারে দুঃস্থ, ভিখারী শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক অর্থাৎ এই প্রদেশের প্রায় সমস্ত শিক্ষক গোষ্ঠী সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। প্রদেশের অন্যান্য অধিবাসীরই মত তাঁরা ভেবেছিলেন– যুদ্ধাবসানে বিপদ খানিকটা কেটে যাবে, কষ্টের কিছু লাঘব হবে। কিন্তু কই, কিছুই হল না। তাঁরা যা রোজগার করেন তাতে তো তাঁদের এক জনের এক বেলার মতনও খাদ্য জোটে না ; জিনিসপত্র এখনও অগ্নিমূল্যই রইলো। চার গুণ মূল্য দিয়ে চোরা বাজারে না গেলে অন্ন বস্ত্র বা রোগের ঔষধপথ্য জোটে না। পক্ষান্তরে কাজে লাগাবার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না করে শুধু সার্জেন্ট স্কীমের লোভনীয় প্রস্তাব বা পে কমিশনের লোভ দেখাইয়া দেশের শিক্ষকদের ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র চলেছে। সব দিক দিয়ে শিক্ষকদের বেশী নিরাশ করা হয়েছে। সমস্ত সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরা, এমনকি ধাঙ্গড়, মজুররাও যখন যুদ্ধ ভাতা আদায় করলো– প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাগ্যে তখন কি জুটেছে? চিরদিন মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন বলেই তাঁদের প্রতি এই অবজ্ঞা, এই অবজ্ঞার জন্যই তাঁরা গত ১০ বৎসরের মধ্যে এক মুষ্টি অন্নের সন্ধানে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। যাঁরা আজও শিক্ষকতাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁরা বুঝেছেন গ্রামের মধ্যে শিক্ষার ক্ষীণতম আলোক বর্তিকাকে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তাঁরা

www.pathagar.com

নিয়েছেন। সেই কর্তব্যের গুরুত্বকে সঙ্গী করেই সর্বদা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁরা লড়াই চালাচ্ছেন। তাঁরা ভীরু নন তাঁরা দুর্বল নন। বিশ্বযুদ্ধের যে বিরাট পরিবর্তনে সমস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভিত্তির গোড়ায় আঘাত করেছে, বাঁচার তাগিদে যে সামাজিক চেতনা আজ প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মনে জেগেছে, তাতে কেউ আজ নীরবে মুখ বুজে অবজ্ঞা অবিচার সইতে পারে না। তাই শিক্ষক সমাজের এই নবজাগরণ।

এতদিন পর্যন্ত সরকার সমিতিকে কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই। কেবল উপেক্ষাই করিয়াছেন। সমিতি ধর্মঘটের নোটিশ দিলে সরকার তাঁহাদের তাবেদার সংবাদপত্র ও শিক্ষা বিভাগের শাসনযন্ত্রকে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের শক্তি ও সংহতিকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত অপচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় সমিতি এক বিরাট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।

১৬/৩/৪৮ইং তারিখে ঢাকাতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সভায় গৃহীত ২ নং প্রস্তাবানুসারে পূর্ববঙ্গ সরকারকে এই মর্মে এক চরমপত্র দেওয়া হয় যে, যদি বর্তমান বাজেটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বনিম্ন দাবীগুলি মানিয়া না লন তবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাতে বাধ্য হইয়াই পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষকদের চরমপন্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন।

আমাদের ডেপুটেশনের নিকট শিক্ষামন্ত্রী শিশু রাষ্ট্রের অজুহাত দেখাইয়া আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিবার উপদেশ দেন। ইতিপূর্বে ঢাকা জেলার শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পত্নীতলা, ধামাইরহাট, পোর্ষা এই তিনটি থানার শিক্ষকগণের বেতন সম্বন্ধে সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট, অন্যান্য মেম্বরগণ ৩ বার ডেপুটেশন দেন। প্রত্যেক ডেপুটেশনেই সরকার আমাদিগকে আশ্বাস বাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিয়েছেন। পরে সরকার ইহার কোন প্রতিকার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। পোর্ষা, ধামাইরহাট, পত্নীতলার শিক্ষকগণ প্রায় ২ বৎসর পর্যন্ত বেতন পাইতেছেন না, ইহা হইতে দুঃখ আর কি হইতে পারে?

এই তো গেল ডেপুটেশনের কথা। এ পর্যন্ত বিভিন্ন কাগজে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন সমিতিতে জোর আন্দোলন করা হইতেছে। তবুও আমাদের সরকার সেসব শুনিয়াও শুনেন না, দেখিয়াও দেখেন না।...পূর্ব পাকিস্তানবাসী দরিদ্র কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে পাট উৎপন্ন করে, সেই পাট শুল্ক অন্য কোন খাতে খরচ না করিয়া এই দরিদ্র চাষীদের ছেলে মেয়েদের জন্য ব্যয় করা কি উচিত নহে? যে জমিদারী প্রথার কল্যাণে একদল শোষক এ দেশের কৃষক কুলের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদের বিরাট অংশ অযথা শোষণ করিতেছেন সেই জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিয়া তাহার আয় হইতে দরিদ্র চাষীদের ছেলে মেয়ের ব্যবস্থা করা কি অন্যায় হইবে? মোট কথা, ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই।...

এরপর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবুল ফজল শিক্ষকদের কাছে নিম্নলিখিত ভাষায় আন্দোলনের আহ্বান জানান:

www.pathagar.com

বন্ধুগণ। কাকুতি মিনতি আবেদনের পালা শেষ হইয়াছে, ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে আপনাদের ভাগ্যে জুটেছে শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা, মনে রাখতে হবে দুর্বলকে কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। সমিতির নির্দেশ মতে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হউন। আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

৩. ধর্মঘটের পথে প্রাথমিক শিক্ষক

১৯৫০ সালের ২৭শে এপ্রিল ময়মনসিংহের ছায়াবাণী হলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১] ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল মোনায়েম খাঁ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সম্মেলনের সমস্ত স্থানীয় আয়োজনের তত্ত্বাবধান করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ এবং সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বাঙলা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ইব্রাহিম খাঁ।

পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে বহুসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে নোতুন বৎসরের জন্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন সভাপতি এবং আবুল ফজল সম্পাদক নির্বাচিত হন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিলো তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সরকারকে সতর্ক করে নওবেলালের একটি সম্পাদকীয়তে এই সময় বলা হয়,

> পূর্ব পাকিস্তানের ৮০ হাজার অসহায় প্রাথমিক শিক্ষকদের চরম দুর্দশার কথা আমরা পূর্বেও আমাদের সংবাদপত্রের মারফতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।... পূর্ব পাকিস্তান সরকার আগামী ১০ বৎসরে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার মৌলিক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ১৯৫০-৫১ সাল হইতে তাহার প্রারম্ভিক কার্য শুরু হইবে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু কোথায়? সরকারের পক্ষ হইতে তেমন আশাপ্রদ সাড়া দেখা যাইতেছে না।... আমরা মনে করি এই প্রাথমিক শিক্ষকদের রক্ষা করা–দেশকে রক্ষা করা, জাতিকে রক্ষা করা এখানেই সত্যিকারের ডিফেন্স। এই প্রায় এক লক্ষ শিক্ষকেরা ১৫৷৹ টাকা হইতে ৩২৷৹ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হইতে চাউলের দাম যে প্রকার ধা ধা করিয়া বর্ধিত হইতেছে তাহাতে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া কিভাবে এই হতভাগ্যেরা জীবন যাপন করিতেছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই শিক্ষকদের দাবী ছিল শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পিয়ন পেয়াদা চাপরাশীদের সমান মাহিনা। –এবং জীবন সন্ধ্যায় যাহাতে প্রভিডেন্ট ফান্ড হইতে কয়েকটা টাকা লইয়া জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইয়া যাইতে পারেন তার ব্যবস্থা। এমনি নিম্নতম দাবী। দীর্ঘদিন হইতে আদর্শের মোহে আজও ঝড়ের দিনে জাতির কাণ্ডারী হিসাবে হাল ধরিয়া এই শিক্ষকেরা আছেন। অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক নিষ্পেশনে তাহাদের আদর্শের

www.pathagar.com

মর্মমূল চ্যুত করিতে পারে নাই। আজ কিন্তু স্থিতির গভীরে নাড়া পড়িয়াছে। সরকারের সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন।[২]

দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষকদের বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও সরকার তাঁদের দুরবস্থা অবসান অথবা লাঘবের কোন বাস্তব পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কাউন্সিল ১৯৫০ সালের ২৭শে অক্টোবর চাঁদপুরে এক বৈঠকে মিলিত হন।[৩] এই বৈঠকে স্থির হয় যে, পরবর্তী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব বাঙলা সরকার যদি তাঁদের ন্যায্য দাবীদাওয়াসমূহ পূরণ না করেন তাহলে ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এই বৈঠকে আরও স্থির হয় যে, পরবর্তী ২রা ডিসেম্বর তাঁরা পূর্ব বাঙলার সর্বত্র 'প্রাথমিক শিক্ষক দিবস' পালন করবেন। এ জন্যে কার্যকরী কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রতি জেলায় ৯ জন সদস্য নিয়ে এক একটি 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হবে। এছাড়া শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, হাজি সৈয়দ সুলতান (চট্টগ্রাম), আব্দুল গণি (রংপুর), ফাত্তাহ খান (ময়মনসিংহ), মোহাম্মদ সাখাওয়াত আলী (ত্রিপুরা) এবং মোহাম্মদ আহমদ হোসেন (পাবনা)কে নিয়ে একটি 'প্রাদেশিক সংগ্রাম পরিষদ'ও এই বৈঠকে গঠিত হয়।

শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কাউন্সিলের চাঁদপুর বৈঠকের পর একদিকে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র ধর্মঘটের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং অপরদিকে পূর্ব বাঙলা সরকার সেই পরিস্থিতির মোকাবেলার উদ্দেশ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো শিক্ষকদের দাবী দাওয়া ও শিক্ষক সমিতির বক্তব্য সম্পর্কে এক সরকারী প্রেস নোট। এই প্রেস নোটের জবাবে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজিমুদ্দীন একদিকে সরকারী প্রেস নোটের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য ও প্রচারণা এবং অপরদিকে শিক্ষকদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবৃতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রদান করেন :

> শিক্ষা সংক্রান্ত প্রেস নোটটিতে প্রথমেই শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী ঔদাসীন্যের সমালোচকদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সকল সমালোচনাই স্রেফ অজ্ঞতা প্রসূত এবং ধ্বংসাত্মক। তবে প্রেস নোটে এমন সব ভ্রান্তিমূলক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যাহাতে দেশবাসী প্রদেশের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ পাইবেন না। বরং অনেকের মনেই একটা বিভ্রমের সৃষ্টি হইতে পারে।
>
> প্রেস নোটে এমন কতকগুলি কৃতিত্ব কাহিনীর উল্লেখ করিয়া শিক্ষা বিভাগের যোগ্যতা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে, যেগুলির পুনঃপুন উল্লেখের ফলে তাহারা প্রায় পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলকে কলেজের পর্যায়ে উন্নয়ন প্রভৃতি কীর্তি কাহিনীর কথা দেশবাসী পূর্বেও বহুবার শুনিয়েছেন।
>
> নিজেদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার প্রকাশকে ঢাকিবার জন্য আমাদের শিক্ষা

www.pathagar.com

বিভাগ রূপকথার শিয়াল পণ্ডিতের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছেন। নতুবা সিন্ধ ও সীমান্তের মত অনগ্রসর প্রদেশ দুইটির যে ক্ষেত্রে পাকিস্তান অর্জনের পর স্ব স্ব এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে সে ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা সম্প্রসারণ করতঃ প্রদেশের গোটা কয়েক কলেজের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং দুই একটি নূতন কলেজ স্থাপন করিয়া কি এমন গৌরব দাবী করিতে পারে? এই পরীক্ষা গ্রহণের ফলাফল প্রকাশ করিতেই আবার বৎসর শেষ হইয়া যায়।

শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কেই পূর্ববঙ্গের শিক্ষাবিভাগ সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যর্থতার পরিচয় দান করিয়াছেন। তবুও প্রেস নোটে গোটা দুই শিক্ষা সংস্কার কমিটি স্থাপন ও তাহাদের কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কমিটিগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের খেয়াল খুশী মত কতকগুলি প্রশ্নমালা তৈরি করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এম.এল.এ প্রমুখ বিশিষ্ট (?) শিক্ষাবিদের মতামত সংগ্রহকরত শিক্ষা বিভাগের অফিসের ফাইল চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সমবায়ে আজ পর্যন্ত কোনো কমিটি গঠিত হয় নাই এবং আজ পর্যন্ত কোনো কমিটিই পল্লী বাংলার অভ্যন্তরে ভ্রমণকরত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।

শিক্ষা বিভাগের শৈথিল্যের দরুন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দেশে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হইবার পর সর্বপ্রথম আলোচ্য প্রেস নোটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরিভাবে অস্বীকার করলেন। জাতি গঠনের প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত জরুরী ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত রাখিয়াছে স্কুল বোর্ডগুলির স্কন্ধে। জেলা স্কুল বোর্ডগুলি এক শ্রেণীর রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কুচকাওয়াজের আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। সভ্যগণের অধিকাংশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার যোগ্যতা নাই। আসল ব্যাপার হইতেছে এরূপ অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের বেতনের হার নির্ধারণ করা, স্কুল ও শিক্ষক ছাঁটাইয়ের নির্দেশ দান করা, পাঠ্যতালিকা স্থির করা, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ইত্যাকার সকল কার্যই সরকারী শিক্ষা বিভাগ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া সরকারের মুখপাত্ররূপে জিলায় প্রধান পরিদর্শক কর্মচারী পদাধিকার বলে স্কুল বোর্ডের সেক্রেটারী হইয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকাংশ দায়িত্ব বহন করিয়াও শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব এড়াইতে চাহিতেছেন কেন?

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব এড়াইয়া শিক্ষা বিভাগ চট্টগ্রাম, বরিশাল, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি জিলায় ব্যাপক স্কুল ও শিক্ষক ছাঁটাইয়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব অস্বীকার করার ফন্দী আঁটিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু কয়েকটি জেলায় আটটি প্রচলিত ট্রেনিং কেন্দ্র উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে একটি করিয়া ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে। এই আটটি কেন্দ্রে যে স্থলে পূর্বে দুই তিন শত শিক্ষক ট্রেনিং পাইতেন সে স্থলে একটি কেন্দ্রে মাত্র একশত শিক্ষকের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাহাই হউক, শিক্ষা বিভাগের

www.pathagar.com

কর্তারা কি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী পারিশ্রমিক না দিয়া শুধু নূতন নূতন ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করিলেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হইবে না।

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বাক্যের অপেক্ষা কার্যের সমাপন অনেকাংশে শ্রেয়। প্রচার প্রপাগাণ্ডার দ্বারা সত্যকে ঢাকিয়া সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হইলেও ইহার পরিণাম ভাল হয় না।[৪]

শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫০, তারিখে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র 'প্রাথমিক শিক্ষক দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এই দিবস উদ্‌যাপনকালে প্রাথমিক শিক্ষকরা এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, পরবর্তী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার তাঁদের দাবী দাওয়া স্বীকার করে না নিলে তাঁরা ১লা জানুয়ারী থেকে 'চরম পন্থা' অবলম্বন অর্থাৎ ধর্মঘট করবেন।

১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১, তারিখে রংপুর টাউন হলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৫] এই সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ অসুস্থতাবশত অনুপস্থিত থাকায় তাঁর লিখিত অভিভাষণটিই পাঠ করে শোনানো হয়। সম্মেলনে প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহের প্রাথমিক শিক্ষক আবদুর রহমান এবং দ্বিতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন বরিশালের প্রাথমিক শিক্ষক মোতাহেরুদ্দিন আহমদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত পূর্ব বাঙলার সকল জেলা থেকে প্রায় এক হাজার শিক্ষক প্রতিনিধি এই রংপুর সম্মেলনে যোগদান করেন।

শিক্ষক সম্মেলনে ধর্মঘট সম্পর্কে ১৫ই ফেব্রুয়ারী নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:

সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী দাওয়া বার বার উপেক্ষিত হওয়ায় এবং মুসলিম লীগের শরণাপন্ন হইয়াও ব্যর্থ হওয়ায় সম্মেলন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত করিতেছে। আগামী ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রতীক ধর্মঘট করিবেন এবং ১লা এপ্রিল হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চালাইয়া যাইবেন।

অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে সরকার ও সরকারী দলের জুলুম সম্পর্কে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুটি উল্লেখযোগ্য :

ময়মনসিংহ স্কুল বোর্ডের সভাপতি সাহেব★ বিগত ২রা ডিসেম্বর "প্রাথমিক শিক্ষক দিবস" পালন করার অজুহাতে বহু প্রাথমিক শিক্ষকদের বিল বন্ধ করিয়া এবং শিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়া যে জুলুম শুরু করিয়াছেন তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে প্রতিকার দাবী করা হয়।

ফরিদপুর জেলা স্কুল বোর্ডে নন ম্যাট্রিক আনট্রেইন্ড প্রাথমিক শিক্ষকদের ছাঁটাই করার নির্দেশ দিয়া যে অন্যায় জুলুমবাজী শুরু করিয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ

★ আবদুল মোনায়েম খান

www.pathagar.com

করা হয় এবং একাদিক্রমে যে সকল শিক্ষক তিন বৎসর যাবত শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখার দাবী জানান হয়।[৬]

রংপুর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকরা পূর্ব বাঙলার সমস্ত স্কুলে ৪-৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। কোন কোন স্থানে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭] এই উপলক্ষে শিক্ষকরা যে সকল সভা সমিতি করেন তাতে ১লা এপ্রিল থেকে সাধারণ ধর্মঘট অনির্দিষ্টকালের জন্যে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের সমর্থনে শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তোলেন।

৪ঠা থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত তিন দিন স্থায়ী প্রতীক শিক্ষক ধর্মঘটের পর এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক নওবেলাল 'চরমপন্থা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে[৮] বলেন,

> পূর্ব বাংলার প্রাইমারী শিক্ষকেরা চরমপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য আয়োজন শেষ করিয়াছেন। সমগ্র পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার শিক্ষকেরা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে তাহাদের ন্যূনতম দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করিবেন।
>
> পাকিস্তান অর্জনের প্রথম দিন হইতে অসহায় শিক্ষকদের দাবী-দাওয়াগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যাহারা বর্তমানে পাকিস্তানের কর্ণধার তাহারা দেশের জনসাধারণের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা চাহেন না। এবং এই কয়েক হাজার শিক্ষক গলায় কলস বাঁধিয়া নদীতে ঝাঁপ দিলেও রাষ্ট্র কর্ণধারগণের বিশেষ আসে যায় না। মাঝে মাঝে পরিষদে, ভোজসভায়, বিভিন্ন জমায়েতে মন্ত্রীগণকে এই অসহায় শিক্ষকদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করিতেও দেখা গিয়াছে। আবার কাহাকে কাহাকে ইহাও বলিতে শুনা গিয়াছে, পাঠশালার শিক্ষকেরা নাকি নিজের অন্তরের তাগিদে এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করেন নাই, তাহা বাহিরের মানুষের উস্কানীতে বিভ্রান্ত হইয়া করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞেস করি, পেটের ক্ষুধা কি জিনিস তাহা কি মন্ত্রীরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন?

ধর্মঘটের পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের আবেদন নিবেদন সম্পর্কে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

> প্রাইমারী শিক্ষকেরা দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত সুধীজনকে তাহাদের দুঃখ এবং দুর্দশার কথা বার বার জানাইয়াছেন। আজাদ দেশের সরকারের ছিন্নপত্রের ঝুলিতে কয়েক লক্ষ আবেদনপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাইমারী শিক্ষকেরা জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াছেন– তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ব বাঙলায় যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এবং আন্দোলনের পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সেই প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট সরকারের জন্যে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে নওবেলাল এই সম্পাদকীয়টিতে যা বলেন সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য :

www.pathagar.com

দেশ শাসনে অনভিজ্ঞ মন্ত্রীগণ কালোমেঘের রুদ্ররূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছেন না। ঝড়ের বাতাস যে শুরু হইয়াছে তাহাতে খড়কুটা সব ভাসিয়া যাইবে। সেই মহানিশা অবসানের দায়িত্ব সম্পর্কে জন-সাধারণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রাইমারী শিক্ষকদের আসন্ন ধর্মঘটের সহিত জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। প্রাইমারী শিক্ষকেরা তাহাদের স্ব স্ব দাবীকে ভিত্তি করিয়া, তাহাদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থাগুলি তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধন মুক্তির আন্দোলন করিতেছেন। একটির সহিত অন্যটির প্রকৃতগত সম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালকগণ মানবীয় বৃত্তিগুলি বিসর্জন দিতে পারেন। কিন্তু নির্যাতিত জনগণের আন্দোলনের গতিধারাকে রোধ করিয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য আঘাত না দিয়া আসন্ন প্রাইমারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণ নিবারণ করা প্রয়োজন। যথাসময়ে রাষ্ট্র কর্ণধারগণকে সজাগ হইবার জন্য আমরা বলিতেছি। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা বিবেচনা না করিলে একটা বিরাট সঙ্কট দেখা দিবে।...প্রাইমারী শিক্ষকেরা তাহাদের চরম পন্থা কার্যকরী করার পূর্বেই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা আশা করি সরকার দেশে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হইতে দিবেন না।

৪. ধর্মঘট বানচালের উদ্দেশ্যে সরকারী ঘোষণা

আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের মোকাবেলা করার অন্যতম উপায় হিসেবে পূর্ব বাঙলা সরকার মার্চ মাসের শেষ দিকে একটি প্রেস নোটের মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কিত একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন।[১] এতে বলা হয় যে, যে সমস্ত এলাকাতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সরকার নিম্নলিখিত হারে ভাতাসহ বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন :

(ক) প্রধান শিক্ষক, ট্রেইন্ড ম্যাট্রিক ও তদুর্ধ যোগ্যতাসম্পন্ন ৫০৷. ১-৬৫৷. (খ) সহকারী শিক্ষক, ট্রেইন্ড ম্যাট্রিক, ৪৫৷.-১-৫৫৷. (গ) সহকারী শিক্ষক, ট্রেইন্ড নন ম্যাট্রিক অথবা আনট্রেইন্ড ম্যাট্রিক ৩৫৷০-১-৫০৷০।

প্রেস নোটটিতে বলা হয় যে, পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইতিমধ্যে প্রবর্তিত হয় নাই সে রকম এলাকায় যে সমস্ত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক বর্তমানে কাজ করছেন তাঁরাও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে নয়া হারের সুবিধা পাবেন। তবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত এলাকায় সকল শিক্ষক যে এই নোতুন হারে বেতন পাবেন তা নয়।

প্রেস নোটটির মাধ্যমে সরকার আরও ঘোষণা করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি বদলীর যোগ্য করা হয়েছে। কোন এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে সেখানকার অধিকাংশ চাকরিই বাধ্যতামূলক

www.pathagar.com

বদলীর আওতায় পড়বে এবং অপরাপর এলাকার অর্থাৎ যেখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই সেখানকার শিক্ষকদেরও অনেককেই বদলীর ব্যবস্থা করা হবে।

যে সমস্ত এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও প্রবর্তন করা হয় নাই সেইসব এলাকার শিক্ষকদের বেতন নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধির কথা প্রেস নোটটিতে বলা হয় : প্রধান শিক্ষক ২৷৷০ ; সহকারী শিক্ষক ১৷৷০। এই বেতন বৃদ্ধির ফলে সরকারের বাৎসরিক ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে এবং তা পরবর্তী ১লা এপ্রিল অর্থাৎ ধর্মঘট যে তারিখে শুরু হওয়ার কথা সেই তারিখ থেকেই কার্যকর হবে।

যে সকল যোগ্যতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক বর্তমানে কাজে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে থেকে অনেককেই নবপ্রবর্তিত সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সব সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরদেরকে শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকের উচ্চতর পদে নিয়োগের সম্ভাবনার কথাও এই সাথে প্রেসনোটটিতে বলা হয়।

সরকারী প্রেস নোটে বেতন বৃদ্ধির যে কথা ঘোষণা করা হয় তা এতই সামান্য যে প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু তার থেকে বেশী বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের চাকরি বদলীযোগ্য করায়। নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষকদের কিছু কিছু প্রভাব ছিলো। এই প্রভাবকে বিনষ্ট করার জন্যেই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। বিপুল অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষকই মাইনে অতি অল্প হওয়ার জন্যে নিজ নিজ এলাকায় কৃষিকার্য অথবা অন্য কোন অর্থকরী কাজে লিপ্ত থাকতেন। তাঁদেরকে তাঁদের নিজ নিজ এলাকা থেকে বদলী করার অর্থই ছিলো তাঁদের জীবিকার ভিত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা। কাজেই এই সরকারী সিদ্ধান্ত যে ধর্মঘটীদেরকে ধর্মঘটের পথ থেকে নিরস্ত না করে তাঁদেরকে আরও নিশ্চিতভাবে ধর্মঘটের দিকে ঠেলে দেবে সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। এবং বস্তুতপক্ষে ঘটেছিলও তাই। প্রধান শিক্ষকদেরকে প্রলুব্ধ করার জন্য যে সম্ভাবনার কথা প্রেস নোটটিতে বলা হয়েছিলো তারও ভাঁওতাপূর্ণ চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষকদের মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। এ সবের ফলে সরকারী প্রেস নোটটি ধর্মঘটে আগ্রহী শিক্ষকদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে তো পারেই নি, উপরন্তু তার ফলে তাঁদের ঐক্য জোরদারই হয়েছিলো।

এই প্রেস নোটটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটি ২৩শে মার্চ ঢাকায় ৩২ নম্বর পুরানা মোগলটুলীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মহম্মদ আজিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে এই বৈঠকে শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবুল কাসেমসহ বিভিন্ন জেলার প্রায় ৪০ জন সদস্য উপস্থিত থাকেন।[২]

এই বৈঠকে সমিতির কার্যকরী কমিটি প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে ১লা এপ্রিল ধর্মঘট শুরু করে অনির্দিষ্টকালের জন্যে তা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। পূর্ব বাঙলা সরকার বাধ্যতামূলক এলাকার বাইরের প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক ১॥.-২॥. হারে বেতন বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তাকে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে অভিহিত করেন। তাঁরা এই বৈঠকে সুস্পষ্টভাবে দাবী জানান যে, জীবিকা নির্বাহের উপযোগী বেতন বৃদ্ধি না করা পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের স্ব স্ব এলাকা থেকে বদলী করা চলবে না।

৫. প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী ১লা এপ্রিল থেকে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষকরা ধর্মঘট শুরু করেন। ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে কার্যকরী কমিটি প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অবলম্বনের নির্দেশ দেন :

> (ক) ৫ই এপ্রিল প্রত্যেক মহকুমা শহরে মহকুমার সকল শিক্ষক সমবেত হইয়া মিছিল ও সভার এন্তেজাম করিবেন (খ) ৭ই এপ্রিলের মধ্যে প্রত্যেক জেলা সমিতি সংগ্রাম ফি-এর এক-চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট পাঠাইয়া দিবেন (গ) ধর্মঘটকালে সর্বত্র সভা সমিতি করিয়া জনসাধারণকে ধর্মঘটের কারণ বুঝাইয়া বলিতে হইবে। (ঘ) আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে জেলা সমিতিকে মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে। (ঙ) আগামী ১৫ই এপ্রিল সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষক দিবস পালন করিতে হইবে। এই উপলক্ষে জনসাধারণের নিকট হইতে ধর্মঘট তহবিলে চাঁদা আদায় করিতে হইবে এবং হরতাল, মিছিল ও সভার এন্তেজাম করিতে হইবে। শহর এলাকাগুলিতে এই দিবস পালনের জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে।[১]

প্রাথমিক শিক্ষকদের এই ধর্মঘট জনগণের মধ্যে এক ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। পূর্ব বাঙলার সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সমাজ এই ধর্মঘটকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।[২] ২৭-২৮শে মার্চ ঢাকায় যে পূর্ব পাকিস্তান যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

> সম্মেলন অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রস্তাবিত ১লা এপ্রিল হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় এবং সরকারকে তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইবার জন্য দাবী জানায়।[৩]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই যুব সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নামে

www.pathagar.com

যে নোতুন যুব সংগঠনটি গঠিত হয় তার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অলি আহাদ। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় যে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার মূল উদ্যোক্তাদের একজন এবং সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। শিক্ষা সমস্যা ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তাঁরা এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং এজন্যেই প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট সম্পর্কে যুব সম্মেলনের সমর্থন নিষ্ক্রিয় নয়, যথেষ্ট সক্রিয়ই ছিলো।

প্রাথমিক শিক্ষকরা নিজেরা ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে সভা সমিতি, মিছিল ইত্যাদি সংগঠিত করে চলেন এবং জনগণও বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র তাকে সমর্থন জানায়।[৪]

১৮ই এপ্রিল আগানগর (জিঞ্জিরা, ঢাকা) প্রাথমিক স্কুলে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির একটি বৈঠক হয়। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আজিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে শিক্ষকেরা ধর্মঘটে আশানুরূপ সাড়া দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ২রা মে সর্বত্র 'প্রাথমিক শিক্ষক দিবস' পালন করা হবে। ১১ই মে চাঁদপুরে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির একটি বিশেষ সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে গৃহীত হয়।[৫]

২৭শে এপ্রিল তারিখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের সমর্থনে একটি জনসভা আহ্বান করেন। ঐ দিনই পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ প্রাথমিক শিক্ষকদের সমর্থনে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন ঃ

> জীবিকার উপযুক্ত বেতনের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষকেরা ১লা এপ্রিল থেকে ধর্মঘট করেছেন। এই ধর্মঘটের ফলে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে এবং দেশের শিশুদের জন্যে শিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়েছে। শিক্ষকদের দাবীর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে একথা মনে হয় যে, জনগণের শিক্ষার জন্য কোন পরোয়া না করাই সরকারের ইচ্ছাকৃত নীতি। দেশের জনগণের শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে সরকারকে অল্পসংখ্যককে সীমিত সুযোগ দানের নীতিই অনুসরণ করতে দেখছি। শিক্ষাকে রক্ষা করতে গেলে এই নীতিকে যে কোন মূল্যেই প্রতিরোধ করতে হবে।
>
> প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ আজ আরমানীটোলা ময়দানে একটি জনসভা আহ্বান করেছে। আমরা, যুব লীগের কর্মীরা, শিক্ষকদের দাবী দাওয়ার প্রতি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি এবং জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি যাতে তাঁরা সরকারের শিক্ষা উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলেন।[৬]

ধর্মঘট চলাকালে 'প্রাইমারী শিক্ষক' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে

www.pathagar.com

ঢাকার ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার বলেন যে, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা সারা প্রদেশব্যাপী চালু করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ তখনই পাওয়া যেতে পারতো যদি সরকার বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর চালু করার মতো সব আজগুবি পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয় না করতো।[৭]

পাকিস্তান অবজার্ভারের এই বক্তব্যের একটি প্রতিবাদ ঐ পত্রিকাতেই ২৫শে মে প্রকাশিত হয় যাতে বলা হয় যে, সরকারী মহল থেকে জানা গেছে যে, এই সব অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং তাদের অর্থ বিভ্রান্তিকর। প্রাদেশিক সরকার বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর চালু করার জন্য কোন অর্থ ব্যয় করে না। পরিকল্পনাটি কেন্দ্রের দ্বারা গৃহীত এবং তার জন্য কেন্দ্রের বাৎসরিক ব্যয় হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

কেন্দ্রের সম্পূর্ণ তাবেদার প্রাদেশিক সরকারের পরিবর্তে কেন্দ্র নিজে বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর প্রচলনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে সরকারী প্রতিবাদের এই বক্তব্য যে অভিযোগের মূল বক্তব্যটিকে মোটেই নাকচ করে না তা বলাই বাহুল্য। আসল কথা হচ্ছে সে সময় প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করে সরকার, সে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক যাই হোক, কতকগুলি উদ্ভট ও গণবিরোধী পরিকল্পনার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যাচ্ছিলো। তাদের এই অপব্যয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ যে একই গণবিরোধী নীতির অন্তর্গত ছিলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের সমর্থনে এবং সরকারী নীতি ও বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৭ই মে, ১৯৫১, তারিখে নওবেলাল 'কথামত' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে বলেন,

> পূর্ব পাকিস্তানের ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘটের ৪৩শ দিনে আমাদের স্বনামধন্য শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ সাহেব সংবাদপত্রে এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতি মারফৎ বুভুক্ষু প্রাথমিক শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে যে সব কথামৃত বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে ধর্মঘটের অবসান না হইলেও তাহাদের মহাবুভুক্ষার কিছুটাও নিরসন করবে নিঃসন্দেহ!
>
> শুরুতেই মহাপ্রাণ মন্ত্রী বাহাদুর এই 'অযৌক্তিক' ধর্মঘটের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "সরকারী চাকুরীয়াদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা অপরাধ নহে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।" অতঃপর তিনি নানা অবান্তর কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যে ২ কোটি টাকা ব্যয়ীত হইতেছে তাহা অপচয় হইতেছে মাত্র। সেই জন্য তিনি আগামী "১০ বছরের স্বল্পকাল" মধ্যে সমস্ত প্রদেশব্যাপী উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

এই পরিকল্পনানুযায়ী প্রতি বৎসর প্রদেশের এক-দশমাংশ উপকৃত হইতে থাকিবে যে পর্যন্ত না দশ বৎসরের শেষে সারা প্রদেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। অপরদিকে জনাব শিক্ষামন্ত্রী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সম্প্রতি সরকার শিক্ষকদের জন্য আড়াই টাকা ও দেড় টাকা বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়া যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কার্যকরী করিলে খাজাঞ্চীখানা হইতে ১৪ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হইয়া যাইবে। অর্থাৎ মন্ত্রী বাহাদুর এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিতেই যদি ১৪ লক্ষ টাকা সাবাড় হইয়া যায় তাহা হইলে সরকারের অন্য খরচ চলিবে কি করিয়া!

জনাব শিক্ষামন্ত্রী এইখানেই থামিয়া যান নাই। তিনি পরাধীনতা যুগের যুদ্ধকালীন মহার্ঘতার নজির টানিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনকার অবস্থা হইতেও বর্তমান অবস্থা অনেকাংশে ভাল কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট করার কুবুদ্ধি তখন হইল না। জাতীয় সরকারের পক্ষে জনাব আবদুল হামিদ যখন শিক্ষা মন্ত্রীত্বের গদীতে সমাসীন তখনই তাহাদের সুযোগ উপস্থিত হইল।...

এই সব অমূল্য কথামৃতের পরও যদি গুমরাহের দল শিক্ষা লাভ না করে তাহা হইলে জনাব ওজিরে তা'লিম শিক্ষকদের পরলোকগত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অভ্রান্ত নীতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং বজ্রকঠোর কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন "প্রাথমিক শিক্ষকগণ কাজে যোগ দাও।"...

কিন্তু মানুষকে আর শুধু কথায় ভুলাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। মানুষ আজ ভাবিতে শুরু করিয়াছে। তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উম্মীলিত হইতেছে। ফাঁকিবাজিতে আর তাহারা ভুলিবে না। স্বাধীনতার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। যেখানেই তাহাদের বঞ্চিত করিবার সামান্যতম প্রয়াস পরিলক্ষিত হইবে সেখানেই প্রতিবিধানের জন্য তাহারা মাতিয়া উঠিবে।

তাই সময় আসিয়াছে শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁহার সহযোগীদের বাস্তবকে উপলব্ধি করার এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সম্মুখের পানে দ্রুত আগাইয়া যাওয়ার। অন্যথায় জনসাধারণ তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিবেই।

১৫ই মে চাঁদপুর টাউন হলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ আহমদের অনুপস্থিতিতে হাতেম আলী খান সভাপতির কাজ পরিচালনা করেন। বিভিন্ন জেলার প্রায় পাঁচশো শিক্ষক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।[৮]

শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিমুদ্দীন প্রথমে শিক্ষক ধর্মঘটের কারণ বর্ণনা করেন এবং তারপর জনসাধারণের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন আবদুল আউয়াল, আবু বকর সিদ্দিক, সিদ্দিকুর রহমান ও কোবাদ আহমদ। শিক্ষকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে বক্তৃতা করেন শিক্ষক প্রতিনিধি আবদুল গনি।[৯]

চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এই শিক্ষক সম্মেলন ধর্মঘট সম্পর্কে নিম্নলিখিত চারটি প্রস্তাব[১০] গ্রহণ করেন :

১। প্রাথমিক শিক্ষক উন্নতি, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকগণের জীবন ধারণ

www.pathagar.com

উপযোগী বেতন, ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ১ মাস ১৫ দিন যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষকগণ ধর্মঘট করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি পূর্ব বঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সহানুভূতিহীন, নৈরাশ্যজনক ও সমস্যার সমাধানের পরিপন্থী বিধায় এই সম্মেলন পূর্ব পাক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক উত্থাপিত দাবি দাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বা সম্মানজনক শর্তে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও ঈমানদারীর সহিত ধর্মঘট চালাইয়া যাওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে নির্দেশ দান করিতেছে।

২। পূর্ব পাক প্রাথমিক শিক্ষকগণের এই সম্মেলন ১৬ই মে ও ১৭ই মে ঢাকায় আহূত জেলা স্কুল বোর্ড প্রেসিডেন্ট সমিতির সভায় প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী দাওয়া উত্থাপন করিবার জন্য পূর্ব পাক প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির কর্ম পরিষদকে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে।

৩। এই সম্মেলন পূর্ব পাক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কর্মপরিষদকে সমিতির পক্ষ হইতে বর্তমান জরুরী অবস্থায় সমস্ত কার্য চালাইয়া যাওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে।

৪। এই সম্মেলন আগামী ২৫শে মে শুক্রবারে প্রাথমিক, শিক্ষকদের রুটির লড়াইয়ে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে সর্বত্র 'মোনাজাত দিবস" প্রতিপালন করিবার জন্য শিক্ষক ও জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছে।

ধর্মঘটী শিক্ষকদেরকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্যে পূর্ব বাঙলার অনেক জায়গায় জনগণের পক্ষ থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান এবং তার জন্যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১১] বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে জনসভাও অনুষ্ঠিত হতে থাকে।[১২]

৬. ধর্মঘটের অবসান

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ২রা জুন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল ফজল ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতির মাধ্যমে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে শিক্ষকদেরকে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে জানান যে, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি আবদুল মোনায়েম খানের মধ্যস্থতায় পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন শিক্ষকদের দাবী দাওয়া পূর্ণ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই অনুযায়ীই শিক্ষকদেরকে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটী শিক্ষকদের কোন কোন দাবী সরকার পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছেন সে বিষয়ে আবুল ফজল তাঁর বিবৃতিতে কিছু উল্লেখ করেন নি। তবে ধর্মঘটী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে না, এই মর্মে তিনি তাঁর বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেন।[১]

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক আবুল ফজল কর্তৃক এইভাবে ধর্মঘট

www.pathagar.com

প্রত্যাহার যে সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আপোষ এবং শিক্ষক ধর্মঘটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে আবদুল মোনায়েম খান ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ধর্মঘটী শিক্ষকদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালান এবং যাঁর বিরুদ্ধে ধর্মঘটী শিক্ষকরা নিজেদের সভায় প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করেন তাঁরই মধ্যস্থতায় ধর্মঘটের এই অবসান যে শিক্ষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে না, তা বলাই বাহুল্য। এ জন্যে শিক্ষকদের কোন মূল দাবীই যে সরকার কর্তৃক ধর্মঘটের পর স্বীকৃত হয় নি তাই নয়। সরকার শিক্ষকদেরকে ধর্মঘটকালীন বেতন দেওয়ার ব্যাপারেও অনেক বিলম্ব ও হাঙ্গামা করে।

মোনায়েম খানের মধ্যস্থতায় শিক্ষক সমিতির উর্ধতন কর্মকর্তারা নূরুল আমীনের সাথে আলাপের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকদের কোন দাবী দাওয়াই যে আদায় করতে সমর্থ হন নি একথা ধর্মঘট প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তাই শিক্ষক ধর্মঘট ও তার অবসান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সাপ্তাহিক সৈনিক ৩রা জুন তারিখেই একটি সম্পাদকীয়তে বলেন,

> প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর সহিত শিক্ষক প্রতিনিধিগণ চাঁদপুর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলাপ আলোচনা করিয়া মীমাংসায় আসিয়াছেন এই খবরসহ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের এক বিবৃতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিবৃতিতে তিনি ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা করিয়াছেন।
>
> নানা কারণে এই ধর্মঘট বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। দেশের শিক্ষা জীবনের মেরুদণ্ড ৮০ হাজার শিক্ষকের এত দীর্ঘদিন ধরিয়া ধর্মঘট সত্যিই এক বিরাট ব্যাপার।
>
> প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনে গরীব শিক্ষকদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির অবদান অতুলনীয়।... বর্তমানে প্রতি থানায় একটি ইউনিয়নে বর্ধিত যে বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইতেছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সবই বাধ্যতামূলক করা হইবে বলিয়া সরকার যে ঘোষণা করিয়াছে তাহাও এই সমিতির আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল।
>
> তবুও প্রশ্ন জাগে এই ধর্মঘট সব দাবী আদায় করিতে পারিল না কেন?

ধর্মঘটের অবসানের পর প্রাথমিক শিক্ষকরা বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘটকালীন বেতন ইত্যাদির দাবীতে সভা সমিতি করতে থাকেন।[২] রংপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক আবদুল গণি মিঞা অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে একটি সংবাদপত্র বিবৃতিতে বলেন যে, আজ পর্যন্ত সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মধ্যে ধর্মঘটের সময় যে চুক্তি হয়েছিলো তা কার্যকর করার কোন লক্ষণ নেই। সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং নিশ্চুপ রয়েছেন।[৩] দীর্ঘ দুই মাস ধর্মঘটের পর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারা সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর যে শিক্ষক মহলে

www.pathagar.com

এই ধরনের নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেবে সেটাই স্বাভাবিক।

এই অবস্থা বেশ কিছুদিন চলতে থাকার পর ৫ই অক্টোবর ঢাকায় ৩২ নম্বর পুরান মোগলটুলীতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদের একটি বৈঠক হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম। এই বৈঠকে আশ্বাস দান সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে ধর্মঘটকালীন বেতন না দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে এ বেতন পরিশোধের জন্যে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী দাওয়া আদায়ে সক্ষম না হলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই ধর্মঘট বিফল হয় নি। একদিকে সমিতির কর্মকর্তাদের আপোষ এবং অপরদিকে সরকারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কারণে ধর্মঘট প্রকৃতপক্ষে বানচাল হয়ে গেলেও দীর্ঘ দুই মাসের এই ধর্মঘট ও তার পরিণতি, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি সরকারের মনোভাব ও নীতি ইত্যাদি শিক্ষকদের চেতনাকে অনেকখানি প্রখর করে এবং তাঁদের মধ্যে সরকার বিরোধী বিক্ষোভকে বাড়িয়ে তোলে। মুসলিম লীগ সরকার যে শুধু প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বার্থ বিরোধী তাই নয়, তারা যে সাধারণভাবে মেহনতী জনগণেরও বিরোধী এই চেতনার উন্মেষও ধর্মঘটের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে ঘটে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের এই চেতনা রাজনীতিগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরা গরীব হলেও গ্রাম্য সমাজে তাঁদের একটা ব্যাপক প্রভাব থাকে। তাছাড়া ছাত্রদের সাথে সরাসরি আলাপ আলোচনার সুযোগ থাকায় তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ছাত্র আন্দোলনের নোতুন পর্যায়

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর প্রতি বৎসর ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪৮-এর পর ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন নোতুন উদ্যোগ দেখা যায় নি। অন্যদিকে সরকার পক্ষ থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত জারী থাকলেও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সরাসরি বাংলা ভাষা বিরোধী কোন বক্তব্য কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এই সময়ের মধ্যে ঘোষিত হয় নি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বেশ সতর্কতার সাথেই যতদিন সম্ভব নিশ্চুপ থাকার কৌশলই গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাষ্ট্রভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হলেও তিন চার জন উর্দুভাষী ছাত্র প্রথম দিকে ক্লাসে যোগদান করে। তবে শেষ পর্যন্ত তারাও ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়।[২]

দুপুর বারোটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খালেক নওয়াজ খানের সভাপতিত্বে ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের এক সভা শুরু হয়। সভায় হাবিবুর রহমান (শেলী), বদিউর রহমান, মহম্মদ আলী, আবদুল মতিন, সিদ্দিক আহমদ ও মুখলেসুর রহমান বক্তৃতা করেন। এছাড়া কতকগুলি প্রস্তাবও উক্ত সভায় পাশ হয়। সভা চলে বেলা দুটো পর্যন্ত।[৩]

১১ই মার্চের এই বিশ্ববিদ্যালয় সভায় ১৯৪৮ সালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রাদেশিক সরকারের নিন্দা করা হয়। তাছাড়া ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কিছুসংখ্যক তথাকথিত নেতার বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করে সেই ধরনের লোকদের আন্দোলনের নেতৃত্বে আসার পথ বন্ধ করার ব্যাপারে ছাত্র ও জনগণের প্রতি সতর্ক থাকার আহ্বানও জানানো হয়। সংবিধান সভায় পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের কাছে সভায় দাবী জানানো হয় যাতে তাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আওয়াজ

www.pathagar.com

তোলেন। তাঁরা এই কর্তব্য পালন না করলে সংবিধান সভা থেকে তাঁদের পদত্যাগও দাবী করা হয়।[৪]

ঐ দিনের সভায় বক্তৃতাকালে আবদুল মতিন বলেন যে, তাঁদের কর্তব্য ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সে জন্য রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি নোতুনভাবে উত্থাপন করে সংগঠিতভাবে তার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এই বক্তব্যের পর নাদিরা বেগম আবদুল মতিনকে নির্দিষ্টভাবে তাঁর প্রস্তাব সভায় উত্থাপনের জন্য বলেন। তারপর মতিন প্রস্তাব করেন যে, রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ (সংগ্রাম পরিষদ) নোতুনভাবে গঠন করা এবং সেই কমিটির উপর আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালনার সকল দায়িত্ব অর্পণ করা দরকার। এই প্রস্তাবের পর সেদিনকার সেই বিশ্ববিদ্যালয় সভাতেই ছাত্রদের উপস্থিতিতে আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়।[৫] এই কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হাবিবুর রহমান শেলী, বদিউর রহমান, মাকসুদ আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, আনোয়ারুল হক, মোশাররফ হোসেন, আবদুল ওদুদ, নূরুল আলম, সালাহউদ্দীন, রুহুল আমিন চৌধুরী প্রভৃতি।[৬]

ঐদিনের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,

> ১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এছাড়া বাংলাকে অবিলম্বে আদালতের ভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।
>
> ২। মেডিকেল স্কুল ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবী অবিলম্বে স্বীকার করা হোক।
>
> ৩। এই সভা মার্কিনের সাহায্যপ্রাপ্ত ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাজের তীব্র নিন্দা করছে, মরক্কো থেকে ফরাসী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী করছে এবং মরক্কোর জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করছে।[৭]

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রেরাও ১১ই মার্চ একটি পৃথক সভা করেন। মেডিকেল ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানো হয়।[৮]

১১ই মার্চ নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীরাও পূর্ণ ধর্মঘট পালন এবং বিরাট মিছিল সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করেন। মিছিলে তাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আওয়াজ তোলেন এবং রহমতুল্লাহ ইনষ্টিটিউটে এসে একটি সভায় সমবেত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অলি আহাদ এবং অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন মহম্মদ তোয়াহা, মুজিবুর রহমান, সুলতান আহমদ, শামসুল হুদা ও বজলুর রহমান।[৯]

নব গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের প্রথম বৈঠক হয়

www.pathagar.com

১৩ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখে। মকসুদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন হাবিবুর রহমান শেলী, আব্দুল মতিন, আনোয়ারুল হক, বদিউর রহমান, মোশাররফ হোসেন, আবদুল ওদুদ, নূরুল আলম ও তাজউদ্দীন আহমদ।[১০]

এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভাষা আন্দোলনের তহবিল সংগ্রহের জন্য পতাকা দিবস পালন করা হবে। এর জন্য কাগজের ছোট ছোট পতাকায় ছাপার অক্ষরে বাংলায় লেখা হয় 'আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে চাই'। কিছুসংখ্যক কর্মী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত সেক্রেটারিয়েটের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পতাকা বিক্রি করেন এবং একদিনে তাঁরা প্রায় ৭৫০ টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন।[১১]

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ অপর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। সেটি হলো, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রণয়ন করা এবং তা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্যদের কাছে পাঠানো। সেই সময় সংবিধান সভার অধিবেশন করাচীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। এ ছাড়া পাকিস্তানের উভয় অংশের সংবাদপত্রের কাছেও স্মারকলিপির কপি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১২] এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রভৃতিকে নিয়ে একটি স্মারকলিপি খসড়া কমিটি গঠিত হয়।[১৩]

২৫শে মার্চ ১৯৫১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের অফিসে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন হাবিবুর রহমান শেলী। এই বৈঠকে খসড়া প্রণয়ন কমিটি স্মারকলিপির একটি খসড়া উপস্থিত করেন এবং তা গৃহীত হয়। স্মারকলিপিটি কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার ও পূর্ব বাঙলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।[১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এই স্মারকলিপিটি অবাঙালীদের বোঝার সুবিধার জন্য ইংরেজীতে রচিত হয়েছিলো। সেই ইংরেজী খসড়াটি ঢাকার প্যারামাউন্ট প্রেসে ছাপা হয়। সম্পূর্ণ স্মারকলিপিটির বাংলা অনুবাদ হলো নিম্নরূপ :

> আমরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা, যারা তিন বৎসর পূর্বে পূর্ব বাঙলায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছিলাম তারা এখন বাংলার জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায় করতে যে কোন সময়ের থেকে বেশী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আপনারা যখন করাচীতে সমবেত হয়েছেন তখন আমরা আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী জোরের সাথে উত্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সুযোগ গ্রহণ করছি।
>
> এই আন্দোলন বেশ পুরাতন হয়ে গেছে এবং এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের সমস্ত শক্তি যখন জাতি গঠনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকা উচিত সে সময়ে

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে একটি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করতে অস্বীকার করে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি করছেন।

এই সন্দেহ খুব ন্যায্য এবং যদি তা দূর করা না যায় তাহলে তা নিশ্চিতভাবে জনগণের এমন এক অংশকে বিচ্ছিন্ন করবে যার সর্বান্তকরণ সহযোগিতা ব্যতীত ঐক্য ও সংহতির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

আত্ম নিয়ন্ত্রণের নীতি থেকেই পাকিস্তান এসেছে এবং এই নবীন রাষ্ট্র এখনো প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে। বস্তুগতভাবে ও আধিমানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার জন্য এখনো অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাথমিক বাধা হিসেবে ইংরেজী ভাষার ভয়ঙ্কর চাপ তুলে নিয়ে জনগণের ভাষার জন্য স্থান করতে হবে। কোন স্বাধীন জনগণই অবহেলা করতে পারে না তার মাতৃভাষাকে একমাত্র যা হলো প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত আধিমানসিক গুণাবলীর বিকাশকে সহায়তা করার উপযোগী। একটি বিদেশী ভাষার প্রভুত্বই হলো নিকৃষ্টতম প্রভুত্ব এবং একটি জনগোষ্ঠীকে দাসত্বন্ধনে আবদ্ধ রাখার পক্ষে সব থেকে উপযোগী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফারসীকে উচ্ছেদ করে বৃটিশরা যখন ইংরেজী প্রবর্তন করেছিলো তখন একথা তারা জানতো।

স্বাধীনতার প্রথম মাসগুলিতে করাচীর সরকারী মহল উর্দুকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলছিলেন। পাকিস্তানের এই অংশের জনগণ যখন জানতে পারলেন কেন্দ্র বাংলাকে কত সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে তখন তাঁরা কলঙ্কিত বোধ করলেন। এরপর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাঙলার প্রতিটি কোণ থেকে স্কুল, কলেজ সংবাদপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ে-প্রতিবাদের জোর আওয়াজ উঠলো। সমস্ত প্রদেশই এই হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়ালো; শুরু হলো সভা সমিতি; ছাত্রেরা রাস্তায় মিছিল করলো এবং জেলে গেলো। পূর্ব বাঙলার যুব সমাজের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রত্যেকটি সম্ভাব্য উপায়ই সরকার গ্রহণ করলো এবং তা সত্ত্বেও এ লড়াইয়ে অর্ধেক জয় হলো যখন তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে নমনীয় হতে হলো এবং জনগণকে এই মর্মে আশ্বাস দিতে হলো যে, এই প্রদেশের ক্ষেত্রে বাংলা হবে সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। এ ছাড়া তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন যে তাঁর সরকার কেন্দ্রের কাছে বাংলার বিষয়টি উপস্থিত করবেন যাতে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও তার স্থান পেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার এখনো পর্যন্ত তার নীতি স্পষ্টভাবে ও নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করে নি। তারা সব থেকে বড়ো এক ভুল করে বসবে যদি তারা রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে।

যখন কোন রাষ্ট্রে একটিমাত্র ভাষা থাকে তখন সমস্যা সরলই থাকে। যখন তার সংখ্যা অনেক হয় তখন দেখা দেয় অগ্রাধিকারের প্রশ্ন। যদি

www.pathagar.com

অধিকাংশের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা যথেষ্ট উন্নত হয় এবং তার সাহিত্যও থাকে তাহলে কোন প্রকার ইতস্তত না করে তাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া চলে। যদি ভাষাগত সংখ্যালঘুরা সোচ্চার হয়ে ওঠে তাহলে সেক্ষেত্রে কয়েকটি ভাষা থাকতে পারে যেমন কানাডা এবং সুইজারল্যান্ডে।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বাংলাকেই নির্বাচন করতে হয়। এটা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের (পাকিস্তানের ৫৬% জনসংখ্যা বাংলাভাষী) ভাষা এবং এটা শুধু পাকিস্তানেরই নয়, সমগ্র পাক-ভারতীয় উপমহাদেশেরই সব থেকে সমৃদ্ধ ভাষা। এর একটা হাজার বৎসরের পুরাতন ইতিহাস আছে এবং বিদেশী প্রভাবকে বিকশিত ও আত্মস্থ করার মতো এক অদ্ভুত প্রাণশক্তিও এর আছে। বিগত একশত বৎসরে এর বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে এবং মাটির রস থেকেই এ ভাষা নিজের পুষ্টি সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত হিন্দুস্থানী উর্দু ও ফার্সীর মূলের সঙ্গে এর জটিল সম্পর্ক আছে। এটা হচ্ছে আবার এমন এক ভাষা যা পশ্চিমী সাহিত্যের মর্মবস্তুকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছে। উৎপত্তির দিক দিয়ে মূলত প্রাচ্য হলেও উপমহাদেশের অন্যসব ভাষার থেকে এটাই হলো দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে আধুনিক ও পাশ্চাত্য।

উর্দু–যা কেন্দ্রের দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে খুব সম্ভবত এই কারণে যে, মন্ত্রিসভা ও সেক্রেটারিয়েটের কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন উর্দুভাষী–বাংলা ভাষার তুলনায় খুব দরিদ্র। এটা পাকিস্তানের কোন অংশেরই মাতৃভাষা নয় এবং বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচ ও সীমান্তের মানুষের কাছে একই রকম বিদেশী। উর্দু হচ্ছে ধ্বংসোন্মুখ সংস্কৃতির প্রতীক। এর কোন ভিত্তি নেই বললেই চলে এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত এটা টিকে থাকতে সক্ষম কিনা সন্দেহ। এমনকি পাকিস্তানের স্বাপ্নিক ও শতাব্দীর মহান উর্দু কবি ইকবাল তাঁর দুরূহ চিন্তার বাহন হিসেবে একে অযোগ্য মনে করেছিলেন। তাঁর মহান দার্শনিক কাব্য "আসরার-ই-খুদী" রচনার সময় উর্দু বর্জন করে তাঁকে ফার্সী গ্রহণ করতে হয়েছিলো এবং তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন :

আমার চিন্তার উচ্চ চরিত্রের জন্য
একমাত্র ফার্সীই তার উপযোগী।

(Secrets of the self. P.15 lines 183-184)

এমন একটি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে, রাজনৈতিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে যার কার্যকারিতা খুব সন্দেহজনক এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে যা দূরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, কখনো পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।

কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলে উর্দুর পক্ষে কতকগুলি পয়েন্ট জোর দিয়ে বলা হয়। একে একটি ইসলামী ভাষা হিসেবে দাবী করা হয়। আকাশের নীচে কোন ভাষা ইসলামী, খ্রীস্টান অথবা হেদেন হতে পারে একথা বিশ্বাস করতে আমরা অস্বীকার করি। উর্দু যদি ইসলামী হয় তাহলে বাংলাও সমানভাবে ইসলামী। শুধু

www.pathagar.com

তাই নয়, তা আরও ইসলামী কারণ আরও অধিক সংখ্যক লোক বাংলায় কথা বলে। দ্বিতীয়ত উর্দুকে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটি ঐক্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে জোরালোভাবে উপস্থিত করা হয়। এর দ্বারা যদি এ কথা বোঝানো হয় যে, ভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশগুলির মধ্যে উর্দু লিংগুয়া ফ্রাংকা হিসেবে কাজ করতে পারে তাহলে তার থেকে উদ্ভট আর কিছু হতে পারে না কারণ তা পাকিস্তানের সকল অংশেই সমানভাবে বিদেশী। একটি লিংগুয়া ফ্রাংকা সব সময়েই এক স্বাভাবিক ঐতিহাসিক বিকাশের ফল ; তা কখনোই কোন সরকারের দ্বারা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট নয়।

তাই ইসলামী ভাষা হিসেবে, যা হলো উদ্ভট, অথবা লিংগুয়া ফ্রাংকা হিসেবে, যা হলো অলীক, সেই উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী করতে পারে না।

এসব সত্ত্বেও উর্দুকে যদি একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে গুরুতর সব সমস্যার উদ্ভব ঘটাবে।

(১) সেই ভাবে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করবে যেভাবে করেছিলো ইংরেজী কারণ বিপুল অধিকাংশ যারা উর্দু বলে না তাদের পক্ষে রাতারাতি এটা আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হবে না। এর ফলে অল্পসংখ্যকের দ্বারা অধিকসংখ্যককে শোষণ করার পথ প্রশস্ত হবে।

(২) এটা সাধারণভাবে পাকিস্তানীদের মধ্যে এবং বিশেষভাবে বাঙালীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এবং আঘাত করবে জাতীয় অখণ্ডতার মূলে যা ছাড়া আমাদের দেশের কোন ভবিষ্যৎ নাই। তৃতীয়ত এবং শেষত বস্তুগত এবং আধিমানসিক উন্নতি যা জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তা বিপদগ্রস্ত হবে। যে কোন জনগণকে নিজের ভাষাতেই শিক্ষা করতে ও চিন্তা করতে হবে। কোন ব্যাক্তিকে তার ভাষা থেকে বঞ্চিত করার অর্থ তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করা। এবং কোন জনগণের ভাষা হরণ করার অর্থ তার স্বাধীনতাকে কল্পকাহিনীতে রূপান্তরিত করা।

সর্বশেষে আমরা পুনরুক্তি করবো তারই যা আমরা বার বার স্পষ্টভাবে বলেছি। যদি পাকিস্তানের একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে হয় তাহলে সেটা হবে বাংলা, যদি তা একাধিক হতে হয় তাহলে বাংলাকে হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম। এই সরল যুক্তি আমাদের নেতাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে কিভাবে ব্যর্থ হয় সেটা উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। এর মধ্যে কোথাও কোন গণ্ডগোল নিশ্চয়ই আছে। অন্যথায় সোনালী আঁশের এই প্রদেশের প্রতি কেন্দ্রের এই অন্যায় ও বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখা দেওয়া মুশকিল।

পূর্ব বাঙলার বুভুক্ষু প্রাথমিক শিক্ষকদের কাতর চিৎকারের প্রতি কর্ণপাত না করে করাচীর স্বাপ্নিকরা প্রদেশে আরবী কেন্দ্রের জন্য হাজার হাজার টাকা অপচয় করছেন। তাঁরা উর্দুকে সকল সম্ভাব্য সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন এই আশা করে যে, একদিন তা ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত হবে। এ জন্য তাঁরা বাংলার উপর আরবী অক্ষর চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষতিকর খেলাতেও নিযুক্ত রয়েছেন। আমরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা, যারা ভাষার ব্যাপারে প্রাদেশিক নীতির আশু প্রয়োগ দাবী করছি এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করছি তারা বেশ শক্ত লড়াই করেছি এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। আমরা সেই চক্রান্ত উদ্ঘাটন করার শপথ নিয়েছি যার লক্ষ্য হলো পূর্ব বাঙলাকে একটি

www.pathagar.com

উপনিবেশে পরিণত করা।

আমরা তাঁদেরকে এবং জনগণের যে সকল প্রতিনিধি সব কিছু পরিচালনা করছেন তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রদেশে এবং কেন্দ্রে বাংলার দাবী যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শান্ত হবে না।[১৫]

১১ই এপ্রিল, ১৯৫১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক আবদুল মতিনের স্বাক্ষরে[১৬] উপরোক্ত স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও দেশের দুই অংশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাছে পাঠানো হয়।[১৭]

পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাগুলির মধ্যে লাহোরের ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান টাইমস'-এ সংবাদ হিসেবে স্মারকলিপিটির উল্লেখ করা হয়।[১৮] এ ছাড়া পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'খাইবার মেল' ২০শে এপ্রিল, ১৯৫১ তারিখে স্মারকলিপিটির উপর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। নিম্নলিখিত এই সম্পাদকীয়টি ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এ ৫ই মে ১৯৫১ তারিখে এবং সিলেটের সাপ্তাহিক 'নওবেলালে' ১০ই মে, ১৯৫১ তারিখে পুনর্মুদ্রিত হয় :

কিছুদিন যাবৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সমস্যা সমাধানের পথে কিছুটা বাধা আছে সত্য। কিন্তু ভাষার মূলগত উৎকৃষ্টতার দিক দিয়া এইসব বাধার কোন হেতুই নেই। অতএব যাঁহারা সব ছুতান তাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের দাবী খাড়া করেন তাঁহাদের আরও গভীরভাবে এবং দ্রুততর চিন্তা করা প্রয়োজন।

করাচীর জনৈক সহযোগীর (ডন নহে) অদ্ভুত যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও একথা অতি সত্য যে, অবিভক্ত ভারতের মুসলমানগণ অন্যান্য দাবীর মধ্যে উর্দুকে জাতীয় ভাষা করার দাবীও করিয়াছিলেন। উর্দু ভাষা সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং সেটাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহা তখন যেমন প্রমাণ করিয়াছিল ঠিক তেমনি প্রমাণ করিতেছে যে, উর্দু সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ভাব বিনিময়ের এক সাধারণ বাহনস্বরূপ। পশতু, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী ভাষাগুলি একই আরবী অক্ষরে লিখিত হয় এবং যাহারা এই ভাষাগুলিতে কথা বলেন তাহারা অতি সহজেই উর্দু ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন। অতএব পশ্চিম পাকিস্তানে এক নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ইংরাজীর পরিবর্তে উর্দু গ্রহণ করার কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু বাংলা ভাষার দাবী কিছুতেই অবহেলা করা চলে না। পাকিস্তানের জনসংখ্যার অধিকাংশই পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী এবং বাংলা ভাষার এক নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্য রহিয়াছে। উর্দুকে কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া চলে না। সুইজারল্যান্ডে ইটালিয়ান, জার্মান ও ফরাসী তিনটি ভাষাই বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা সরকারী ভাষারূপে পরিগণ্য। লীগ অব নেশনস সরকারীভাবে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মুখপত্র ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। অতএব আমরা মনে করি যে বাংলা এবং উর্দু উভয়

www.pathagar.com

ভাষাকেই পাকিস্তানের সরকারী ভাষা রূপে স্বীকার করা উচিত।

দুইটি সরকারী ভাষা প্রথম দিকে কার্যত কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে এবং ব্যয়ভার বর্ধিত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু দুইটি ভাষার অবাধ সংমিশ্রণের ফলে জাতির ভিতর এক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে বাধ্য।

১১ই এপ্রিল স্মারকলিপিটি পাঠানোর পর ১২ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি বৈঠক ফজলুল হক হলের ৬০ নম্বর রুমে বদিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান সংবিধান সভার পূর্ববঙ্গীয় কিছু সংখ্যক সদস্যের কাছে টেলিগ্রাম যোগে অনুরোধ জানানো হবে যাতে তাঁরা রাষ্ট্রভাষা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দ্বারা প্রেরিত স্মারকলিপি সম্পর্কে পার্লামেন্টে শর্ট নোটিশ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এরপর ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে কর্মপরিষদের আর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হলে ৭৬ নম্বর রুমে। বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, বদিউর রহমান, সালেহউদ্দীন, রুহুল আমীন চৌধুরী প্রভৃতি।[১৯]

১৭ই এপ্রিলের এই বৈঠকের পর ঐদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে নূরুল আমীন, ফজলুল হক, নূর আহাম্মদ, মিএগ ইফতেখারউদ্দীন, শওকত হায়াত খান, ইব্রাহিম খান, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রভৃতির কাছে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আপনাদের কাছে জরুরী আবেদন জানাচ্ছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে শর্ট নোটিশ প্রশ্ন উত্থাপনা করতে। দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ কর্তৃক প্রেরিত স্মারকলিপি।[২০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক এইসব তৎপরতা সত্ত্বেও পাকিস্তান সংবিধান সভায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করেন নি। এ বিষয়ে লিয়াকত আলীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘকাল এক চক্রান্তমূলক নীরবতা বজায় রাখেন। এই নীরবতা শেষ পর্যন্ত ভঙ্গ হয় লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর ঢাকায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের পল্টন ময়দান বক্তৃতার মাধ্যমে।

কিন্তু সরাসরি সরকারীভাবে কেবলমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা না বললেও সেই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ভাষা বিতর্ককে উর্দুর স্বপক্ষে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার ও মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে অব্যাহত থাকে। এই প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫১ তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত সারা পাকিস্তান উর্দু সম্মেলন।[২১] এই সম্মেলনে মওলানা মহম্মদ আকরাম খান সভাপতির ভাষণে বলেন :

www.pathagar.com

যে একদল লোক পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষার বিরোধিতা করে তারা সেই মহল থেকে প্রেরণা ও সমর্থন লাভ করে যারা যা কিছু ইসলামী তারই বিরোধী ও তার প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন এবং যেহেতু তারা মনে করে যে উর্দু পাক ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে সে জন্য তারা উর্দুর প্রতিও পোষণ করে বিরূপ মনোভাব।

ঐ একই ভাষণে আকরাম খান আরও বলেন,

পাকিস্তানের আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ভাষা বাংলা, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশতু বেঁচে থাকবে, উন্নত হবে ও সমৃদ্ধি লাভ করবে (এবং আমি নিশ্চিত যে এই সম্মেলনে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি তাদেরকে বন্ধ করার পক্ষপাতী)। কিন্তু উর্দুর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং এর স্থান ও মর্যাদাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। উর্দুর একটা পালন করার মতো ভূমিকা আছে, যে ভূমিকা হলো পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আধিমানসিক ও ভাষাগত সাদৃশ্যের এবং আত্মীয়তার বিকাশ ঘটিয়ে একটি ঐক্যের শক্তি ও বন্ধনের উৎস হিসেবে কাজ করা।

পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্ব বাঙলা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী ফজলীও সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে উর্দু বিরোধিতা দূর করার আহ্বান জানান।

উপরোক্ত সম্মেলনে মাওলানা আকরাম খানের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৮ই এপ্রিল ১৯৫১ তারিখে ঢাকার ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার 'জাতীয় ভাষা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলেন,

রিপোর্ট অনুযায়ী মওলানা আকরাম খান উর্দু সম্মেলনে বলেছেন যে, পূর্ব বাঙলায় যারা উর্দুর বিরোধিতা করে তারা ইসলামের শত্রু। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি এই "শত্রুদের" মধ্যে ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লার মতো যাঁরা উর্দুর পরিবর্তে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী তাঁদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

পূর্ব বাঙলার অপর একজন সংবিধান সভার সদস্যা বেগম ইকরামুল্লাহ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে অফিসে উর্দু প্রবর্তন করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে একথা বলেন নি। কারণ যদিও তিনি সেই অল্প সংখ্যক বাঙালী পরিবারের সদস্য যাঁরা উর্দুভাষী তথাপি তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁর প্রস্তাব যদি বাস্তবত গ্রহণ করা যায় তাহলে পূর্ব বাঙলার ৯০% সরকারী কর্মচারী যাঁরা উর্দু জানেন না তাঁরা তৎক্ষণাৎ চাকরিচ্যুত হবেন।

সম্পাদকীয়টিতে আরও বলা হয় যে,

যে ধরনের সম্মেলনে মওলানা আকরাম খান সভাপতিত্ব করেছেন সেগুলি সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য বিখ্যাত নয়। আমাদের একথা মনে করারও কোন দরকার নেই যে, উর্দু প্রেমিকদের একটি সম্মেলনে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মওলানা আকরাম খান যা বলেছেন এ প্রদেশে ফিরে এসে তিনি তার পুনরুক্তি করবেন।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার দাবী সমর্থন করার জন্য একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী সরকারী কর্মচারীকে ঢাকা থেকে বদলীর একটি ঘটনাও সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করা হয়।

করাচীর উর্দু সম্মেলনে আকরাম খান ও শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ কর্তৃক নানা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য পেশ করার পর ঢাকা এবং পূর্ব বাঙলার অন্যত্র ছাত্র বুদ্ধিজীবীরা তার প্রতিবাদ করেন এবং প্রায় তিন সপ্তাহ পর্যন্ত সেই প্রতিবাদ আন্দোলন চলার পর ৭ই ও ৮ই মে, ১৯৫১, তারিখে পাকিস্তান অবজার্ভার "রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক অপর একটি সম্পাদকীয় দুই দফায় প্রকাশ করেন। ৭ই মে তারিখে তাতে বলা হয়,

> রাষ্ট্রভাষার উপর এই দুঃখজনক বিতর্ক ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি করেছে এবং একে রোধ করা না হলে এর পরিণতিতে অনেক কুৎসিত ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। আমরা আশা করি করাচীতে রাজনৈতিক দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দেউলিয়াপনা বিরাজ করছে না। যদি বাংলা এবং উর্দু উভয়কেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় তাহলে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝি সহজতর, অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও সুখকর হবে।

করাচীর উর্দু সম্মেলনে মওলানা আকরাম খানের বক্তব্য যে বিতর্ক সৃষ্টি করে তারপর পূর্ব বাঙলায় রাষ্ট্রভাষার দাবীতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা বিবৃতি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। এই অবস্থায় সাংগঠনিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[২২] এই প্রস্তাবের একটিতে তাঁরা বলেন,

> আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম। এবং সেই দাবীর উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের রাষ্ট্র গঠন করবো এই প্রতিশ্রুতিই আমরা জনসাধারণকে দিয়েছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের উপর লোক বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। উর্দুর সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষার প্রচলন নাও থাকতো তবু আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন করতাম। কারণ পাকিস্তানের উন্নতি, পূর্ণ বিকাশ ও একতার জন্য বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইতিপূর্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রায় সব সময়েই অপরাপর কয়েকটি দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষার কথা উল্লেখ করা হতো। খুব সম্ভবত এই প্রথম একথা জোর দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ছাত্রনেতারা ঘোষণা করলেন যে, "পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষার প্রচলন নাও থাকতো তবুও আমরা বাংলাকে অন্যতম

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন করতাম।" পূর্ব বাঙলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে জনগণের সংগ্রামী জীবন থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ক্রমশ এবং দ্রুতগতিতে দৃঢ়ভিত্তিক একটি আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উপরোক্ত ঘোষণা তারই একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

৮ই সেপ্টেম্বরের সভায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কর্মপরিষদ অপর একটি প্রস্তাবে বলেন,

> পাকিস্তানের উন্নতি সমৃদ্ধি ও একতার উপর লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করেছিলাম। কিন্তু তখন আমাদের কেউ কেউ ভুল বুঝেছিল ও সরকার এই দাবী বানচাল করবার চেষ্টা করেছিলো। ন্যায্য ও জনগণের দাবীকে জোর করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই এই আন্দোলন আজ ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে ও দিন দিন সবল হচ্ছে। এই আন্দোলনকে সমর্থন করে, পাকিস্তানকে সবল করা আজ যুব সমাজের কর্তব্য। এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করা জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন। কারণ ৪॥. কোটি লোকের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ার অর্থ সেই ভাষাকে ধ্বংস করে দেওয়া। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার অর্থ জাতিকে দুর্বল করা। আমরা আজ দুর্বল হতে চাই না, চাই সবল হতে। তাই বন্ধুগণ পাকিস্তানকে সবল করতে হলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনারা নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন ও আপনাদের স্থানীয় এলাকায় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করুন। তারপর আমরা প্রত্যেক এলাকার প্রতিনিধি নিয়ে এক সম্মেলন করবো ও সমবেতভাবে আমাদের দাবি জানাবো। তখন আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আপনারা এই মহৎ কর্তব্যে এগিয়ে আসুন। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিন বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে পাকিস্তানের কত অনিষ্ট করা হবে। আমরা পাকিস্তানের অনিষ্ট চাই না তাই যারা অনিষ্ট করতে চায় তারা যাতে মিথ্যা প্ররোচনা ও ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে তা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং তা করা তখনই সম্ভব যখন আমরা সংগঠিত হবো। আজ সংগঠনের আশু প্রয়োজন। স্থানীয় এলাকা সংগঠন করুন ও স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করে কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন। আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করুন।

উপযুক্ত সাংগঠনিক ভিত্তি ব্যতীত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে যে শক্তিশালী এবং জয়যুক্ত করা সম্ভব নয় এই উপলব্ধি থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

২. মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘট

সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স প্রবর্তন এবং পূর্ব বাঙলায় মেডিকেল স্কুলগুলিকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কলেজে উন্নীত করার দাবিতে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী মেডিকেল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল ছাত্র এসোসিয়েশনের আহ্বানে ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫১, তারিখ থেকে ধর্মঘট শুরু করেন।[১]

www.pathagar.com

এই ধর্মঘট উপলক্ষ্যে জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি★ স্বাক্ষরিত একটি ইশতাহার[২] প্রকাশিত হয়। এই ইশতাহারটিতে মেডিকেল ছাত্রদের নিম্নলিখিত দাবী দুটি প্রথমে উল্লেখ করা হয় :

> ১। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি মেডিকেল স্কুলকে ক্রমান্বয়ে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে মেডিকেল কলেজে পরিণত করে ডাক্তারী শিক্ষাকে একই পর্যায়ভুক্ত করা যাহা ভারত ডমিনিয়ন ও পশ্চিম পাকিস্তান বহু পূর্বেই করেছে।
>
> ২। যারা এ পর্যন্ত এল. এম.এফ. পাশ করেছে এবং আগামী পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এল.এম.এফ. পাশ করবে তাদেরকে আগামী সেশন হতে অন্তর্বর্তীকালের জন্য সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স খুলে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া।

উপরোক্ত দাবী দুটি উল্লেখ করার পর ইশতাহারটিতে বলা হয়,

> তাদের দাবী আজ নতুন নয়, ১৯৪০ সালে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল এ দাবী কার্যকরী করার সোপারিশ করেছেন। এ সোপারিশ অনুযায়ী ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান মেডিক্যাল স্কুলগুলোকে কলেজে পরিণত করেছে এবং অন্তবর্তীকালের জন্য সংক্ষিপ্ত এম. বি.বি.এস. কোর্স প্রবর্তন করেছে।
>
> দেশ বিভাগের পূর্বে যুক্ত বাংলার লীগ সরকারও সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স প্রবর্তন করেছিলেন এবং স্কুলগুলোকে কলেজে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে নতুন ভর্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
>
> কিন্তু পাকিস্তান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তথাকথিত জাতীয় নেতা গোষ্ঠী গদী দখল করে নিজেদেরকে পাকিস্তানের এক একজন সম্রাট মনে করতে থাকলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের আমলে যে কোটি কোটি মানুষ নির্যাতিত নিষ্পেষিত শোষিত ও বঞ্চিত ছিল তাদের উপরই নতুন করে দমন ও শোষণ নীতির স্টীমরোলার চালিয়ে তাদেরকে একদম ধ্বংস করার নীতিই গ্রহণ করেন।
>
> তাদের এ জুলুম আমরা দেখছি মানুষের বাঁচার যে প্রাথমিক উপকরণ অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসা তা নিয়ে তারা কি করে ছিনিমিনি খেলছেন–নানা উপায়ে কোটি কোটি মানুষের কি অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছেন। মানুষের যে জন্মগত অধিকার– তার ভাষা ও বর্ণ, তাকে কি করে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে শিক্ষা-সংকোচন নীতির ভিতর দিয়ে কি করে বানচাল করছেন।
>
> তাদের এ শিক্ষা সংকোচ নীতিরই একটি মাত্র অভিব্যক্তি– অতীতের সমস্ত সোপারিশ ও পরিকল্পনাকে বানচাল করে মেডিক্যাল স্কুলগুলোকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত না করা এবং অন্তর্বর্তীকালের জন্য এম.বি.বি.এস. কোর্স প্রবর্তন না করা ও এভাবে আমাদের দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত

★ইশতাহারটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন এম.এ. ওয়াদুদ, এম.এ. সামাদ, খালেক নেওয়াজ খান ও রোকেয়া খাতুন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু, সিদ্দিকী–ব.উ.

www.pathagar.com

> উন্নত দেশের তুলনায় নীচু করে রেখে দেশকে শিক্ষাক্ষেত্রে পঙ্গু করে রাখবার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। মেডিক্যাল ছাত্রদের এ দাবী কত যুক্তিসঙ্গত সে সম্বন্ধে দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান অবজার্ভার এবং আরো কয়েকটি খবরের কাগজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও কয়েকবার মন্তব্য করেছেন।

সর্বশেষে সাধারণভাবে সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে ইশতাহারটিতে ছাত্র নেতারা বলেন,

> আসুন, আমরা এককভাবে ও সামগ্রীকভাবে মেডিক্যাল ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার দাবীকে সমর্থন করে উপযুক্ত ও অধিকসংখ্যক ডাক্তার সৃষ্টি করে দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে আমাদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করি এবং সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলি।

ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর ধর্মঘট পরিচালনায় নিযুক্ত ৫ জন ছাত্র নেতাকে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী সরকারী নির্দেশের মাধ্যমে বহিষ্কার করা হয়।[৩] এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মেডিকেল ছাত্রছাত্রীরা ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে শহর প্রদক্ষিণ করেন এবং বেলা প্রায় আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হন।[৪]

১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতীক ধর্মঘট এবং ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে বিরাট জনসভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং তা একটি ইশতাহারের আকারেও প্রকাশিত হয়।[৫] এই ইশতাহারটিতে তাঁরা ধর্মঘট পরিস্থিতি সম্পর্কিত কিছু ঘটনাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন,

> আমরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি স্কুলের ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা-লাভের অধিকারের জন্য ২৫শে জানুয়ারী হতে অবিরাম ধর্মঘট চালাচ্ছি। আমাদের দাবী–আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে মেডিক্যাল স্কুলগুলোকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করে ডাক্তারী শিক্ষাকে একই পর্যায়ভুক্ত করা এবং অন্তর্বর্তীকালের জন্য কন্ডেন্সড, এম.বি.বি.এস. প্রবর্তন করে এল.এম.এফ. ডাক্তারগণকে এম.বি. পড়ার অধিকার দেওয়া। এ ব্যবস্থা ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান বহু পূর্বেই করেছে। কিন্তু পূর্ব পাক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকার আমাদের উচ্চ শিক্ষালাভের অধিকারের এ পবিত্র দাবী মেনে নেওয়া তো দূরের কথা বরং আমাদের উপর নানা প্রকার জুলুম আরম্ভ করেছে।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, পূর্ব বাঙলায় মেডিকেল স্কুলগুলিকে কলেজে পরিণত না করা এবং সংক্ষিপ্ত কোর্স প্রবর্তন না করার জন্য ইশতাহারটিতে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান সরকারকেই দায়ী করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান সরকার যে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের আজ্ঞাবহ মাত্র এবং কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের দ্বারাই মূলত পরিচালিত এ চেতনা তখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অপেক্ষাকৃত সচেতন ছাত্র সমাজেরও ছিলো না।

www.pathagar.com

যাই হোক, ধর্মঘটের দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উপর ন্যস্ত করার পর ইশতাহারটিতে পুলিশী নির্যাতনের উপর বলা হয়,

> কর্তৃপক্ষ আমাদের মিটফোর্ডের ৫ জন বিশিষ্ট ছাত্রকে স্কুল হতে বহিষ্কার করে দিয়েছে এবং পুলিশ রাতে আমাদের মেস আক্রমণ করে ৩ জনকে গ্রেফতার করে ঢাকা হতে বের করে দিয়েছে। এদের রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট এ চারটি জেলায় যাওয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। আরো অনেককে নানা প্রকার জুলুমের হুমকী দিচ্ছে। কিন্তু আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি যে,–যত জুলুমই আসুক না কেন আর সে যত কঠোরই হউক না কেন আমাদের একটিমাত্র ছাত্র বা ছাত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত মেডিকেল স্কুলে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা লাভের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে আপ্রাণ সংগ্রাম করবেই করবে।

এই বক্তব্যের পর ইশতাহারটিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী আরমানিটোলা ময়দানের জনসভায় যোগদান করে মেডিকেল ছাত্রদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তোলার আহ্বান জানানো হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল ছাত্রদের ধর্মঘটের সমর্থনে এবং ধর্মঘটীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ দিন সরকার এক নির্দেশের মাধ্যমে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন।[৬]

মেডিকেল ছাত্রদের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের নির্দেশে যে শোভাযাত্রা এবং আরমানিটোলা ময়দানে যে সভা হওয়ার কথা ছিল সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারী করায় সেটা বন্ধ রাখা হয়।[৭]

কিন্তু শুধু ঢাকাতেই নয়। পূর্ব বাঙলার অন্যত্রও মেডিকেল স্কুল ছাত্রদের ধর্মঘটের সপক্ষে একের পর এক ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি সিলেটের গোবিন্দ পার্কে ঢাকায় মেডিকেল ছাত্রদের প্রতি সরকারী নীতির প্রতিবাদে একটি বিরাট ছাত্র ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৮] ২৬শে ফেব্রুয়ারী সিলেটের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীরা মেডিকেল ছাত্রদের দাবীর সপক্ষে ধর্মঘট করেন এবং প্রায় চার হাজার ছাত্র ছাত্রী 'মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানতে হবে,' 'ছাত্রসমাজ এক হও' ইত্যাদি শ্লোগানসহ শহর প্রদক্ষিণ করে। এরপর ছাত্র ছাত্রীরা গোবিন্দ পার্কে একটি ছাত্র সভা করেন এবং সিলেট মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কার আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করে উক্ত আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান।[৯]

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১, তারিখে মেডিকেল ছাত্রদের ফাইনাল পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ধর্মঘটের ফলে এবং ছাত্রদের উপর সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা বর্জন করেন।[১০]

www.pathagar.com

২রা মার্চ, ১৯৫১, তারিখে ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে ধর্মঘটী মেডিকেল ছাত্রদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ছাত্র ও জনগণের একটি প্রতিনিধি সভা আহ্বান করে। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত একটি ইশতাহারে[১১] বলা হয় :

> গত ২৫শে জানুয়ারী হতে আজ ১ মাসেরও অধিক কাল পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি মেডিকেল স্কুলের প্রায় ২০০০ ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভের অধিকারের জন্য অবিরাম ধর্মঘট চালিয়ে আসছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের এ দাবী মেনে নেওয়া তো দূরের কথা বরং তাদের উপর দিনের পর দিন নানা প্রকার জুলুম চালাচ্ছে।
>
> ৫ জন ছাত্রকে স্কুল হতে বের করে, পুলিশ দিয়ে তাদেরকে ঢাকা হতে তাড়িয়ে দিয়ে এমন কি প্রদেশের আরো কয়েকটি স্থানে তাদের যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেও কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হয় নি। ছাত্রদেরকে স্কুল প্রাঙ্গণের হোস্টেল হতেও বের হয়ে যাওয়ার পরওয়ানা জারী করেছে।
>
> এ জালেম সরকারের জুলুমে এদেশের গরীব জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজ আজ অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। দুনিয়ার প্রতিটি দেশ যখন শিক্ষা সংস্কৃতির পথে দিন দিন এগিয়ে চলেছে তখন আমাদের শাসকগোষ্ঠী 'ফেরাউনের' দল আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করে, দেশে দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসার অভাবে গরীব জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজকে তিলে তিলে অকালে মৃত্যুর কবলে ঠেলে দিচ্ছে।
>
> এ জালেমদের জুলুম আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা একমাত্র মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক অধিকার উচ্চ শিক্ষার দাবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার যে নীতি তাতেই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এরা যে কত নির্লজ্জ এবং এরা যে বালির বাঁধের উপর গদী নিয়ে বসে আছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ—১৪৪ ধারা জারী করে বাজেট মিটিং করা। শিক্ষা ও জনকল্যাণকর কাজ বাদ দিয়ে জমিদার, মহাজন, চোরাকারবারীদের মনঃপুত বাজেটে তা পাশ করাবার উদ্দেশ্যে এম.এল.এ-গণকে সরকারের গৌরবময় (?) কীর্তি (সরকারে ১২ জন বড় কর্মচারীর জন্য ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাড়ী ইত্যাদি) দেখবার জন্য গাড়ী করে ঘুরিয়ে আনা, গভর্নমেন্ট হাউসে পার্টি দেওয়া, স্বাধীন পাকিস্তানে এর চেয়ে কলঙ্কের ব্যাপার আর কি হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল ছাত্র এসোসিয়েশনের আহ্বানে ১৮ই মার্চ সারা পূর্ব বাঙলায় মেডিকেল ছাত্রসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করেন।[১২]

মেডিকেল ছাত্রদের দাবীর প্রতি কোনরূপ কর্ণপাত না করে ছাত্রদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকাতে যে সব মতামত ব্যক্ত হয় তার মধ্যে 'মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘট ও জনসাধারণ' নামে একটি চিঠিতে বলা হয় যে,

> একদিন ছিল যখন যে কোন আন্দোলনের পিছন থেকে জনসাধারণের সহানুভূতি এরা ছিনিয়ে নিতে পারতেন কম্যুনিষ্ট বা দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের কচি বয়সের দোহাই দিয়ে। কিন্তু আজ বায়ু তাদের অনুকূলে নয়

www.pathagar.com

তা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। মানুষ আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে নবজাত শিশুকে ভাঙ্গ খাইয়ে কারা শিশুটিকে ভবিষ্যতের জন্য দুর্বল অথর্ব্ব বোকা এবং অকেজো করে তুলছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজ আজ বুঝেছে যে, ধনিক লাইটপোস্টগুলিকে★ তারা একদিন ব্যক্তিগতভাবে না হলেও মুসলিম লীগের প্রয়োজনে ভালবেসে নিজেদের প্রতিনিধি মনোনীত করেছিল তারাই আজ তাদের বুকে মুসলিম লীগ আর পাকিস্তানের দোহাই দিয়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে রয়েছে।[১৩]

২৪শে মার্চ সরকার পূর্ব বাঙলার সব কয়টি মেডিকেল স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়ে বলপূর্বক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়ার পর এই সব নির্যাতনের বিবরণ প্রদান করে তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে ২৬শে মার্চ পূর্ব পাক মেডিকেল এসোসিয়েশন-এর কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ একটি ইশতাহার প্রকাশ করে।[১৪] এই ইশতাহারটিতে বলা হয় :

> আমাদের উচ্চ শিক্ষার দাবীতে গত দুই মাস যাবত ধর্মঘটের পেছনে যে সক্রিয় জনমত গড়ে উঠেছিল তাকে ধ্বংস করবার জন্য আমাদের তথাকথিত জাতীয় সরকার আজ তাদের হিটলারী রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গত ২৪শে তারিখ প্রদেশের সবগুলি মেডিকেল স্কুল, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। রাত্রে পুলিশের দ্বারা বর্বর অত্যাচার চালিয়ে আমাদের হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছে। মেয়েদের হোস্টেল থেকে তাদের মান ইজ্জতের উপর পশুসুলভ আক্রমণ দ্বারা বের করে বৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ্যে রাজপথে সারা রাত কাটাতে বাধ্য করেছে। স্বাধীন পাকিস্তানে এই কি নারীর মূল্য? এই কি পাকিস্তানে ইসলামের রূপ? বর্বর ফেরাউনের হাতে আজ ইসলাম এমনি বিপন্ন।
>
> রাত্রি ১১. দেড়টার সময় নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ আরম্ভ করে। আমাদের ৩ জন নির্দোষ ছাত্রবন্ধু আজ জেলের মধ্যে এবং ১০ জন গুরুতরভাবে আহত। দিনে দুপুরে বন্দী ছাত্রদের হাত কড়া লাগিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে এদিক ওদিক ঘুরিয়েছে। সরকারের এই বর্বর অত্যাচারের কথা যাতে জনসাধারণের নিকট পৌঁছাতে না পারে তার জন্য সংবাদপত্রের উপর "প্রি-সেন্সরশীপ" আদেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> আজ আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে সরকারের এই চ্যালেঞ্জকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হবে। যে কোন ত্যাগ স্বীকার করেও আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতেই হবে। তাই দেশের প্রতিটি ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের আকুল আবেদন– আসুন আজ ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলি : মেডিকেল ছাত্রদের দাবী–মানতে হবে, মা বোনদের মান ইজ্জত– রক্ষা করবোই, মেডিকেল স্কুল ও ছাত্রাবাস বন্ধ করা– চলবে না, সংবাদপত্রের উপর প্রি-সেন্সরশীপ আদেশ– প্রত্যাহার কর, ১৪৪ ধারা মানবো না।

এই সব ঘটনার পর ২৯শে মার্চ, ১৯৫১, তারিখে ধর্মঘটের প্রায় পাঁচ

★১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচার না করে পাকিস্তানের দাবী জোরদার করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে লাইটপোস্টকেও ভোট দেওয়ার জন্য মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান।–ব.উ.

www.pathagar.com

সপ্তাহ অতিবাহিত হবার পর নওবেলাল পত্রিকায় "মেডিকেল স্কুলের দ্বার বন্ধ" নামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তাতে পত্রিকাটি বলেন,

> পূর্ববঙ্গ সরকার মেডিকেল ছাত্রদের প্রতি শেষ নির্দেশ প্রদান করিয়া সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মেডিকেল স্কুলগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হোস্টেল হইতে ছাত্রদিগকে বলপূর্বক বাহির করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাত্র এবং সরকার উভয়েরই পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার। মেডিকেল ছাত্রগণ কতকগুলি দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করিয়াছিলেন, সেই দাবীগুলি ন্যায্য কি অন্যায্য তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির দ্বারা বিচার করিয়া সরকার এই চরম পন্থা অবলম্বন করিলে শোভনীয় হইত বলিয়া আমরা মনে করি। ছাত্রদের দাবী যদি ন্যায্য না হইত তবে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মেডিকেল ছাত্রগণ সমবেতভাবে এই ধর্মঘট করে কেন? কোন কোন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদকেও মেডিকেল ছাত্রদের দাবী সমর্থন করতে দেখা গিয়াছে। সরকার এই চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া শুধু মেডিকেল ছাত্রদের প্রতি জেদ মিটাইলেন না। সমগ্র পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। আমরা পূর্ববঙ্গ সরকারের চিকিৎসা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যদি ছাত্রদের দাবী-দাওয়াগুলি অসঙ্গত ও অসমীচীন হয় তাহা পরিষ্কারভাবে জনসাধারণের নিকট ধরিয়া দিন। আর যদি ছাত্রদের দাবী ন্যায়সঙ্গত হয় তবে দেশ ও দশের ক্ষতি সাধন না করিয়া অবিলম্বে তাহাদের দাবী মানিয়া লইয়া স্কুলগুলি পুনরায় খুলিবার ব্যবস্থা করুন। দেশের সুধীজনের নিকট আমাদের নিবেদন তাঁহারা জাতীয় সঙ্কটের কথা চিন্তা করিয়া সরকার ও ছাত্রদের ঝগড়া মিটাইবার জন্য আগাইয়া আসুন।

একশো দিনের বেশী ধর্মঘট চলার পর এবং ধর্মঘটের জন্য সরকার কর্তৃক পূর্ব বাঙলার মেডিকেল স্কুলগুলি বন্ধ রাখার পর কর্তৃপক্ষ ৭ই মে, ১৯৫১, তারিখে মেডিকেল স্কুলগুলি পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পূর্ব বাঙলা সরকারের সার্জেন জেনারেল এক বিবৃতিতে ৭ই মে থেকে মেডিকেল স্কুলগুলি খোলার কথা ঘোষণা করে ছাত্রদেরকে অবিলম্বে ক্লাসে যোগদানের অনুরোধ জানান। ধর্মঘটের ফলে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি দূর করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে এই মর্মে তিনি ছাত্রদেরকে আশ্বাসও প্রদান করেন। ছাত্রদের মূল দুটি দাবী স্বীকার করে নিয়ে তিনি বিবৃতিতে আরও বলেন যে, অবিলম্বে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স প্রবর্তন করার জন্য সরকার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এছাড়া পূর্ব বাঙলায় মেডিকেল কলেজ এবং স্কুলের সংখ্যা যথাশীঘ্র বৃদ্ধি করার সরকারী সিদ্ধান্তের কথাও তিনি বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।[১৫]

সরকারী সূত্র থেকে আরও বলা হয় যে, ১৯৫১ সালের জুলাই মাসেই একটি নোতুন মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন করা হবে। এই কলেজ চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের পর হবে পূর্ব বাঙলায় দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজ। এছাড়া চলতি বৎসরেই বগুড়া এবং বরিশালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও এই সূত্র থেকে উল্লেখ করা হয়।[১৬]

www.pathagar.com

এরপর পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর এ. এম মালেক ৯ই মে' তে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব বাঙলা সরকার মেডিকেল ছাত্রদের ক্লাসে যোগদানের জন্য সর্বশেষ যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স প্রবর্তন এবং মেডিকেল স্কুলের মান উন্নয়নের দাবী স্বীকৃত হয়েছে। বিবৃতিতে ডক্টর মালেক ছাত্রদেরকে ক্লাসে যোগদানের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনের পর মেডিকেল ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদ ৯ই মে তারিখেই ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[১৭]

৩. ছাত্র সংগঠনের অবস্থা

১৯৫১ সালে পূর্ব বাঙলায় প্রাদেশিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছাত্র সংগঠন ছিলো মাত্র দু'টি। এর একটি হলো তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং অপরটি হলো মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কিত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ।

এই দুটি ছাত্র সংগঠনই ছিলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত। কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পর থেকেই মুষ্টিমেয় ছাত্রের সংগঠনে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ ও কমিউনিষ্ট পার্টির অনেক ভুল ভ্রান্তির ফলে ১৯৪৯ সালের পর তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

উপরোক্ত দুটি সাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের ভাঙন ১৯৫১ সালের আগে থেকেই শুরু হলেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের একটি আজ্ঞাবহ সংগঠন হিসেবে ১৯৫১ সালে তাদের সেই ভাঙন আরও ত্বরান্বিত হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন হলেও কোন বিকল্পের অভাবে অনেক প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক ছাত্র তাতে যোগদান ও অবস্থান করেন এবং বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ছাত্র সংগঠনটিও ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ* নামে যে সংগঠনটি গঠিত হয় তার সম্মেলনে যোগদান করা এবং তার কার্যকরী কমিটির সদস্য হওয়ার অভিযোগে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদকে তিন দিনের জন্য সংগঠন থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা হয়। এ প্রসঙ্গে ৮ই এপ্রিল, ১৯৫১, তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যকরী কমিটির এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ৮ই এপ্রিল থেকে তিন দিনের জন্য সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদকে নিখিল

---

*পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য-.ব.উ

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে সাসপেন্ড করা হবে এবং ঐ তিন দিনের মধ্যে তিনি যাতে যুব লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন তার সুযোগ প্রদান করা হবে। তিনি এই সুযোগের ব্যবহার করে যদি যুবলীগ থেকে পদত্যাগ না করেন তাহলে তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং এই বহিষ্কার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ১২ই এপ্রিল সকাল থেকেই কার্যকর হবে।[১]

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ কার্যকরী কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পর সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ সাধারণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা দান করে একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[২] বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> নোতুন রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একদল নেতা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে জনগণকে বেশ ভুলে গেলেন এবং পরিণত হলেন তাঁদের নির্যাতকে। এই আত্মস্বার্থ-চালিত গ্রুপটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হলেন এবং খুব পরিচিত কতকগুলি পদ্ধতির মাধ্যমে বেশ কিছুসংখ্যক তথাকথিত ছাত্র নেতাদেরকে হাত করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু আমরা যারা এমন এক পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম যেখানে জীবন আরও ভালো হবে, শিক্ষা আরও কম ব্যয়সাধ্য হবে এবং কাজ নিশ্চিত হবে তারা নিজেদের শক্তি দিয়ে সংগঠনের কাজ করে চলেছিলাম, ছাত্রদের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সংগঠনকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, আমরা এক্ষেত্রে একটা পরাজয়মুখী সংগ্রামই চালিয়ে যাচ্ছিলাম।
>
> আমাদের সংগঠনে এই মুষ্টিমেয় তথাকথিত ছাত্রনেতার গ্রুপটি চালবাজী চক্রান্ত এবং অন্য অনেক সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে সেই সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করে আসছিলো যেগুলির সাথে আমরা সংগঠনকে সম্পর্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শিক্ষা সম্মেলনে তারা গণ্ডগোল করার চেষ্টা করেছিলো এবং সাধারণ ছাত্রদের দৃঢ় প্রচেষ্টা না থাকলে তারা শাসকচক্রের স্বার্থে সম্মেলন পণ্ড করতে সক্ষম হতো। বিকল্প মূলনীতি প্রণয়নের জন্য আজও গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে তারা অংশগ্রহণ করে নি এবং সেই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনসহ অপরাপর যে সব আন্দোলন ঢাকাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সেগুলিতেও অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলো। সর্বশেষে পাকিস্তান যুব সম্মেলনে তাদের বিরোধিতা এতই সাম্প্রতিক যে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাদের এই সব বিরোধিতার কারণ খুব স্পষ্ট। সংগঠনের মধ্যে তারা যে কোন মতভেদকে গলাটিপে হত্যা করছে। খুব অল্পসংখ্যক কার্যকরী কমিটির সদস্য, যারা দীর্ঘকাল ধরে আর ছাত্র নেই, তারাই সংগঠন পরিচালনা করছে। কাউন্সিল সভা আহ্বানের সব প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে কারণ সেই সভার ফলাফল সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়।
>
> এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যে, আমার পক্ষে ছাত্রদের স্বার্থের জন্য এমন একটি সংগঠনে থেকে কাজ করা সম্ভব নয় যা নিশ্চিতভাবে গণবিরোধী শক্তিসমূহের সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত করেছে এবং ছাত্রসহ জনসাধারণের অপরাপর অংশের জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য যে সব ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে নিয়মিতভাবে সেগুলির বিরোধিতা করছে। তাই শুধু এই সংগঠনের সাধারণ

www.pathagar.com

সম্পাদকের পদ থেকে নয়, প্রাথমিক সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগ করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করছি।

আবদুস সামাদের উপরোক্ত বিবৃতির পর নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য সুলতান হোসেন খান, আওলাদ হোসেন, তাহমিদুদ্দীন, আবদুল হাকিম, সুলতান আহমদ চৌধুরী এবং আবদুল হায়াত একটি পাল্টা বিবৃতি প্রদান করেন।[৩] এই বিবৃতিতে তাঁরা আবদুস সামাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে কিছুদিন থেকেই তিনি সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে চলেছেন, সাধারণ সম্পাদকের পদের অপব্যবহার করেছেন এবং তথাকথিত কিছু প্রগতিশীলদের খপ্পরে পড়েছেন। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন যে, সংগঠনের কার্যকরী সংসদের নির্দেশ অমান্য করে তিনি কমিউনিষ্ট ও সুবিধাবাদীদের দ্বারা আহূত পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সম্মেলনে যোগদান করেছেন এবং সেই সংগঠনের সদস্য হয়েছেন। সংগঠন থেকে ইতিমধ্যে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে সংগঠন থেকে তাঁর পদত্যাগ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ সম্পর্কে আবদুস সামাদ যে সব অভিযোগ করেন সেগুলি খণ্ডন করতে গিয়ে কার্যকরী কমিটির উপরোক্ত সদস্যরা বিবৃতিতে বলেন যে, তাঁদের সংগঠনই ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং বৃদ্ধি ২০% কমিয়ে আনতে সক্ষম হন। তাছাড়া মূলনীতি কমিটির কুখ্যাত সুপারিশের বিরোধিতা করে তাঁরা একটি বিকল্প সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের কাছে পেশ করেন।

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ কার্যকরী কমিটির সদস্যদের এই সব দাবী সত্ত্বেও একথা সত্য যে, ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পর্কিত থেকে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এই ছাত্র সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ পদে পদে সকল ধরনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরোধিতা করে এসেছিলেন। এই বিরোধিতা বিবৃতি প্রদান থেকে শুরু করে গুণ্ডামীর মাধ্যমে সভা-সমিতি পণ্ড করা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। কিন্তু মুসলিম লীগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থেকে তাদের হুকুমদার হিসেবে কাজ করে যাওয়ার ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে সঙ্গে এই সংগঠনটিও দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় এবং অল্প কিছু কালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের মধ্যে উপরে বর্ণিত দ্বন্দ্ব চলার সময়েই ৬ই এপ্রিল, ১৯৫১, তারিখে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের এক বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন।[৪]

ময়মনসিংহের অলকা হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কাউন্সিলর ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব

www.pathagar.com

করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি শামসুল হক চৌধুরী।

কোরান তেলাওয়াত এবং অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নওয়াজ খান তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর অতীত আন্দোলনের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও সংগঠনের ভবিষ্যৎ কাজের লাইন সম্পর্কিত বক্তব্য সংবলিত "আমাদের এক বৎসরের পর্যালোচনা" নামে খালেক নওয়াজ খান কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকা পাঠ করে শোনান মোশাররফ হোসেন চৌধুরী। পুস্তিকাটির উপর কিছু আলোচনার পর সেটি কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয়। এছাড়া কাউন্সিল কতকগুলি প্রস্তাব করেন। এগুলির একটিতে পাকিস্তান সরকারকে বিশ্ব শান্তির স্বার্থে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ পরিত্যাগের দাবী জানানো হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে জনগণের মতামত দমন করার উদ্দেশ্যে ঢাকা ও প্রদেশের অপরাপর এলাকায় প্রবর্তিত ১৪৪ ধারা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। জনমত ও সংবাদপত্র দমনের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত নিরাপত্তা আইন গণতন্ত্রের খাতিরে প্রত্যাহার করার দাবীও একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে করা হয়। বিনা বিচারে রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে আটক রাখার নীতির বিরোধিতা করে সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী দাওয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে তাঁদের সংগ্রামে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাবও তাঁরা করেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা নীতির তীব্র নিন্দা করে, শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তনের দাবী জানিয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কেন্দ্রের বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করেও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় বাজেটে পূর্ব বাঙলাকে তার উপযুক্ত অংশ প্রদান না করার প্রতিবাদ করে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলার সদস্যদের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করা হয়। একটি প্রস্তাবে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ করে প্রদেশগুলিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের দাবী জানানো হয়।

আধুনিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আরবীর ছাত্রদের জন্য একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহীতে অবিলম্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীও এই সম্মেলনে করা হয়।

www.pathagar.com

মুসলিম ছাত্র লীগের এই সম্মেলনে উর্দু অথবা আরবীর সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানো হয় এবং সেই দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়।

কাশ্মীরে আশু গণভোট গ্রহণের উপর এবং মরক্কোয় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বর্বর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করে ও সেখানকার জনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে সেই সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে দুটি পৃথক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সম্মেলনের এই অধিবেশনের পর বিকেলে ময়মনসিংহের বিপিন পার্কে রফিকউদ্দীন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি থেকে দেখা যায় যে, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের ভূমিকা তৎকালে অনেকখানি প্রগতিশীল ছিলো এবং সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই সংগঠনটি কিছুটা সক্রিয় অংশগ্রহণ করছিলো। এ কারণে এই ছাত্র সংগঠনটি অল্পকালের মধ্যেই অনেকখানি বিকাশ লাভ করে এবং পূর্ব বাঙলার ছাত্র সমাজের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এই ছাত্র সংগঠনটির সাম্প্রদায়িক চরিত্র এর গণতান্ত্রিক চরিত্রকে অনেকখানি খর্ব করেছিলো। তাছাড়া কমিউনিষ্টদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা মাঝে মাঝে কিছু গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলো।★ এই সব বিবেচনা করে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সাথে সম্পর্কিত প্রগতিশীল যুবকেরা একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন।

খুব সম্ভবত তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে সিলেটে একটি ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিলো অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম লীগের সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের এবং সভাপতিত্ব করার কথা ছিল মুসলিম লীগের মুখপত্র ঢাকার দৈনিক 'সংবাদ'-এর প্রধান সম্পাদক খায়রুল কবীরের। কিন্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে সিলেটের ডেপুটি কমিশনার সিলেটে ১৪৪ ধারা জারী করে সম্মেলনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৫]

★১৯৫০ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এই উভয়েরই বিরোধিতা করে। ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নওয়াজ খান এবং শিক্ষা সম্মেলনের সাথে সম্পর্কিত কয়েকজন ছাত্রনেতার দুটি পৃথক ইস্তাহার থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু সিলেটে এই নিষেধাজ্ঞা জারী সত্ত্বেও ১৬ই নভেম্বর, ১৯৫১, তারিখে সিলেট শহর থেকে ১৮ মাইল দূরে ফেঞ্চুগঞ্জের পাঠানটুলা মাঠে সিলেট জেলা ছাত্র সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৬] জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

নির্বাচিত সভাপতি খায়রুল কবিরের অনুপস্থিতিতে বরিশাল জেলা যুব লীগের সভাপতি ও যুব লীগের কার্যকরী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক এমাদুল্লাহ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আবুল হাশিমের অনুপস্থিতিতে সম্মেলন উদ্বোধন করেন যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ।

একটি মাত্র ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্মেলনে একটি ম্যানিফেস্টো গ্রহণ এবং জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে একটি সংগঠনী পরিষদ গঠন করা হয়। আবদুল হাই ও রুহুল কুদ্দুস যথাক্রমে এই সংগঠনী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সম্মেলনের সমাপ্তির দিকে সম্মেলনের সভাপতি এমাদুল্লাহ যখন তাঁর ভাষণ প্রদান করছিলেন সে সময়ে ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সম্মেলন স্থানে উপস্থিত হয়ে সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশক্রমে সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করেন এবং তারপর সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কমিউনিষ্টরা এই ছাত্র সম্মেলনের সাথে জড়িত এই কারণেই সম্মেলন ভেঙে দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করা হয় বলে একটি সংবাদপত্র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।[৭]

এই সম্মেলনের পর কোন অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান তাড়াতাড়ি গঠন করা সম্ভব হয় নি। সে ধরনের একটি সংগঠন গড়ে উঠতে আরো কিছু সময় লেগেছিলো এবং ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিলো।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ

১. যুবলীগ গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ

১৯৫১ সালের প্রথম দিকে মাহমুদ নূরুল হুদা নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর সাথে করাচী যান। বুলবুল চৌধুরী করাচী থেকে বিদেশ যাওয়ার পর অসুস্থ অবস্থায় নূরুল হুদা কিছুদিন করাচীতে থাকেন।[১]

এই সময় একদিন পূর্ব বাঙলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার আবদুর রউফকে অনুরোধ করেন যাতে তিনি নূরুল হুদাকে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে নিয়ে আসেন। নূরুল হুদা (সম্পর্কে হাবিবুল্লাহ বাহারের মামা) অসুস্থতার পর দুর্বল শারীরিক অবস্থায় ঢাকা আসছিলেন বলেই হাবিবুল্লাহ বাহার এই অনুরোধ করেছিলেন। তিনি নিজে ভয় ও সাবধানতাবশত এ কাজ করতে নিরুৎসাহী ছিলেন কারণ শহীদ সুহরাওয়ার্দীর প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নূরুল হুদা তখন সরকারের কাছে ছিলেন সন্দেহের পাত্র।★ আবদুর রউফ যথাসময়ে তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে নূরুল হুদাকে নিয়ে র‍্যাংকীন স্ট্রীটে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা আনোয়ার হোসেনের বাসায় পৌঁছে দেন।[২]

আনোয়ার হোসেনের বাসায় আলোচনা প্রসঙ্গে নূরুল হুদা আবদুর রউফকে বলেন যে, পূর্ব বাঙলায় যুবকদের জন্য একটা নোতুন সংগঠন করা দরকার। এ ব্যাপারে করাচীতে মিস ফাতেমা জিন্নাহর সাথেও তাঁর আলাপ হয়েছে বলে নূরুল হুদা উল্লেখ করেন। ফাতেমা জিন্নাহর সাথে তখন লিয়াকত আলীর গণ্ডগোল চলছিলো। কাজেই তিনি চাইছিলেন এই ধরনের একটা সংগঠনের মাধ্যমে বিরোধী রাজনীতি কিছু অগ্রসর হোক।[৩]

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুবলীগ নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়েছিলো। নূরুল হুদার প্রস্তাবিত এই সংগঠনের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিলো না, কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, সেই পুরাতন সংগঠনের সাথে কোন যোগ রাখতে গেলে নোতুন সংগঠন ঠিক মতো গঠন

★তৎকালে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের নির্যাতনমূলক নীতি কি ধরনের ছিলো এবং তার ফলে এমনকি মন্ত্রী মহোদয়দের মনেও ভয়ভীতি কি পরিমাণ ছিলো বিশেষভাবে তারই একটি উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হলো। –ব.উ.

www.pathagar.com

করা সম্ভব হবে না।[৪]

আনোয়ার হোসেন এবং নূরুল হুদা একটি যুব সংগঠন গঠনের উদ্দেশ্যে কিছু প্রাথমিক তোড়জোড় শুরু করেন। এই উদ্যোগের সাথে তাঁরা আবদুর রউফকেও সম্পর্কিত রাখেন। আবদুর রউফ তখন ছিলেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী। এ জন্য প্রত্যক্ষভাবে এই উদ্যোগের সাথে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি পরোক্ষভাবে থাকেন। তাঁকে সাংগঠনিক কমিটিতেও রাখা হয় তবে আবদুর রউফ নামে নয়, আবু সাঈদ (আবু সাঈদ মহম্মদ আবদুর রউফ এই পুরো নামের অপরিচিত প্রথমাংশ) নামে।[৫]

এই প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হওয়ার সময় একদিন কমিউনিষ্ট পার্টির অনিল মুখার্জী আবদুর রউফের কাছে এসে বলেন যে, তাঁরা যুবলীগ গঠনের যে কাজ শুরু করেছেন তাতে তাঁদের সমর্থন আছে। তাঁরাও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে অনিল মুখার্জী তাঁকে জানান। আবদুর রউফকে একথা বলার কারণ তিনি সে সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির টেক (গোপন) কাজ করতেন এবং সেই হিসেবে তাঁদের সাথে যুক্ত ছিলেন।[৬]

অনিল মুখার্জী এ প্রসঙ্গে আবদুর রউফকে আরও বলেন যে, ১৯৪৭ সালে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের যে চেষ্টা করা হয়েছিলো সেটা সফল হয় নি কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা এখনো আছে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন অবস্থায় তার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কাজেই সেটা গঠনের ব্যবস্থা করলে তাঁরা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করবেন। তবে আবদুর রউফ পার্টির টেক কাজ করতেন সে কারণে অনিল মুখার্জী তাঁকে প্রস্তুতি কমিটিতে না থাকার পরামর্শ দেন। এরপর কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে মহম্মদ তোয়াহাও আবদুর রউফের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং যুবলীগ গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করেন।[৭]

ইতিমধ্যে আনোয়ার হোসেন (যাঁর সাথে তখনো পর্যন্ত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং মুসলিম লীগের কিছু সম্পর্ক ছিলো) সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে ব্যবসা বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তিনি আবদুর রউফকে জানান যে, যে নোতুন যুব সংগঠনটি গঠনের মূল সাংগঠনিক দায়িত্ব তখনো পর্যন্ত তাঁর উপরই ছিলো সেই সংগঠনটিকে তিনি ভালো লোকদের হাতে তুলে দিতে চান। "ভালো লোক" বলতে তিনি কি বোঝাতে চান সেটা সুস্পষ্টভাবে না বললেও তিনি যে তার দ্বারা কমিউনিষ্টদেরকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না, কারণ আবদুর রউফের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পর্কের বিষয় তিনি মোটামুটিভাবে জানতেন।[৮]

খালেক নামে মুসলিম লীগের গুণ্ডা প্রকৃতির একজন কর্মী আনোয়ার

www.pathagar.com

হোসেনকে যুব লীগের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য বলেছিলো এবং তিনি সে ভূমিকা পালন না করে অবসর নিলে তাদের হাতেই সংগঠনটি তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলো। কিন্তু আনোয়ার হোসেন তাতে সম্মত না হয়ে সংগঠনটি যাতে কমিউনিষ্টদের হাতে চলে যায় তারই পক্ষপাতী ছিলেন। তৎকালীন সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ছিলেন নূরুল হুদা। তাঁর প্রতিও আনোয়ার হোসেনের কোন আস্থা ছিলো না। কমিটি সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আবদুর রউফরা তোয়াহাকে সম্পাদক করার চিন্তা করেন। কিন্তু তোয়াহা তাঁকে জানান যে, তিনি নিজে সম্পাদক হতে চান না। তার পরিবর্তে তিনি অলি আহাদকে সম্পাদক করার প্রস্তাব করেন। কমিউনিষ্ট পার্টিরও এই প্রস্তাবে সম্মতি আছে বলে তিনি জানান। কাজেই শেষ পর্যন্ত অলি আহাদকেই সম্পাদক করার সিদ্ধান্ত হয়।[৯]

কিন্তু সম্পাদকের ব্যাপারে কোন অসুবিধা না হলেও সভাপতি নিয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হলো। তখনো পর্যন্ত সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ছিলেন নূরুল হুদা। তাঁর সম্পর্কে অনেকের ভালো ধারণা না থাকলেও আবদুর রউফরা তাঁকে সভাপতি করতে অসম্মত ছিলেন না। কিন্তু অন্য অনেকের তাতে আপত্তি ছিলো। আনোয়ার হোসেনেরও তাতে তেমন সম্মতি ছিলো না। তাছাড়া তখনকার একমাত্র বিরোধীদলীয় দৈনিক পত্রিকা 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর সম্পাদক আবদুস সালাম ও সেই পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী (যদিও তিনি নূরুল হুদার আত্মীয়) একথা জানান যে, নূরুল হুদাকে সভাপতি করা হলে যুব লীগের কোন সংবাদই তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করবেন না।[১০]

সেই অবস্থায় নূরুল হুদাকে সভাপতি করার চিন্তা বাদ দেওয়া ব্যতীত উপায় থাকলো না। কাজেই সাংগঠনিক কমিটির নাম বদল করে অভ্যর্থনা কমিটি করার এবং নূরুল হুদাকে তার চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।[১১]

এই সময় সিলেটের তসদ্দুক আহমদের (তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সম্পর্কিত) মাধ্যমে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সিলেটের সাপ্তাহিক 'নওবেলাল'-এর সম্পাদক মাহমুদ আলীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[১২] এবং তাঁর সাথে এই যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁকেই যুব লীগের সভাপতি করার ব্যাপারে সকলে একমত হন।[১৩]

৬ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখে ফজলুল হক হলের অ্যাসেম্বলী হলে সন্ধ্যার দিকে যুব সম্মেলনের ব্যাপারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন বদিউর রহমান। সভায় যুব লীগের উদ্দেশ্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন মহম্মদ তোয়াহা।[১৪] এরপর ১৪ই মার্চ পুনরায় যুব সম্মেলনের বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

ছাত্রদের কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হলের ৬০ নম্বর কামরায়। তাতে উপস্থিত থাকেন হাবিবুর রহমান শেলী, সৈয়দ মহম্মদ আলী, বদিউর রহমান, মকসুদ আহমদ, রোকেয়া এবং অন্য এক মহিলা।[১৫]

যুবলীগ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের জন্য ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে একটি সভা আহ্বান করা হয়। খবর পৌছায় যে সালেক প্রভৃতি মুসলিম লীগের গুণ্ডারা ঐ সভা ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করছে। এই খবর পাওয়ার পর যুব লীগের সংগঠকরাও তাদের গুণ্ডামী প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আবদুর রউফ সে সময় ছিলেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী। তাঁর এই অবস্থানের সুযোগ নিয়ে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, আহ্বায়ক কমিটি গঠনের সভা শুরু হওয়ার আগে থেকে সভাস্থলে মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকশো মেথর-ধাঙড়কে সেদিন বার লাইব্রেরীর আশে পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। সেই অনুযায়ী সভার দিন মেথররা বার লাইব্রেরীর সামনে কেউ কেউ লাঠি হাতে এবং কেউ খালি হাতে ঘোরাফেরা করে পাহারা দিতে থাকলেন। সালেক তার কিছু লোকজন নিয়ে বার লাইব্রেরীর কাছে এসে পরিস্থিতি দেখার পর স্থান ত্যাগ করলো এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত আর কোন গণ্ডগোল না হয়ে সভার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো।[১৬]

যুবলীগ গঠনের উদ্দেশ্যে যুব সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৯৫১ সালের ২৭শে মার্চ। সম্মেলনের সময় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী থাকায় বার লাইব্রেরী হলে সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ২৬শে মার্চ সরকারী কর্তৃপক্ষ যুব সম্মেলনের কর্মকর্তাদের জানান যে, ১৪৪ ধারা বার লাইব্রেরীর মধ্যে বলবৎ থাকবে কাজেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে তাঁরা সেখানে কোন সম্মেলন করতে পারবেন না।[১৭] এই নোতুন পরিস্থিতিতে সম্মেলনের কর্মকর্তারা সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করেন বুড়িগঙ্গার অপর তীরে জিঞ্জিরা বাজারে।

২. যুব সম্মেলন

সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা দুপুর আড়াইটায় থাকলেও সম্মেলনের উদ্যোক্তারা জিঞ্জিরা বাজার পৌছান সন্ধ্যা ছয়টার পর। এই বিলম্বের ফলে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি তিন ঘণ্টা জিঞ্জিরা বাজারে ঘোরাফেরা করেন। অবশেষে সম্মেলন শুরু হয় মগরেবের নামাজের পর সন্ধ্যা সাতটায়।[১] প্রতিনিধিরা ছাড়াও সম্মেলনের জায়গায় কয়েক হাজার শ্রোতা সমবেত হন।

সম্মেলনের শুরুতে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল এবং জাতীয়

www.pathagar.com

স্বাধীনতার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তার পর কোরান তেলাওয়াতের★ পর ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর সম্পাদক আবদুস সালাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, দেশের যুবকদের মনে এক দারুণ নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছে কারণ আজাদী লাভের পূর্বে তারা যে সোনার স্বপ্ন দেখেছিলো সেটা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। এই মনোভাব যে দেশের পক্ষে ক্ষতির কারণ হতে পারে একথা উল্লেখ করে আবদুস সালাম সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।[২]

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নূরুল হুদা তাঁর অভিভাষণে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, সরকারের ফ্যাসিস্ট নীতির ফলে দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, এমন কি কথা বলার স্বাধীনতা পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। তিনি আরও বলেন, "সরকার আজকাল সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীলতার নীতি গ্রহণ করিয়া দেশের অগ্রগতি বন্ধ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দেশের যুব সমাজ এই সবের বিরুদ্ধেই আওয়াজ তুলিয়াছেন এবং তাহা প্রতিরোধের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।" নূরুল হুদা সরকারের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেন এবং যুব সমাজের সামনে যে বিরাট কর্মসূচী অপেক্ষা করছে তার উল্লেখ করে বলেন যে, "আমাদের প্রথম কাজ হইল সকল প্রকার যুদ্ধ প্ররোচনার মূলোচ্ছেদ করিয়া শান্তি স্থাপন করা এবং দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটান।"[৩]

এরপর নির্বাচিত সভাপতি মাহমুদ আলী তাঁর আসন গ্রহণ করে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন।[৪] তাতে তিনি বলেন,

> আজ এক দেশের পরিস্থিতির সহিত অন্য দেশের তথা সমগ্র দুনিয়ার পরিস্থিতি এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন এক দেশের পরিস্থিতির পরিমাপ করা আর সম্ভবপর নয়। সদ্য বৃটিশ শাসনমুক্ত আমাদের এই দেশ বিদেশী শাসনমুক্তির সাথে সাথেই বিশ্ব রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অন্য দেশের উত্থান পতনে আমরাও আন্দোলিত হই–বিভিন্ন দুটি দেশে যুদ্ধ বাধলে আমাদের দেশেও তার ছোঁয়াচ লাগে। 'ওরা মারামারি কাটাকাটি করছে আমাদের তাতে কি' একথা বলে আজ আর আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। কারণ ওদের মারামারি কাটাকাটি আমাদের গায়েও আঘাত হানে। ঠিক তেমনি করে তাদের বেলায়ও একই অবস্থা।

জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সভাপতির ভাষণে মাহমুদ আলী বলেন,

> আমি ইতিপূর্বে বলেছি আন্তর্জাতিক সমস্যার সহিত আমাদের জাতীয় সমস্যা

★সে সময় পরিস্থিতি এমন ছিলো যে, গণতন্ত্রের যত কথা বলা হোক কোন সভা সম্মেলন কোরান তেলাওয়াত ব্যতীত শুরু করলে শুধু সরকারই নয় জনগণের মধ্যেও তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো। খুব সম্ভবত এই কথা বিবেচনা করে কোরান তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়।–ব.উ

www.pathagar.com

ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। তাই জাতীয় সমস্যাকেও আমরা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করবো।

বিদেশী শাসন মুক্তির পর জাতির সামনে যে সমস্যা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো দেশের অগণিত জনসাধারণের ভাত কাপড়ের সমস্যা, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যা, এক কথায় স্বাধীন মানুষের মতো বেঁচে থাকার সমস্যা। যে স্বাধীনতায় এই প্রাথমিক সমস্যাগুলির কোন সমাধান নেই সে স্বাধীনতা কাহারো কাম্য হতে পারে না- সে স্বাধীনতা, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি- পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কথা ছিল না- পাকিস্তান আন্দোলনে যে সব মহাপ্রাণ যুবক যুবতী ও অসংখ্য স্বাধীনতাকামী মানুষ জীবনাহুতি দিয়েছেন এ তাদের কাম্য ছিল না। সর্বোপরি জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সে পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই- "যে পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মর্মপীড়া অনুভব করে, সে পাকিস্তানে আমার প্রয়োজন নেই-।" কায়েদে আজমের এই অমর বাণী আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়। পাকিস্তান লাভের সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি আমরা শুধু যেই তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থেকে যাই নি, বরং তিমির আমাদের আরো ঘনীভূত হয়েছে। বৃটিশ শাসনমুক্ত আমরা হয়েছি সত্য কিন্তু বৃটিশের উত্তরাধিকারসূত্রে যাঁরা আমাদের উপর চেপে বসেছেন তাঁরা বৃটিশ শাসনের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন তার নির্মমতার- অমানুষিক চরম পর্যায়ে। তাই আমরা দেখতে পাই জাতীয় সমস্যার কোন সমাধান না করেও জনসাধারণের তরফ হতে সমাধানের দাবী উঠলেই সেটা দমন করার জন্য তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেন-দমন নীতির কঠোরতম অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসেন জনসাধারণের দিকে। এই দেশের মানুষের কল্যাণ সাধন করা যেন তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে নয়। তাঁরা যেন আল্লাহর তরফ থেকে এসেছেন মাটির মানুষের উপর নির্মম শাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য- এতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে এ কার সাধ্য?

শুধু তাই নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী শোষণের যাঁতাকল আজও আমাদের সমাজ জীবনে ভূতের মত চেপে আছে। দেশের যা কিছু সারবস্তু তার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করছে তারা এবং তাদের দেশীয় উত্তরাধিকারীগণ দালাল সেজে সাহায্যকারীর নীরব ভূমিকার মহড়া দিয়ে চলেছে। অথচ যারা এ সব কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করতে এগিয়ে যায়, যারা সত্য কথা বলার সৎসাহস রাখে আজ তারাই আখ্যা লাভ করছে- "রাষ্ট্রদ্রোহী"। "কম্যুনিষ্ট", "ইসলাম বিরোধী", "বিভেদ সৃষ্টিকারী", আরও কত কি!

যুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের মত আরও বহু দেশ বিদেশী শাসনমুক্ত হয়েছে। তারা অনেকেই নিজেদের মোহমুক্ত করে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছে এবং সেই সমাধান কার্যকরী করে দেশের মানুষকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে গেছে। অতএব যদিও রাষ্ট্রের দোহাই, সময়ের স্বল্পতার দোহাই দিয়ে যে অজুহাত দেখান হয় মূলত তার কোন ভিত্তি নেই। কারণ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিচ্ছে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে আমাদেরও পেছনে পড়ে থাকার কোন কারণ নেই।

আমরা দেখতে পেয়েছি তথাকথিত জাতীয় সরকার জনসাধারণকে সুখ, সমৃদ্ধির

www.pathagar.com

কল্প কাহিনীর প্রসাদ দিয়ে প্রতারিত করে গদী কায়েম রাখার সব ব্যবস্থাই করেছেন। আমার মনে হয় জনসাধারণ আজ স ধারণভাবে এ প্রতারণা ধরতে পেরেছে এবং পেরে মুক্তির সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছে।

এই পাগল করা উতলা আবহাওয়ায় তারা নিজেদের লক্ষ্য পথ হারিয়ে ফেলতে পারে– তাদের বিভ্রান্তি ঘটতে পারে– তারা সংযোগহীন অবস্থায় দমন নীতির কঠোর নিষ্পেষণে চিরতরে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়তে পারে।

তাই এদিক থেকে শিক্ষিত সমাজচেতন যুবসমাজের দায়িত্ব রয়েছে অপরিসীম। এই সঙ্কটকালে তাদের উদ্‌ভ্রান্ত জনতার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে– তাদের দিতে হবে পথের সন্ধান–তাদের বাঁচাতে হবে অত্যাচারী মানুষখেকো শোষকের কবল থেকে। আমি বিশ্বাস করি আজকের এই ঐতিহাসিক যুব সম্মেলন সেই বাঁচার পথের সন্ধানই দেবে।

এরপর ভাষণ শেষ করার পূর্বে মাহমুদ আলী বলেন,

ধীরে হলেও আমাদের নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। আজ দেশের কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারোরই জীবন যাত্রার এতটুকু নিশ্চয়তা নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলেছে যুদ্ধের মহড়া–যুদ্ধের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে চলেছে দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী করার হীন প্রচেষ্টা।

তাই আজ যুব সমাজের কর্তব্য জনসাধারণের সহযোগিতায় যুদ্ধবাজদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া। সর্বপ্রকার যুদ্ধ প্ররোচনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা। সামন্ততান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার বিনাশ সাধন করে জাতীয় উন্নতির পরিপোষক স্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। বিদেশী ও বড় বড় দেশী ধনিকদের শোষণের পর্দা উন্মোচন করে দেশের অগণিত মধ্যবিত্ত–কৃষক মজুরের দলকে মোহমুক্ত করে সংগঠিত করা এবং সুনিশ্চিত পদক্ষেপ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সহায়তা করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ভিত্তিতে আমরা এগিয়ে গেলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সুনিশ্চিত সাফল্য অবধারিত। আমরা পাকিস্তানকে এক সুখী সমৃদ্ধ প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করতে সমর্থ হবো।

সাফল্য আমাদের কিন্তু সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় এও আমাদের জানা আছে। আজকের জীবনের নিবিড় আমাকে উদয় সূর্য্যের রক্তিমাভায় রঞ্জিত করতে হলে প্রয়োজন বহু লালিমার।

সভাপতির অভিভাষণের পর নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ একটি খসড়া মেনিফেস্টো সম্মেলনে পেশ করেন।[৫] ম্যানিফেস্টোর উপর আলোচনা পরবর্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখার পর খোন্দকার গোলাম মোস্তফা[৬] যে প্রস্তাবাবলী সম্মেলনে পেশ করেন

www.pathagar.com

তার সংবাদপত্র রিপোর্ট[৭] নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

প্রথম প্রস্তাবে পাকিস্তানের ভিত্তিকে শক্তিশালী করিবার কাজে সম্মেলনের আত্মনিয়োগের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এই সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের চরম শাস্তি দানের দাবী জানানো হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের দাবী জানান হয়। এই ব্যাপারে আমেরিকার কদর্য্য ভূমিকার নিন্দা করা হয়।

পূর্বে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও অফিসের ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হওয়ায় সম্মেলনে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। সম্মেলন প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষাকে সেই প্রদেশের শিক্ষার মাধ্যম এবং প্রদেশের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সার্বজনীন সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়ার মত পোষণ করে।

সম্মেলনে মোহাজের যুবকদের পুনর্বসতির প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য বাটা সু ফ্যাক্টরী, ডানলাপ ফ্যাক্টরী ইত্যাদির শ্রমিকদের স্থানচ্যুতকরণের নিন্দা করা হয় ও অবিলম্বে তাহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবী করা হয়।

সম্মেলন মূলনীতি কমিটির সুপারিশকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিবার দাবী জানায় এবং পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র গত নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে গৃহীত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠনের দৃঢ়মত পোষণ করে।

সম্মেলন আগামী বৎসরের প্রথম ভাগেই পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদকে বাতিল করিয়া পূর্ণ বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনের দাবী জানায়।

সম্মেলন অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রস্তাবিত ১লা এপ্রিল হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় এবং সরকারকে তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইবার জন্য দাবী জানায়।

অন্য একটি প্রস্তাবে সম্মেলন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী এবং 'পাকিস্তান অবজার্ভার' ও 'দৈনিক ইনসাফের' উপর সরকারী প্রি-সেন্সরশীপ আদেশের নিন্দা এবং তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবী জানায়।

সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ফেনীর সাপ্তাহিক "সংগ্রাম" পত্রিকার উপর ৩০০০ টাকা জামানত তলব আদেশের নিন্দা করে এবং উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়া পত্রিকাটিকে বিনা বাধায় প্রকাশ হইতে দেওয়ার অনুরোধ জানায়।

শেষ প্রস্তাবে সম্মেলন প্রদেশের দ্বিতীয় শিল্প চা শিল্পের অবস্থার পুনর্বিবেচনা করিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইউরোপীয় মিঃ ব্রাবান্টের প্রদত্ত রিপোর্টে পশ্চিম পাকিস্তানে চা বাগানের পরীক্ষা চালাইবার জন্য পাকিস্তানের এই অংশের পরিত্যক্ত দেশী চা বাগানগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়ার সুপারিশের সমালোচনা করে। সম্মেলনের মতে ইহা দেশীয় চা শিল্পীদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং ইউরোপীয় চা শিল্পীদের স্বার্থের প্রতি সুবিধাজনক। এই হেতু সম্মেলন এই রিপোর্ট বাতিলের দাবী জানায়।

খোন্দকার গোলাম মোস্তফা উপরোক্ত প্রস্তাবাবলী সম্মেলনের

www.pathagar.com

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পাঠ করার পর ফেনীর খায়েজ আহমদ এগুলির উপর আলোচনা করেন।[৮] তারপর প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনে গৃহীত হয়।[৯] শুরু থেকে এ পর্যন্ত পুলিশ রিপোর্টাররা সম্মেলনে উপস্থিত থাকে এবং প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার পর রাত্রি দশটার সময় প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।[১০]

জিঞ্জিরা বাজারে পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হওয়ার ফলে সেখানে সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব না হওয়ায় উদ্যোক্তারা বুড়িগঙ্গায় নৌকোর উপর দ্বিতীয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। অধিবেশন শুরু হয় রাত্রি ১১টায়। এই অধিবেশনে মাইক ব্যবহৃত হয়।[১১] সম্মেলনে আগত ২৫০ জন প্রতিনিধিই দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন।[১২] তাঁদের মধ্যে হালিমা খাতুন সহ চার-পাঁচজন মহিলা প্রতিনিধিও ছিলেন।[১৩]

সামান্য রদবদলের পর প্রথম অধিবেশনে পেশকৃত খসড়া ঘোষণাপত্র বা ম্যানিফেস্টোটি* গৃহীত হয়। এই গৃহীত ঘোষণাপত্রটিতে** বলা হয় :

> পাকিস্তান কায়েম হওয়ার প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের দেশ এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর শিকলে বাঁধা। এখনও পাকিস্তানের ধনসম্পদ, যেমন–পাট, চা প্রভৃতি ব্যবসার উপর সেই ব্রিটিশ পুঁজির কর্তৃত্ব অব্যাহত। আজও মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী ধনিক আমাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া সুখ-বিলাসে কাল কাটাইতেছেন। আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজ গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আজও আমাদের শিল্পের বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। আমাদের দেশের বাজার বিদেশীর মালপত্রে ছাইয়া গিয়াছে ; এবং মুষ্টিমেয় ধনিকের সহায়তায় বিদেশী ধনিকগণই আমাদের দেশের বাজারের উপর কর্তৃত্ব এবং একাধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

এই সাধারণ বক্তব্যের পর সমাজের প্রতিটি স্তরের যুবক যুবতীর বিভিন্ন সমস্যার উপর ঘোষণাটিতে নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয়। কৃষক যুবক সম্পর্কে তাতে বলা হয় :

> আমাদের দেশের অর্থনীতি এখনও রহিয়াছে সেই অনগ্রসর ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পর্যায়ে। আমাদের দেশের যুব সমাজের শতকরা ৮০ ভাগই গ্রামের কৃষক। দেশের যুব শক্তির এই প্রধান অংশ আজও সামন্তবাদী জমিদারী প্রথার নিষ্পেষণে পিষ্ট। সরকার নামেমাত্র জমিদারী উচ্ছেদ করিয়াছে। কার্যতঃ জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে মাত্র; চাষী জমির স্বত্ব পায় নাই। দেশের প্রাণ এই যুব সমাজ আজও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; জমি হইতে বঞ্চিত। নিজেদের

---

*এই খসড়া ঘোষণা পত্রটি মার্চ ১৯৫১-এর প্রথম সপ্তাহে যুব সম্মেলনের প্রচার দপ্তর কর্তৃক ৩৬ নং র‍্যাংকিন স্ট্রীট, ঢাকা (আনোয়ার হোসেনের বাসা) থেকে প্রকাশিত হয়। তখন এই খসড়া ঘোষণাপত্রটির নাম ছিল পাকিস্তান যুব সম্মেলনের ঘোষণা। –ব.উ.

**পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের ঘোষণাপত্র উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নামে এই ঘোষণা পত্রটি ক্যাপিটাল প্রিন্টিং প্রেস, ৫০, বেগম বাজার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং প্রচার দপ্তর কর্তৃক ৪৩/১ নম্বর যোগীনগর লেন (মহম্মদ তোয়াহার বাসা) ওয়ারী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। –ব.উ.

www.pathagar.com

জীবনকে সুখী ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার কোন পথই তাহাদের সম্মুখে নাই। এক মুঠো পেটের ভাতের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, চাকুরীর আশায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি, পরের বাড়ীর গোলামী এবং অকালে মৃত্যু ইহাই আজও পাকিস্তানের যুব শক্তির ভাগ্য। আমাদের অবস্থা উন্নত করার কোন চেষ্টাই বর্তমান সরকারের নাই। অর্থনৈতিক শোষণে, শিক্ষার অভাবে দেশের প্রাণ এই গ্রাম্য যুবশক্তি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া পাকিস্তানের জন্য লড়িয়াছিলাম- জমি পাইব, শিক্ষা পাইব; কিন্তু বর্তমান মুসলিম লীগ সরকারের কল্যাণে আমাদের কৃষক যুব শক্তির সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে।

শ্রমিক যুবক সম্পর্কে ঘোষণাতে বলা হয় :

আমরা যুব সমাজের যে অংশ রেলে কাজ করিয়া, চট্টগ্রাম ডকে গতর খাটিয়া, সূতাকল চালাইয়া, রিক্সা চালাইয়া বা অনুরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিন-মজুর হিসাবে জীবিকা অর্জন করি- আমরা সেই যুব সমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানে আমরা জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী পাইব, পাইব চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং শিক্ষা। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমাদের আসল মজুরী কমিতেছে খাটুনি বাড়িতেছে। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। বেকারী ও ছাঁটাই এর বিভীষিকা আমাদের সম্মুখে। অথচ আমাদিগকে শোষণ করিয়াই মুষ্টিমেয় ধনিক টাকার পাহাড় জমাইতেছে।

মধ্যবিত্ত যুবক সম্পর্কে ঘোষণাতে বলা হয় :

আমরা মধ্যবিত্ত যুব সমাজ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম- পাকিস্তানে আমরা চাকরি পাইব, ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের সুযোগ পাইব, গৃহ পাইব, পাইব উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নততর জীবনধারণের মান। কিন্তু বাস্তবতার নিষ্ঠুর কষাঘাতে সে স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অভাবের তাড়নায় আমরা জর্জরিত। শহরের বাসস্থানের অভাব আমাদের এক বিরাট সমস্যা। তদুপরি আজ আমরা ১৫ লক্ষের বেশী বেকার এক মুঠো ভাতের জন্য এখানে ওখানে ধর্ণা দিতেছি, আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতেছি।

মোহাজের যুবকদের সম্পর্কে বলা হয় :

আমরা, মোহাজের যুবকেরা, পাকিস্তানের জন্য আমাদের সর্বস্ব হারাইয়াছি। কিন্তু আজ পাকিস্তানে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। সরকার আমাদিগকে কেবল মৌখিক সহানুভূতি এবং খবরের কাগজের মারফৎ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমাদের পুনর্বসতি ও পুনর্জীবনযাত্রার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই তাহারা করেন নাই। বাস্তুহারা হইয়া পাকিস্তানে আসিয়া আমাদিগকে বেকার হইয়া, গৃহহারা হইয়া, অন্নহারা হইতে হইতেছে, এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্তও করিতে হইতেছে।

এরপর সর্বশেষে নারী-যুব সমাজ সম্পর্কে ঘোষণাটিতে বলা হয় :

আমরা নারী যুব-সমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানের সরকার আইন করিয়া আমাদিগকে সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি দিবেন, শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন এবং দিবেন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান মর্যাদা ও অধিকার। কিন্তু আজও আমরা নিগৃহীতা এবং শিক্ষা ও সভ্যতার সামান্যতম

www.pathagar.com

অংশ হইতেও বঞ্চিত। আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে পাকিস্তান হওয়ার পর আট বছর অতীত হইতে চলিল, দেশের সমগ্র যুব সমাজের অর্ধেক এই নারী যুব শক্তির শতকরা একজনও লিখিতে পড়িতে পারে না। তদপুরি সিলেট মেয়ে কলেজ ও কামরুন্নেছা মেয়ে কলেজ, ইডেন স্কুল, বরিশালের একমাত্র ছাত্রী নিবাস, জগন্নাথ কলেজে মেয়েদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকার এক বিরাট অভিযান চালাইতেছে। অথচ আলবেনিয়ার★ ন্যায় ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রে ১৯৪৫ সনে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ায় ১৯৪৬ সালের শেষে একমাত্র পেশার জেলায় শতকরা ৭৫ জনের নিরক্ষরতা দূর হইয়া যায়। স্কুটারী জেলায় ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি ২৩০০০ হাজার মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে। এইরূপে বিভিন্ন স্বাধীন দেশে আমাদের বোনেরা যখন শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তখন আমাদের, পাকিস্তানের নারী-যুব সমাজের ভাগ্যে জুটিতেছে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও সামাজিক দাসত্ব।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ঘোষণাটিতে শুধু দ্রব্য মূল্যের কথা এইভাবে বলা হয় :

পূর্ব বঙ্গের তথা পাকিস্তানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হইতেছে কৃষি। পাকিস্তানের শতকরা ৯২ জন অধিবাসীই কৃষক। যে পাট তাহারা গড়ে ৩৫ টাকা দরে বিক্রয় করিত তাহা আজ ১২ টাকায়, যে সুপারী গড়ে ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করিত তাহা আজ ১০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। তদুপরি সুপারীর উপর প্রতি মণে ১০% টাকা শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় সুপারী বিক্রয়ই হয় না। এভাবে পাকিস্তানের অধিবাসীদের নগদ আয়ের পথ ভীষণভাবে সংকুচিত হইতেছে। অন্যদিকে দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদি তাহাদিগকে অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে। বিগত কয় বছরের দ্রব্য মূল্যমানের সূচক সংখ্যা (price-index) হইতে এই তথ্য সহজেই জানা যায়।

১৯৩৯ সনে	দ্রব্যের	গড়	পড়তা	মূল্য	ছিল	১০০
১৯৪৮ "	"	"	"	"	"	৩৭৪
১৯৪৯ "	"	"	"	"	"	২১৪

(পাকিস্তান পার্লামেন্টের প্রদত্ত অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা হইতে)

আজ একদিকে পাট, সুপারী, তামাকের দাম দ্রুত কমিয়া কৃষকের আয় ভয়ানকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ও অপরদিকে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাকিস্তানের অধিবাসীগণ আজ তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঘোষণাতে বলা হয় :

আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজ আশা করিয়াছিলাম যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে সরকার সমস্ত দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রচলন করিয়া বৃটিশ আমলের

★আলবেনিয়া ১৯৪৫ সালে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন পরিচালিত একটি রাষ্ট্র, যদিও বিপ্লবের পূর্বে তার জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিলো মুসলমান পরিবারভুক্ত।–ব.উ.

www.pathagar.com

কুশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করিবেন কিন্তু তার পরিবর্তে আজও দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ১১ জন। প্রাইমারী স্কুল বাড়ীর পরিবর্তে সরকার শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ স্কুল– একমাত্র চট্টগ্রাম জেলায় ৮৪৪টি, নাটোরে ৪০০টি– উঠাইয়া দিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার সংকোচন করিতেছেন। সরকার আজ শিক্ষাখাতে ৫.৬ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যুদ্ধখাতে দেশে সম্পদের শতকরা ৭.২ ভাগ ব্যয় করিতেছেন।

তদুপরি সরকার পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া উর্দু চাপাইতেছে এবং আরবী হরফে বাংলা লিখার উদ্ভট পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য অজস্র অর্থের অপচয় করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, উর্দু ও বাংলা একত্রে রাষ্ট্রভাষা হইলে পাকিস্তান দুর্বল হইবে না। এবং আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আরবী হরফে বাংলা লিখার ব্যবস্থাকে আমাদের উপর চাপাইয়া দিলে আমরা দেশের যুবক সমাজ চিরদিনের জন্য অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইব ; আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে।

সরকারী দমননীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে যুব লীগের এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়,

আমরা যুব সমাজ আশা করিয়াছিলাম পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আজ যখনই আমরা নিজেদের কোন দাবী বা সমাজের উন্নতির জন্য কোন আন্দোলন বা সংগঠনে সমবেত হই তখনই সরকার আমাদের উপর দমননীতি প্রয়োগ করেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তান পুলিশের ধর্মঘট, লাহোর বাটা শ্রমিকের ধর্মঘট, করাচী ডাল মিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ধর্মঘট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম বেতন ভোগী কর্মচারীদের সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট, মেডিকেল ছাত্রদের ধর্মঘট প্রভৃতি ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সরকারী দমননীতির তীব্র কশাঘাত আমরা পূর্ব বাঙলা তথা পাকিস্তানের যুব সমাজ আজও ভুলি নাই, মেডিকেল ছাত্রদের ও ডাক্তারদের দাবীর প্রতি সরকারের অনমনীয় মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। "ভুখা" চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বরখাস্তের ব্যাপারও গভীর ক্ষোভের সহিত আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

সরকারের দমননীতির কোপে পড়িয়া আজ পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবাদী শত শত যুবক-যুবতী কারাগারে আবদ্ধ। সরকারী দমননীতির দরুন স্বাধীনভাবে সভাসমিতি করার বা সংগঠন গড়ার অধিকার আমাদের নাই। নিষ্ঠুর সরকারী দমননীতির ফলে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ বিপর্যস্ত। তাই আজ আমাদের যুব সমাজের জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক এই চতুর্বিধ সঙ্কট নামিয়া আসিতেছে। আমাদের সমাজের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য আজও অব্যাহত। আমাদের গ্রাম্য শিল্প নাই, গণতান্ত্রিক অধিকার নাই। বেকারীর দুঃসহ জ্বালায় আমরা জর্জরিত ও আমাদের দেহ মন স্বাস্থ্য আজ হীনবল। বর্তমান সরকারের নীতিই আমাদের দেশের যুব শক্তির এই মহাসঙ্কটের কারণ।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে ঘোষণায় বলা হয় :

আমরা পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের যুব সমাজ নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য

www.pathagar.com

সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমরা কখনও কামানের খোরাক হইব না। আমরা জানি যুদ্ধের আনুসঙ্গিক ফল, সেই ৫০ সনের মন্বন্তর হইতেও ভয়াবহ মন্বন্তর যে মন্বন্তরে আমরা আমাদের ৩৫ লক্ষ মা-ভাই-বোনকে হারাইয়াছি। আমরা জানি যুদ্ধের অর্থ আমাদের স্কুল কলেজে আবার মিলিটারীর আস্তানা, আমরা জানি যুদ্ধের অর্থ সেই ৫০ সনের মতো আমাদের শত শত নারীর ইজ্জতহানি, আমরা জানি এবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গুলি ও বোমার আঘাতে আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ধ্বংস হইবে। যুদ্ধের এই বিপদ সম্পর্কে আমরা যুব সমাজ সচেতন হইয়াছি। আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজ চাই স্বাধীনতা; শান্তি, সুখী ও উন্নত জীবন।

প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সরকার ও শাসক দল কর্তৃক ইসলামকে ব্যবহার করা প্রসঙ্গে ঘোষণাটিতে বলা হয় :

জাতীয় জীবনের এই সমুদয় পুঞ্জীভূত সমস্যা ও সঙ্কট সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন তুলিলেই সরকার আত্মরক্ষার একাধিক প্রকারের বর্ম পরিধান করিয়া থাকেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল শিশু রাষ্ট্রের দোহাই। কিন্তু সেই দোহাই-এর স্বরূপ আজ জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাই আজ "শিশু রাষ্ট্রের" কথা আমরা শুনিতে পাই না। আজ আবার নূতন ধরনের বুলি তাঁহারা আওড়াইতেছেন। আমরা দেশের কোন সমস্যার কথা তুলিতে গেলেই আমাদিগকে আখ্যা দেওয়া হয়– "রাষ্ট্রের শত্রু বা রাষ্ট্রদ্রোহী"। কোন প্রকার সমস্যা সমাধান হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে কেন, এইরূপ প্রশ্ন করলেই তার জবাব স্বরূপ সরকার হইতে বলা হয় "ইসলামী শরিয়তের বিধান মতে ইহা করিতে হইবে সে কারণে দেরী হইতেছে।"

...পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে একাধিক সরকারী মুখপাত্র হইতে আমরা অনুরূপ জওয়াবই পাইয়াছি। তদুপরি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতক নাজিমুদ্দীন, কায়েদে আজমের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে ছাড়েন নাই।

ইসলামের নামে আজ তিন বৎসর যাবত আমাদের নেতারা জনসাধারণকে অনেক ভাঁওতা দিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম, তাহাদের "প্রোগ্রামে" তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের সাথে যোগাযোগ যতটুকু তাহা দিন দিনই আমাদের দেশবাসীর নিকট পরিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। ইসলামের প্রতি জনসাধারণের ভালবাসা আছে তাহা আমাদের নেতারা জানেন, তাই তাহারা ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই পরস্পর ইসলামের বুলি আওড়াইতেছেন, অর্থাৎ "ইসলাম", "রাষ্ট্রদ্রোহী", "রাষ্ট্রের শত্রু" প্রভৃতি বুলি সরকার যে কোন আন্দোলনের মুখে আত্মরক্ষার ধর্মরূপে এবং গণদাবীকে চাপা দেওয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতে চাই যে, আমাদের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। আত্মসর্বস্ব নেতাদের বাগাড়ম্বর দ্বারা নয়। পাকিস্তানের যে রঙিন স্বপ্ন আমরা দেখিয়াছিলাম নেতাদের কার্যকলাপ তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্ব আমাদের যুব সমাজকেই লইতে হইবে।

এই সব বক্তব্যের পর ঘোষণাপত্রটিতে "আমাদের ঘোষণা ও দাবী"

www.pathagar.com

শীর্ষক অংশে বলা হয় :

১। আমরা যুদ্ধ চাই না। দুনিয়ার যুব সমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হইব না। আমরা দাবী করিতেছি যে, আমাদের সরকার যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক।

এ কথাও আমরা ঘোষণা করিতে চাই– এটম্ অস্ত্র হইতেছে আক্রমণের অস্ত্র, মানুষকে ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অস্ত্র। তাই আমরা দাবী করিতেছি এটম অস্ত্রকে বিনাশর্তে অবৈধ ঘোষণা করা হউক এবং এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য তারপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

যে সরকার প্রথম কোন দেশের বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র ব্যবহার করিবে, সেই সরকার মানব জাতির শত্রুতা করিবে, আমরা তাহাকে যুদ্ধ অপরাধে অপরাধী মনে করিব।

আজ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে, দুনিয়ার গুটিকয়েক রাষ্ট্র এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির আজাদীর আন্দোলনে ভীত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা মারমুখো হইয়া ঐ সব দেশে রক্তের স্রোত বহাইয়া দিতেছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় আওয়াজ তুলিতে চাই এবং আজাদী সংগ্রামে নিযুক্ত আমাদের কোটি কোটি ভাই-বোনদের অভিনন্দন, অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই।

২। আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করুক এবং পাকিস্তানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম হউক। যাহাতে প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিবে, প্রত্যেকটি উপজাতি পাইবে কৃষ্টির স্বাধীনতা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করিবে সমান নাগরিক অধিকার এবং আরবী হরফহীন বাংলা হইবে রাষ্ট্রভাষা।

৩। আমরা চাই বেকারীর অবসান এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক যুবতীর চাকরি ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্য সরকারী ভাতা।

৪। আমরা চাই প্রাপ্তবয়স্কদের সাবর্জনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন।

৫। আমরা চাই দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি, যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষার জন্য বর্ধিত হারে ব্যয় বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রয়োজন অনুসারে মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত যুব সমাজের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের উন্নতি, ছাত্রছাত্রীদের আবাসস্থল বৃদ্ধি ও ছাত্র বেতন হ্রাস।

৬। আমরা চাই যুব সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য শহরে ও গ্রামে সরকার কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে পাঠাগার, ক্লাব ও খেলা-ধুলার ব্যবস্থা এবং বর্তমানে যে সমস্ত পাঠাগার ও ক্লাব আছে সেইগুলিতে সরকারী সাহায্য, মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

৭। আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রভূত পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ–শহরে ও গ্রামে প্রচুর চিকিৎসালয় ও ব্যায়ামাগার স্থাপন।

৮। আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি।

৯। আমরা চাই শ্রমিকের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসেবে সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ। শ্রমিক যুবকদের জন্য খেলাধুলা, পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

১০। আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ, বড় বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।

১১। আমরা চাই যুব সমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র বহন করিবার অধিকার।

১২। আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, বিনা বিচারে আটক রাখার কানুন নাকচ, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, মেয়েদের, চাকুরেদের নিজ নিজ সংগঠন গড়ার, সভা সমিতি করার ও মত প্রকাশের পূর্ণ ও অবাধ অধিকার। প্রত্যেকটি দলের নিজ মতানুযায়ী কাজ ও মত প্রকাশ করিবার বৈধ অধিকার।

১৩। আমরা চাই দেশের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা।

১৪। আমরা চাই সকল প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান।

"আমাদের ঘোষণা ও দাবী" শীর্ষক এই কর্মসূচীর পর যুব লীগের ঘোষণা পত্রটিতে সাধারণভাবে যুবকদের প্রতি নিম্নোক্ত আহ্বান জানানো হয় :

আমরা জানি যে, দেশের যুব সমাজের তথা সমস্ত সমাজের উন্নতির জন্য মূল প্রয়োজন–রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সরকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন ও মৌলিক পুনর্গঠন। সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপরোক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে দলমত ধর্ম নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমস্ত যুব সমাজ যুব লীগে যোগদান করিয়া পাকিস্তানের সর্বত্র শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

আমরা জানি যে, আমাদের পথ সহজ নয়। বহু বাধা কায়েমী স্বার্থের রক্তচক্ষু ও অত্যাচার আমাদের এই জয়যাত্রার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, কিন্তু দেশের যুব সমাজ অসাধারণ শক্তির অধিকারী। মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তার জন্য চাই যুব সমাজের ঐক্য ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা।

দুনিয়ার দেশে দেশে আজ যুব শক্তির অতুলনীয় অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। দেহে অমিত শক্তি ও মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহারা আজ আগাইয়া চলিয়াছে স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আসুন আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজ দল-মত নির্বিশেষে তাহাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হই। আমাদের জীবনের সর্ববিধ উন্নতি ও পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করার জন্য আমরা চাই স্বাধীনতা,

www.pathagar.com

শান্তি ও গণতন্ত্র। আমরা চাই দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান।

২৭শে মার্চ, ১৯৫১, তারিখে যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, প্রস্তাবাবলী ও ঘোষণা থেকে যে অংশগুলি উপরে উদ্ধৃত করা হলো সেগুলির গুরুত্ব, শুধুমাত্র যুব সম্মেলনের দলিল হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দলিলগুলিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ জীবনের বিভিন্ন দিকের যে চিত্র পাওয়া যায় সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য।

মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর যুব লীগের খসড়া ঘোষণাপত্রটি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের দ্বারা সামান্য রদবদল হয়ে গৃহীত হওয়ার পর "পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ" নামে একটি যুব সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ১২৫ সদস্যবিশিষ্ট "পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সংগঠনী কাউন্সিল"।[১৪] প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয় রাত্রি আড়াইটায়।[১৫]

২৮শে মার্চ বিকেল ৪-৩০ মিনিটে ৪৭ নম্বর ঠাঁটারী বাজারে ৩০ জন সদস্যের[১৬] এই বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের একটি কার্যকরী কমিটি[১৭] গঠিত হয় :

> সভাপতি–মহম্মদ আলী (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ); সহ-সভাপতি–খায়েজ আহমদ (সম্পাদক-সংগ্রাম), ইয়ার মহম্মদ, শামসুজ্জোহা, আবদুল মজিদ, দৌলতুন্নেছা; সাধারণ সম্পাদক–অলি আহাদ; যুগ্ম সম্পাদক–আবদুল মতিন, রুহুল আমীন; কোষাধ্যক্ষ–টি.এ. চৌধুরী; সদস্য– নূরুল হুদা, মোহাম্মদ তোয়াহা, মতিউর রহমান, আব্দুল হালিম, আবদুস সামাদ, মকসুদ আহমদ, খোন্দকার গোলাম মোস্তফা, কবির আহমদ, আবদুল ওদুদ, এ. গফুর চৌধুরী, প্রাণেশ সমাদ্দার।

এই কাউন্সিল অধিবেশনে একটি পৃথক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের যুব সমাজকে একটি যুব প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় নূরুল হুদার উপর।[১৮]

২৮শে মার্চ তারিখে সন্ধ্যার সময় তেজগাঁও-এ সম্মেলন উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। মশাল জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের স্থানটি আলোকিত করা হয় এবং পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিল্পীরা গান, বাজনা, আবৃত্তি ও কমিক পরিবেশন করেন। এইভাবে দুইদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান যুব সম্মেলন সমাপ্ত হয়।[১৯]

এই সম্মেলনের উপর 'নবীন আশার আলো' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে সাপ্তাহিক নওবেলাল বলেন :

> সম্প্রতি পাকিস্তান যুব সম্মেলনের অনুষ্ঠানের ফলে "পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ" জন্মলাভ করিয়াছে। এই নোতুন প্রতিষ্ঠানটির জন্মলাভ আমাদের জাতীয় জীবনে

www.pathagar.com

এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের যুব সমাজের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে- কিন্তু সেই যুব সমাজের কর্মপ্রচেষ্টা সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি, "পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ" দেশের যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিয়া জাতিকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ করিয়া তুলিবে। আমরা জানি, তাহাদের জয়যাত্রা ব্যর্থ করিয়া দিবার প্রয়াস পাইবে কায়েমী স্বার্থবাদ। কিন্তু যৌবনের দৃঢ় শপথ তাকে সম্মুখের পানে আগাইয়া লইয়া যাইবেই।[২০]

৩. যুব লীগের প্রাথমিক সাংগঠনিক তৎপরতা

১৯৫১ সালের ২৭শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুব লীগের সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়। পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সব প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন এবং কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যে দিয়েই সাংগঠনিক তৎপরতার সূত্রপাত করেন। এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ২৩শে এপ্রিল পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় গঠিত শাখাসমূহে এবং ঢাকায় যুব লীগের উদ্যোগে কবি ইকবাল-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।[১] এরপর ১৩ মে ঐ একইভাবে সারা প্রদেশে যুব লীগ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করে।[২]

যুব লীগের সাংগঠনিক কাজকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং বিভিন্ন এলাকায় কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য ২৭ ও ২৮শে মে ১৯৫১ তারিখে ঢাকা জেলার নরসিংদীতে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সাংগঠনিক কাউন্সিলের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৩] এই অধিবেশনে যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ বলেন, "দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে সুসংবদ্ধ করা–বর্তমান মন্ত্রিসভার কবল হইতে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পূর্ণভাবে মুক্ত করাই আমাদের বর্তমান জরুরী কাজ।"[৪]

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর এই অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এগুলির মধ্যে একটিতে যুব লীগের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক প্রচারণার জবাবে বলা হয় যে, "পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দিক হইতে উত্থিত প্রশ্নের উত্তরে সাংগঠনিক কাউন্সিলের এই সভা পুনরুক্তি করিতেছে যে, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে কর্মরত যুবকগণের একটি গণতান্ত্রিক সাধারণ প্রতিষ্ঠান। অতএব ইহাকে একটি রাজনৈতিক দল বলিয়া সন্দেহ করার কোন হেতু নাই।"[৫]

www.pathagar.com

ধর্মঘটী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের মনোভাব ও নীতির তীব্র নিন্দা করে এবং অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে প্রস্তাবে পাট ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত আয়কর ধার্য করে তার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নতির জন্য ব্যবহার করার দাবীও জানানো হয়।[৬]

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন★ তার প্রশংসা করে এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারী অফিস সমূহে অবিলম্বে বাংলাকে কার্যকরী ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করার দাবী জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৭]

এই সময় সরকার সংবাদপত্রের উপর যে সব নিষেধাজ্ঞা জারী ও নির্যাতন করেন★★ তার নিন্দা করে অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, "জনসাধারণের প্রতিবাদকে অবজ্ঞা করে পাঞ্জাবের 'নওয়াইওক্ত' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ এবং 'পাকিস্তান অবজার্ভার', 'ইনসাফ', সাপ্তাহিক 'সৈনিক' ও 'সংগ্রাম' পত্রিকার উপর নানারূপ আঘাত দ্বারা সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিতেছেন।"[৮]

২২শে জুলাই ১৯৫১ তারিখে ঢাকায় যুব লীগের কার্যকরী সংসদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে একটি সাংগঠনিক প্রস্তাবে বিভিন্ন শাখা যুব লীগের নির্বাচনের তারিখ এইভাবে নির্ধারণ করা হয়, (১) প্রাথমিক শাখা ১৫ই অক্টোবর (২) থানা ও শহর শাখা ৩০শে অক্টোবর (৩) মহকুমা শাখা ১৫ই নভেম্বর (৪) জেলা শাখা ৩০শে নভেম্বর এবং (৫) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫১।[৯]

এরপর ঢাকায় কার্যকরী সংসদের অপর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৬শে অক্টোবর ১৯৫১। ইতিপূর্বে ১লা অক্টোবর একটি সরকারী প্রেস নোটে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ৫ বৎসরের অনুর্ধ বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য আরবী, উর্দু ও বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ঘোষণা দেওয়া হয় তার প্রতিবাদ করে প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাদানের দাবী জানিয়ে এই বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১০]

অপর একটি প্রস্তাবে লবণের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির★★★ ভয়াবহতার

★চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

★★পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। -ব.উ

★★★পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। -ব.উ

www.pathagar.com

উল্লেখ করে বলা হয় যে, তা সরকারের দেউলিয়া শিল্প নীতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। প্রস্তাবে সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য লবণ আমদানির উপর সকল প্রকার বিধিনিষেধ রহিত, পূর্ববঙ্গ লবণ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অতি সত্ত্বর পূর্ববঙ্গে লবণ তৈরির উপর সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা এবং লবণের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর পাঁচ বৎসর কোন কর ধার্য না করার কথা বলা হয়। খুলনার দুর্ভিক্ষাবস্থার উপরও এই বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১১]

নভেম্বর মাসে যুব লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে পূর্ব বাঙলার অনেকগুলি জেলা সফর করেন এবং তাঁদের উপস্থিতিতে কতকগুলি জেলায় যুব লীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।[১২] এই প্রাথমিক সাংগঠনিক কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় যুব লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন।

৪. যুব লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন

১৯৫১ সালের ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ আলী। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম। সম্মেলনে ইষ্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সভাপতি কামরুদ্দীন আহমদও বক্তৃতা করেন।[১]

এই সম্মেলনে যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাতে যে শুধু যুব লীগের প্রতিষ্ঠার পরবর্তী নয় মাসের সাংগঠনিক রিপোর্টই প্রদান করা হয় তাই নয়, তৎকালীন অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও রিপোর্টটিতে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য উপস্থিত করা হয়।

যুব লীগের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে যে প্রচারণা সরকারী এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে করা হচ্ছিলো সে সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ তাঁর রিপোর্টে বলেন,

> কোন কোন মহল হইতে বলা হইতেছে যে, যুবলীগ মুসলিম লীগের লেজুড়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা আওয়ামী লীগের শাখা। আবার কেহ কেহ আমাদের প্রতিষ্ঠানকে 'কমিউনিষ্টদের প্ল্যাটফরম' বলিয়া অভিহিত করেন। আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন মহল যখন পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করিতেছেন তখন ইহা প্রমাণিত হয় যে, কাহারও মতই ঠিক নহে। যুব লীগ কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের "শাখা" বা প্ল্যাটফরম নয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা

www.pathagar.com

প্রয়োজন যে, যুব লীগ কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র প্রতিষ্ঠান নয়, সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ছাত্র যুব সমাজকে সংগঠিত করিতে যুব লীগ চেষ্টা করিবে। আমাদের যুব লীগ কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দ্বারা চালিত নয়। ঘোষণায় সম্বলিত কর্মসূচী যুব লীগের আদর্শ এবং যে কোন দলের, যে কোন শ্রেণীর, যে কোন মতের যে কোন ধর্মের যুবক যুবতী ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। যুব লীগ সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত যুব সমাজের গণতান্ত্রিক গণপ্রতিষ্ঠান। যদি কেহ ইহাকে নিজেদের দলগত স্বার্থে ব্যবহার করিতে চাহেন, তবে তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইবেন এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, যুব লীগের প্রত্যেকটি কর্মী ও সভ্য যুব লীগের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখিয়া ইহাকে যুব সমাজের সত্যিকারের গণপ্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিবেন; ইহার ভিতর ব্যাপক যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন।[২]

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অলি আহাদ যুব লীগের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী সম্মেলনের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন :

১। ঘোষণার বাণী সর্বত্র প্রচার করা। যুবলীগ সম্পর্কে যে সব সংশয় উঠিবে অনবরত প্রচার দ্বারা তাহা দূর করা এবং এই উদ্দেশ্যে একটি মুখপত্র প্রকাশ করা।

২। যুব সমাজের বিভিন্ন স্তরের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়া– তাঁহাদের বেকারীর সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা ও অন্যান্য স্থানীয় সমস্যা নিয়া তাঁহাদের ভিতর দৈনন্দিন কাজ চালান ও সেই সব সমস্যা দূরীকরণের জন্য আন্দোলন করা।

৩। যুব সমাজের প্রগতিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা। পাড়ার ও গ্রামের ক্লাব লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং খেলাধুলা প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা। যে সব ক্লাব লাইব্রেরী প্রভৃতি আছে সেগুলিকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। সরকার যাহাতে ক্লাব লাইব্রেরীর প্রচলন করে ও ক্লাব লাইব্রেরীকে সাহায্য করে তাহার জন্য আন্দোলন করা।

৪। যুব সমাজের ভিতর হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গণশিক্ষার অভিযান চালান, নাইট স্কুল করা ও সরকার হইতে যাহাতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য আন্দোলন করা।

৫। ব্যক্তিস্বাধীনতা কায়েম ও সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির জন্য সারা প্রদেশে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়া।

৬। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আন্দোলন করা। অবাঙালীদের শিক্ষার মাধ্যম হইবে তাঁহাদের নিজস্ব ভাষা।

৭। সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্য ছাড় ও এশিয়া ছাড় আন্দোলন গড়িয়া তোলা।

৮। সাংগঠনিক দিক দিয়া ব্যাপকভাবে যুব লীগের সভ্যসংগ্রহ ও প্রত্যেক জেলায় শাখা গঠন। প্রতিটি কমিটিতে সমষ্টিগতভাবে কাজ করানোর জন্য কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক প্রভৃতি করা।

৯। প্রতি কমিটির তরফ হইতে সভ্য ও বন্ধুদের নিকট হইতে নিয়মিত চাঁদা আদায় ও একটি প্রাদেশিক তহবিল গঠন করা।

১০। যুব কর্মীদল গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা করা।[৩]

www.pathagar.com

আলোচনার পর এই কর্মসূচীটি সম্মেলনে গৃহীত হয়।[৪] এই সম্মেলনে যুব লীগের কার্যকরী সংসদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচিত হন :

> সভাপতি–মাহমুদ আলী। সহ-সভাপতি–মির্জা গোলাম হাফিজ, ফয়েজ আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, ইয়ার মহম্মদ খান, শামসুজ্জোহা। সাধারণ সম্পাদক– অলি আহাদ। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক–মহম্মদ সুলতান ও ইমাদুল্লাহ। কোষাধ্যক্ষ–মাহবুব জামাল জাহেদী। সদস্য–আবদুল হালিম, আবদুল মতিন, এ.বি. এম. মুসা, নূরুল হুদা, আনওয়ারুল হুসেন, আবদুল ওদুদ, আবু তাহের, সালেহউদ্দীন, আবদুল ওদুদ, সুফী খান, আলী আশরাফ, এ. রহমান সিদ্দিকী, মুতাহের হুসেন, নূরুর রহমান, মফিজুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুস সামাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, আবদুল কাদের ও প্রানেশ সমাদ্দার।[৫]

দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সম্মেলনে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় তিনশো কাউন্সিল সদস্য ও প্রতিনিধি যোগদান করেন।[৬]

৫. সম্মেলনে যুব লীগের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের বিবরণ

পূর্ব বাঙলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অলি আহাদ তাঁর রিপোর্টে বলেন,

> আমরা আজ যখন এখানে সমবেত হইয়াছি, তখন পূর্ব বাঙলার অন্যতম শস্য ভাণ্ডার খুলনা জেলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ* বিরাজ করিতেছে। মুসলিম লীগ এম,এল,এ, জনাব সবুরের বিবৃতি হইতেই জানা যায় যে, এই দুর্ভিক্ষে ইতিমধ্যেই ১০ হাজার নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন এবং প্রতিদিন অনশনে লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। ৫০ সনের মন্বন্তরে সারা বাংলাদেশে মানুষের জীবনে ব্যাপকভাবে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল আজ খুলনা জেলায় ছোট আকারে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। না খাইয়া পথের ধারে শিয়াল কুকুরের মতো প্রাণত্যাগ করা, একমুঠা ভাতের জন্য পিতামাতার নিজের সন্তানকে বিকাইয়া দেওয়া, গৃহস্থ বাড়ীর কুলবধূর লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া এক মুঠা ভাতের জন্য রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান নারীর ইজ্জতহানি প্রভৃতি ৫০ সনের মন্বন্তরের প্রতিটি জঘন্য ঘটনাই আজ খুলনার গরীব জনসাধারণের জীবনে ঘটিতেছে। এই দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে আজ পূর্ব বাঙলার অগণিত যুবক-যুবতী তাঁহাদের প্রাণ হারাইয়াছেন।[১]

ঐ দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয়,

> অন্যায়ভিত্তির উপর রচিত ভূমিব্যবস্থা, তদুপরি নদ-নদী খাল বিল সংস্কারের অভাবে উত্তর দিক হইতে আগত নদীগুলির মিঠা পানির চাপ কমিয়া যাওয়াতে দক্ষিণ হইতে আগত লোনাপানির উপর্যুপরি বন্যা এবং পাক-ভারত বাণিজ্যের ভিতর নানা বাধা নিষেধ হেতু খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলের কাঠ, পাটি, মাদুর, হোগলাপাতা প্রভৃতির বাজার নষ্ট হইয়া যাওয়া– এই সমস্ত কারণেই আজ খুলনার নর-নারী দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। যে যুবশক্তি সুস্থ সবল মানুষ হিসাবে পাকিস্তানের সর্ববিধ উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করিতে

---

*বস্তৃত বিবরণের জন্য পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। –ব.উ.

www.pathagar.com

পারে সেই যুব শক্তির এক অংশই আজ অনাহারে খুলনার পথে ঘাটে প্রাণ হারাইতেছে। ইহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য দেশের আর কি হইতে পারে। যে মূল অর্থনৈতিক কারণে খুলনার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, সেই মূল কারণ পূর্ব বাংলার সমস্ত জেলাতেই বিদ্যমান।

সে জন্যই, সোনার পূর্ব পাকিস্তানে শস্যের উৎপাদন ঘাটতি এবং সে জন্যই খুলনাতে আজ যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সেরূপ বিপর্যয় যে কোন স্থানে দেখা দিতে পারে।★ বস্তুত রাজশাহী জেলার আত্রাই এলাকায় লোকচক্ষুর অন্তরালে গত ৭ বৎসর দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলিয়াছে। এ বছর সিলেটের বড়লেখা, গোলাপগঞ্জ, জগন্নাথপুর প্রভৃতি কয়েকটি থানায়, বরিশালের কয়েকটি মহকুমায় ও নোয়াখালীর হাতিয়ার জনগণও বিষম খাদ্য সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তাই এ কথাই বলা চলে যে, আমরা পূর্ব বঙ্গের যুব সমাজ তথা সমস্ত নর-নারী চির দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার ভিতর বাস করিতেছি। যখন যেখানেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে তখনই সেখানে সেখানকার দুঃস্থ ভাইবোনদের সাহায্যে ছুটিয়া যাওয়া যুব লীগ কর্মী ও যুব সমাজের অবশ্য কর্তব্য। তবে চির দুর্ভিক্ষের এই বিভীষিকা হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ হইল আমাদের দেশের ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। সে দিকেও আমরা আপনাদের এবং পূর্ব বাঙলার যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।[২]

এরপর লবণ সঙ্কটসহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের অপরাপর দিক সম্পর্কে অলি আহাদ বলেন,

পূর্ব বাঙলায় রহিয়াছে হাজার মাইল সমুদ্র উপকূল কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী অবহেলার জন্যই এখানে লবণ তৈয়ারী শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই এবং পূর্ব বাঙলার জনগণকে ১০ হইতে ১৬ টাকা সের দর দিয়া লবণ কিনিয়া খাইতে হইয়াছে।★★ এখনও অধিকাংশ স্থানে লবণের সের এক টাকা। নূন ভাত খাওয়াও আজ আমাদের সামনে কঠিন সমস্যা।

নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি জিনিসের দাম আজ আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সরকারের সমর্থক "মর্নিং নিউজ" কাগজে ২২/১০/৫১ইং তারিখে খবর বাহির হইয়াছে "অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসের দামও টাকায় আরও দুই হইতে চার আনা বাড়িয়াছে। যে সব সিগারেট সাধারণ লোক ব্যবহার করে তাহার দাম আগের মতই চড়া। খাসী ভেড়ার গোস্তের দাম ৩৷. টাকা সের, মাছ দুই টাকার উপর। অন্যান্য বহু জিনিস কালোবাজারে চলিয়া গিয়াছে। সর্বত্রই জীবন ধারণের খরচের নিষ্ঠুর চাপে জনগণ অসহ্য দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন কিন্তু ব্যবসায়ী চোরাচালানী ও চোরাকারবারিরা প্রভূত মুনাফা করিতেছে।"

এর উপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। করাচীর ব্যবসায়ী মহলও এক উপাখ্যানের মত অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়াছে। (পাকিস্তান অবজার্ভার ২৬/১০/৫১ইং) যে সব

★বস্তুতপক্ষে ১৯৪৭-৪৯ এবং ৫১ সালে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলায় দুর্ভিক্ষ অথবা প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করে। বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ। -ব.উ.

★★লবণ সঙ্কটের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'র দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ। -ব.উ.

www.pathagar.com

কারণের জন্য আজ এই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা আজ সুবিদিত। মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী মুনাফাখোর পূর্ব বঙ্গের ব্যবসা বাণিজ্যে একাধিপত্য করিতেছে এবং তাহারা মুনাফার জন্য জিনিসপত্রের দাম যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে অথচ সরকার হইতে ইহার কোন প্রতিবিধান করা। চেষ্টা করিতেছেন না।

আমাদের ধারণা যে ১৯৩৯ সনে জীবন ধারণের খরচের মান যদি ১০০ ধরা যায় তাহা হইলে এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে পূর্বেকার কয়েকগুণ। জীবন ধারণের খরচা বৃদ্ধির এই পটভূমিকায় দেশের কৃষক সমাজ তাঁহাদের পণ্য অত্যন্ত কম মূল্যে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। এবার পাটের মরশুমে যখন সাধারণ কৃষকগণ পাট বিক্রি করেন তখন পাটের দর ছিল ১৫ হইতে ২০ টাকা। উত্তরবঙ্গের কৃষকদের অন্যতম প্রধান অর্থকরী শস্য পাট এবার তাঁহারা ৪ টাকা মণ দরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেখানে আখের দর কৃষকগণ পাইতেছেন মণ প্রতি গড়ে ১৸৵। ইহাতে তাহাদের উৎপাদন খরচই পোষায় না।

কাজেই একদিকে জীবন ধারণের খরচের অসম্ভব রকম বৃদ্ধি ও অন্যদিকে নিজের ফসলের কম দাম এই উভয় সঙ্কটের যাঁতাকলে পড়িয়া সমগ্র কৃষক সমাজ বিষম দুর্গতি ভোগ করিতেছেন এবং কৃষক যুব সমাজ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছেন। পূর্ববঙ্গের কৃষক যুব সমাজের অধিকাংশের দৈনিক খাওয়া হইল এক বেলা এক তরকারী ভাত। তাও রোজ জোটে না। আর অন্য বেলা শাকসবজি সিদ্ধ।

দৈনিক কায়িক পরিশ্রম করিয়া যে সব যুবক জীবন ধারণ করেন তাঁহাদের অবস্থা আজ কি? ঢাকা শহরে প্রায় ৭০০০ রিক্সাচালক আছেন যাহাদের অধিকাংশই গরীব যুবক। ৮/৯ ঘণ্টা গাড়ী টানিয়া তাহাদের আয় দৈনিক ৪ টাকা ৪৷. আনার মত। ইহার ভিতর তাহাদের চা নাস্তা খাইতে চলিয়া যায় এক টাকা দেড় টাকা এবং রিক্সা ভাড়া বাবদ দিতে হয় ২ টাকা। বাড়ীতে তাঁহারা নিয়া যান দৈনিক ১ টাকা দেড় টাকা। এই সামান্য আয়ে পাঁচ জনের সংসার চলে না। তাই পূর্ব বঙ্গের রাজধানীতে যেখানে লাট সাহেব, মন্ত্রী, বড় বড় আমলা ও মুষ্টিমেয় ধনী প্রাসাদোপম ইমারতে বিলাসে কালযাপন করেন সেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশ এই বস্তীবাসী গরীব জনগণ সকালে কোন নাস্তা খান না, সস্তা চা পানি খাইয়া ক্ষুধা মিটান। দিনের পর দিন অপুষ্টিকর খাওয়া ও সারাদিন কঠোর পরিশ্রম ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে একজন সুস্থ সবল রিক্সাচালক যুবক তিনমাস রিক্সা চালাইয়াই প্রথম আক্রান্ত হন যকৃতের ব্যাধিতে, পরে হয় যক্ষ্মা। আজ নিদারুণ যক্ষ্মা রোগ বস্তিবাসী মেয়েদের ভিতরও ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঢাকা নগরীর বস্তিবাসীদের প্রতি দশ ঘরে একজন যক্ষ্মা রোগী পাওয়া যায়। শহরের গরীব যুব সমাজ আজ তিলে তিলে ধ্বংসের পথে চলিয়াছেন।

www.pathagar.com

কলে-কারখানায় যে সব শ্রমিক কাজ করেন তাঁহাদের মূল মজুরী ও মাগ্গী ভাতাও বাড়ে নাই। আজও রেলওয়ে বিভাগের ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ডম্যানের বেতন মাত্র ৩৩ টাকা। কাজেই, জীবন ধারণের খরচা বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহাদের জীবন ধারণের মানের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে।

সরকারী চাকরিতে যে সব গরীব যুবক নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অবস্থা কি? প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরে নিযুক্ত জমাদারের মাসিক বেতন ৫৬ টাকা ও চাপরাশীদের বেতন ৫১ টাকা। আবার যাঁহারা নীলক্ষেত ব্যারেকে থাকেন তাঁহাদের বেতন হইতে ঘরভাড়া বাবদ কাটিয়া নেওয়া হয় ৬৷৴ । কাজেই মাসে ৪৫৷৷. টাকা আয় নিয়া যে এই গরীব চাকুরিয়াগণকে পরিবারসহ অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটাইতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

মধ্যবিত্ত যুব সমাজের অবস্থাও মোটেই ভাল নয়। মুষ্টিমেয় যুবক-যুবতী সরকারী কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া কিছু কিছু সুবিধা পাইয়াছেন বটে। কিন্তু চাকুরিতে নিযুক্ত অধিকাংশ মধ্যবিত্ত যুবক যুবতী অভাবের ভিতর দিয়াই জীবন যাপন করিতেছেন। প্রাদেশিক তথ্য বিভাগের (Provincial statistical board) প্রকাশিত তথ্য হইতেই জানা যায় যে, ঢাকা শহরের শতকরা ৭৮টি মধ্যবিত্ত পরিবার আজ নিজের আয়ে সংসার চালাইতে পারেন না।

কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, একদিকে স্বল্প আয় অন্যদিকে জিনিসপত্রের চড়া দাম এই উভয় কারণ হেতু পূর্ব বঙ্গের মধ্যবিত্ত শহরের গরীব শ্রমিক ও গ্রামের কৃষক যুব সমাজ যাহারা সমগ্র যুব সমাজের শতকরা ৯৫ জনেরও বেশী তাহাদের জীবন ধারণের মানের ক্রমাবনতি এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হেতু তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে। প্রাদেশিক তথ্য বিভাগের মাসিক পুস্তিকা হইতে পূর্ব বাংলার জেলা শহরগুলির জন্ম ও প্রধান প্রধান অসুখের মৃত্যুর মানের যে হিসাব আমরা নীচে দিলাম তাহা হইতেই আজ অবস্থার গুরুত্ব বোঝা যাইবে :

সময়		সমস্ত শহরের জন্ম	সমস্ত শহরের মৃত্যু
ডিসেম্বর	১৯৫০	৯৬৪	১২০৪
জানুয়ারী	১৯৫১	৬৪৯	৮৬৫
ফেব্রুয়ারী	১৯৫১	৭৮৬	৭৫৯
মার্চ	১৯৫১	৭৮৫	৮৯৯
এপ্রিল	১৯৫১	৫৯৯	৮৩৭

উপরের এই সব তথ্য সম্পূর্ণ নয়। কারণ, শহরের গরীবের ঘরের অনেক জন্ম মৃত্যুর কোন হদিস থাকে না। তাছাড়া গ্রামে যেখানে বিনা চিকিৎসায় প্রতিদিন বহু মৃত্যু ঘটে তাহার কোন তথ্যও পাওয়া যায় না। তবুও উপরের তথ্য হইতে এই নিষ্ঠুর সত্য বাহির হইয়া আসে যে, আজ পূর্ববঙ্গে জন্ম হইতে মৃত্যুর হার

www.pathagar.com

অধিক। আজ জাতি তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।[৩]

সাধারণভাবে পূর্ব বাঙলার জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার এই বর্ণনা দেওয়ার পর যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ তাঁহার রিপোর্টে বেকারত্ব সম্পর্কে বলেন,

> পূর্ব বঙ্গের যুব সমাজের আর একটি প্রধান সমস্যা হইল বেকারী। বেকারী যে কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি তাহার প্রমাণ। পাকিস্তান অবজারভারে কিছুদিন আগে নীচের খবর দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল।
>
> (ক) বরিশালে ১০০টি★ কনস্টেবল পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছিল ৮০০০ যুবক!
>
> (খ) চট্টগ্রাম ডকে ৫টি টালি ক্লার্কের পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন ১৫০ জন। টালি ক্লার্কের পদের যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল ম্যাট্রিক পাশ। কিন্তু ঐ ১৫০ জন প্রার্থীর ভিতর কয়েকজন ছিলেন বি.এ. এবং এম.এ. পাশ যুবক।
>
> কিছুদিন আগে ঢাকায় সরকারী দপ্তরে তিনটি সাধারণ চাকুরির পদ খালি হয়। ইহার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন হাজারের উপর। ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈসুণ্ডী মহল্লার আমাদের কর্মীদের নিকট হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের মহল্লার গরীবদের ভিতর ২৩ জন ম্যাট্রিক পাশ যুবকের ভিতর উপার্জনের পথ পাইয়াছেন মাত্র ৫ জন। বাকী ২৮ জন বেকার ও আধা বেকার।
>
> এই সব ঘটনার উপর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। অনাহার দারিদ্র ও বেকারীর জ্বালায় অস্থির হইয়া, সৎভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণের কোন উপায় না পাইয়া আজ পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার যুবক অসৎ পথে টাকা উপায় করিয়া বাঁচিবার পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী প্রতিটি জেলা হইয়াছে ভারতের সঙ্গে চোরাকারবারের ঘাঁটি। এই চোরাকারবারীরা যুব সমাজের বেকারীর সুযোগ নিয়া হাজার হাজার যুবককে তাহাদের চোরা আমদানি রপ্তানির প্রধান বাহক হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।[৪]

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সঙ্কটের উপর অলি আহাদ তাঁহার রিপোর্টে বলেন,

> দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে গলদ চলিতেছে তাহাতেও যুব সমাজের সামনে নানাবিধ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। গত আই.এ. পরীক্ষায় পাশের হার অত্যধিক কম হওয়াতে বহু ছেলে-মেয়ের আবার কলেজে পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ গরীব মা বাপের আজ এ ক্ষমতা নাই যে, একবার ছেলে-মেয়ে ফেল করিলে আবার পয়সা খরচ করিয়া পড়াইতে পারেন। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? প্রথম দায়ী এই অন্যায় সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাহার চাপে অধিকাংশ মানুষ গরীব হইয়া থাকিতেছে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে আজ বহু ছাত্র-ছাত্রীই সব পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারেন না, পরীক্ষার পড়াও তৈয়ার করিতে পারেন না। তৃতীয়ত, অধিকাংশ স্কুল কলেজেই উপযুক্ত শিক্ষক নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও বেতন কম। কাজেই পড়াশোনা ভাল হয় না। চতুর্থত, অধিকাংশ পরীক্ষকের মত ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম ছাত্রদের শিক্ষার অন্যতম অন্তরায়। এই সব কারণেই পরীক্ষায় ফেলের হার অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং অগণিত যুবক যুবতীর শিক্ষা কৃষ্টিগত উন্নতির পথ

★ এখানে পত্রিকায় শতকের ঘরের সংখ্যাটি অস্পষ্ট থাকায় ঠিক পড়া যায় না। যেটুকু পড়া যায় তাতে সংখ্যাটি ১ মনে হলেও, আসলে অন্য কিছু হওয়াও সম্ভব। –ব.উ.

www.pathagar.com

রুদ্ধ হইয়াছে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা হেতু কলেজে পড়া আজকাল বহু ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে এবং কোন কোন কলেজে ছাত্রের সংখ্যা কমিতেছে।...

> বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশাও চোখে দেখিয়াছি। রংপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ ৮ মাসের বেতন পান নাই। শুনা যায় যে, কর্তৃপক্ষ নাকি ডাকে চেক মারফৎ শিক্ষকদের মাহিনার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই চেক নাকি পোস্ট অফিসে উই পোকায় কাটিয়াছে। কাজেই চেক অচল হইয়া গিয়াছে। শিক্ষকগণও অনাহারে দিন কাটাইতেছেন।
>
> অল্প মাহিনা ও অনিয়মিত মাহিনার জন্য বহু প্রাথমিক শিক্ষকই অন্যান্য কাজে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন এবং ইহার দরুন সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আবার প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর যুবক যুবতীদের শিক্ষিত করার কোন ব্যবস্থাই নাই বলিয়া কোটি কোটি যুবক যুবতী অশিক্ষিত থাকিয়া যাইতেছেন।[৫]

সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয় :

> যুব সমাজ বিভিন্ন স্থানে নিজেদের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক ও দৈহিক চর্চার বা খেলাধুলার ক্লাব ও লাইব্রেরী বা প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য নাইট স্কুল গড়িয়া তুলিতেছেন। অত্যন্ত আশার কথা। কিন্তু এগুলি সরকার হইতে কোন অর্থ সাহায্য পায় না। অর্থের অভাবের দরুন যুব সমাজের সাংস্কৃতিক, মানসিক ও দৈহিক উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই সব ক্লাব লাইব্রেরী ও নাইট স্কুলগুলি উন্নতি করিতে পারিতেছে না।
>
> পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত যুব সমাজ নিজেদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন, ইকবাল, রবীন্দ্র, নজরুল দিবস ও অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানও করিয়াছেন। গত কয়েক মাসে বহু প্রগতিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহা তরুণ প্রাণের নূতন জাগরণের চিহ্ন এবং এই জাগরণে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক এবং ঢাকার লেখক ও শিল্পী মজলিশ, তমদ্দুন মজলিশ ও প্রগতিশীল উর্দু লেখকগণ ও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সফল অবদান রহিয়াছে।
>
> প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুব সমাজের এই নবজাগরণকে "কমিউনিষ্টদের কারসাজি ও যুক্ত বাংলা গঠনের চক্রান্ত" বলিয়া কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, পূর্ব বাংলার যুব সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এই হীন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।[৬]

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে অলি আহাদ তাঁর রিপোর্টে বলেন,

> মুসলিম লীগ সরকার জনমত পদদলিত করিয়াই চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী হইতে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু ভাষা ও আরবী বর্ণমালা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করিতেছেন। ইহার ফল কি হইবে? দেশের ছেলেমেয়েদের কচি বয়স হইতেই শিখিতে হইবে চারটি ভাষা-বাংলা, উর্দু, আরবী ও ইংরেজী-চিনিতে হইবে চারটি বর্ণমালা। ইহাতে কচি মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের শিক্ষাও হইবে না। তদুপরি, এ কথা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য যে, যদি জনসাধারণকে নিজের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না হয়, তাহা

www.pathagar.com

হইলে সেই জাতি কখনও শিক্ষিত হইতে পারে না। কাজেই আমাদের উপর উর্দু ভাষা ও আরবী হরফ চাপাইবার সরকারী সিদ্ধান্ত পূর্ব বাঙলার যুব সমাজের তথা সমস্ত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নূতনভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। অথচ উর্দু ও বাংলা মিশ্রিত এক বিকৃত, জারজ ভাষার সৃষ্টি করার চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা এবং করাচীতে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা এবং তাহাদের মোসাহেবেরা জনসাধারণের অজস্র অর্থের অপব্যয় করিয়া এই 'শঙ্কর' ভাষার প্রচলনে ব্যস্ত।

আজ আমাদের দারিদ্র্য, স্কুল-কলেজে শিক্ষকের অভাব, স্কুল-কলেজে অর্থের অভাব, ক্লাব লাইব্রেরীগুলির অর্থের অভাব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ ও আমাদের ভাষার উপর সরকারের আক্রমণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আনিয়াছে বিষম সঙ্কট এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে সৃষ্টি করিতেছে বিষম বাধা। সেই সঙ্গে আমেরিকা হইতে আমদানীকৃত যৌন বিষয়ক অশ্লীল সাহিত্য বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। সিনেমায় সিনেমায় দেখান হইতেছে বিকৃত রুচিসম্পন্ন ছবি। এইভাবে যুব সমাজের তরুণ মনকে কলুষিত করিবার জঘন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। সরকারের পুলিশ বিভাগ প্রগতিশীল সাহিত্যের আমদানি ও প্রকাশ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট কর্মতৎপরতা দেখায় বটে। কিন্তু আমেরিকার যৌন বিষয়ক অশ্লীল বইপত্র আমদানি বন্ধ করার কাজে সরকারের কোন প্রচেষ্টা নাই। সিনেমায় শিক্ষণীয় ছবি দেখানোর জন্য সরকার কোন উদ্যোগও নেন না।

উপরে বর্ণিত অবস্থা হইতে বুঝা যায় যে, ৯ মাস আগে আমাদের প্রথম সম্মেলনের সময়ে আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলাম, আমাদের সেই অর্থনৈতিক সমস্যা, জীবন ধারণের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সমস্যা, বেকারীর সমস্যা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট এবং আমাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা যুব সমাজের এই প্রত্যেকটি সমস্যাই মুসলিম লীগ শাসনের অধীনে আরো জটিল হইয়া উঠিতেছে।[৭]

পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুব লীগ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ও ঘটনায় কি ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে অলি আহাদ তাঁর রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে যা বলেন সেটা সাংগঠনিক দিক দিয়ে এবং সেই সঙ্গে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঠিক আগে পূর্ব বাঙলার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের সময় যুব লীগের ভূমিকা সম্পর্কে অলি আহাদ বলেন,

আমাদের সম্মেলনের ঠিক পরেই শুরু হয় পূর্ব বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের সাধারণ ধর্মঘট।★ প্রাথমিক শিক্ষকদের একটা বিরাট সংখ্যা যুবক এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা আপনারা সবাই জানেন। এ রিপোর্টেও তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল সমস্যা হইল অত্যন্ত কম মাহিনা (মাসিক গড়ে বাধ্যতামূলক এলাকায় ৩৮।৪ পাই এবং অন্যান্য এলাকায় যথাক্রমে ২৫৮/৪ পাই ও ১৯ ॥) ও অনিয়মিত মাহিনা। ইহার বিরুদ্ধে মাহিনা বাড়ানো ও নিয়মিত মাহিনা পাওয়ার মূল দাবী নিয়া তাঁহারা ১৯৫০ সনের

★ তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।–ব.উ.

www.pathagar.com

এপ্রিল হইতে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু করেন। প্রায় ২৫০০০ প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব বাংলার প্রত্যেকটি জিলায় বিভিন্ন স্থানে এই ধর্মঘট হয়। শিক্ষকদের এত বড় ব্যাপক ধর্মঘট পূর্ববঙ্গে আর হয় নাই। একমাত্র মুসলিম লীগ ছাড়া পূর্ব বঙ্গের আর প্রায় সমস্ত দল ও গণপ্রতিষ্ঠান এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানান। যুব লীগের প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটিও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেন এবং ফেনী, সিলেট, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে যুব লীগের কর্মীগণ এই ধর্মঘটের সহানুভূতিতে সভা শোভাযাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন।

সরকার এই ন্যায়সঙ্গত বৈধ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে দমননীতির হুমকি দেখাইতে থাকেন ও রংপুরে ধর্মঘটের নেতাকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু ধর্মঘট চলিতে থাকে ও দেড় মাস পরে প্রাথমিক শিক্ষকদের কোন কোন দাবী বিবেচনার ওয়াদা দিয়া সরকার শিক্ষকদের সংগঠনের সঙ্গে আপোষ করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার একটিও পালন করা হয় নাই।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের পরেই জুন মাস হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মীদের ধর্মঘট শুরু হয়। তাহাদের ভিতরও একটা বিরাট সংখ্যা হইল যুবক। অত্যন্ত কম মাহিনার জন্য তাঁহাদের জীবনে যে সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার তাগিদে এই চাকরিজীবীগণ বহুদিন হইতেই সরকারের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতেছিলেন কিন্তু সরকার সে সব গ্রাহ্যের ভিতর আনেন না। তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহারা নোটিশ দিয়া ধর্মঘট শুরু করেন। সরকার জরুরী আইন জারী করিয়া প্রথমেই এই বৈধ ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং সংবাদপত্রের উপর আদেশ দেন যাহাতে ধর্মঘটের কোন খবর কাগজে প্রকাশ করা না হয়। সরকার ধর্মঘটের নেতাদের গ্রেফতার করার জন্য হুলিয়াও জারী করেন। এই প্রচণ্ড দমননীতির সম্মুখীন হইয়াও ধর্মঘটীগণ ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে থাকেন। ইতিমধ্যেই কাশ্মীর সমস্যা নিয়া দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহাতে ধর্মঘট চালান যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া কর্মচারীগণ তাঁহাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া নেন।★ট

পাট চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়,

প্রতি বৎসরই যখন সাধারণ কৃষকগণ পাট বিক্রয় করেন তখন নানা চক্রান্ত করিয়া বড় বড় ব্যবসায়ীরা পাটের দর নামাইয়া দেয়। গত জুন-জুলাই মাসেও কাশ্মীর সমস্যা নিয়া যখন পাক-ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটে তখন তাহার সুযোগে পাটের বড় বড় ব্যবসায়ীগণ পাটের দর কমাইয়া দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার পাটের নিম্নতম ন্যায্য মূল্য স্থির করিয়া দেন। ইহাতে কৃষক যুব সমাজ তথা সমস্ত কৃষক সমাজের সামনে এক বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ঢাকার 'পাট চাষী সমিতি' চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বহুস্থানে সভা প্রভৃতির দ্বারা যে আন্দোলন শুরু করেন যুবলীগ তাহাতে সমর্থন জানায় এবং সেই সমিতির ভিতর যুবলীগ কর্মীরা রহিয়াছেন। যুব লীগের কার্যকরী সমিতি এক বিবৃতিতে দাবী করেন যে পাটের নিম্নতম দর ৪০ টাকায় ধার্য করা হোক এই দাবী নিয়া

★জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, বৈদেশিক শত্রুর বিরোধিতা ইত্যাদির নামে প্রণীত বৈদেশিক নীতিকে বুর্জোয়ারা কৌশলের সাথে সব সময়েই অভ্যন্তরীণ সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ার কাজে ব্যবহার করে থাকে। শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারটি এই ধরনেরই একটি উদাহরণ। –ব.উ.

www.pathagar.com

আমাদের যুব লীগ সহ-সম্পাদক সিরাজগঞ্জে এক বিরাট সভা করেন।

সরকার আজও পূর্ববঙ্গের পাট চাষীদের ন্যায্য দাবী মানিয়া পাটের নিম্নতম দর স্থির করিয়া দেন নাই। এ বিষয়ে সরকারকে বাধ্য করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের যুব শক্তিকে বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পাট আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদের উপর মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী ধনীর একচেটিয়া একাধিপত্য আমরা সহ্য করিব না।[৯]

খুলনার দুর্ভিক্ষ এবং লবণ সঙ্কটে যুব লীগের ভূমিকা সম্পর্কে অলি আহাদ বলেন,

খুলনায় আজ দুর্ভিক্ষের যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে তাহার প্রথম সূত্রপাত হয় গত এপ্রিল মাসে। কিন্তু তখনও সরকার ইহাকে আমল দেন নাই এবং জনগণের সামনেও ইহার বীভৎসতা ধরা পড়ে নাই। গত মে মাস হইতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগাইয়া আসেন। ঢাকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠান করিয়া 'খুলনা রিলিফের' জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। যুব লীগও গত মে মাসে খুলনা রিলিফের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সেদিন আমাদের কর্মীগণ ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ৯৩ টাকা আদায় করেন। সে টাকা আমরা খুলনায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু, অত্যন্ত লজ্জার সহিত একথা আমরা স্বীকার করিতেছি যে, ঐ সামান্য টাকা পাঠানো ছাড়া এতবড় বিপর্যয়ে খুলনার ভাই-বোনদের আমরা কোন সাহায্য করিতে পারি নাই। আমাদের এই শোচনীয় ব্যর্থতা আজ দূর করা দরকার।...

পূর্ববঙ্গে লবণ দুর্ভিক্ষের কথা আপনারা সবাই জানেন। বাজার হইতে লবণ উধাও হওয়ার পর সারা পূর্ববঙ্গে এক বিরাট গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বহু সভা, মিছিলের ভিতর দিয়া জনগণ একবাক্যে দাবী করেন যে, "সস্তা দরে লবণ দাও"। ঢাকায় যুব লীগের প্রাদেশিক সমিতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় লবণ সমস্যার উপর এক সভা করে। জামালপুর, সিলেট, ফেনী ও বরিশাল যুব লীগের কর্মীগণ সভা-সমিতি করিয়া সস্তা দরে লবণ চাই আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই উপলক্ষে আমরা দেখিয়াছি যে, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আজ ফ্যাসিস্টসুলভ মনোভাব দেখাইতেছেন। লবণের দাবীর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য যুব লীগের কর্মী জামালপুর কলেজের পাঁচজন ছাত্রের উপর কলেজের কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।[১০]

ভাষা আন্দোলনে যুব লীগের ভূমিকা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়,

নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করার জন্যও পূর্ব বাঙলার যুব সমাজ অগ্রণী হইয়াছেন। উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা করা ও বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একটি এ্যাকশন কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা সভা সমিতি করিয়া দাবী জানাইয়াছেন যে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হউক এবং আরবী হরফ চাপান চলিবে না। বহু স্থানে যুব সমাজ ও প্রগতিশীল অন্যান্য দল ও ব্যক্তিগণও এই দাবী নিয়া সভা সমিতি করিয়াছেন। যুব লীগও সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং এই দাবীর আন্দোলনে ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানে যুব লীগের কর্মীগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে ইহা জানাইতে চাই যে, আমাদের এই দাবী অন্য কোন ভাষার বিরুদ্ধে নয়। সমস্ত ভাষাই নিজ নিজ মর্যাদায় ও সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হোক

www.pathagar.com

ইহাই আমরা চাই। আমরা ইহাও চাই যে, পূর্ববঙ্গে যে সব অবাঙালী জনসাধারণ বাস করিতেছেন তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হোক।

আমাদের দেশের জন্য আমাদের মূল দাবী হইল যে, আমাদের ভাষাকে পদদলিত করা চলিবে না, আমাদের ভাষার পূর্ণ মর্যাদা আমরা চাই। ইহা আমাদের জাতীয় দাবী এবং এই দাবী আমরা হাসিল করিতে চাই।[১১]

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয় :

আজ দেশে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে ও আমাদের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য যে আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে সেই সমস্ত আন্দোলনে সাহায্য করা, এ বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং সংস্কৃতি ও ভাষার সমস্ত আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করা। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির "লালজুজুর" ভয় দেখাইয়া ও বাঙালী অবাঙালী বিরোধ সৃষ্টি করিয়া এই সব আন্দোলনে যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সমস্ত যুব সমাজ দলমত ধর্ম জাতি নির্বিশেষে সমস্ত যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করুন। আমেরিকা হইতে অশ্লীল যৌন সাহিত্য আমদানি সিনেমায় বাজে ছবি দেখাইয়া আজ যুব সমাজের তরুণ মনকে কলুষিত করার যে অপচেষ্টা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। যদি আজ আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে সমস্ত জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। তাই আজ সংস্কৃতি ও ভাষাকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব বাংলার যুব সমাজের ভিতর প্রাণের যে নূতন স্পন্দন আসিয়াছে তাহাকে আগাইয়া নিয়া যান, আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে মহান করিয়া তুলুন।[১২]

ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য যুব লীগের আন্দোলন প্রসঙ্গে রিপোর্টটিতে যা বলা হয় তার মধ্যে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তে তৎকালীন সরকারের গণবিরোধী নীতি এবং নির্যাতনের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় :

গত নয় মাসের কাজের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহাও দেখেছি যে যুব সমাজের ন্যায়সঙ্গত বৈধ আন্দোলনগুলির উপরও দমননীতি চালাইতেছেন। মেডিক্যাল স্কুল ছাত্রদের, প্রাথমিক শিক্ষকদের ও সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটী যুবকদের উপর সরকারের দমননীতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। লবণের দাবীতে আন্দোলন করার অপরাধে জামালপুর কলেজের পাঁচজন ছাত্রের স্টাইপেন্ড নাকচ হওয়ার কথাও বলা হইয়াছে। এছাড়া গত ৯ মাসে আরও যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাও আপনাদের সামনে পেশ করিতেছি।

গত ১৫ই আগস্ট দিবসে সিলেটের জনগণের উপর পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে বৈধ সভা করার অপরাধে সিলেট জেলা যুব লীগের সহকারী সভাপতি জনাব নূরুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মোতাসিম আলী ও আবদুল বারীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঐ জেলার প্রখ্যাত যুব নেতা জনাব হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পুলিশ হুলিয়া জারী করে। বরিশাল শহরে রিক্সা চালকদের বৈধ আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ বরিশাল যুব লীগের সম্পাদক জনাব আলী আশরাফ, রিক্সা ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রী সুনিল বসু, মিউনিসিপ্যালিটির একজন যুবক কমিশনার প্রভৃতিকে বরিশাল শহর হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন।

www.pathagar.com

গাইবান্ধার যুব কর্মী জনাব আবু তাহের ও আওয়ামী লীগ সম্পাদক আবদুস সোবহানকে সরকার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। কিশোরগঞ্জ যুব লীগের অফিসে ও যুব লীগ সম্পাদকের বাড়ীতেও পুলিশ সম্প্রতি খানা তল্লাশী চালাইয়াছে। কর্তৃপক্ষের দমন নীতি যে কি জঘন্য রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। দুই মাস আগে সিলেট সরকারী কলেজের ম্যাগাজিনে জমিদার জোতদার পুঁজিপতিদিগকে সাবধান করিয়া দিল্লী কনভেনশনে কায়েদে আজম যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু কায়েদে আজমের বাণীতে ধনী ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল সেই হেতু কর্তৃপক্ষ ইহা সহ্য করিলেন না। সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রথম সেই ম্যাগাজিনের প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন। পরে কায়েদে আজমের সেই বাণীর উপর সাদা কাগজ লাগাইয়া ম্যাগাজিন প্রচলন করা হয়। বর্তমান শাসক চক্রের দমন নীতির তাণ্ডবে পাকিস্তানে কায়েদে আজমের বাণী জনসমক্ষে প্রচার করিবার অধিকারও আমাদের নাই। ইহার আরও প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি যে, বর্তমান শাসক চক্রের স্বার্থের জন্য খাতুনে মিল্লাত মিস জিন্নাহর রেডিও বক্তৃতা হইতেও অংশ বিশেষ ছাটিয়া দেওয়া হয়। এই শাসক চক্রের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই জনাব সোহরাওয়ার্দীর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সফরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল। এই শাসক চক্রের গদী টিকাইয়া রাখার জন্যই আজ পূর্ববঙ্গে নূতন করিয়া কুখ্যাত জননিরাপত্তা আইন জারী করা হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের আওয়ামী লীগ, পূর্ববঙ্গ ব্যক্তিস্বাধীনতা লীগ, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সঠিকভাবেই বলিয়াছেন যে, জনগণের নিরাপত্তার জন্য নয়, "বর্তমান শাসক চক্রের গদীর নিরাপত্তার জন্যই" এই আইন পাশ করা হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলিতে চাই যে, বর্তমান শাসক চক্র নিজেদের গদী টিকাইয়া রাখা ও মুষ্টিমেয় ধনীর স্বার্থ রক্ষার জন্য গত চার বছর যাবত যুব সমাজের উপর দমন নীতি চালাইতেছেন, বহু বিশিষ্ট যুব কর্মীকে তাঁহারা আটক করিয়া রাখিয়াছেন ও আটক করিতেছেন এবং তাঁহাদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা টিকাইয়া রাখার জন্যই তাঁহারা এই কুখ্যাত নিরাপত্তা আইন পাশ করিয়াছেন।

সরকার পক্ষ বলিয়া থাকেন যে, "পাকিস্তান বিরোধী" শক্তিগুলিকে দমন করার জন্যই তাঁহারা নিরাপত্তা আইন পাশ করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তান বিরোধী কে? যাঁহারা আজ পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য কাজ করেন, আন্দোলন করেন, সংগঠন গড়েন তাঁহারা পাকিস্তান বিরোধী? না, যাঁহারা কায়েদে আজমের বাণী প্রচলন করিতে দেন না, যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষক, সরকারী চাকুরিয়া, শ্রমিক, রিক্সাচালক, রাজমিস্ত্রী, ছাত্র প্রভৃতি সমস্ত যুব সমাজের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবনতি ঘটাইয়া দেন, তাঁহারা পাকিস্তান বিরোধী?

"পাকিস্তান বিরোধী শক্তি দমন করার" ভাঁওতার আড়ালে শাসকচক্র আজ যুব সমাজের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত বৈধ আন্দোলন দমন করিতেছেন, আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা কাড়িয়া নিতেছেন। পূর্ব বাংলার যুব সমাজ ইহা সহ্য করিতে পারেন না। গত ৯ মাসে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সরকারের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে যুব লীগ প্রতিবাদ জানাইয়াছে। যুব লীগের কর্মীরা আজ ব্যক্তি

www.pathagar.com

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছেন এবং যুব লীগের সম্পাদক ও বরিশাল জেলা যুব লীগের সভাপতি যখন গত নভেম্বর মাসে বিভিন্ন জেলায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা গাইবান্ধা রংপুর, বগুড়া, আক্কেলপুর, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের জনসভায় ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঢাকা শহরে পাট চাষীদের সহিত ও একটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যুবলীগ নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করিয়াছে। বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানও আজ নিরাপত্তা আইনের নাকচ ও সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী নিয়া আন্দোলন করিতেছে। ঢাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মিলিত উদ্যোগে একটি ব্যক্তিস্বাধীনতা লীগ গঠিত হইয়াছে। আমরা ইহাতে যোগদান করিয়াছি এবং 'ব্যক্তিস্বাধীনতা লীগ' নিরাপত্তা আইনের নাকচ ও সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির মূল দাবী উত্থাপন করিয়াছে। আমরা আপনাদের নিকট ও পূর্ব বাংলার সমস্ত যুব সমাজের নিকট আবেদন করিতেছি যে, পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।[১৩]

এরপর রিপোর্টটিতে কাশ্মীর সমস্যা, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর হত্যাকাণ্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশের জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ দেওয়ার পর জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়।[১৪]

রিপোর্টের শেষে সাংগঠনিক কাজের হিসেব দিতে গিয়ে বলা হয় :

পূর্ব বাংলায় গত ৯ মাসের যুব আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন প্রশ্নে যুব সমাজ নিজেদের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন করিয়াছেন। যুবলীগ সাধ্যমত সেই সব আন্দোলনে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের কাজের গলদ অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহা হইল যে, আমরা যুব লীগের কর্মীগণ যুব সমাজের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়া, যেমন বেকারীর সমস্যা, গরীব যুবকদের মঞ্জুরী বাড়ানোর প্রশ্ন, ছাত্রদের শিক্ষা বা বাসস্থানের সমস্যা, মেয়েদের শিক্ষার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করি নাই। যুব সমাজের শরীর চর্চা, খেলাধুলা প্রভৃতির জন্য আন্দোলনও আমরা করি নাই।

যে সমস্ত প্রশ্ন বা সমস্যা সাধারণভাবে সময়ে সময়ে সারা দেশ বা যুব সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে আমরা সেই বিষয় নিয়া আন্দোলন করার ভিতরই আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। আমাদের কাজের ধারার এই গলদ আজ দূর করা দরকার। আজ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, যুব সমাজের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি নিয়া যদি আমরা আন্দোলন গড়িতে চেষ্টা না করি, যদি যুবক-যুবতীদের প্রতিটি সমস্যায় যুব লীগ তাঁহাদের পাশে গিয়া না দাঁড়ায়, যদি তাঁহাদের প্রতিদিনকার আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপার নিয়া যুব লীগ তাঁহাদিগকে সংগঠিত করিতে চেষ্টা না করে, যদি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা এর চারিটি বিষয়েই আমাদের কাজে ধারা প্রবাহিত না হয় তাহা হইলে যুব লীগ কখনই ব্যাপক যুব সমাজের প্রতিনিধিত্ব মূলক গণপ্রতিষ্ঠান রূপেই দাঁড়াইবে না।

www.pathagar.com

এ কথাও সত্যি যে, যদিও যুব লীগ আজ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে তবুও আমাদের প্রতিষ্ঠান এখন সমস্ত শ্রেণীর যুব সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হয় নাই। আমাদের সংগঠন এখনও সারা পূর্ব বাংলার শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে নাই। ঢাকা নগরীতে বিভিন্ন পাড়ায় এখনও আমাদের সংগঠন হয় নাই।

আমাদের সংগঠন নিম্নলিখিত স্থানে গঠিত হইয়াছে : বরিশাল জেলা যুব লীগ, বগুড়া জেলা যুব লীগ, বগুড়া শহর যুব লীগ, আক্কেলপুর (স্থানীয়) যুব লীগ, গাইবান্ধা মহকুমা যুব লীগ, কিশোরগঞ্জ মহকুমা যুব লীগ, সিলেট জেলা যুব লীগ, কুমিল্লা জেলা যুব লীগ, ফেনী মহকুমা যুব লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুব লীগ, রংপুর জেলা যুব লীগ, জগন্নাথ কলেজ যুব লীগ (ঢাকা), ময়মনসিংহ জেলা যুব লীগ, জামালপুর মহকুমা যুব লীগ।

উপরোক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, মাত্র ৮টি জেলায় আমাদের সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রাম জেলায় আমাদের সংগঠন এখনও গড়িয়া উঠে নাই। যে সব স্থানে সংগঠন আছে, সেগুলিও এখনও মজবুত নয়। সংগঠনের কাজ মাত্র শুরু হইয়াছে। সেই জন্যই আমাদের সভ্য সংখ্যাও খুব কম। সংগঠনের আরও একটি গুরুতর দুর্বলতা যে আমাদের পরিধি এখনও প্রধানত: ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শহরের গরীব, শ্রমিক ও কৃষক যুবকদের ভিতর আমাদের সংগঠন গড়িয়া উঠে নাই। মেয়েদের ভিতরেও আমরা কাজ করিতে পারি নাই।[১৫]

এই সব সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয় :

আমাদের সাংগঠনিক এই দুর্বলতার কারণ কি? পূর্ব বাঙলার যুব সমাজ কি যুব লীগের কর্মপন্থায় সাড়া দেয় না? না, তাহা নয়। আমাদের "ঘোষণা" যেখানে পৌঁছিয়াছে সেখানেই যুব সমাজ সাড়া দিয়াছে।

কিন্তু আমরা যুব লীগের কর্মীগণ আজও সেই "ঘোষণার" বাণী ব্যাপকভাবে যুব সমাজের ভিতর প্রচার করি নাই। আমরা আজও সেই কর্মপন্থা নিয়া পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে গ্রামে যুব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা করিতে পারিতেছি না। আমাদের এই মূল ত্রুটির জন্যই যুব লীগের সংগঠন এখনও মজবুত হয় নাই।

সংগঠন গড়ার কাজে আমাদের আরও সমস্যা আছে। আমাদের কমিটিগুলি সমষ্টিগতভাবে কাজ করিতেছে না। জেলা ওয়ার্কিং কমিটি হইতে শুরু করিয়া স্থানীয় কমিটি পর্যন্ত কোন কমিটিরই নিয়মিত বৈঠক হয় না। গত ৯ মাসে প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইয়াছে ৮টি এবং দুঃখের বিষয় ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সভ্যগণও সমস্ত বৈঠকে উপস্থিত হন নাই। জেলা এবং স্থানীয় কমিটিগুলিতেও এইসব সমস্যা রহিয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে, আমাদের ভিতর বহু কর্মীর কাজে প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক আর্থিক সমস্যা প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট কাজ করিতে পারিতেছেন না। কাজেই এইসব সমস্যা সমাধানের পথ বাহির করিয়া আজ আমাদের কর্তব্য হইবে যুব লীগের একদল আত্মত্যাগী কর্মী গঠন করিয়া তোলা। এ কথাও আমরা জানি এবং গৌরবের

www.pathagar.com

সঙ্গেই ঘোষণা করিতে পারি যে, যুব লীগের ভিতর পূর্ব বাঙলার সমাজের আত্মত্যাগী অগ্রণী অংশের একটি বিরাট সংখ্যার সমাবেশ হইয়াছে। আমাদের এই অধিবেশনই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। নানা দুঃখ কষ্ট, প্রতিবন্ধক, দমননীতি অগ্রাহ্য করিয়াই আপনারা যুব সমাজের স্বার্থের জন্য যুবলীগ গঠনে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনারা আপনাদের কর্মশক্তি দ্বারা যুব লীগকে মজবুত করিয়া তুলুন এবং যুব সমাজের ভিতর হইতে আরও নোতুন নোতুন কর্মী সংগ্রহ করিয়া আসুন।

আমাদের কাজে আর একটি সমস্যা হইলে অর্থের অভাব। প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও সমর্থকদের চাঁদাই আমাদের একমাত্র আয়ের পথ। স্বভাবতই তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। অর্থের অভাবের জন্য উপযুক্ত প্রচার বিভিন্ন জেলায় আমাদের যাওয়া আসা, এমনকি সময় সময় প্রাদেশিক অফিসের দৈনিক কাজ চালানো পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। আমাদের সভ্য ও সমর্থকদের সংখ্যা আরও বহু পরিমাণে বাড়াইয়া এবং তাঁহাদের নিকট হইতে রীতিমতো চাঁদা আদায় করিয়াই আমরা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারি।[১৬]★

★পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদের রিপোর্ট উপরে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করার কারণ প্রথমত, এই রিপোর্টে ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব কালের সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র স্পষ্টভাবে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় সাংগঠনিক দিক দিয়ে যুব লীগের ভূমিকাই ছিলো অন্যসব রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা ছাত্র সংগঠনের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫১ সালে যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে অলি আহাদ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। কাজেই তিনি উপরোক্ত যে রিপোর্ট পেশ করেন তার খসড়া তৈরীর ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা থাকাই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক অবস্থা

১. মুসলিম লীগ

১৯৪৯ সালে ১৮ই এবং ১৯শে জুন ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে★ মুসলিম লীগের যে আভ্যন্তরীণ সংকট খোলাখুলিভাবে দেখা দেয়, সে সংকট পরবর্তী পর্যায়ে নিরসন না হয়ে ক্রমাগত আরও জটিল আকার ধারণ করে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খান কোন গুরুতর সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিলেই সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতেন। পাকিস্তান-পূর্ব কালেও তিনি এভাবে একাধিকবার ইস্তফা দেন। ১৯৪৯ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বেও তিনি একবার ইস্তফা দেন এবং তার ফলে আভ্যন্তরীণ সংকটের একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এইভাবে বারবার সভাপতির পদে ইস্তফা প্রদান করলেও কোন সুবিধাজনক বিকল্পের অভাবে তাঁকে বারবারই ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা হতো এবং তিনি আবার সভাপতির পদেই বহাল হতেন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারীতে আকরাম খান পুনরায় মুসলিম লীগ সভাপতির পদে ইস্তফা প্রদান করলে নোতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর পর সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হিসেবে মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী এবং হামিদুল হক চৌধুরীর নাম ঘোষিত হয়।[১]

আকরাম খানের পদত্যাগের পর ২০শে জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একটি অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকীর উপর প্রাদেশিক সভাপতি হিসেবে কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২] এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ও ফেনী মহকুমা মুসলিম লীগের

★'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'-এর প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা : ২২২-৩৩।–ব.উ.

www.pathagar.com

সম্পাদক শেখ নূরুল্লা চৌধুরী এবং কাউন্সিল সদস্য বজলুর রহমান ঢাকার মুন্সেফ কোর্টে প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ইনজাংশন জারীর জন্য আবেদন করলে সেই অনুযায়ী ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার প্রথম মুন্সেফ ফজলুল করিম চৌধুরী এক সাময়িক ইনজাংশন জারী করেন। পরে ৩রা মে তারিখে এই সাময়িক ইনজাংশনকে স্থায়ীভাবে বহাল রাখার জন্য তিনি নির্দেশ দেন।[৩]

উপরোক্ত দুইজন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলর মুন্সেফ কোর্টে আবেদন করেছিলেন যাতে আবদুল্লাহিল বাকীকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে কার্য পরিচালনা থেকে বিরত রাখা হয়। এ ছাড়া মুসলিম লীগ ওয়ার্কি কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁরা ২২ জন সদস্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর জন্যও আবেদন করেন। তাঁদের আবেদনে বাকীকে এক নম্বর এবং প্রাদেশিক সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী ও কোষাধ্যক্ষকে যথাক্রমে দুই ও তিন নম্বর বিবাদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৪]

মুন্সেফ ফজলুল করিম চৌধুরী আবদুল্লাহিল বাকীকে সভাপতি হিসেবে কাজ করা থেকে বিরত হওয়ার নির্দেশ দিলেও প্রাদেশিক সম্পাদককে তিনি এই নির্দেশ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। নির্দেশে বলা হয় যে, দুই নম্বর বিবাদী প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্পাদক হিসেবে কাজ পরিচালনা করবেন এবং অফিসের খরচ ইত্যাদি বাবদ তিনি মাসিক ৫০ টাকা ব্যয় করতে পারবেন। এই অর্থ কোষাধ্যক্ষ সম্পাদককে প্রদান করবেন। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি হিসেবে কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য মুন্সেফ ২২ জন সদস্যের উপরও নির্দেশ জারী করেন।[৫] বাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন কমরুদ্দীন আহমদ ও আজিজুর রহমান এ্যাডভোকেট এবং বিবাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন রেজাই করিম ও মেজবাহউদ্দীন এ্যাডভোকেট।[৬]

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের উপর ইনজাংশন জারী করে ঢাকার প্রথম মুন্সেফ যে রায় প্রদান করেন তার বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা জজ কোর্টে একটি আপীল রুজু করা হয়। এই আপীলের কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মুন্সেফের নির্দেশ অবৈধ ও ক্ষমতাবহির্ভূত। সুতরাং বাদীর আবেদন ও শপথ গ্রহণের উপর নির্ভর করে ইনজাংশন জারী করা আইনানুগ নয়।[৭]

এই আপীলের রায় প্রকাশিত হয় ২৩শে মে তারিখে। ঢাকার সহকারী দায়রা জজ নূর মহম্মদ খান তাঁর রায়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অস্থায়ী সভাপতি বাকী এবং অপর ২২ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার প্রথম মুন্সেফ যে নির্দেশ দেন সেই নির্দেশকে বাতিল ঘোষণা করেন।[৮] এর ফলে আবদুল্লাহিল বাকী সভাপতি এবং ২২ জন সদস্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে পুনর্বহাল হন।

এই সময় মুসলিম লীগ সংগঠনের সংকট যে শুধু কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধতা

www.pathagar.com

ছিলো তাই নয়। জেলা ও মহকুমা পর্যায়েও এই সংকট যথেষ্ট জটিল আকার ধারণ করে।

১৯৫১ সালের ২১ ও ২২শে জুলাই উত্তর সিলেট লোকাল বোর্ড হলে লোকাল বোর্ডের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দেওয়ান তৈমুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিলেটের পুরাতন মুসলিম লীগ কর্মীদের দুইদিনব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় মুসলিম লীগের জেলা ও মহকুমা এডহক কমিটিগুলির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে অনুরোধ জানান হয় যাতে তাঁরা সিলেট জেলায় মুসলিম লীগের কাজ পরিচালনার জন্য লীগ কর্মী ও জনসাধারণের আস্থাভাজন একটি তদারক কমিটি গঠন করেন এবং সেই কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক, মহকুমা ও জেলা লীগের নির্বাচন পরিচালনা করেন। এছাড়া প্রাদেশিক লীগের সাথে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য দেওয়ান তৈমুর রেজাকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে এবং মহকুমাগুলি থেকে ৯৫ জন সদস্য নিয়ে সভায় একটি অস্থায়ী পরিষদ গঠন করা হয়। কাজের সুবিধার জন্য একটি ছোট কমিটিও এই সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন দেওয়ান তৈমুর রেজা, নূরুর রহমান, মতসির আলী, মুনীরুদ্দীন আহমদ, আব্দুল লতিফ এম. এল.এ, এম.এ. বারী ও সাজ্জাদ আলী চৌধুরী।[৯]

উপরোক্ত সভার পর ১৯শে আগস্ট, ১৯৫১, তারিখে তৈমুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিলেটের জিন্নাহ হলে লীগ কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১০] এই সম্মেলনে সিলেট জেলা, উত্তর সিলেট মহকুমা ও সিটি মুসলিম লীগ এডহক কমিটির উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক লীগের বহু কর্মী, লীগ কাউন্সিলের সদস্য, জেলা ও মহকুমা লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণসহ অনেক মুসলিম লীগ কর্মী এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

সিলেট জেলা মুসলিম লীগ এডহক কমিটির আহ্বায়ক মঈনুদ্দীন আহমদ চৌধুরী সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সিলেটে মুসলিম লীগের দারুণ নিষ্ক্রিয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। বহুক্ষণ আলোচনার পর সিলেট জেলা, উত্তর সিলেট মহকুমা ও সিটি মুসলিম লীগ এডহক কমিটির উপর অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সিলেট জেলায় বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাবে প্রাদেশিক লীগ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানানো হয়। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর মঈনুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, মুদাব্বির হোসেন চৌধুরী, আব্দুর রব চৌধুরী এম.এল.এ, এবং দেওয়ান আবদুল বাসেত সভাস্থল ত্যাগ করেন।

সম্মেলনের বৈকালিক অধিবেশনে ভারত কর্তৃক পাকিস্তান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের নিন্দা করে ও ভারত সরকারকে তার সকল প্রকার আগ্রাসী

www.pathagar.com

তৎপরতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য পেশ করেন। এই সাথে সভাস্থ সকলে পাকিস্তান সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করলেও মুসলিম লীগের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে বক্তারা অনেকেই উল্লেখ করেন। আজমল আলী চৌধুরী মুসলিম লীগের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন, যে মুসলিম লীগ জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে না সে মুসলিম লীগের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না। মুসলিম লীগকে জনসাধারণের আস্থাভাজন হতে হলে সক্রিয়ভাবে দেশের সব সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। মুসলিম লীগকে আত্মস্বার্থে ব্যবহার করা চলবে না।

এডহক কমিটিগুলি ভেঙ্গে দেওয়া সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনার জন্য সম্মেলনে এ.টি.এম মাসুদকে আহব্বায়ক এবং দেওয়ান তৈমুর রেজা, আজমল আলী চৌধুরী, মাহমুদ আলী★ আব্দুর রহিম, আবদুল হাদি ও একরামুর রহমানকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

সিলেট জেলায় মুসলিম লীগের যে আভ্যন্তরীণ সংকটের পরিচয় উপরোক্ত সম্মেলন ও সিদ্ধান্তসমূহের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় সে সংকট ১৯৫১ সালের দিকে সমগ্র মুসলিম লীগ সংগঠনেরই সংকট ছিলো।

এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাহমুদ আলী সম্পাদিত নওবেলাল পত্রিকার ২৩শে আগস্ট ১৯৫১ সংখ্যায় 'মুসলিম লীগের পুনর্গঠন' নামক একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> বিগত ১৯শে আগষ্ট স্থানীয় জিন্নাহ হলে সিলেট জেলার মুসলিম লীগ সংগঠনের অন্যতম এডহক কমিটি কর্তৃক আহূত কর্মী সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে জেলা এডহক, সিটি এডহক এবং উত্তর সিলেট মহকুমা এডহক কমিটিগুলির উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই অনাস্থায় নতুনত্ব কিছুই নাই। ইতিপূর্বে মুসলিম লীগ কর্মীদের যত সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই উক্ত কমিটিগুলির উপর অনাস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি।
>
> আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি জিন্নাহ হলের সম্মেলনে যে সব পুরাতন কর্মী সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত কমিটিগুলির নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করেন এবং এডহক কমিটির আড়ালে জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চালবাজীর নিন্দা করেন। এইভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধি সাজিয়া জনসাধারণেরই মাথায় কাঁঠাল ভাঙার ব্যবস্থা কায়েম হইতে দিতে তাঁহারা নারাজ এই কথা সেইদিনকার সম্মেলনে লীগ কর্মীগণ পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুদীর্ঘ চারি বৎসরের মধ্যে মুসলিম লীগের কোন গঠনমূলক

★পূর্ব পাকিস্তানের যুব লীগের সভাপতি থাকা সত্ত্বেও মাহমুদ আলী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন।– ব.উ.

www.pathagar.com

কর্মসূচী না থাকায় লীগের সংগঠন কার্য অতি স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হইয়াছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে কোন কালেই লীগ সত্যিকার জন প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারিবে না। এ কথাও তাঁহারা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।

পাকিস্তান আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করিতে যাইয়া কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাকেও মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য গঠনতন্ত্রের মারফত আগাইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং তিনি মাত্র দশ বৎসরের স্বল্পকাল মধ্যে পাকিস্তান অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ যাঁহাদের হাতে মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে তাঁহারা যদি আদর্শহীনভাবে গঠনতন্ত্রকে বগলদাবা করিয়া শুধু এডহক ও মনোনীত কমিটি দ্বারা কাজ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহারা দারুণ ভুল করিবেন। তাঁহাদের এবম্বিধ কার্যকলাপ দ্বারা মুসলিম লীগের গোর রচনা করিবেন। আমরা পূর্বাহ্নেই ওই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া রাখিতেছি।

১৯শে আগস্ট তারিখের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাথে সিলেটের সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি ১লা, ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক লীগ সভাপতি আব্দুল্লাহিল বাকী, সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁদের বক্তব্য শ্রবণ করেন। এর পরে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ও প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী যত শীঘ্র সম্ভব সিলেট গিয়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।[১১]

প্রধানমন্ত্রী ও প্রাদেশিক লীগ সম্পাদকের এই প্রস্তাবিত সিলেট সফর সম্পর্কে কোন রিপোর্ট কোন সংবাদপত্রে পরবর্তী সময়ে দেখা যায় নি। এর থেকে মনে হয় যে, প্রাদেশিক সংগঠন থেকে জেলা সংগঠনকে এ ব্যাপারে যে আশ্বাস দেওয়া হয় সেটা শেষ পর্যন্ত একটি কাগুজে ব্যাপার হিসেবেই থেকে যায়।

এই পরিস্থিতিতে ডিসেম্বর মাসে সিলেট জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচন শেষ হয়। সুনামগঞ্জ দক্ষিণ সিলেট ও হবিগঞ্জে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সুনামগঞ্জে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী মহকুমা লীগ গঠিত হয় এবং অন্য দুইটি মহকুমায় লীগ সংগঠন দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ সংকটের জন্য উত্তর সিলেট মহকুমার নির্বাচন স্থগিত থাকে এবং দুই দলের রশিদ বইগুলি জেলা পুলিশ কর্তার হেফাজতে রাখার জন্য হস্তান্তরিত হয়।[১২]

উপরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রাদেশিক সংগঠন এবং সিলেট জেলা সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংকটের যে বিবরণ দেওয়া হলো তার থেকে মুসলিম লীগ দলের সাধারণ সাংগঠনিক অবস্থা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ঠিক এ কারণেই সংকট শুধু যে কেন্দ্রে অথবা একটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

ছিলো তা নয়। এই একই সংকট প্রতিটি জেলায়, মহকুমায় এবং সর্বত্র বিরাজমান ছিলো।

এই বিরাজমান সংকটের একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫১ সালের নভেম্বরে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের আটজন মুসলিম লীগ সদস্যের মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে পদত্যাগের মধ্যে। এই সদস্যেরা হলেন চট্টগ্রামের ফরিদ আহমদ চৌধুরী, আহমদ কবির চৌধুরী, কবির আহমদ চৌধুরী, আলী আহমদ চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আলী আহমদ খান, প্রাক্তন মন্ত্রী কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ, বরিশালের চৌধুরী আরেফ এবং নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী।[১৩]

১৪ই নভেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি থেকে পদত্যাগী সদস্যদের অভ্যর্থনা জানানো হয়।[১৪] অভ্যর্থনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক রফিউদ্দীন চৌধুরী। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ফরিদ আহমদ চৌধুরী বলেন যে, কুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করার সময় এসেছে।

লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির কয়েকজন সদস্যের পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন যে বিবৃতি দেন তার জবাবে পদত্যাগী সদস্যরাও একটি পাল্টা বিবৃতি প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির জবাবে বক্তৃতার সময় আলী আহমদ বলেন "জনাব নূরুল আমীন একটি কল্পনাপ্রসূত গল্পের দ্বারা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।" তিনি আরও বলেন, "জনাব নূরুল আমিন কর্তৃক জনসাধারণের বিশ্বাসভঙ্গের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তিনি ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ বক্তৃতা ঝাড়িতে যে শক্তি ব্যয় করেন দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি, সরকারের পাট নীতির ফলে উদ্ভূত দারিদ্র্য এবং লবণ, চিনি, কয়লা, কাপড় ও সরিষার তৈল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের ব্যাপারে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যয়িত হয় নাই।" জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের কথা উল্লেখ করে জনাব আলী আহমদ খান বলেন "জনাব নূরুল আমীন মুখে দেশপ্রীতি ও ন্যায় নিরপেক্ষতার বুলি যতই আওড়ান না কেন, বিনা বিচারে প্রদেশের রাজনৈতিক কর্মীগণকে কারা অন্তরালে আটক রাখিবার দায় হইতে তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে পারেন না। জনাব নূরুল আমীন তাঁহার পরিকল্পিত অর্ডিন্যান্সগুলি কার্যকরী করিতে সমর্থ হওয়ায় আজ পরম আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কিন্তু জনসাধারণ আর ঘুমাইয়া নাই।"

২. আওয়ামী মুসলিম লীগ

১৯৪৯ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হলেও সাংগঠনিক দিক দিয়ে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে

www.pathagar.com

নি। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি শহীদ সুহরাওয়ার্দী মাঝে মাঝে জনসভায় বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম জনসাধারণের কাছে কিছুটা পরিচিত হলেও সাংগঠনিক দিক দিয়ে দলটি তখনো খুব দুর্বল ছিলো। আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও মুশতাক আহমদ। দল গঠিত হওয়ার সময় শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন। পরে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে খাদ্য আন্দোলনের সময় তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং প্রায় আড়াই বৎসর জেলে থাকেন। কাজেই আওয়ামী লীগের বিশেষ কোনো সাংগঠনিক কাজ তাঁর পক্ষে এই পর্যায়ে সম্ভব হয় নি।

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শামসুল হক তখন যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা থাকলেও একটি নোতুন সংগঠনকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য যে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় সেটা তাঁদের দ্বারা তখনো পর্যন্ত ঠিকমতো সম্ভব হয় নি। এই সময় মওলানা ভাসানী এবং সামসুল হক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন এবং আওয়ামী লীগের নীতি, রাজনৈতিক লাইন, কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়ে অনেক জনসভায় বক্তৃতা করেন। যে কর্মসূচী তাঁরা সাধারণভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরেন তা হলো, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, পাট ব্যবসার জাতীয়করণ, মূল শিল্পসমূহ জাতীয়করণ, রাষ্ট্রীয় খাতে শিল্প গঠন, কুটির শিল্পকে উৎসাহ প্রদান ও তার বিস্তার ঘটানো, দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি উচ্ছেদ করা, ব্যাপক সেচকার্য হাতে নেওয়া ইত্যাদি।[১]

২৬শে এপ্রিল, ১৯৫১, তারিখে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটির একটি বৈঠক হয়।[২] এই বৈঠকে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব বাঙলার সম্পদ অপহরণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রাদেশিক সরকার ও জনগণের কাছে আবেদন করেন এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে এমনভাবে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানান যাতে বৈদেশিক বিষয়, দেশ রক্ষা ও মুদ্রা ব্যতীত অপর সকল বিষয় প্রদেশের এখতেয়ারভুক্ত হতে পারে।

একটি প্রস্তাবে তাঁরা বলেন যে, চাকুরি (সামরিক ও বেসামরিক), ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা এবং অপরাপর ব্যয় খাতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবী ক্রমাগতভাবে কেন্দ্রের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে আসছে, বিক্রয় করসহ আয়ের অন্যান্য উৎসগুলি কেন্দ্রের হাতে চলে গেছে, প্রাদেশিক তহবিলে স্থায়ী ঘাটতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পাট এবং অন্যান্য নীতি কৃষিজীবী এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য মধ্যবিত্তদের ধ্বংস ডেকে আনছে এবং এ সবের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন তাঁদের মধ্যে অল্প সংখ্যককে মন্ত্রীত্ব এবং অন্য ধরনের চাকরি ঘুষ হিসেবে প্রদান করে কেন্দ্রীয় সরকার অসন্তোষ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

অপর একটি প্রস্তাবে দেশে সংবিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য পাকিস্তান সংবিধান সভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এ ছাড়া ১৯৫২ সালের মধ্যে সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের এবং নিরাপত্তা আইন বাতিল ও সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবী জানিয়েও কয়েকটি প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করেন।

১৯৪৯ সালে যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় তার সঙ্গে শহীদ সুহরাওয়ার্দীর কোন সম্পর্ক ছিলো না। তিনি সে সময় কলকাতায় ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকা কালে তিনি সেখানে মামদোতের খানের সঙ্গে একত্রে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিলো না।

কিন্তু কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক না থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে সুহরাওয়ার্দীর একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো এবং তাঁরা শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে নিজেদের লোকই মনে করতেন। এজন্য সুহরাওয়ার্দী ঢাকা এলে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীরাই তাঁর সফরের সকল আয়োজন এবং সভা-সমিতির ব্যবস্থা করতেন।

১৯৫১ সালের ৭ই ডিসেম্বর শহীদ সুহরাওয়ার্দী ঢাকা এলে তেজগাঁও বিমান বন্দরে নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদি সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।[৩] কয়েকদিন পূর্ব বাঙলায় অবস্থানের পর সুহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান এবং পরে ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে মানকী শরীফের পীর এবং মামদোতের খান সহ আবার পূর্ব বাঙলা সফরে আসেন।[৪] এ সময় তাঁদের নির্ধারিত কর্মসূচীর অন্তর্গত থাকে ২৩ তারিখে আর্মানীটোলা ময়দানে একটি জনসভায় বক্তৃতা এবং সন্ধ্যার দিকে একটি কর্মী সম্মেলন। এই কর্মী সম্মেলনের ব্যাপারে যুবলীগও সহায়তা প্রদান করে। তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচী ছিলো রংপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ এবং খুলনার দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা সফর।

নভেম্বর মাসের ২৯শে তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় কিছু রাজনৈতিক কর্মী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৫]

১লা ডিসেম্বর মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একটি সভা করেন। নূরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায়

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান এবং অপরাপর রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৬] ডিসেম্বর মাসেই আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এছাড়া যুব লীগের কার্যকরী সংসদ এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রেরাও শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৭]

উপরে যে ধরনের সাংগঠনিক তৎপরতার উল্লেখ করা হলো তার বাইরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক কাজ এই পর্যায়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের ছিলো না।

৩. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি

পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর কোন সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী না থাকলেও সব ধরনের সরকারী নির্যাতনের ফলে পার্টি সংগঠনের পক্ষে খোলাখুলি কাজ একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রণনীতিগত লাইন অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের পরিণামে বহু পার্টি কর্মী জেলে থাকেন এবং অন্যেরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। কতকগুলি শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা কাজ করতেন এবং সেগুলি মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন অপরাপর ট্রেড ইউনিয়ন, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তার ফলে শেষ পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে বহিষ্কার করে। এই বহিষ্কারের পর কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত রেল শ্রমিকদের ইউনিয়নটি ১৯৪৯ সালের শেষ দিকেই বিলুপ্ত হয়। রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় ঢাকা জেলা সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা রিক্সাচালক ইউনিয়ন, বরিশাল বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আভ্যন্তরীণ নৌচালক ইউনিয়নকেও কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ইউনিয়ন হিসেবে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর ফলে এই ইউনিয়নগুলিও ঐ একই সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়।★

১৯৪৯ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠন শুধু যে শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তাই নয়। কৃষক এলাকাগুলিতেও ১৯৪৯ সালে এই একই ধরনের বিপর্যয় ঘটে।★★ কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন ছাত্র ফেডারেশনও এই সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির মূল পার্টিগত কাঠামো কোন রকমে টিকে থাকলেও তার সাংগঠনিক কাজ-

---

★১৭-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য-ব.উ.

★★পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি দ্বিতীয় খন্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।-ব.উ.

www.pathagar.com

কর্মের ক্ষেত্রে প্রায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই অচলাবস্থার কিছুটা অবসান ঘটে ১৯৫১ সালের মার্চ মার্সে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সংগঠিত হওয়ার পর। কারণ এই সংগঠনটির মধ্যে বহু কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিষ্টদের সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক কর্মী সমবেত হন ও জনগণের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করেন। যুবলীগ খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করে এক বৎসরের থেকে কম সময়ের মধ্যেই পরিণত হয় ছাত্র যুবকদের একটি ব্যাপক গণসংগঠনে।

৪. জাতীয় কংগ্রেস

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে সংগঠন পূর্ব বাঙলায় ছিলো সেটা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অধিকাংশ প্রভাবশালী নেতা ভারতে চলে যাওয়ায় এবং মধ্যশ্রেণীভুক্ত হিন্দুদের ব্যাপকহারে দেশত্যাগের ফলে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোও ভেঙ্গে পড়ে। এই কাঠামোকে নোতুনভাবে গড়ে তোলার কোন চেষ্টা পূর্ব বাঙলার কংগ্রেস নেতারা করেন নি। তাঁদের একমাত্র কাজ ছিলো পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হিসেবে পরিষদে উপস্থিত থাকা এবং বিতর্কে যোগদান করা।

১৯৫২ সালের প্রথম দিকে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের সংখ্যা ছিলো ৩৫। এঁদের মধ্যে কামিনী কুমার দত্ত, বসন্ত কুমার দাস, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, ডক্টর প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, রাজকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতা ও তার প্রতিক্রিয়া

১. খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতা

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে★ পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণ দানকালে বাংলা ভাষার দাবীকে প্রাদেশিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে তিনি বলেন যে, কায়েদে আজম উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।[১] তাঁর এই বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কায়েদে আজম ১৯৪৮ সালে ঢাকায় যে বক্তৃতা করেছিলেন তার একটা অংশ আমি শোনাতে চাই। বক্তৃতাটি আরও বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করার ইচ্ছা থাকলেও সময়ের অভাবে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না।"[২] এরপর খাজা নাজিমুদ্দীন জিন্নাহর ঢাকা বক্তৃতার যে অংশটি উদ্ধৃত করেন সেটা হলো এই,

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে, এ কথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা এই প্রদেশের অধিবাসীরাই, চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু একথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, এ প্রসঙ্গ পরে আসবে।

বক্তৃতাকালে নাজিমুদ্দীন আরও বলেন যে, কায়েদে আজম কঠোরভাবে প্রাদেশিকতার বিরোধিতা করতেন। যারা প্রাদেশিকতায় উস্কানী দেয় তাদেরকে নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন যে,

---

★বর্তমানে যে স্থানটি আউটার স্টেডিয়াম নামে পরিচিত।–ব.উ.

www.pathagar.com

এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে, কিছু সংখ্যক লোক একদিকে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার কথা বললেও তাঁরা অন্যদিকে প্রাদেশিকতাও প্রচার করেন।[৩]

আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের উল্লেখ করে নাজিমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, ইতিমধ্যেই সরকারী তত্ত্বাবধানে ২১টি পরীক্ষামূলক কেন্দ্রে সাফল্যের সাথে আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষা শিক্ষাদান করা হয়েছে। তাছাড়া এই ধরনের অসংখ্য শিক্ষা কেন্দ্র জনসাধারণ কর্তৃক খোলা হয়েছে।[৪]

খাজা নাজিমুদ্দীন ২৭শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলায় বক্তৃতা করেন। কিন্তু জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার মতো বাংলা ভাষা জ্ঞান তাঁর না থাকায় তাঁর বক্তৃতাটি উর্দু অক্ষরে লিখিত ছিলো। নাজিমুদ্দীনের বাংলা বক্তৃতার এই অক্ষরান্তর করেছিলেন মিজানুর রহমান।[৫] তিনি নিজে ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী এবং বাঙালী হলেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী।

নাজিমুদ্দীনের এই পল্টন বক্তৃতা সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বক্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন,

> নাজিমুদ্দীন পল্টন ময়দানে বাংলা ভাষা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন তার কথা আমরা পূর্বে কিছুই জানতাম না। আমি এবং নূরুল আমীন তাঁর বক্তৃতা শুনে রীতিমতো Stupified। আমার মনে হয় মিজানুর রহমান বক্তৃতাটির transcript তৈরী করেছিলেন।[৬]

খাজা নাজিমুদ্দীনের উপরোক্ত বক্তৃতা সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন[৭] বলেন,

> ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন মুসলিম লীগের কাউন্সিল মিটিং-এ যোগদানের জন্য ঢাকা এসেছিলেন। উর্দু অক্ষরে লেখা একটা বাংলা বক্তৃতা তিনি করাচী থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। কেউ কেউ মনে করতেন যে, সেটা আসলে মিজানুর রহমানের দ্বারা লিখিত হয়েছিলো।
>
> পল্টন ময়দানের জনসভায় পঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। ভাষার প্রশ্নে তিনি যা বললেন সেটা শোনার পরই আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে গণ্ডগোল হবে। সভামঞ্চে মোহন মিঞা আমার পাশেই বসেছিলেন এবং তাঁকে আমি সেটাই বলেছিলাম। এটা কোন জীবন্ত ইস্যুই ছিলো না, কিন্তু নাজিমুদ্দীন আকাশ থেকে এটাকে একটা ইস্যুতে পরিণত করলেন।
>
> সভা শেষ হওয়ার পর তাঁকে আমরা বললাম যে, ভাষার প্রশ্নটি তুলে তিনি

www.pathagar.com

নিশ্চিতভাবে একটা ভুল করেছেন। এর ফলে পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নিজের পল্টন বক্তৃতার বক্তব্যকে কিছুটা তরল করার চেষ্টা করেছিলেন।★

নাজিমুদ্দীনের এই বক্তৃতা সম্পর্কে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শাহ অজিজুর রহমান বলেন যে, পুরো বক্তৃতাটিই মীজানুর রহমান কর্তৃক লিখিত হয়েছিলো।[৯] উপরে যে তিনজন মুসলিম লীগ নেতার বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো তাছাড়া পূর্ব বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ (যিনি ছিলেন তৎকালে পূর্ব বাঙলায় কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের আসল প্রতিনিধি) এ প্রসঙ্গে বলেন,

> আমি এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কিন্তু পরে নাজিমুদ্দীন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বক্তৃতাটি পঠিত হওয়ার পূর্বে আমি সেটি দেখেছিলাম কিনা। আমি যখন 'না' বললাম, তিনি খুব বিস্মিত হলেন এবং আমাকে বললেন যে, তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বলেছিলেন প্রাদেশিক সরকারের Clearence-এর জন্য সেটি আমাকে দেখাতে। আমি যদি সেটা আগে দেখতাম তাহলে সেই বিবৃতি না দেয়ার জন্যই তাঁকে আমি পরামর্শ দিতাম।[১০]

২. পল্টন বক্তৃতার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

২৭শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর পল্টন বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক জিন্নাহর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়ার নামে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলায় পূর্ব বাঙলার সর্বত্র যথেষ্ট বিক্ষোভের সঞ্চার হলেও ২৯শে জানুয়ারীর পূর্বে কোন প্রতিবাদ সংগঠিত করা সম্ভব হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ২৯শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে এই সংগঠিত বিক্ষোভের সূচনা করেন।[১] এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পোস্টারিং করা হয়।[২]

ঐ দিনই পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ যুব লীগের পক্ষ থেকে নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে একট বিবৃতি দেন।[৩] এই বিবৃতিতে তিনি বলেন,

> ২৭শে জানুয়ারীর জনসভায় আলহাজ্ব খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে যে ঘোষণা করেছেন, সেটা দেখে

★পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জায়গা সফরের পর ৩রা ফেব্রুয়ারী নাজিমুদ্দীন ঢাকায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, তিনি পল্টন বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। তিনি কায়েদে আজমের মতই প্রকাশ করেছিলেন। তবে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পাকিস্তান গণপরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। নাজিমুদ্দীন এই সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন যে, "রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আমার বক্তৃতাকে এমনভাবে মোচড় দেওয়া হয়েছে যাতে মনে হয়েছে যে সেটা আমার নিজেই মতের অভিব্যক্তি। এটাকে ঘটনার বিকৃতি বলেই আমার মনে হয়।"[৮]

www.pathagar.com

আমরা বিস্মিত হয়েছি। তিনি সুযোগ মতো ভুলে গেছেন যে, মার্চ ১৯৪৮-এ পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বিগত ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন যে তৎকালে এই অংশে তাঁর সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এখন তাঁর এই বক্তব্য প্রদানের পর লোকে কি এই সিদ্ধান্ত করবে না যে, তিনি সাময়িকভাবে পশ্চাদপদসরণ এবং পরে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার উদ্দেশ্যেই সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন?

তিনি এই মর্মে আরও একটি ভুল বক্তব্য রেখেছেন যে, ২১টি কেন্দ্রে আরবী অক্ষরে বাংলা শিক্ষা প্রচলন সাফল্য লাভ করেছে। তাছাড়া তিনি আরও আবিষ্কার করেছেন যে, জনগণ নিজেরাই এ ধরনের কেন্দ্র খুলছেন। বিবৃতিটিকে আমরা একটি স্থূল মিথ্যা এবং আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার একটি চক্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হচ্ছি। এটা সত্যিই দুঃখের ব্যাপার যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামনে প্রথমবার উপস্থিত হয়েই পাকিস্তানের জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে তিনি চক্রান্ত শুরু করেছেন।

আমরা আমাদের সকল ইউনিটকে বিশেষভাবে এবং জনগণকে সাধারণভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যাতে তাঁরা এর নিন্দা করেন। আমরা এই সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির প্রতি যাতে তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের 'প্রতীক' ধর্মঘট আহবান করে এবং ঐদিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় একটি ছাত্রসভার ঘোষণাও প্রদান করে। সংবাদপত্রেও এই ধর্মঘট ও ছাত্র সভার নোটিশ প্রকাশিত হয়।[৪]

৩০শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের "প্রতীক" ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হয় এবং কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা দুপুরের দিকে আমতলায় নাজিমুদ্দিনের পল্টন বক্তৃতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের অন্যতম নেতা খালেক নওয়াজ খান।[৫] বিভিন্ন বক্তা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে বক্তৃতা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে নাজিমুদ্দীনের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য দাবী জানান। এই মর্মে প্রস্তাবও সেদিনকার ছাত্র সভায় গৃহীত হয়।[৬]

সভা শেষে যখন মিছিল বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মী ও নেতারা মিছিলের বিরোধিতা করেন। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও সেদিন মিছিল বের হয়। মিছিলে ছাত্রেরা আওয়াজ তোলেন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" "আরবী অক্ষর আমরা সহ্য করবো না" "নাজিমুদ্দীন গদী ছাড়ো"।[৭] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে মিছিল ফুলার

www.pathagar.com

রোড দিয়ে বর্ধমান হাউস (তৎকালে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন এবং বর্তমানে বাংলা একাডেমী)-এর সামনে দিয়ে এসে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ হয়। মিছিলের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমগ্র ঢাকা শহরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়।[৮]

ঐ একই দিন অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দীন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং "প্রাদেশিকতার" অভিশাপকে পাকিস্তান থেকে নির্মূল করার জন্য আহ্বান জানান।[৯]

৩. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

২৭শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতার পর যুব লীগের যুগীনগর অফিসে যুব লীগের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নোতুন পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণের বিষয় আলোচনার পর একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী তোয়াহা, অলি আহাদ প্রভৃতি যুব লীগের নেতারা আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।[১]

আওয়ামী মুসলিম লীগের ছাত্রফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং কর্মধারা নির্ধারণের জন্য ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঢাকা বার লাইব্রেরীতে একটি সর্বদলীয় সভা আহবান করে।[২]

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিশ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ সহ ঢাকার কিছু নেতৃস্থানীয় নাগরিক ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিরা ৩১শে জানুয়ারী এই সভায় উপস্থিত থাকেন। ঢাকার প্রায় সব রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।[৩]

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম খাজা নাজিমুদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, বিভাগপূর্ব কালে মুসলিম লীগের সমস্ত দাবীকে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতা বলে অভিহিত করেছিলো এবং তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ভারত বিভক্ত হয়েছিলো। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং একগুয়েমীপ্রসূত

www.pathagar.com

বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, দেশের প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনকে যাঁরা বিভেদ সৃষ্টিকারীদের কারসাজি বলে দাবিয়ে দিতে চান তারা যেখানে কোনো সমস্যা নেই সেখানে সমস্যা সৃষ্টি করেন। খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন সে চুক্তি প্রতিপালন করার জন্য তিনি দাবী জানান।[৪]

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নওয়াজ খান বলেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশের জন্য ১৯৪৮ সালে পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে নাজিমুদ্দীন একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর ২৭শে জানুয়ারীর ঘোষণার দ্বারা তিনি সেই চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন।[৫]

পূর্ব বাঙলার প্রাক্তন অর্থসচিব হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, মুসলিম লীগ ক্রমশই জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ছে। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন ঘোষণা প্রদানের আইনগত ক্ষমতা নাজিমুদ্দীনের নেই। তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবেই সেটা করেছেন।[৬]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক বলেন যে, কায়েদে আজমও একথা স্বীকার করেছেন যে জনগণই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবে। অধ্যাপক খায়রুল বাশার বলেন যে, বাংলা যখন সংখ্যাগুরুর মাতৃভাষা তখন বাংলাকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন বলেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে। মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণে ছাত্র ও কর্মীদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।[৭]

এই কর্মী সম্মেলনে অন্য যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যুবলীগ সম্পাদক অলি আহাদ, তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবদুল গফুর, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আবুল ফজল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন এবং নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সৈফুদ্দীন।[৮]★

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সভায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় ৪০

★এই সভায় অপরাপর বক্তাদের নাম এবং বক্তব্যের বিবরণ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কোন সূত্রের মধ্যে পাওয়া না যাওয়ায় তা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।—ব.উ.

www.pathagar.com

জন প্রতিনিধি নিয়ে একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি কাজী গোলাম মাহবুব।[৯★]

৩১শে জানুয়ারী সর্বদলীয় কর্মীসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :

১। "বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এই সভা ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও জনগণের সহিত নিজের চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলিয়া সম্প্রতি ঢাকায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দা ব্যক্ত করিতেছে।

"সেই হিসেবে এই সভা খাজা নাজিমুদ্দীনকে তাঁহার অগণতান্ত্রিক ও অযাচিত ঘোষণা প্রত্যাহার করিবার জন্য দাবী জানাইতেছে।"[১০]

২। "বাংলা ভাষাকে হত্যার আর একটি চক্রান্ত হিসেবে বাংলায় আরবী অক্ষর প্রচলনের জন্য এই সভা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।"[১১]

৩। "ঢাকা শহরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট করিবার যে সিদ্ধান্ত ঢাকার ছাত্রেরা গ্রহণ করিয়াছে এই সভা তাহার প্রতি সমর্থন জানাইতেছে।"[১২]

৪। "এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা হইবে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের রাষ্ট্রভাষা ; আর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ যদি উর্দুকে তাঁহাদের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে উর্দুও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হইবে।"[১৩]

৫। "এই সভা অবিলম্বে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আটক বন্দীর মুক্তি এবং জননিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে।"[১৪]

৪. কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম বিবৃতি

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

★কাজী গোলাম মাহবুবের নির্বাচন সম্পর্কে তোয়াহা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় (২৯.৬.৬৮) বলেন, "বীর লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি ভর্তি লোকজন। যদিও কথা ছিলো প্রত্যেক দলের থেকে দুই একজন থাকবে। কিন্তু দেখা গেলো প্রায় ৫০টা ছোটখাটো সংগঠনেরও প্রতিনিধি হাজের। এর অর্থ হলো, যুব লীগকে সংখ্যালঘু করে দেওয়া। এ বিষয়ে কাজী গোলাম মাহবুব জেলে আমাকে বলেছিলো যে, মেজরিটি দিয়ে আমাদেরকে cowed down করার চেষ্টা তারা করেছিলো। আমরা কিন্তু এতো confident ছিলাম যে, সে রকম কোন ব্যবস্থা করি নি। আওয়ামী লীগ-এর পক্ষে এই কাজ করে খোন্দকার মুশতাক আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নওয়াজ খান, আউয়াল এবং ওদুদ। মিটিং-এ কনভেনারের প্রশ্ন যখন উঠলো আমরা আমাদের candidate দেওয়ার কথা তুলতেই পারলাম না। কারণ মাইনরিটি। কাজেই কাজী গোলাম মাহবুব কনভেনর।"–ব.উ.

এ প্রসঙ্গে আবদুল মতিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় (৯.১.৬৮) বলেন, "ঐ মিটিং-এর আহ্বায়কদের সদিচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না। এজন্য বিষয়টি নিয়ে আমি অলি আহাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আমি সর্বদলীয় কমিটির আহ্বায়কের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি কাজী গোলাম মাহবুবের নাম বলেন। এতে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বলি যে, তিনি effective হবেন না। আমি অলি আহাদকে বললাম যে, আমি নিজেই আহ্বায়ক হতে চাই। এতে অলি আহাদ হেসে ওঠে আমাকে ঠাট্টা করে বললেন যে, আমার নেতা হওয়ার সখ হয়েছে। যাই হোক, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না এবং কাজী গোলাম মাহবুব আহ্বায়ক হলেন।"–ব.উ.

www.pathagar.com

আইনত নিষিদ্ধ না হলেও বাস্তবত নিষিদ্ধ ছিলো। কারণ সে সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য বলে চিহ্নিত করা হলে তাঁকেই সরকার গ্রেফতার করতো, কমিউনিষ্টদের আশ্রয়গুলির উপর নিয়মিত আক্রমণ চালানো হতো এবং কমিউনিষ্টপার্টির কোন ধরনের সমর্থক ও দরদী বলে কাউকে মনে হলেই সরকারী রোষ তাঁর উপর পতিত হতো। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে খোলাখুলি কাজ চালিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিলো। কাজেই এ সময় বাস্তবত একটি বে-আইনী সংগঠন হিসেবেই কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিজের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যেতে হতো।

১৯৫১ সালের ২৭শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টন ময়দানের বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য পেশ করার পর কমিউনিষ্ট পার্টিও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাদের পক্ষে খোলাখুলি কোন সভা অথবা মিছিল সংগঠিত করা অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব না হলেও পার্টি কর্তৃক ২রা ফেব্রুয়ারী একটি গোপন ইশতাহার প্রকাশিত হয়। 'বাংলা ভাষার অধিকার ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা কায়েম করুন' শীর্ষক এই ইশতাহারটির মাধ্যমেই "পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব বঙ্গ সংগঠনী কমিটি" নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করে :

> পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব বঙ্গ সংগঠনী কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন।
>
> পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দীন গত ২৭শে জানুয়ারী ঢাকায় বক্তৃতা দান কালে "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে" বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন আমরা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছি।
>
> ১৯৪৮ সালে পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জনাব নাজিমুদ্দীন প্রবল গণআন্দোলনের চাপে বাংলাভাষা সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছিলেন এই ঘোষণা দ্বারা তিনি সেই ওয়াদা খেলাপ করিতেছেন। এই ঘোষণা দ্বারা তিনি বাঙালী জাতির জন্মগত অধিকার ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া নিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিজের শোষণের সুবিধার জন্য জনগণকে পশ্চাৎপদ রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করিয়া জনগণের শিক্ষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া ছিল। পাকিস্তানের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীও জনগণকে নিরক্ষর ও পশ্চাদপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানো ও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিয়া জনগণের শিক্ষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছে।
>
> ভাষার ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে যুক্তিসহ করার জন্য লীগ নেতারা বলিয়া থাকেন যে, "ইসলামী তমদ্দুন" ও "জাতীয় সংহতির" জন্য একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা দরকার।
>
> কিন্তু এই যুক্তি অসার। যেখানে পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির বাস,

www.pathagar.com

যেখানে পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশী লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন, যেখানে সমস্ত দেশ নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, সেখানে "ইসলামী তমদ্দুনের" নামে কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপাইয়া দিলে সমস্ত জনগণের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

যদি প্রত্যেকের ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়া না হয় যদি বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগণকে নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্রের কাজ চালাইবার অধিকার দেওয়া না হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির ভিতর সংহতির পরিবর্তে আসিবে জাতিগত ও প্রদেশগত রেষারেষি ও বিভেদ।

পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির ভাষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির উপরই পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ও সংহতি নির্ভর করে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি যেমন–বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী–প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী উন্নতি লাভ করুক, সমস্ত ভাষা যেমন উর্দু, বাংলা, পুষ্তু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী– সমস্ত ভাষাকেই রাষ্ট্রে সমান অধিকার দেওয়া হোক– ইহাই পাকিস্তানবাসী সকল জাতির কাম্য। কিন্তু লীগ সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করার চেষ্টা করিয়া শুধু বাঙালীর অধিকার ও কৃষ্টির উপরই আক্রমণ করিতেছেন। ইহাতে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। তাই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও সকল ভাষার সম মর্যাদা দানই পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি ব্যক্তির দাবী। এই দাবীর পিছনে বাঙালী-অবাঙালী সকল জনসাধারণকে সমবেত হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি অতীতের ন্যায় এবারও বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ উস্কাইয়া ভাষা আন্দোলনকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করিবে। তাই বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে সজাগ থাকিয়া বাঙালী-অবাঙালী সকলকেই আজ বুঝিতে হইবে যে, ভাষার অধিকারের জন্য এই আন্দোলন, উর্দু বিরোধী বা অবাঙালী বিরোধী আন্দোলন নহে। ইহা পরস্পরের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন। ভাষার ক্ষেত্রে লীগ সরকারের স্বেচ্ছাচারী নীতিকে ব্যর্থ করার জন্য বাঙালী-অবাঙালী সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই আজ প্রয়োজন। ঢাকার ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকগণ ৩০শে জানুয়ারী ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করিয়া প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধত ঘোষণার সমুচিত জবাব দিয়াছেন ও বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার কায়েম করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১শে জানুয়ারী বিভিন্ন দলের মিলিত সভায় বাংলা ভাষার অধিকারের দাবী ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালন করিয়া ভাষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সকল দল ও প্রতিষ্ঠান আহবান জানাইয়াছেন। আমরা জনসাধারণের এই সংগ্রামকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

আমরা পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণী, দল, প্রতিষ্ঠান, বাঙালী-অবাঙালী সমস্ত জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দ্বারা বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানোর চক্রান্তকে ব্যর্থ করুন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও উর্দু ভাষার সমান মর্যাদা দানের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

www.pathagar.com

এই আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রদেশের সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সর্বদলীয় শহর কমিটি ও মহল্লা কমিটি গঠন করুন।

২রা ফেব্রুয়ারী

পূর্ব বঙ্গ সংগঠনী কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

উপরে উদ্ধৃত এই সাইক্লোস্টাইল করা ইশতেহারটিতে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে নীতিগত ঘোষণা ও সাংগঠনিক কর্মসূচী প্রদান করে সেই অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে কমিউনিষ্টরা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং তা পরিচালনার চেষ্টা করেন।

৫. ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘট ও মিছিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৩০শে জানুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহর এবং প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১]

এই ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সংগ্রাম কমিটির কর্মীরা সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সময় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের' কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্র ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটের পর মিছিল করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তাঁদের সম্ভাব্য সক্রিয় বিরোধিতার কথা চিন্তা করে সংগ্রাম কমিটির মধ্যে অবস্থিত যুব লীগের কর্মীরা ৩রা ফেব্রুয়ারী একটি বৈঠকে মিলিত হন এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট ও মিছিলের পুরো কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি ছিলো, ছাত্র লীগের কোনো সদস্যের পরিবর্তে গাজীউল হকের নাম ও ঐ দিনকার সভার সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করা এবং যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে ধর্মঘটের পর মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তার পক্ষে সমর্থন লাভ করা।[২]

৪ঠা ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হলে সভার কাজ শুরু হয়। কিন্তু তার পূর্বেই 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিছিলের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন।[৩] যাই হোক পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো, ছাত্র লীগের কেউ তাদের নিজেদের লোককে সভাপতি করার প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বেই এম. আর. আখতার (মুকুল) সভাস্থলে রাখা একটি টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতি হিসেবে গাজীউল হকের নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ সমর্থন করেন কমরুদ্দীন শহুদ।[৪]

সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব[৫] এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন। মিছিলের বিরুদ্ধে মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মীদের প্রচারণার উল্লেখ করে মতিন সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলেন, "শোভাযাত্রা হবে কি হবে না সেটা আপনারা এখানে ঠিক করবেন।" তিনি এ কথা বলার পর চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠলো "হবে না কথাটা উঠলো কোথা থেকে?" সমবেত ছাত্রদেরকে মিছিলের পক্ষে এইভাবে দাঁড়াতে দেখে মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মীরা মিছিলের খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন। এরপর মিছিলের পক্ষে সভায় এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হলো যে, সভা বেশীক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সভাপতি গাজীউল হক মিছিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সভা ভঙ্গ করে দিলেন।[৬] হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" "আরবী হরফে বাংলা চলবে না", ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হলেন।[৭]

ছাত্রদেরকে সামনে রেখে মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবন[৮] এবং পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের বাসভবন[৯] হয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হলো। এরপর মিছিলটি নানা প্রকার ধ্বনি দিতে দিতে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নবাবপুর রোড, পাটুয়াটুলী, আরমানিটোলা, নাজিমুদ্দিন রোড অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।[১০] মিছিলটি শহরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবার সময় যানবাহন চলাচল কিছুক্ষণের জন্য অচল হয়ে যায় এবং শহরের বাসিন্দারা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে মিছিলে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের সঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দীনের উপর একটি সহ বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গ চিত্র ছিলো। পোস্টারও ছিলো অনেক, যার একটিতে লেখা ছিল,

"চালের বদলে খুদ খাইয়েছো
চিনির বদলে গুড়
লবণের কথা না-ই বা বললাম
এবার সাড়ে চার কোটি লোকের
মুখের ভাষাটি কেড়ে নিতে
সাহস করো না।"[১১]

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের পরিবর্তে ঐ দিন সকাল ৮টা থেকে স্কুল শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।[১২] কিন্তু ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ দিন নিজেদের স্কুল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেলা ১১টার মধ্যে সমবেত হন। ঢাকা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষসহ কয়েকজন অধ্যাপক কলেজের গেট বন্ধ করে দেন।[১৩]। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের

www.pathagar.com

সভায়[১৪] এবং ঐ দিন বিকেলেই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির একটি সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘট আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৫] সর্বদলীয় কমিটির সভায় মওলানা ভাসানী আবুল হাশিম সহ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অনেক সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন।[১৬] ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুধু ঢাকাতেই নয়, পূর্ব বাঙলার সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। যশোর, রাজশাহী ও নোয়াখালীতে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করেন। এছাড়া ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ফেনী ইত্যাদি সহ আরও অনেক স্থানে ধর্মঘট ভালভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।[১৭]

নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট পালন করেন এবং মিছিল সহকারে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেন। মিছিল শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় রহমতুল্লাহ ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[১৮]

কুমিল্লায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা ধর্মঘট পালন করে এবং শোভাযাত্রা বের করে নানা ধরনের বিক্ষোভাত্মক ধ্বনিসহ প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। ঐদিনই বিকেলে টাউন হল প্রাঙ্গণে ছাত্র ও জনসাধারণের এক মিলিত জনসভা হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আমীর হোসেন। সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের ও রাষ্ট্রভাষা সমস্যা সমাধানের পূর্বে জনমত গ্রহণের দাবী জানিয়ে এবং আরবী হরফে বাংলা শিক্ষার উদ্ভট পরিকল্পনার নিন্দা করে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৯]

ময়মনসিংহে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে এক বিরাট মিছিল সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিকেলে বিপিন পার্কে রফিকউদ্দীন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এক জনসভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২০] চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়াতেও এই একই ধরনের ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২১]

৬. পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ প্রতিক্রিয়ার দুটি উদাহরণ

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, তারিখে "প্রাদেশিকতা" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করাচী থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগ সমর্থক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'ডন'-এর একটি সম্পাদকীয়তে প্রাদেশিকতাকে পাকিস্তানের সব থেকে বড়ো শত্রুরূপে আখ্যায়িত করা হয় এবং পূর্ব বাঙলার ভাষা প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

উত্থাপন করে বলা হয়, "ভাষা প্রশ্নকে, যুবকদের কাছে যার একটা আবেগময় আবেদন আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি খুব শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সব মানুষ কায়েদে আজমের জীবদ্দশায় কোনদিন মাথা তোলার সাহস করে নি তাদেরকেই প্ররোচিত করা হচ্ছে জাতির পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করতে।" এর পর ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে ভাষা প্রসঙ্গে জিন্নাহর উক্তি উদ্ধৃত করে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় যে, সে সময় কেউ সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি।★ কিন্তু গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন যখন সেই একই কথাগুলির পুনরুক্তি করেন তখন সেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করেছে বলে জানা গেছে। কার প্রভাবে এই ছাত্রদেরকে জাতির পিতার বিরুদ্ধে এই অসম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে সেটা কি স্পষ্ট নয়? এই প্রভাব, যা আসলে পাকিস্তানের শত্রুদেরই প্রভাব, নিশ্চিহ্ন করতে হবে যদি পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হয়। যারা আমাদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে খর্ব করতে বদ্ধপরিকর তাদের কাছে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার সময় এসেছে।... যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রাদেশিকতার ওকালতি করে তাদেরকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করা এবং কোন প্রকার প্রশ্রয় না দেওয়া উচিত।" 'ডনের' এই সম্পাদকীয়টিতে শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে একজন প্রাদেশিকতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয় যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ধ্বনি তুলে সেই ধ্বনিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটা হাতিয়ার, হিসেবে ব্যবহার করছেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাব থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্য চৌধুরী নাজির আহমেদ খান ভাষা প্রশ্নে নাজিমুদ্দীনের একটি উক্তির প্রতিবাদ করে সংবাদপত্র বিবৃতির মাধ্যমে বলেন,

> "একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়ে সংবিধান সভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই মন্তব্য টেকনিক্যাল দিক দিয়ে সঠিক হতে পারে কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রী একথা বলেছেন সেজন্য এর থেকে এই বিপদ ঘটতে পারে যে যারা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতার কারণে আমাদের জাতীয় ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায় তারা একে ভুল বুঝতে পারে এবং এর অপব্যবহার করতে পারে। উর্দু যে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষারূপে প্রত্যেক সরকারী মুখপাত্র এবং দায়িত্বশীল নেতার দ্বারা পাকিস্তানের প্রথম থেকেই স্বীকৃত হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। খাজা সাহেবের বিবৃতির আরও ব্যাখ্যা খুবই প্রয়োজন অন্যথায় আমি আশঙ্কা করি যে, এর ফলে বিতর্ক ও তিক্ততার সিংহদ্বার খুলে যাবে, যার পরিণতি দাঁড়াবে খুব খারাপ।"[১]

★ডন-এর এই বক্তব্য যে সম্পূর্ণ মিথ্যা একতা সুবিদিত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'র প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।–ব.উ.

www.pathagar.com

৭. পাকিস্তান অবজার্ভার-এর উপর নিষেধাজ্ঞা

১২ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার Crypto Fascism শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন,

> "ইসলামের তৃতীয় খলিফা খুবই ধার্মিক ও ভালো মানুষ ছিলেন ; কিন্তু তিনি ছিলেন আত্মীয় প্রীতির দোষে দুষ্ট। তিনি নিজের এমন সব আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদেরকে লম্বা দড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন যাঁরা কোন ধরনের বিবেচনার যোগ্যই ছিলো না।"
>
> এরপর খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে খলিফা ওসমানের তুলনা করে নিবন্ধটিতে বলা হয়, "খাজা নাজিমুদ্দীন যে একজন ধার্মিক মানুষ একথা কেউ অস্বীকার করবে না ; আমরা আশা ও প্রার্থনা করি যে তিনি নিজেকে একজন দ্বিতীয় ওসমান বিন আল-আফফান প্রমাণ করবেন না।"

উপরোক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মওলানা আকরাম খান একটি সংবাদপত্র বিবৃতির মাধ্যমে হুমকি দিয়ে বলেন যে, "সরকার যদি এ ব্যাপারে কিছু না করে মুসলমানরাই এ বিষয়ে একটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"[১]

মওলানা দীন মুহম্মদও ওসমানের বিরুদ্ধে অবজার্ভার-এর সম্পাদকীয় বক্তব্যের নিন্দা করে ঐ দিন একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাছাড়া মওলানা আকরাম খান, রাগীব আহসান, মওলানা আবদুল গফুর, মওলানা শামসুল হক এবং হাফিজ সোলায়মান "পাকিস্তান অবজার্ভার-এর সম্পাদকীয়তে খলিফা ওসমানের উপর গর্হিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করার জন্য" ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩টায় পুরানা পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আহ্বান করেন।[২] ১৪ই ফেব্রুয়ারীর 'মর্নিং নিউজ'সহ অন্যান্য পত্রিকায় 'অবজার্ভার'-এর বিরুদ্ধে শাহ আজিজুর রহমান, সাহেবে আলম প্রভৃতির বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে পূর্ব বাঙলা সরকার পূর্ব বাঙলা জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ১৯৫১-এর ১০ নম্বর সেকশনের বলে অবিলম্বে অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে পাকিস্তান অবজার্ভার-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পত্রিকার মালিক প্রাক্তন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী এবং সম্পাদক আবদুস সালামকে তাঁদের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।[৩]

পাকিস্তান অবজার্ভারের উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারীর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, পত্রিকাটি বিগত দুই বৎসর যাবত খোলাখুলিভাবে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ এবং দেশ বহির্ভূত আনুগত্যের প্রমাণও তাঁদের হাতে আছে।[৪]

www.pathagar.com

ঐ একই দিনে, যে আল-হেলাল প্রেস থেকে পাকিস্তান অবজার্ভার প্রকাশিত হতো সে প্রেসটিও পূর্ব বাঙলা সরকারের আদেশক্রমে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫]

১৪ই ফেব্রুয়ারী একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুসলিম লীগ এবং উর্দু সমর্থক ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর জন্য নূরুল আমীনের প্রাদেশিক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, এই পদক্ষেপ খুবই সঠিক হয়েছে যদিও তা নিতে অনেক দেরী হয়েছে। কারণ পত্রিকাটি বহুদিন ধরেই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে মর্নিং নিউজ আরও বলেন যে,

> পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আবহাওয়া এই পত্রিকাটির রুচিও পছন্দ মাফিক ছিলো না। পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে এর খুবই অস্বস্তিবোধ হতো। পাকিস্তানে পছন্দ করার মতো কিছুই নেই। এতে পাকিস্তানের নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হতো, এতে পাকিস্তানের ভাষা ও আদর্শকে খেলো করা হতো, এতে পাকিস্তানের চার বৎসরে যা কিছু অর্জন করা হয়েছে তাকে ছোট করা হতো, ইসলামী ধারণা অনুযায়ী আমাদের জীবন গঠনের প্রচেষ্টাকে এতে ঠাট্টাতামাশা করা হতো। 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর রাজনৈতিক মক্কা স্পষ্টতই ছিলো নয়াদিল্লী যেখান থেকে সে তার প্রেরণা এবং পুষ্টি লাভ করতো। ভারতীয় নেতাদের বার্ষিকী এতে সব সময়েই 'সংবাদ' হিসেবে দেখা যেতো; কলকাতায় কমিউনিষ্টদের নির্বাচন এর কাছে, যে কোনভাবে হোক, "গৌরবময়" মনে হতো। নিঃসন্দেহে এই পত্রিকাটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বহিঃশত্রুর গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে আসছিলো। দেরীতে হলেও সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ সঠিক এবং যারা পাকিস্তানকে ভালবাসে, এখানে বসবাস করে এবং পাকিস্তানের জন্য কাজ করে ও মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত তাদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করবে।"

পত্রিকাটির বিচার শুরু হলে রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে তার চক্রান্তের বিষয়ে আরও অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে বলে 'মর্নিং নিউজ' এর এই সম্পাদকীয়টিতে আশা প্রকাশ করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'নিষেধাজ্ঞা' শীর্ষক অপর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'মর্নিং নিউজ' এ সম্পর্কে সরকারী প্রেস নোট এবং অন্যান্য বিষয়ে উপরোক্ত ধরনের অনেক মন্তব্য ব্যক্ত করেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী 'পাকিস্তান অবজার্ভার'–এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে যে সরকারী প্রেস নোট[৬] জারী করা হয় সেটি হলো নিম্নরূপ :

> 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় "ছদ্ম ফ্যাসিজম" শিরোনামায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যথেচ্ছভাবে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জনসাধারণের ধর্মীয় মনোভাবেই আঘাত করা হইয়াছে। এই মন্তব্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে এবং শান্তিভঙ্গেরও আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ১৯৫১ সালের পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী

www.pathagar.com

এই সমস্ত মন্তব্য আপত্তিকর বিধায় যে সমস্ত লোক প্রধানত এই পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদিগকে অর্থাৎ জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, সম্পাদক ও মুদ্রক, অর্ডিন্যান্সের ৭ ধারা (উহার ২ ধারার সহিত পঠিতব্য) (৪) (ক) এবং ৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে অভিযুক্ত করা হইতেছে।

গত দুই বৎসর যাবৎ এই পত্রিকা খোলাখুলিভাবে যে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে এবং এই পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ও পররাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের যে প্রমাণ সরকার পাইয়াছেন তদনুযায়ী উল্লিখিত অর্ডিন্যান্সের ১০ ধারা অনুসারে সরকার "পাকিস্তান অবজার্ভার" পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

উল্লিখিত অর্ডিন্যান্সের ৯ ধারা অনুসারে আরও নির্দেশ জারী করিয়াছেন, যে "আল-হেলাল" প্রেসে এই সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত, পূর্বাহ্নে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন মুদ্রাকর বা প্রকাশক সেই প্রেসে কোন সংবাদপত্র বা অপর কোন কাগজপত্র মুদ্রিত করিতে পারিবেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকারকে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে। কেননা জননিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন স্থগিত রাখিতে পারে না।

'পাকিস্তান অবজার্ভার' কর্তৃক 'ছদ্ম ফ্যাসিজম' শীর্ষক সম্পাদকীয়টি নিয়ে যে বিতর্ক ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তারপর পাকিস্তান অবজার্ভার-এর পরিচালকমণ্ডলী ও সম্পাদকীয় বোর্ড এক বিবৃতিতে প্রবন্ধটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সেই সঙ্গে খলিফা ওসমান সম্পর্কিত মন্তব্যের প্রতিটি শব্দ প্রত্যাহার করেন।[৭]

১৭ই ফেব্রুয়ারী যুগীনগর লেনস্থ যুব লীগের অফিসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের কার্যকরী সমিতির একটি সভায় 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের কার্যকরী সমিতির এই সভা জননিরাপত্তার নামে "পাকিস্তান অবজার্ভার" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সরকারের তীব্র নিন্দা করিতেছে। দেশের গণআন্দোলনকে– বিশেষ করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার মতলবে উক্ত আদেশ জারী করা হইয়াছে বলিয়া সভা মনে করে। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র বিরোধী দলীয় পত্রিকার প্রতি সরকারের এই নীতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধী মতবাদ ও প্রেসের স্বাধীন মতামতের উপর তীব্র আঘাত হানিতেছে। অতএব এই সভা অবিলম্বে এবং বিনাশর্তে পত্রিকার প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার দাবী জানাইতেছে।

পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করার হুকুম প্রত্যাহারের জন্য দেশের স্বাধীনতাকামী পুরুষদিগকে একত্রীকৃত হইয়া আন্দোলন চালাইবার জন্য সভা আবেদন জানাইতেছে।[৮]

'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ একটি সংবাদপত্র বিবৃতির মাধ্যমে বলেন,

www.pathagar.com

> সরকারী প্রেস নোটে গত দুই বছর ধরিয়া পাকিস্তান অবজার্ভার এর "রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের" উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার কর্তৃক পত্রিকাখানি রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন না করার কি কারণ থাকিতে পারে? তাহা হইলে কি এতদিন সরকার ঘুমাইতেছিলেন।... রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারের এই রূপ দমন নীতির পিছনে নানা দুরভিসন্ধি রহিয়াছে।[৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর নিন্দা করে বলা হয় যে, পত্রিকাটির পরিচালকমণ্ডলী যখন ক্ষমা প্রার্থনাকরত: আপত্তিকর প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দ প্রত্যাহার করেছেন তখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত।[১০]

'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর পর পাকিস্তান সম্পাদক পরিষদের করাচী শাখার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় 'ডন' সম্পাদক আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত অথবা মতামত প্রকাশ না করে তাঁরা বিষয়টি পাকিস্তান সম্পাদক পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১১]

এদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'পাকিস্তান অবজার্ভার' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে সাপ্তাহিক নওবেলাল বলেন,

> বর্তমানে মামলা বিচারাধীন থাকায় এই সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ হইতে আমরা বিরত রহিলাম।
>
> কিন্তু সরকার নিরাপত্তা আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী "রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের" অজুহাতে পাকিস্তান অবজার্ভারের প্রকাশ বন্ধ করার পর উক্ত অপরাধের জন্য পত্রিকাখানিকে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করেন নাই। ইহাতে জনসাধারণের মনে নানা ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। কারণ এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে অভিযুক্ত সংবাদপত্রের বা ব্যক্তি বিশেষের প্রকাশ্য বিচার হওয়া শুধু ন্যায়-নীতি সম্মতই নহে ইসলামের নির্দেশও বটে। সরকার বিরোধিতা বা নিছক সরকারের সমালোচনা রাষ্ট্র বিরোধিতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না।
>
> এই ধরনের বিনা বিচারে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধের রীতি কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকগণ সমর্থন করিতে পারে না। তাই আজ দেশের ছাত্র, যুবক, আবালবৃদ্ধবনিতা সরকারের এই কাজের তীব্র সমালোচনা করিতেছেন এবং প্রকাশ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার দাবী করিতেছেন।
>
> প্রদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন সমাগত। এই সময় জননিরাপত্তা আইনের আড়ালে সর্বপ্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মাটি চাপা দিয়া সরকার নির্বাচন বৈতরণী পার হইবার প্রয়াস পাইলে তাঁহারা নিতান্তই ভুল করিবেন। কারণ চৌধুরী খালিকুজ্জামানের ভাষায় আমাদের বলিতে হয়, "রাজনৈতিক দমননীতি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে।"

একমাত্র বিরোধী দলীয় দৈনিক পত্রিকা হিসেবে 'পাকিস্তান অবজার্ভার'

www.pathagar.com

১৯৫০ সাল থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলো। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকাই ছিলো তৎকালে বিরোধী মতামত প্রকাশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সেই হিসেবে সরকার এই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো 'পাকিস্তান অবজার্ভার' সম্পাদক আবদুস সালামের 'ছদ্ম ফ্যাসিজম' শীর্ষক অবিবেচনাপ্রসূত এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্পাদকীয়টি সরকারের জন্য সেই সুযোগই সৃষ্টি করেছিলো। সরকার এবং মুসলিম লীগ দল এক মুহূর্তেও দেরী না করে সেই সুযোগের 'সদ্ব্যবহার' করেছিলো।

৮. পতাকা দিবস এবং অন্যান্য ঘটনা

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকাতে নানা ধরনের তৎপরতা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বাইরে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র সেই একই ধরনের তৎপরতা শুরু হয়।

রংপুর জেলার নীলফামারী, ডোমার ইত্যাদি স্থানে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। নীলফামারীতে এই সময় বাংলা ভাষার দাবীতে একটি জনসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাকিউল আলম এবং মিছিলের পুরোভাগে থাকেন খয়রাত হোসেন এম.এল.এ, গিয়াসউদ্দীন আহমদ ও জালালউদ্দীন। রংপুর শহর, পাবনা এবং মাদারীপুরেও কর্মপরিষদ গঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জে যে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয় তার সভাপতি এবং আহ্বায়ক হন যথাক্রমে শামসুজ্জোহা ও মফিজউদ্দীন আহমদ। কুমিল্লায় কর্মপরিষদ গঠিত হয় আমির হোসেনের সভাপতিত্বে। চট্টগ্রামে সর্বদলীয় ভাষা কমিটি গঠিত হয় জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের এম.এ. আজিজ এবং তমদ্দুন মজলিশের আজিজুর রহমানের উদ্যোগে। এছাড়া পূর্ব বাঙলার অন্যান্য সব অঞ্চলেই রাষ্ট্রভাষা পরিচালনার জন্য কর্মপরিষদ বা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[১]

ঢাকাতে এই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বৈঠকে মিলিত হতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের কার্যকরী কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যপরিষদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের প্রত্যেক শাখাকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা পূর্ব বাঙলায় সাধারণ ধর্মঘট পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া বৈঠকের অপর দুটি প্রস্তাবে ১১ই ফেব্রুয়ারী "পতাকা দিবস" পালনের জন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের

www.pathagar.com

যুবলীগ কর্মীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানানো হয়।[২]

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মহম্মদ মুজিবুল হক সহ-সভাপতি, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী সম্পাদক এবং মোস্তফা কামাল যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩] এই তিনজন যে প্যানেলে নির্বাচিত হন সেই প্যানেলে ইসলামী ভাবধারার সমর্থকদেরই বিপুল প্রাধান্য ছিলো।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ঢাকা সিটি মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী কমিটির এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন।[৪] এরপর ১৮ই ফেব্রুয়ারী নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের কার্যকরী পরিষদ তার সভাপতি শামসুল হুদা এবং মনজুরুল হককে সংগঠনের নীতি ও স্বার্থের বিরোধিতা করার জন্য সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আখতারউদ্দীন আহমদকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে মনোনীত করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারীর কাউন্সিল অধিবেশনে নোতুন নির্বাচনের কথাও সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়।[৫]

১১ এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারীর পতাকা দিবসে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য কিছু সাংগঠনিক তৎপরতা দেখা যায়। অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ খুব অল্প হলেও এই দিবস উদযাপনকে উপলক্ষ্য করে কিছু নোতুন কর্মী ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এ সময় নাদিরা বেগম এবং শাফিয়া খাতুনকে অনেক পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তাঁরা দুজনে অন্যান্য ছাত্রীদের সহযোগিতায় এই দায়িত্ব পালন করেন।[৬]

১৪ই ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করা হয় যে, প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন ২০শে ফেব্রুয়ারী শুরু হলে সেই অধিবেশনে লিয়াকত আলীর মৃত্যু এবং হামিদুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় তাঁর শাস্তির জন্য কেন্দ্রীয় গণপরিষদের যে দুটি আসন শূন্য হয়েছে সেই স্থান পূরণের জন্য পূর্ব বাঙলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।★ পরিষদের বাজেট অধিবেশন ১১ই মার্চ পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলেও ঘোষণাটিতে বলা হয়।[৭]

১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ভোরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একটি চিঠি গোপনে পাচার হয়ে আসে। তাতে বলা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং বরিশালের মহিউদ্দীন আহমেদ নিজেদের মুক্তির জন্য জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। এই সংবাদের সঙ্গে চিঠিতে রাজবন্দীদের

★১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হওয়ার সময় লিয়াকত আলী খান পূর্ব বাঙলার প্রতিনিধি হিসেবে পূর্ব বাঙলা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।- ব.উ.

www.pathagar.com

মুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু করার অনুরোধও জানানো হয়।★

১৮ তারিখে চিঠি পাওয়ার পরই ১৯শে তারিখে বন্দী মুক্তির দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখলেসুর রহমান। সভায় যাঁরা বক্তৃতা দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জিল্লুর রহমান, নাদিরা বেগম এবং শামসুল হক চৌধুরী। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দীন আহমেদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী করে প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়াও 'বিশ্ববিদ্যালয় রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৮]

এই সময়ের খুব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বদলী। ভাষা আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন হায়দার নামে একজন প্রবীণ অফিসার। কিন্তু পূর্ব বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ তাঁকে বদলী করে তাঁর স্থলে কোরেশী নামে একজন অল্পবয়স্ক অফিসারকে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৎকালীন সম্পাদক মোহন মিঞার নিম্নলিখিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ১৭ই ফেব্রুয়ারী আমি ফরিদপুর রওয়ানা হই। রওয়ানার পূর্বে, রাত্রি দশ এগারোটার সময়, আমি নূরুল আমীনের বাড়ী গিয়ে তাঁর সাথে নানা ব্যাপারে আলাপ করি (সে সময়ে নারায়ণগঞ্জের স্টীমার রাত্রি ১টা ২টার সময় ছাড়তো)। আমি তাঁকে বললাম যে, ভাষার ব্যাপার নিয়ে একটা খুব major গণ্ডগোল হবে। ১৯৪৮ সালের উল্লেখ করে আমি বললাম যে, সে সময়ে ছাত্রেরা পরিষদ ভবন ঘেরাও করে রেখেছিলো। আমরা সকলেই আটকা পড়েছিলাম এবং সেই অবস্থায় নাজিমুদ্দীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং জি.ও.সিকে★★ ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য। সেবারে ছাত্রেরা পরিষদ ভবনের উপর ইঁট-

---

★শেখ মুজিবুর রহমানের এই অনশন সম্পর্কে অলি আহাদ বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। চিকিৎসার কারণে সরকার তাঁহাকে ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। প্রহরী পুলিশের ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমরা তাঁহার সহিত হাসপাতালেই কয়েক দফা দেখা করি। তিনি ও নিরাপত্তা বন্দী মহিউদ্দিন আহম্মদ ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে মুক্তির দাবীতে অনশন ধর্মঘট করিবেন, সেই কথা শেখ সাহেবই আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন।... ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জিলা কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে ফরিদপুর যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে নারায়ণগঞ্জ নেতৃবৃন্দের সহিত শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাতকার ঘটে। কথোপকথন কালে তিনি যুবলীগ নেতৃদ্বয় জনাব শামসুজ্জোহা ও শফি হোসেন খানকে জানান যে, পথিমধ্যে স্টীমারেই ১৫ই ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ১২টার পর নিজ মুক্তির দাবীতে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন (জাতীয় রাজনীতি ঃ পৃঃ ১৫১-৫২)।

★★ জেনারেল আইয়ুব খান।– ব.উ.

www.pathagar.com

পাটকেলও ছুঁড়েছিল কিন্তু পুলিশ তাদের উপর গুলি করেনি। পরিষদ ভবন ছাড়া সেক্রেটারিয়েট ভবনও তারা সেবার ঘেরাও করেছিলো।★ সেবারের মতো এবারও তারা এ্যাসেম্বলীতেই concentrate করবে এই কথা আমি নূরুল আমীনকে বললাম। কাজেই আমাদের খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিলি করতেও আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম।

নূরুল আমীনের সাথে এই আলোচনার সময় আমি প্রথম শুনলাম যে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হায়দারকে বদলী করে তার স্থলে কোরেশীকে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই বদলী এবং নিয়োগের ব্যবস্থা আজিজ আহমেদ নিজে করেছিলো এবং নূরুল আমীন তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

কোরেশী প্রায় বছর দুই পূর্বে ফরিদপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলো। কাজেই আমি তাকে এবং হায়দারকে, উভয়কেই, ভালভাবে জানতাম। কোরেশীকে আমি একজন tactless officer হিসেবেই জানতাম। সে লোক ভালো ছিলো কিন্তু বয়স তার অল্প থাকার জন্য সব সময়ে বিশেষত crisis-এর সময় সে tactfully কাজ করতে পারতো না। কিন্তু হায়দার সাহেব ছিলেন বয়স্ক ও সিনিয়র অফিসার, কাজেই তার সে অসুবিধা ছিলো না। তিনি ছিলেন Sober এবং tactful।

১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হায়দার ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলো, যদিও তার বদলীর আদেশ হয়ে গিয়েছিলো। আমি নূরুল আমীনকে বললাম যে, হায়দারকে সেই crisis-এর সময় যেন বদলী করা না হয়। এ সময়ে একজন senior tactful অফিসার দরকার। নূরুল আমীন বললেন যে, 'বদলীতো হয়েই গেছে'। আমি বললাম, order হয়ে গেছে সত্যি কিন্তু তাঁকে এখনই অন্য জায়গায় না পাঠিয়ে ঢাকাতেই রাখা হোক। জরুরী অবস্থা শেষ হলে কোরেশীকে এখানে যোগ দিতে দিলেই হবে।

নূরুল আমিন কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে আজিজ আহমদের সাথে কোন আলাপ করতে রাজি হলেন না। আমি তখন তাঁকে বললাম যে, তিনি একটা বিরাট risk নিচ্ছেন। আমার নিজের assessment অনুযায়ী, একথা আমার মনে হয়েছিলো। আমি অবশ্য নূরুল আমীনকে বলে গেলাম, শেষ মুহূর্তে গুলিটুলী কোর না। কোরেশী ছেলেমানুষ এবং ভয়ানক বদরাগী।"৯★★

৯. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর কমিউনিষ্ট পার্টির সার্কুলার

১৯৫২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব বাঙলা প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটির সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক 'রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সার্কুলার (১০ নম্বর) পার্টির মধ্যে প্রচার করা হয়। এই সার্কুলারটিতে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য, লাইন, এবং সাংগঠনিকভাবে করণীয় কর্তব্য বেশ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়। আন্দোলনের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়,

---

★এই বইয়ের প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য। –ব.উ.

★আমার সঙ্গে ২৮.৬.১৯৬৮ তারিখে মোহন মিঞার সাক্ষাৎকার। –ব.উ.

www.pathagar.com

২৭শে জানুয়ারী ঢাকার সভায় বক্তৃতা দানকালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে– "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে।" এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে আবার রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত উক্তির প্রতিবাদে ও 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার' দাবিতে ৩০শে জানুয়ারী ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রথম প্রতীক ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৩১শে জানুয়ারী 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' পরিচালনার জন্য একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' গঠিত হয়।

'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের প্রতি বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' পরিপূর্ণ সমর্থন জানান। সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের যুক্ত প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘট দারুণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে–সমস্ত স্কুল-কলেজে পরিপূর্ণ হরতাল পালিত হইয়াছে। ইউনিভারসিটি প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হইয়াছে এবং সভার পর প্রায় দেড় দুই মাইল লম্বা বিরাট এক শোভাযাত্রা সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ঢাকা শহরে এত বড় শোভাযাত্রা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। এই শোভাযাত্রার প্রধান আওয়াজ ছিল– "বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই;" "সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই"।

'বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর' এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' ও 'ইউনিভার্সিটি রাষ্ট্রভাষা কমিটি' ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করার আহ্বান জানাইয়াছেন। সারা প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা খুবই জরুরী।

১৯৪৮ সালে 'ভাষা আন্দোলন' পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী গণআন্দোলন হিসাবে গড়িয়া উঠে। সেই সময়ে শক্তিশালী ভাষা আন্দোলনের চাপে পড়িয়া স্বয়ং নাজিমুদ্দীন সাহেবই ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, বাংলা ভাষাও যাহাতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য হয়, তাহারই ব্যবস্থা তিনি করিবেন। কিন্তু নাজিমুদ্দীন সাহেব সেই ওয়াদা খেলাপ করায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আবার শুরু হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের আন্দোলন হইতেও এবারের আন্দোলন অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের স্বরূপ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। এই সময়ে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনও সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে পূর্ব বঙ্গের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বাঙালী ও অন্যান্য জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া আগাইয়া যাইবে।

অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং একটি শক্তিশালী ও ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত করার জন্য পার্টিকে আজ সঠিক কর্মপন্থা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

জাতীয় আন্দোলন হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে

www.pathagar.com

এই সার্কুলারে বলা হয়,

> বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর- এই দাবী বাঙালী জাতির জাতীয় অধিকারের দাবী, এই দাবী বাঙালী জাতির জন্মগত অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী। অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন বাঙালী জাতির অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কেবল বাঙালী জাতিরই আন্দোলন নয়, রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি জাতি যেমন-বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচ প্রভৃতি-সকল জাতির ভাষা ও কৃষ্টিকে সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন, এই আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির সমগ্র জনসাধারণের আন্দোলন।

এরপর ভাষা আন্দোলনের দুর্বলতার দিকগুলি সম্পর্কে সার্কুলারটিতে বলা হয়,

> রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ সালেই পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবারও সেই আন্দোলন যে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি লক্ষ্য করিয়া তাহা দূর করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার।
>
> রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও বাঙালী জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবাঙালী ছাত্র ও জনসাধারণ এখনও এই আন্দোলনে তাহাদের যোগ্য অংশগ্রহণ করেন নাই, বরং অবাঙালী জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে নানা রকম ভুল ধারণা আছে।
>
> অনেক অবাঙালী এই আন্দোলনকে উর্দু বিরোধী আন্দোলন বলিয়া মনে করিয়া এই আন্দোলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন সম্পর্কে অবাঙালী ও বাঙালীর মধ্যে যে ভুল ধারণা আছে, তাহা দূর করার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের আন্দোলন যে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির ভাষা ও কৃষ্টিকে সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন এবং প্রত্যেক জাতিই যাহাতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করার অধিকার পায়, তাহারই জন্য আন্দোলন, তাহা খুব ভাল করিয়া বাঙালী-অবাঙালী সকলকেই বুঝাইতে হইবে।
>
> (খ) এই আন্দোলনের আর একটি বিশেষ দুর্বলতা এখনও রহিয়া গিয়াছে। কারণ এই আন্দোলন এখনও পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও প্রধানত শহরের ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। পাকিস্তানের মজুর ও কৃষকশ্রেণী এখনও এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। পাকিস্তানের মজুর (বিশেষ করিয়া রেল মজুর) ও কৃষক শ্রেণী যাহাতে এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আন্দোলনকে সঠিক পথে নিয়া যাওয়ার জন্য আগাইয়া আসিতে পারে, তার জন্য আমাদের পার্টির তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার।

এরপর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে দেশের মজুর ও কৃষকদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে পার্টির সুনির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়,

www.pathagar.com

'উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার' পেছনে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর কি মতলব, তাহা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনসাধারণের এবং বিশেষ করিয়া বিভিন্ন জাতির মজুর কৃষক শ্রেণীর নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত জরুরী। পাকিস্তানের বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি প্রভৃতি সকল জাতির জনগণকে অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানো ও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যবস্থা করিয়াছে। পাকিস্তানের মজুর, কৃষক-অগণিত জনসাধারণ যাহাতে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, তার জন্যই শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিকে নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার ও রাষ্ট্রের কাজ চালাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। অতএব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে মজুর ও কৃষক শ্রেণীকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখার ও শোষণ ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখার যে মতলব শাসকগোষ্ঠীর রহিয়াছে সেই মতলবকে বিভিন্ন ভাষাভাষি জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা প্রয়োজন। তবেই আমরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির সমগ্র জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত করিতে সমর্থ হইব।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সব বিভ্রান্তি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে এবং আন্দোলনকে বিভক্ত ও বিপথগামী করতে পারে সে বিষয়ে পার্টি সদস্যদেরকে হুঁশিয়ার করে সার্কুলারটিতে বলা হয়,

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন যাহাতে কোন অবস্থায়ই প্রাদেশিকতার খাতে প্রবাহিত হইতে না পারে, সেই সম্পর্কে আমাদের বিশেষ হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। যদিও এবারের আন্দোলন অনেক বেশী সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়া চলিতেছে, তবুও একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে এই আন্দোলনে প্রাদেশিকতার মনোভাব আনার জন্য সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা আছে এবং থাকিবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও তাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনকে প্রাদেশিকতার পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নিবে। এই আন্দোলনের উপর প্রাদেশিকতার ছাপ দিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা চলিয়াছে। অতএব এই বিষয়ে আমাদের খুব হুশিয়ার থাকা দরকার।

সকল ভাষার সমমর্যাদা দান– এই শ্লোগানের উপর বিশেষ জোর দিয়া আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি জাতির ভাষা ও কৃষ্টির উন্নতির জন্য সমান সুযোগ ব্যবস্থার উপরই আমাদের প্রধান জোর দিতে হইবে। তবেই আমরা এই আন্দোলনকে প্রাদেশিকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া অগ্রসর করিয়া নিতে সমর্থ হইব।

(খ) আন্দোলনে বিভ্রান্তি ও বিভেদ আনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন।

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' সম্পর্কে ভুল ধারণা ও জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য সরকার প্রচার করিতেছেন যে 'ইসলামী তমদ্দুন' ও মুসলিম সংহতির জন্যই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হইতেছে। সরকারের এই যুক্তি যে কত অসার তাহা জনসাধারণের নিকট ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সকল মুসলমানদের একই ভাষা নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষি মুসলমান বাস

www.pathagar.com

করিতেছে। অতএব একই ভাষার মাধ্যমে কখনও বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির কৃষ্টিগত উন্নতি হইতে পারে না। বরং সকল ভাষার সমমর্যাদা, সকল জাতির নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার সুযোগ না দিলে সংহতির পরিবর্তে বিভেদ বাড়িবে। একমাত্র সকল ভাষাকে রাষ্ট্রে সমমর্যাদা দানের ভিতর দিয়াই সকল ভাষাভাষি জাতির ঐক্য গড়িয়া ওঠা সম্ভব। অতএব 'ইসলামী তমদ্দুন' মুসলিম সংহতির নাম করিয়া উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা যে খাটে না, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে।

আর একটা বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইবে। আন্দোলনে বিভেদ আনার জন্য ও দমননীতি প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ উস্কাইয়া নানারকম প্রচেষ্টা শাসকগোষ্ঠী করিবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি গুণ্ডা নিয়োগ করিয়া হইলেও বাঙালী অবাঙালীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টা নিবে। অতএব আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির তরফ হইতে যে সব ষড়যন্ত্র চলিতে পারে, সেই সম্পর্কে পূর্ব হইতেই আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে এবং তাহাদের সকল ষড়যন্ত্রকেই বানচাল করিতে হইবে। এই আন্দোলনের পেছনে যাহাতে বাঙালী-অবাঙালী সকল ভাষাভাষির জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠে, তাহারই চেষ্টা নিতে হইবে।

কমরেডস,

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের শ্লোগানকে আরও বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরা প্রয়োজন।

★পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্যাদা চাই★পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির নিজ নিজ শিক্ষালাভ করা ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার চাই★ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই– এই তিনটি শ্লোগানকে একই সঙ্গে জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা প্রয়োজন। তবেই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে পাকিস্তানে সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিবে।

এরপর '২১শে ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন' পার্টি কর্মীদের কাছে এই আহ্বান জানিয়ে সার্কুলারটিতে বলা হয়,

আমাদের কাজ। (১) মজুর শ্রেণীর সাথে বিশেষ করিয়া বাঙালী রেল মজুরদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে মজুর শ্রেণী যাহাতে বিশেষ ভূমিকা লইয়া অগ্রসর হইতে পারে, তার জন্য আমাদের তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাঙালী-অবাঙালী রেল মজুর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিলে এই আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে আগাইয়া যাইবে। অতএব লিফলেট পোষ্টার ও ছোট ছোট বৈঠক মারফৎ রেলমজুর ও অন্যান্য মজুর শ্রেণীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

(২) গ্রামাঞ্চলে কৃষক শ্রেণী যাহাতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আগাইয়া আসে তার জন্যও আমাদের তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। ২১শে ফেব্রুয়ারী গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতেও যাহাতে হরতাল পালিত হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন। এখন হইতেই, সভা, বৈঠক মারফৎ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

www.pathagar.com

(৩) উর্দু ভাষাভাষি ছাত্র, শিক্ষক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ভালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রগতিশীল উর্দু সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট হইতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিবৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। উর্দু ভাষাভাষি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে উর্দু ভাষায় প্রচার পত্র, পোষ্টার ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

(৪) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া জেলায় ও স্থানীয়ভাবে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' গঠন করুন।

(৫) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রচার, সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা করুন।

(৬) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উস্কানী সত্ত্বেও ২১শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ সভা ও শোভাযাত্রা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে চলে, সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘটকে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সর্বদলীয় কমিটির নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া তোলার উপর জোর দিন।

(৭) পার্টির তরফ হইতে বেশী সংখ্যায় প্রচারপত্র দেওয়া সম্ভব হইবে না ; অতএব সর্বত্র ব্যাপকভাবে পোষ্টার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে এই আন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণী সমবেত হওয়ার দারুণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া পাকিস্তানের প্রত্যেক ভাষাভাষি জাতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলনও আগাইয়া যাইবে। অতএব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য এবং আন্দোলনকে সারা প্রদেশব্যাপী ব্যাপক গণভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার জন্য প্রত্যেকটি পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্য সম্মিলিতভাবে কার্যকরী প্ল্যান লইয়া অগ্রসর হউন।

এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বহু কর্মী ও পার্টি মিলিট্যান্ট বাহির হইয়া আসিবেন। অতএব এই নোতুন কর্মীদের পার্টি গ্রুপে সংগঠিত করা ও পার্টি নীতিতে শিক্ষিত করিয়া তোলা পার্টির এক বিশেষ দায়িত্ব। পার্টি ইউনিট ও গ্রুপগুলিকে সংগঠিত করা এবং পার্টি মেম্বার ও নতুন নতুন মিলিট্যান্টদের শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য প্রত্যেক ডি ও সি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

উপরে পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির যে সার্কুলারটি বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা হলো তার মধ্যে ভাষা আন্দোলনের চরিত্র, গতিপ্রকৃতি, দুর্বলতা ও সম্ভাবনা এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে পার্টি কর্মীদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যাঁরা সক্রিয়ভাবে পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য অথবা সমর্থক হিসেবে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলনগত চিন্তাধারা ও লাইন উপরোক্ত সার্কুলারের লাইন অনুযায়ীই মূলত গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিলো।

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ২০শে ফেব্রুয়ারী

১. কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব বঙ্গ সাংগঠনিক কমিটির ১০ নম্বর পার্টি সার্কুলারে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যে নীতি ও লাইন নির্দেশ করা হয় সেই অনুযায়ী তাঁরা ২০শে ফেব্রুয়ারী 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবানে সাড়া দিন, সকল ভাষার সমমর্যাদা ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা করুন" শীর্ষক একটি সাইক্লোস্টাইল করা ইশতেহার প্রচার করেন।

এই সংক্ষিপ্ত ইশতেহারটিতে যে সব আওয়াজ তোলার আহবান জানানো হয় সেগুলি হলো, "ইংরেজী ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না; পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্যাদা চাই ; বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচি, উর্দুভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া চাই ; বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।"

এছাড়া ইশতেহারটির শেষ দিকে আরও বলা হয়,

> বাংলার জন্য আন্দোলন উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। ইংরেজীর বদলে উর্দু, বাংলা-সকল ভাষাকে রাষ্ট্রে সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন।
>
> ইংরেজ পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিকে পশ্চাদপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি ভাষা-ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিয়াছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রাখিয়াছেন এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন। একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি পশ্চাদপদ থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতিই ব্যাহত হইবে।
>
> অতএব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমমর্যাদা দান ও রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর আন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচ, উর্দুভাষী–

www.pathagar.com

সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন।★

২. পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বাজেট অধিবেশন

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেল তিনটায় পরিষদের স্পীকার আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। প্রায় ১২৩ জন সদস্যের এই পরিষদে ৮০ জন ঐদিন উপস্থিত থাকেন।[১]

অধিবেশনের শুরুতেই খায়রাত হোসেন 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর উপর একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন বলেন, যে জনস্বার্থেই সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, পত্রিকাটি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যাতে করে এই পদক্ষেপ না নিলে আরও অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারতো।[২]

পরিষদের অনুমতি না পাওয়ায় প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত আর আলোচিত হয় নি।[৩]

৩. ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী

২০শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোরেশী সমগ্র ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে এক নির্দেশ প্রদান করেন। এই নির্দেশে বলা হয়,

> যেহেতু এটা দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের একটি অংশ ঢাকা শহরে জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার চেষ্টা করছে এবং যেহেতু, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি যে সেই ধরনের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল জনসাধারণের জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারে তাই আমি, এস.এইচ. কোরেশী. সি.এস.পি, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঢাকা, সি.আর.পি.সি.র, ১৪৪ ধারা অনুযায়ী কোতয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা ও তেজগাঁও পুলিশ স্টেশন নিয়ে গঠিত ঢাকা শহরের সমগ্র এলাকায় আমার লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, থেকে তিরিশ দিনের জন্য সেই ধরনের সকল জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি।[১]

এইভাবে ১৪৪ ধারা জারী সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গের তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ বলেন, "গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে আমরা অবগত হই যে, একুশে তারিখে বিক্ষোভকারীরা এ্যাসেম্বলী ভবন ঘেরাও করবে এবং জোরপূর্বক তার ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে। এ্যাসেম্বলীর অধিবেশন চলাকালে সদস্যদের উপর সেই ধরনের কোন আক্রমণ যাতে না হয় তার জন্যই আমরা ১৪৪ধারা জারী করেছিলাম।"[২]

★ ইশতেহারের সাইক্লোস্টাইল কপি থেকে গৃহীত।–ব.উ.

www.pathagar.com

'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের' কর্মসূচীতে এ্যাসেম্বলী ভবন ঘেরাও করার কথা ছিলো। কিন্তু জোরপূর্বক তার মধ্যে ঢুকে সদস্যদেরকে মারপিট ইত্যাদির কোন পরিকল্পনা ছিলো না। ১৪৪ ধারা জারীর পক্ষে যুক্তি খাড়া করার উদ্দেশ্যেই যে এক্ষেত্রে গোয়েন্দা রিপোর্টের কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছিলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে প্রাক্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হায়দারকে দিয়ে এইভাবে ১৪৪ ধারা জারী ইত্যাদি কাজ তেমন সহজে হবে না একথা চিন্তা করেই আজিজ আহমদ ২০শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই তাঁকে ঢাকা থেকে বদলী করে সিলেট পাঠান এবং তাঁর স্থানে কোরেশীকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকাতে নিয়ে আসেন।

এ সম্পর্কে নূরুল আমীন বলেন যে, '১৪৪ ধারা জারীর সিদ্ধান্ত অফিসিয়াল পর্যায়ে নেওয়া হয়েছিলো। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন পরামর্শ করা হয় নি।'[৩] এটাই ছিলো স্বাভাবিক, কারণ সে সময়ে পূর্ব বাঙলার প্রাদেশিক সরকার প্রকৃতপক্ষে চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের নির্দেশেই পরিচালিত হতো। গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্তই আজিজ আহমদ গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনবোধে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে পরে জানিয়ে দিতেন।

নূরুল আমীন এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'সে সময়ে কারও ধারণা ছিলো না যে ১৪৪ ধারা জারীর ফলে ঐ ধরনের কোন পরিস্থিতি দেখা দেবে।'[৪]

১৪৪ ধারা জারী সম্পর্কে যে প্রেস নোটটি উপরে উদ্ধৃত করা হলো সেটি ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলেই পরদিন থেকে ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারীর নির্দেশ সরকার কর্তৃক মাইকযোগে প্রচারিত হয়।[৫]

৪. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠক'

২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ৯৪, নবাবপুর রোডস্থ আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১]

এই বৈঠকে কমিটির যে সব সদস্য উপস্থিত থাকেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন- আবুল হাশিম (অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক)★, খয়রাত হোসেন এম.এল.এ, বেগম আনোয়ারা খাতুন এম.এল.এ, শামসুল হক (আওয়ামী মুসলিম লীগ), মহম্মদ তোয়াহা (যুব

★সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য হিসেবে আবুল হাশিমকে অলি আহাদ, গাজীউল হক, এম. আর. আখতার, মহম্মদ সুলতান প্রভৃতি তাঁদের নানা লেখায় 'খিলাফাতে রাব্বানী' পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ খিলাফাতে রাব্বানী পার্টি গঠিত হয়েছিলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর আবুল হাশিম জেলে থাকার সময়, তার পূর্বে নয়। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯৫৩ সালে আবুল হাশিম খিলাফাতে রাব্বানী পার্টিতে যোগদান করেন।-ব.উ.

www.pathagar.com

লীগ), অলি আহাদ (যুব লীগ), কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নওয়াজ খান (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ), মীর্জা গোলাম হাফিজ (সিভিল লিবার্টি কমিটি), মুজিবুল হক (সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ), হেদায়েত হোসেন চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ), শামসুল আলম (সহ-সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ), আব্দুল মতিন (আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ), সৈয়দ আব্দুর রহিম (সভাপতি, রিক্সা ইউনিয়ন), শামসুল হক চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পূর্ব পকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ), আবুল কাসেম (তমদ্দুন মজলিশ), আবদুল গফুর (সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক, তমদ্দুন মজলিশ), শওকাত আলী (পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবির), গোলাম মাওলা (সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ), ইব্রাহিম তাহা (ইসলামী ভ্রাতৃ সংঘ), ইশতিয়াক আহমদ (ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ), নূরুল আলম (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ) এবং আখতারউদ্দীন আহমদ (নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ।[২]★

২০শে ফেব্রুয়ারী এই বৈঠকে একটি বিষয়ের উপরই আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং সে বিষয়টি হলো, ১৪৪ ধারা জারীর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ। এই করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে অথবা হবে না এই প্রশ্নটিই দেখা দেয় মূল প্রশ্ন হিসেবে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বিপুল অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে খুব জোরালোভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করেন।[৫]

যাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের মূল যুক্তি ছিলো এই যে, ভাষা আন্দোলন যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাতে এই আন্দোলনকে এখন আর শুধু ছাত্র সমাজের আন্দোলন বলা চলে না। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার মোকাবেলা করার মতো কোনো সাংগঠনিক প্রস্তুতি সেই পর্যায়ে নেই। দ্বিতীয়ত সরকার ১৯৫৩ সালে সাধারণ নির্বাচনের

★মওলানা ভাসানী পূর্ব নির্ধারিত সফরসূচী অনুযায়ী ১৯শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা ত্যাগ করায় ২০শে ফেব্রুয়ারী এই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। আতাউর রহমান খান মামলার কাজে ঐ সময় ময়মনসিংহে থাকায় তিনিও উপস্থিত ছিলেন না।[৩]

নিজের অনুপস্থিতি সম্পর্কে আতাউর রহমান খান বলেন, '৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর মিটিং-এ আমি ছিলাম না। ছিলাম সে সময়ে ময়মনসিংহে। মুনেম খানের কাছে আমি সর্বপ্রথম সেখানে ঢাকায় গুলী চালনার কথা শুনি। এরপর ঢাকা ফিরি ২২শে তারিখে। সেই দিনই সন্ধ্যায় হামিদুল হকের ভগবতী ব্যানার্জী রোডের বাড়ীতে একটি সভায় আমরা কয়েকজন মিলিত হই।[৪]

www.pathagar.com

যে ঘোষণা প্রদান করেছেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে যুক্তি হিসেবে উপস্থিত করে সরকার সেই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তার ফলে সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি হবে।[৬]

১৪৪ ধারা প্রসঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক বলেন,

> প্রথমত, আওয়ামী মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে ; দ্বিতীয়ত, গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরকার প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষেপ করিবে এবং
>
> তৃতীয়ত, রাষ্ট্র বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে।[৭]

'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব বলেন,

> ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা উচিত কিনা সেটা নির্ভর করবে শুধু ঢাকাতে নয়, সমগ্র প্রদেশে আন্দোলনের শক্তির উপর। কারণ এটা শুধু ছাত্র আন্দোলন নয়। এটা এমন এক আন্দোলন যা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। কাজেই প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল না হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে না। সেটা করলে তার পরিণতি অ্যাডভেঞ্চারিজম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।[৮]

আবুল হাশিম, কমরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন প্রভৃতিও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে এই একই ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন।[৯]

১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে অলি আহাদ বলেন,

> ১৯৪৯ সালে টাংগাইলের উপনির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে জনাব শামসুল হককে সদস্য হিসাবে কর্তব্য পালনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাঁহার সদস্যপদ চক্রান্ত করিয়া খারিজ করা হইয়াছে।★ এমন কি টাংগাইলে উপনির্বাচনে পরাজিত হইবার পর মুসলিম লীগ সরকার অদ্যাবধি আর কোন উপনির্বাচন দেন নাই। শুধু তাই নয়, বিনা অজুহাতে আমাদের পুনঃপুন ঘোষিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করিবার অসদুদ্দেশ্যেই সরকার ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছে। অতএব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে সমুচিত জবাব দিব।
>
> –যাহা হয় হইবে। ইহাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। এইবার যদি সরকারের জালিম ও হঠকারী মনোভাব রুখিতে না পারি, তবে ভবিষ্যতে সামান্যতম প্রতিবাদও করিতে পারিব না। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের মার্চ মাসেও সরকার ১৪৪ ধারা জারী করিয়া ঢাকা জিলা বার লাইব্রেরী হলে যুব সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিল।★★এই মুহূর্তে সম্মিলিত গণশক্তি যদি সরকারের অন্যায় আদেশ প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে আর কখনো প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং now or never।[১০]

★'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।–ব.উ.

★★এই বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।–ব.উ.

www.pathagar.com

১৪৪ ধারা ভঙ্গ প্রসঙ্গে আবদুল মতিন বলেন,

> আমাদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। যখনই কোন আসল আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দেবে তখনই ১৪৪ ধারা জারী করা হবে। এবং এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার কাছে আমরা যদি নতি স্বীকার করি তাহলে কোন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিই হলো মাতৃসংগঠন (Parent body) এবং সেই সংগঠনই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।★ সুতরাং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি'র কোন এখতেয়ার নেই অন্য ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের। যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হোক সেটা আগামীকাল সকালের জনসভাতেই স্থির করা হবে।[১১]

উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি উভয় পক্ষের মূল বক্তব্য হলেও সেই বক্তব্য উভয় পক্ষই নানাভাবে উপস্থিত করতে থাকেন এবং সেই বিষয়ে বিতর্ক অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে।

এ বিষয়ে তোয়াহার কোন জোরালো ভূমিকা পালন না করার কারণ ছিলো এই যে, তিনি তখনকার কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং সেই হিসেবেই যুব লীগের মধ্যে কাজ করছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টিই ছিলো তাঁর মূল সংগঠন যার শৃঙ্খলা তাকে মেনে চলতে হতো। কিন্তু বৈঠক চলাকালে তিনি পার্টির থেকে ১৪৪ ধারার ব্যাপারে কোন নির্দেশ পাচ্ছিলেন না এবং নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার কারণেই তাঁর পক্ষে ১৪৪ ধারা প্রসঙ্গে কোন সুনির্দিষ্ট ও জোরালো ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয় নি।[১২] শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টি বৈঠক চলাকালেই, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য চাপ সৃষ্টি না করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির ঐক্য রক্ষার জন্য তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুস সামাদ এবং দেওয়ান মাহবুব আলীকে নির্দেশ প্রদান করেন।[১৩]

এ প্রসঙ্গে মহম্মদ তোয়াহা বলেন,

> আমি বলেছিলাম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। তাছাড়া আন্দোলন হবে কি করে। তবে তার জন্য ভোটাভুটি দরকার নেই। আমি বেশী কথা না বলে চুপ থাকলাম। অপেক্ষা করছিলাম নির্দেশের জন্য। আমি বলেছিলাম ইউনিভারসিটির ছাত্রেরাই প্রধান। তাদের মত আমরা জানি না। সেটা জানা উচিত। In fact, আমি instruction-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মতিন সাহেবরা এমন সময় গিয়ে বললেন তাঁরা violate করতে চান। ভোটের সময় আমি পার্টি সিদ্ধান্ত পেলাম। কাজেই আমি ভোট দিই নি। অলি আহাদ discipline বুঝতো না।[১৪]

★আবদুল মতিন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি হলেও এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছিলো বলে কোন তথ্য জানা নেই।–ব.উ.

www.pathagar.com

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির লাইন, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্পর্কে শহীদুল্লাহ কায়সার★ বলেন,

> ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে ঢাকাতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ঐ একই দিন বিকেলে নবাবপুরে অবস্থিত আওয়ামী লীগ অফিসে সংগ্রাম কমিটি একটি বৈঠকে মিলিত হন। পরের দিনের ধর্মঘট এবং ঐ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন আলোচনার জন্য বৈঠকটি পূর্বেই ডাকা হয়েছিলো। কিন্তু তাহলেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো।
>
> তোয়াহা, অলি আহাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী এবং সামাদকে তকিউল্লাহ নির্দেশ দিলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য চাপ দিতে কিন্তু অন্যদেরকে যদি এ ব্যাপারে রাজী করানো সম্ভব না হয় তাহলে তাঁদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।★★ কিন্তু প্রাথমিক কিছু আলোচনার পরই দেখা গেলো যে, আওয়ামী লীগের লোকেরা এবং সংগ্রাম কমিটির অন্যসব অ-পার্টি সদস্যরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে অনিচ্ছুক। সুতরাং পার্টিকে দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলো।
>
> একটি জরুরী বৈঠকে পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, পার্টি কোন অবস্থাতেই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির মধ্যে কোন ভাঙ্গন ঘটাতে দেবে না। কোন extremism-কেও উৎসাহিত করা হবে না কারণ সেই ধরনের ঘটনা সরকার কর্তৃক খুব সুবিধাজনকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সেজন্য পার্টি তোয়াহা, অলি আহাদ, সামাদ এবং দেওয়ান মাহবুব আলীকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিলো যে, তারা যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য চাপ সৃষ্টি না করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সদস্য।★★★ তাঁদেরকে আরও বলা হলো যে, তাঁরা যেন কমিটির কাছে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন যে, যে কোন জরুরী অবস্থার ফলে অল্প দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত হয়ে যেতে পারে এবং নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেলে তা পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক জীবনে হবে একটা বিরাট setback। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির অন্য যে সব সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বলেছিলেন তাঁরা প্রায় এই একই লাইনে যুক্তি প্রদান করেন।[১৫]

কোন সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সর্বদলীয় কমিটির এই বৈঠক অব্যাহত থাকে। অবশেষে কমিটির বিবেচনার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করা এবং পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী বাতিলের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন।[১৬] প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অলি আহাদ ও আবদুল মতিন প্রবল আপত্তি জানালে সেটি ভোটে প্রদান করা হয়। অলি আহাদ, আবদুল মতিন এবং গোলাম মওলাসহ (সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র) চার জন প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট

★১৯৫২ সালেই এই সময়ে শহীদুল্লাহ কায়সার কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে ছাত্র আন্দোলনে পার্টি কর্মীদেরকে নির্দেশ প্রদান ও পরিচালনা করতেন।–ব.উ.

★★এই সময় তকিউল্লাহ এবং উল্লিখিত পাঁচ জনই তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। এ কারণেই পার্টি তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলো।-ব.উ.

★★★দেওয়ান মাহবুব আলী কমিটির সদস্য ছিলেন এর কোন উল্লেখ অন্য কোথাও নেই।–ব.উ.

www.pathagar.com

দেন।★ মহম্মদ তোয়াহা ভোট দানে বিরত থাকেন।[১৭] আবুল হাশিম, কমরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নওয়াজ খান, মীর্জা গোলাম হাফেজ প্রভৃতি ১১ জন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করেন।[১৮] এই বৈঠকে প্রথম দিকে উপস্থিতির সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বৈঠক ত্যাগ করে যাওয়াই সম্ভবত কারণ যার জন্য ভোটাভুটির সময় কমিটি সদস্যদের মধ্যে মাত্র ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

★প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটদাতাদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকেই অনেক নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে দুইজনের সম্ভাব্যতাই বেশী। প্রথম জন হলেন ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি শামসুল আলম। অলি আহাদ (জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৪৯)- সহ আরও কয়েকজন তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। সেই সময় ফজলুল হক হলের ছাত্রেরা ব্যাপকভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সমর্থক ছিলেন। সেই হিসেবে এবং শামসুল আলমের সঙ্গে যুব লীগের কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য শামসুল আলমের পক্ষে ভোট দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কারণে তিনি হয়তো ভোট না দিয়েও থাকতে পারেন। সে কারণটি হলো, ভোটাভুটির সময় বৈঠকের জায়গায় তাঁর অনুপস্থিতি। আবদুল মতিন উল্লেখ করেছেন যে, আলোচনা যত দীর্ঘতর হচ্ছিলো ততই তাঁরা শেষ করার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলেন কারণ পরদিনের কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য ঐ সময় তাঁদের কিছু সাংগঠনিক কাজ করার দরকার ছিলো। ফজলুল হক হল যেহেতু এই তৎপরতার একটি কেন্দ্রস্থল ছিলো সেজন্য শামসুল আলম হয়তো সাংগঠনিক কাজে সভা শেষ হওয়ার পূর্বেই বৈঠকের স্থান ত্যাগ করেছিলেন। তাছাড়া তোয়াহার বক্তব্য ছিল ভোটাভুটি না করে Consensus এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সেজন্য হয়তো অনেকের মনে এই ধারণা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ভোটাভুটির কোন প্রয়োজন হবে না।

অপর ব্যক্তি হলেন ইব্রাহিম তাহা। তাঁর সম্পর্কে মহম্মদ সুলতান বলেন (একুশের সংকলন ৮২ ; পৃঃ ৭৮), 'এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, জনাব ইব্রাহিম তাহা যদিও একটি প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের (ইসলামিক ব্রাদারহুড) প্রতিনিধি ছিলেন, তথাপি তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সেদিনের সেই সভায় মত দিয়েছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দুটি কণ্ঠ সেদিন সোচ্চার হয়েছিলো-(১) জনাব অলি আহাদ, (২) জনাব ইব্রাহিম তাহা। জনাব মতিন ঐ সভায় তেমন কোন মতামত সেদিন দিতে পারেন নি সত্য তবে আগামীকাল অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সে সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে বলে মত দেন।'

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের পক্ষ থেকে সেদিনকার বৈঠকে ইব্রাহিম তাহা ব্যতীত ইশতিয়াক আহমদও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য হলো, "ঐ দিন তাহা খুব জোরালোভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মতামত ও যুক্তি দিয়েছিলো। আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষেই ছিলাম।" (সাক্ষাৎকার ২৪.৯.৮২)

অপর একটি তথ্য থেকেও ইব্রাহিম তাহার বিরোধী ভোট দানের কথাটি গ্রাহ্য বলে মনে হয়। গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিচারণে (একুশের সংকলন ৮২ পৃঃ ১৪৮) বলেছেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী যে দ্বিতীয় গ্রুপটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে বাইরে যায় তার নেতৃত্ব দেন ইব্রাহিম তাহা এবং আবদুস সামাদ। তাহা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো মত পোষণ না করতেন তাহলে প্রথম দিকেই এইভাবে তাঁর পক্ষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না।

ইব্রাহিম তাহা উপস্থিত থাকলে সে বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত দেওয়াই স্বাভাবিক ছিলো (এবং ইশতিয়াক আহমদ বলেন যে, তিনি উপস্থিত ছিলেন)। হয়তো তিনি চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে ভোটও প্রদান করেছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি একট প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের প্রতিনিধি ছিলেন সেজন্য তাঁর কথা প্রায় সকলেই ভুলে গেছেন এবং পরে আর তাঁর নাম উল্লেখ করার কথা কারো মনে হয় নি। এটাই একটা কারণ হতে পারে যার জন্য বিরোধী চতুর্থ ভোট সম্পর্কে স্মৃতিচারণকারীদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই।

www.pathagar.com

এই ভোটাভুটির পর অলি আহাদ বৈঠক স্থলেই সকলকে শুনিয়ে বলতে থাকেন যে সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত যাই হোক, আগামীকাল সকালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। তাঁর এই ধরনের উক্তির পর আবুল হাশিম বলেন যে, সেই অবস্থায় সর্বদলীয় কমিটির আর কোন প্রয়োজন হবে না। কাজেই ১৪৪ ধারা ঐ ভাবে ভঙ্গ হলে সেই সঙ্গে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে। এ কথার পর আবুল হাশিমের এই বক্তব্যটিও প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়।[১৯]

এছাড়া তৃতীয় একটি প্রস্তাবও ২০শে তারিখের এই বৈঠকে গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, সকালে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সভায় সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া ও ব্যাখ্যা করার জন্য শামসুল হকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[২০]

৫. ছাত্র মহলে ১৪৪ ধারা জারী ও সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া

২০শে ফেব্রুয়ারী সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটে যোগদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্য প্রচার কাজ চালান।

> মেয়েদেরকে সংগঠিত করার কাজ সম্পর্কে শাফিয়া খাতুন বলেন, 'ওমেন্স স্টুডেন্টস ইউনিয়নে'র ভি.পি. হিসেবে আমি শুধু ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্বই পালন করতাম। ছাত্রীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে মেয়েদের স্কুলে পাঠাই। তখন ছাত্রীদের মাঝেও এমন উৎসাহ লক্ষ্য করেছি যে, তা কোন দিন ভুলবার নয়। পায়ে হেঁটে মেয়েরা বাংলাবাজার গার্লস স্কুল ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারীর আমতলার সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রীদেরকে সংগঠিত করেছে। একুশের আন্দোলনকে সফল করার পেছনে এসব তৎপরতা অসীম অবদান রেখেছে।[১]

এ সম্পর্কে শামসুন্নাহার আহসান বলেন,

> একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করে তোলার জন্য আমরা গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুলে গিয়ে পরদিন আমতলার মিটিং-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করি। এসব তৎপরতার প্রতি উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায়।[২]

২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলের দিকে মাইকযোগে ১৪৪ ধারা জারীর ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে এবং মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে ছাত্রেরা সভা করে সরকারের এই ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করতে

www.pathagar.com

থাকেন এবং তাঁদের এই তৎপরতার মাধ্যমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির উপর ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য কিছু চাপ সৃষ্টি হয়। ছাত্রদের এই মনোভাব বৈঠকরত সর্বদলীয় কমিটির কাছে ব্যক্ত করার জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়।[৩]

২০শে তারিখ সন্ধ্যায় সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সেই সভায় স্থির হয় যে ১৪৪ ধারা মেনে নেওয়া হবে না। কাজেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় কমিটিতে জানিয়ে দিতে হবে। ঐ একই সময়ে ফজলুল হক মুসলিম হলে আবদুল মমিনের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সেখানেও সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের।[৪]

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত ছাত্রাবাসগুলিতে পৌঁছলে ছাত্রদের মধ্যে নোতুনভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তাঁরা সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে পরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য প্রত্যেকটি হলে প্রচার কার্য শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পোস্টারও লেখা হয়। এই ধরনের তৎপরতা ২০-২১শের রাত্রে প্রায় সারাক্ষণই ছাত্রাবাসগুলিতে বজায় থাকে।[৫]

মধ্যরাত্রিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী পুকুরের পূর্ব পাড়ের সিঁড়িতে একটি বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন- গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান (শেলী), মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান, আবদুল মোমিন, এম. আর. আখতার (মুকুল), কমরুদ্দীন শহুদ, এস.এ. বারী এটি, আনোয়ারুল হক খান প্রভৃতি।[৬]

ঐ সভায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা পরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। পরদিন সকালের ছাত্র সভায় গাজীউল হককে তাঁরা সভাপতি করার চেষ্টা করবেন এই মর্মেও একটি সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেন।[৭]

এই বৈঠক সম্পর্কে গাজীউল হক সহ কয়েকজন কিছুটা বিস্তারিত সাংগঠনিক বিষয়ের উল্লেখ করলেও হাবিবুর রহমান (শেলী) প্রসঙ্গতঃ বলেন,

> সেদিন রাতে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে এবং আন্দোলন বন্ধ করা চলবে না। আমরা কেমন করে আইন অমান্য করবো তার কোন স্পষ্ট ছবি তখন আমাদের মনে ছিল না। তরুণ মনে এই আশা ছিল যে একবার ১৪৪ ধারা ভাঙলে বেশীর ভাগ ছাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য।[৮]

www.pathagar.com

আসলে এই বৈঠকে যাঁরা যোগদান করেন তাঁরা যুবলীগ ও বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদের সঙ্গে থাকলেও কোন ধরনের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতেয়ার তাঁদের ছিল না। কিন্তু তবু তাঁরা ১৪৪ ধারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বসেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণও করেছিলেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে এবং মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সব ছাত্রদের মধ্যে যুব লীগের কর্মীরা অনেকে থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের কোন জরুরী বৈঠক এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয় নি।

২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একুশে ফেব্রুয়ারীর পূর্বাহ্নে কোন সংগঠিত প্রস্তুতি অপেক্ষা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার দিকটিই মোটামুটিভাবে প্রাধান্যে ছিলো। এই স্বতঃস্ফূর্ততা ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর মধ্যেও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো।

৬. মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ও ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

২০শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অধিবেশনের পর রাত্রে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে সদস্যরা নূরুল আমীনের উপর চাপ দিয়েছিলেন বাংলা ভাষা স্বীকার করে নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী আজফারের চাপে তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি। সংখ্যাগুরু সদস্যেরা বাংলার সপক্ষে ছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁরা নূরুল আমীনের উপরই দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু নূরুল আমীন সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।[১]

এরপর মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী। সেই বৈঠকে ভাষার প্রশ্নে মওলানা বাকী বাংলা সমর্থন করেন। কিন্তু শেষে তিনি সহ অন্যান্য বাংলা সমর্থকরা সংখ্যালঘু হয়ে যান।[২]

৭. দুটি প্রচার পুস্তিকা

২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে একটি করে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পুস্তিকাটির নাম ছিলো 'আমাদের ভাষার লড়াই' সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুবের অনুরোধে

www.pathagar.com

বদরুদ্দীন উমর কর্তৃক এটি লিখিত হয়।[১] এই পুস্তিকাটি ছাপা হয় খোন্দকার মোশতাকের দায়িত্বে।[২] বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পুস্তিকাটির নাম ছিলো 'রাষ্ট্রভাষা কি ও কেন ?'।[৩] যুব লীগের উদ্যোগে এবং অলি আহাদের অনুরোধেই পুস্তিকাটি আনিসুজ্জামানের দ্বারা লিখিত হয়েছিলো।[৪]★

★এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান ২২.১০.১৯৮২ তারিখে লিখিত একটি পত্রে আমাকে বলেন, "আমার যতদূর মনে পড়ে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে একটি পুস্তিকা রচনার ভার মোহাম্মদ তোয়াহাকে দেওয়া হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, যুবলীগই এই দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেছিলেন : তবে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে তাঁর পুস্তিকা বের হবে, এমন ধারণাই আমাদের জন্মেছিল। তোয়াহা সাহেব লিখতে দেরী করছিলেন। তখন অলি আহাদ আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি পুস্তিকা লিখতে বলেন। আমি লিখে দিলে অলি আহাদ তা সংশোধন করে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের নামে মুদ্রণ ও প্রচার করেন। পুস্তিকাটির নাম ছিল : 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন', সাব-টাইটেল ছিল : 'কি ও কেন ?'। পুস্তিকায় লেখক হিসেবে কারোর নাম ছিল না। এটাই সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসে ছাপা প্রথম পুস্তিকা। এর পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পুস্তিকা বেরিয়েছিল। কোন পুস্তিকারই কপি আমার কাছে নেই।"

এই দুটি পুস্তিকার কপি যাঁদের কাছে রাখতে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা পুলিশের ভয়ে ভীত হয়ে অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে এগুলিও পুড়িয়ে ফেলেন। অনেক খোঁজ করেও অন্য কারো কাছে এ পর্যন্ত আর পাওয়া যায় নি। একুশের পর পুলিশ এগুলি বাজেয়াপ্ত করে।–ব.উ.

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ : ২১শে ফেব্রুয়ারী

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ও সমাবেশ

২১শে ফেব্রুয়ারী খুব ভোর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। নেতৃস্থানীয় ছাত্রদেরকে পাছে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে বাধা দেয় সেজন্য তাঁদের কয়েকজন খুব সকাল করেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। এইভাবে প্রথমে গাজীউল হক ও পরে মহম্মদ সুলতান, এস.এ. বারি এটি প্রভৃতি ছাত্র-নেতারা এলাকায় পুলিশ মোতায়েনের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দুজন দুজন করে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠাতে শুরু করেন।[১][★]

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকেও ছাত্রেরা পিকেটিং-এর জন্য শহরের কিছু এলাকায় যান। সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র নেতারা এই ধরনের পিকেটিং-এর বিরোধিতা করেন এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে খোলাখুলি মতবিরোধ শুরু হয়। অবশেষে ছাত্রেরা নবাবপুর এলাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩]

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সকাল ৮টা থেকেই বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করেন। ৯টা সাড়ে ৯টার মধ্যেই আমতলার নীচে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর সমাবেশ ঘটে।[৪] কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, আব্দুস সামাদ প্রভৃতি ছাত্রদের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সময় শেরওয়ানী ও জিন্নাহ টুপী পরিহিত শামসুল হক মধুর রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হলে ছাত্রেরা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাও করে উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা শুরু করেন এবং শামসুল হকও তাঁদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে নানা যুক্তি দিতে

★ যাঁদের মাধ্যমে এ সব চিঠি পাঠানো হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্কুল ছাত্রী জাহানারা লাইজু, মেডিকেল কলেজ ছাত্র মঞ্জুর, নিযামুল হক প্রভৃতি।[২]

www.pathagar.com

থাকেন। এই বিতর্ক ও বাদানুবাদের এক পর্যায়ে হাসান হাফিজুর রহমান উত্তেজিতভাবে শামসুল হককে traitor বলে গালাগালি দিয়ে তাঁর মাথা থেকে টুপী ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেন।[৫]

সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই ঢাকার সিটি ডি.এস.পি সিদ্দিক দেওয়ানের পরিচালনায় পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করে। খুব সকাল থেকে ঢাকা সিটি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ মাহমুদ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের অবস্থান দেখে বেড়াতে থাকেন। সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে ঢাকার এস. পি. মাহমুদ ইদরিস পুলিশ অবস্থান আরও জোরদার করেন। এর ফলে সেখানে সিটি ডি.এস.পি, এস.এ.এফ-এর ১ জন ইন্সপেক্টর, ২ জন হেড কনস্টেবল ও ২০ জন কনস্টেবল এবং ১ জন ইন্সপেক্টর, ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ১ জন সার্জেন্ট, ২ জন হেড কনস্টেবল ও ১৪ জন লাঠিধারী কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়। মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে এস.এ.এফ-এর ১ জন হেড কনেস্টেবল ও ১০ জন কনস্টেবল এবং সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল-এর সামনে ১ জন হেড কনস্টেবল ও ১০ জন কনস্টেবলকে মোতায়েন করা হয়। এই কনস্টেবলরা ছিলো অস্ত্রসজ্জিত।[৬]

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এইভাবে পুলিশ মোতায়েনের যুক্তি হিসেবে পুলিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়,

> খুব সকাল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, সিটি টহলে বের হয়ে বিভিন্ন পুলিশ অবস্থান দেখে বেড়ান। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিনি দেখেন যে ছাত্রেরা যানবাহন দাঁড় করাচ্ছে যাত্রীদেরকে বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা ও মোটরগাড়ী থেকে নামতে বাধ্য করছে এবং ঐসব যানবাহনের চাকা থেকে হাওয়া বের করে দিচ্ছে যাতে সেগুলি পরবর্তীতে আর ব্যবহার করা না যায়। পুলিশ অফিসাররা যানবাহন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য এতে বাধা প্রদান করতে গেলে তাদেরকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা হয় এবং বিশেষ করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ ইদরিস সকাল ৭-৪৫ মিনিটে খবর পান যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ এলাকার ভিতরে ও বাইরে বহুসংখ্যক ছাত্রের সমাবেশ হয়েছে এবং তারা তাদের দ্বারা ঘোষিত হরতাল জোরপূর্বক কার্যকর করার জন্য চালক ও যানবাহনসমূহকে দাঁড়াতে এবং যাত্রীদেরকে নেমে পড়তে বাধ্য করছে। এই গোলযোগপূর্ণ স্থানে পুলিশ সুপার সকাল ৮-১৫ মিনিটে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, ছাত্রেরা সত্যিই জোর জবরদস্তি করছে যানবাহন থামিয়ে দেওয়ার জন্য ঠিক সেইভাবে যেভাবে তাঁর কাছে রিপোর্ট করা হয়েছিলো। এই সব কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য এস.পি. ছাত্রদেরকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি দেখলেন যে তাঁর প্রতিবাদের কোন ফল হচ্ছে না এবং যেহেতু তিনি গণ্ডগোলের আশঙ্কা করছিলেন সেজন্য তিনি ঐ বিশেষ এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করেছিলেন।[৭]

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, আমতলায় এবং মধুর রেস্তোরাঁয় বহুসংখ্যক ছাত্র জমায়েত হয়ে উত্তেজনাপূর্ণভাবে নানা ধরনের আলোচনা করছিলেন এবং

www.pathagar.com

যাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের বক্তব্য খণ্ডন করছিলেন। আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার জন্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তখন অল্পসংখ্যক ছাত্র ছাড়া বাকী সকলেই মোটামুটি একটা ঐকমতে পৌঁছালেও কিভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে কোন সুষ্ঠু ধারণা তখনো পর্যন্ত কারো ছিলো না। চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খল ভাবও বিরাজ করছিলো।[৮]

গাজীউল হক এবং এম.আর. আখতার (মুকুল) অলি আহাদকে পূর্ব রাত্রিতে ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ের বৈঠকে তাঁদের দ্বারা গৃহীত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা জানান।[৯] ইতিমধ্যে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মতামত খুব প্রবল থাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্র লীগের উপস্থিত নেতৃবৃন্দ খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় কাজী গোলাম মাহবুব অলি আহাদকে জিজ্ঞেস করেন তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন কিনা। এর জবাবে অলি আহাদ বলেন যে, সেটা সাধারণ ছাত্র সভাতেই স্থির করা হবে।[১০]

২১শে ফেব্রুয়ারী আমতলায় ছাত্রসভা শুরু হওয়ার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ডক্টর ওসমান গণি, কলা অনুষদের ডীন ডক্টর জুবেরী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর নিউম্যান সেখানে উপস্থিত হন।[১১] দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর গোলাম জিলানীও প্রায় একই সময়ে সেখানে যান[১২] এবং ছাত্রেরা যাতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করেন তার জন্য তাঁরা সকলে ছাত্রদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী এলিস কমিশনের কাছে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তার থেকে জানা যায় যে, বেলা দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যখন ছাত্রেরা সভার কাজ আরম্ভ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে বলেন ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে এবং তাঁকে অনুরোধ করতে যাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ছাত্রদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেন। এর অল্প পরেই কোরেশী এবং তার ঠিক পরই ভাইস-চ্যান্সেলর অন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে উপস্থিত হন। কোরেশী তাঁদেরকে অনুরোধ করেন ছাত্রদেরকে বোঝাতে যাতে তারা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে।[১৩]

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আমতলায় ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ছিলো আনুমানিক এক হাজার।[১৪] ভাইস-চ্যান্সেলর যখন ছাত্র ছাত্রীদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করা এবং শান্তি রক্ষা করা ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে থাকেন তখন

www.pathagar.com

ছাত্রেরা তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁদের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য। এর জবাবে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন যে, ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে না এবং সভার পর শান্তিপূর্ণভাবে একে একে বাইরে চলে যাবে এই শর্তে তিনি ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্ব করতে সম্মত আছেন। ছাত্রেরা তাঁর এই শর্ত মানতে অস্বীকার করায় ভাইস-চ্যান্সেলরও তাঁদের সভায় সভাপতিত্ব করার ব্যাপারে অসম্মতি জানান।[১৫]

এর ঠিক পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সভার কাজ শুরু হয়। এই সময় ভাইস চ্যান্সেলর সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও শিক্ষক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই কিছু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ান এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।[১৬]

মুসলিম ছাত্র লীগের খালেক নওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুব, নূরুল আলম প্রভৃতি স্থির করেছিলেন যে ঐ দিনের সভায় তাঁরা কাজী গোলাম মাহবুবকে সভাপতি করবেন।[১৭] কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে উদ্যোগী হওয়ার পূর্বেই পূর্ব রাত্রে ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোস্তফা রওশন আখতার (মুকুল) সভাপতি হিসেবে গাজীউল হকের নাম প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেন কমরুদ্দীন শহুদ।[১৮]

সভা শুরু হওয়ার পর একে একে শামসুল হক, মহম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব এবং খালেক নওয়াজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন ও যুক্তি প্রদান করেন। অন্যদিকে আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মতপ্রকাশ করে বলেন যে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অলি আহাদকে এই সভায় বক্তব্য রাখার জন্য কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ অনুরোধ জানালে তিনি বলেন যে, তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে চান কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও চান যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে সংগ্রাম পরিষদ অটুট থাকুক। কাজেই তিনি এমন কোন বাক বিতণ্ডা চান না যার দ্বারা সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য বিনষ্ট হয়।[১৯]

সভা প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর অবশেষে গাজীউল হক সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সপক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, এ ভাবেই তাঁরা নূরুল আমীন সরকারের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে চান। সভায় শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব প্রভৃতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেও তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে তেমন কোন সমর্থন ছিল না। সভাপতি গাজীউল হক কর্তৃক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠেন এবং '১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকেন।[২০] এই সময় আবদুস সামাদ প্রস্তাব করেন যে, কিছুটা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে ১৪৪ ধারা

www.pathagar.com

ভঙ্গের জন্য ১০ জন করে এক এক ব্যাচে বের হওয়া দরকার, কারণ সকলে একসঙ্গে বের হতে চাইলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।[২১] প্রস্তাবটি গৃহীত হলে সভা শেষ হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে সমবেত হতে শুরু করেন। সময় তখন ছিলো বেলা ১১টা।[২২]

২. ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর পূর্বে যাঁরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেন। এ প্রসঙ্গে শামসুল হকের উল্লেখ করে গাজীউল হক বলেন,

> একথা সত্য, জনাব শামসুল হক সভায় ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু যখনই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো তখনই শামসুল হক আমাকে বললেন, 'এ সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম এবং আমি এ সংগ্রামের সঙ্গে আছি।' সুতরাং সেদিন যে কোন কারণেই হোক ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরুদ্ধে যাঁরা ছিলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তাঁরা প্রায় সবাই আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং আন্দোলনে অংশ নেন। এঁদের অনেকেই ঐদিন গ্রেফতার হন। জনাব শামসুল হকও পরবর্তীকালে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন।[১]

যে সব ছাত্রছাত্রী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাইরে যাবেন তাঁদের নামের একটা তালিকা রাখার জন্য মহম্মদ সুলতানকে দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি সেই অনুযায়ী গেটের গোড়ায় উপস্থিত হলেন।[২] ঠিক এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো সে সম্পর্কে হাবিবুর রহমান (শেলী) বলেন,

> আইন ভাঙ্গার প্লানে এমন একটা আতঙ্কিতভাব ছিল যে, অনেকে ভাল করে বুঝতে পারল না কি করতে হবে। আগের রাতে যাঁদের মধ্যে আইন ভাঙ্গার ব্যাপারে একটু ইতস্ততভাব ছিল, দেখলাম, তাঁদের সেই দোটানা ভাব কখন কেটে গেছে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়বে বলে অনেকে রুমাল ভিজিয়ে নিল। ভিড়ের মধ্যে আমিও আমার রুমালটা ভিজিয়ে নিলাম। তারপর মনে কেমন যেন একটা লজ্জা হচ্ছিল। প্রক্টরের গেটের কাছে ক্রমশ ভিড় জমেছে, কিন্তু রাস্তায় বের হওয়ার কোন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। চতুর্দিকে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব। কেউ কারও কথা শুনছে বলে মনে হচ্ছে না।[৩]

এই পরিস্থিতিতে হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বেই প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী স্কোয়াডটি গেট থেকে বের হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে।[৪] এ সম্পর্কে হাবিবুর রহমান বলেন,

> আমি দেখলাম, আমাদের আগের দিনের প্লান প্রায় ভেস্তে যাবার জোগাড়। হঠাৎ করে আমার মনে হল, আমরা কয়েকজন যদি গেটের বাইরে গিয়ে ১৪৪ ধারা

www.pathagar.com

> ভাঙ্গি তবে কেমন হয়। আমাকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে এমন কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে আমার মনে নেই। আমি যেহেতু আগের দিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার উপর জোর দিই সেজন্য বন্ধুদের একটা প্রত্যাশা ছিলো যে, আমি প্রথমে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে যাবো। যাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে এলেন মোহাম্মদ সুলতান তাঁদের নাম লিখে নিলেন। আমি তাঁকে বললাম : "তুই আমার পঙ্খীরাজটা (সাইকেল) দেখিস, আমি চললাম।" গলা ফাটিয়ে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে গেলাম কয়েকজনকে সাথে করে।[৫]

এইভাবে প্রথম দলটি নিয়ে হাবিবুর রহমান ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্যে বের হয়ে যাওয়ার ঠিক পরই ইব্রাহিম তাহা, আব্দুস সামাদ, আনোয়ারুল হক খান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ প্রভৃতি ছাত্রদেরকে নিয়ে বাইরে যান। শাফিয়া খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশান আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার প্রভৃতি বেশ কয়েকজন ছাত্রীও ঐ সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ছাত্রদের দুই তিনটি দল বাইরে যাওয়ার পর তাঁরাও কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গেটের বাইরে গিয়ে পড়েন। তাঁদের প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন শাফিয়া খাতুন। মেয়েদের কয়েকটি দল বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এস. এ. বারী এটি, শামসুল হক (ছাত্রনেতা), আনোয়ারুল আজিম, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্, সৈয়দ ফজলে আলী, বদরুল আমীন প্রভৃতি আরও অনেক ছাত্র শ্লোগান দিতে দিতে গেট পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। মহম্মদ সুলতান, হাসান হাফিজুর রহমান, আজহার প্রভৃতি তাঁদের নাম টুকে রাখছিলেন।[৬] বস্তুতপক্ষে, এই পর্যায়ে ছাত্রেরা দলে দলে পৃথকভাবে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর না হয়ে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মতো বাইরে যাচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের নাম লিখে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিলো না।[৭] তাছাড়া পুলিশ তখন কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করায় সকলেই সে সময় কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো।[৮]

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যাঁরা বাইরে যাচ্ছিলেন তাঁদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিজেদের গাড়ীতে তুলছিলো এবং গাড়ী ভর্তি হলে সেগুলিকে থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করছিলো। কোন ছাত্রীকে অবশ্য সেদিন তারা গ্রেফতার করে নি।[৯] ছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সম্পর্কে তিনটি রিপোর্ট নীচে উল্লেখ করা হলো,

> (ক) শাফিয়া খাতুন : "ছেলেরা বের হতেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলো। আমরা ২ জন ২ জন করে★ দূরত্ব রেখে বের হলাম। গেটের পাশে পানি ভর্তি একটা বালতি রাখা ছিলো। সবাইকে বলা হয়েছিলো, রুমাল ভিজিয়ে নেয়ার জন্য। কাঁদুনে গ্যাস হতে চোখ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

★ছাত্রীদের এই রিপোর্টগুলির প্রত্যেকটিতেই ২ জন করে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ২ জন করে বের হওয়ার কোন ব্যাপার সেদিন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হওয়ার সময় অবশ্য ২ জন করে ভিতরে ঢোকার জন্য সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। –ব.উ.

www.pathagar.com

"আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ এগিয়ে আসছিলো বাধা দেয়ার জন্যে। পাশের থেকে ওদের কোন অফিসার বোধ হয় বললো, 'ছোড় দো'। আর বাধা পেলাম না।"[১০]

(খ) সুফিয়া ইব্রাহিম : "প্রথমে কিছুটা সংকোচ ও দ্বিধা হচ্ছিল এই ভেবে যে মাসুদ মাহমুদ সহ পরিচিত পুলিশ অফিসারদের মাধ্যমে আমার মিছিল করার খবরটি বাসায় পৌঁছে যাবে। যদিও এ ব্যাপারে আমার পিতা কখনো বিরূপ মন্তব্য করেন নি, তবুও খানিকক্ষণ কেন জানি এমনি ধরনের অনুভূতি বিরাজ করছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমরা (আমি, শামসুন্নাহার, সারা তাইফুর) কর্ডনের নীচে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ কয়েকজন সামনে এগিয়ে গেলাম। সবার নাম স্মরণ করতে পারছি না। রওশন আরা (বাচ্চু) ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের সাথে ছিলেন, না শাফিয়া আপাদের সাথে ছিলেন ঠিক মনে নেই। তিনি লাঠির আঘাতে আহত হয়ে ছিলেন।"[১১]

(গ) শামসুন্নাহার : "শাফিয়া আপারা বের হয়ে যাওয়ার খানিক পরেই আমরা বের হয়ে যাই। আমরা মেন গেট দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর পরই দেখি আমাদের ছাত্রদের মধ্যেই কে বা কারা ইউনিভারসিটি গেট বন্ধ করে দিয়েছে। সামনে দেখি পুলিশ কর্ডন করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্ডনের এক পাশে সিটি এস.পি. মাসুদ মাহমুদ দাঁড়িয়ে আছে।

"আমরা কর্ডন ভেদ করে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। সুফিয়া মাসুদ মাহমুদ সহ কয়েকজন পরিচিত পুলিশ কর্মকর্তা দেখে কিছুটা সংকোচ বোধ করছিল। যাক আমি আর সুফিয়া এক জায়গায় কর্ডনের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক করে ফেললাম। এবং ওরা (পুলিশেরা) বুঝবার পূর্বেই হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে সাথে বেশ কয়েকজন মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। আমরা সংগঠিত হয়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমি, সুফিয়া, রওশন আরা ও সারা তাইফুর ছিলাম। সুরাইয়া নামে বোধ হয় আর একজন ছাত্রী ছিল। সবার নাম মনে পড়ছে না।"[১২]

২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের দ্বারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সম্পর্কে এলিস কমিশন রিপোর্টে বলা হয়,

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটি বেলা ১১টার দিকে ভঙ্গ হয়। তখন, ডক্টর জুবেরীর বক্তব্য অনুযায়ী "দারুণ উত্তেজিত অবস্থায়" ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় গেট দখল করে এবং ভাইস-চ্যান্সেলর ও তাঁর দুই জন সহকর্মীর বিবৃতি অনুযায়ী তারা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার জন্য ৫, ৭ ও ১০ জনের ছোট ছোট ব্যাচে গেটের বাইরে বের হয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, একটি নোট বইয়ে লিখিত রোস্টার লিস্ট থেকে নাম পড়ে পড়ে শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা গেটের বাইরে বের হতে থাকে–এটা এমন এক পরিস্থিতি যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, "সভা"র ব্যাপারটি কেবলমাত্র একটি বিরাট ভাঁওতা ছিলো, ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য পূর্বেই সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো এবং সেজন্য ছাত্রদের মধ্যে কারা কিভাবে পর পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করবে তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। ছাত্রেরা যেমন যেমন ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গেটের বাইরে আসছিল তেমনি পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করছিলো–অবশ্য ছাত্রীদেরকে বাদ দেয়া

www.pathagar.com

হচ্ছিলো। কিছু ছাত্র আবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই চড়ে বসছিলো গাড়ীর মধ্যে যেগুলি দিয়ে তাদেরকে থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিলো। মোট ৯১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো এবং তার মধ্যেই পুলিশের গাড়ীতে যা জায়গা ছিলো তা সব ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় গ্রেফতারকৃতদেরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারার জন্য পুলিশ খুব অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলো। এই অস্বস্থির ব্যাপারটা টের পেয়ে জনতা আরও মারমুখো হয়ে উঠলো এবং পুলিশের দিকে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করলো।[১৩]

এই সময় পুলিশ নিজেদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে,

অতিরিক্ত সিটি এস.পি.কে পরিষদ ভবন পাহাড়া দেওয়ার জন্য সেখানে পাঠানো হলো যেহেতু খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে, ছাত্রেরা পরিষদ ভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার মতলব করছে। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে একটি গ্যাস স্কোয়াড নিয়ে আসা হলো। এই সময় পুলিশ বাহিনীর অবস্থান ছিলো নিম্নরূপ ঃ-

বিশ্ববিদ্যালয় গেটে ১ জন ইন্সপেক্টর, ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ১ জন হেড কনস্টেবল, ৬ জন এস.এ.এফ. এর কনস্টেবল, ২ জন হেড কনস্টেবল ও ৪ জন লাঠি সজ্জিত কনস্টেবল ও গ্যাস স্কোয়াডের ১৪ জন কনস্টেবল। মেডিকেল কলেজ গেটে ছিলেন সিটি ডি.এস. পি, ১ জন হেড কনস্টেবল এবং দশজন এস.এ.এফ-এর কনস্টেবল। পরিষদ ভবনের কোনায় ছিলেন অতিরিক্ত সিটি এস. পি, ৩ জন সার্জেন্ট, ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর ও ২ জন হেড কনস্টেবল এবং ১৮ জন অস্ত্রসজ্জিত কনস্টেবল, ১ জন হেড কনস্টেবল ও ৪ জন লাঠিধারী কনস্টেবল এবং গ্যাস স্কোয়াডের ১ জন হেড কনস্টেবল ও ৬ জন কনস্টেবল।[১৪]

৩. ইঁট পাটকেল, কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চার্জ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর পুলিশ ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করতে শুরু করে।[১]

কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করার আরও একটি কারণ ছিলো। এই পর্যায়ে ছাত্রেরা বিপুল সংখ্যায় রাস্তায় বের হয়ে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাঁদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশ রাস্তার উপর ছাত্রদের প্রতি কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে।[২]

কাঁদুনে গ্যাসের শেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং বাইরে রাস্তার উপর সমানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো এবং চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলো। এই সময় একটি শেল আমগাছের কাছাকাছি দাঁড়ানো অবস্থায় গাজীউল হকের গায়ের উপর এসে পড়ে এবং সেটা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁকে তখন ধরাধরি করে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের দোতলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়।[৩]

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তখনো বহুসংখ্যক ছাত্র ছিলেন এবং তাঁরা কাঁদুনে গ্যাসের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সেই সময় চারিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকেন, কখনো বা ভিতরের দিকে অবস্থিত পুকুরের মধ্যে পড়ে চোখে মুখে পানি দিতে থাকেন। মাঝে মাঝে কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া একটু কমে এলে ছাত্ররা আবার দ্বিগুণ মারমুখী হয়ে পুলিশের দিকে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া শুরু করেন।[৪]

ছাত্রেরা পুলিশের দিকে ইঁট-পাটকেল ছোঁড়ার সময় পুলিশ যে ছাত্রদের উপর শুধু কাঁদুনে গ্যাসই নিক্ষেপ করছিলো তাই নয় তারাও ছাত্রদের প্রতি ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ছিলো।[৫]

এ সম্পর্কে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক The Statesman পত্রিকার তৎকালীন ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আবদুল ওয়াহাবের নিম্নলিখিত বর্ণনা খুব উল্লেখযোগ্য,

> বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের গেট থেকে ছাদের যখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করেছিলো সেই সময় আমি সেখানে দাঁড়িয়ে একদিকে লাঠিধারী পুলিশ ও অন্যদিকে ছাত্রদের মধ্যে ঠুকঠাক লড়াই দেখা শুরু করলাম। এই সংঘর্ষ কিছুক্ষণ পরে আরও বিস্তৃত হয়ে বর্তমান মেডিকেল কলেজের সামনের পুরো রাস্তাটা এবং তার গেটের পাশে মেডিক্যাল হোস্টেলের বেড়ার ঘরগুলোর কাছে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।
>
> আমি কখনো পুলিশের দিকে এবং কখনো বা ছাত্রদের দিকে রাস্তার ওপরে ঘোরাফেরা করছিলাম। এর মধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে ঢিল ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সে সময় পুলিশের পক্ষে তার নিজের ন্যায়সঙ্গত হাতিয়ারের পরিবর্তে ঢিল ছোঁড়া আমার কাছে বেশ বিসদৃশ ঠেকেছিলো। কিন্তু তারপর থেকে এ ধরনের ব্যাপার হামেশাই ঘটে আসছে। বোধ হয় এবারই তারা প্রথমবার এটা শুরু করেছিলো এবং ব্যাপারটা আমার কাছে এমন নূতন ও বেখাপ্পা ঠেকেছিল যে সেটা আমি আমার কাগজে (কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা–সম্পাদক–গণশক্তি) উল্লেখ করেছিলাম।★ আমি কয়েকজন ছাত্রনেতার সাথে আলাপ করতে থাকাকালে আমার পায়ের গোছার উপর একটা ইঁট এসে পড়ায় পুলিশের ইঁট নিক্ষেপের ব্যাপারটা আরও ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করি। এর ফলে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমায় খুঁড়িয়ে চলতে হয়।[৬]★★

এই পর্যায়ে ছাত্রদের মধ্যে ইঁট পাটকেল ছোড়ার ব্যাপারে কি ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা একটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বেলা ১টা সোয়া ১টার দিকে অলি আহাদ হাসান হাফিজুর রহমানকে বলেন যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল-এর গেটের সামনে ছাত্ররা পুলিশের দিকে ঢিল

★"এক পর্যায়ে পুলিশ ও ছাত্রেরা একে অপরের দিকে পাথর ছুঁড়ছিলো এবং কয়েকজন পুলিশ আহত হয়েছিলো।"–

★★১৯৭০ সালে সাপ্তাহিক গণশক্তির সম্পাদক থাকার সময় ঐ বৎসর একুশের বিশেষ সংখ্যার জন্য আমি ওয়াহাব সাহেবকে একটি লেখা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। সেই অনুযায়ী তিনি

www.pathagar.com

ছুঁড়ছে। তিনি যেন সেখানে গিয়ে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করেন।[৭] কিন্তু তার ফল হয় উল্টো। এ ব্যাপারে গাজীউল হক বলেন,

> পুলিশের উপর ছাত্রদের ইঁট-পাটকেল ছোড়া নিয়ে যে কি রকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো সেদিনের একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখেই তা বোঝা যাবে। জনাব হাসান হাফিজুর রহমান এবং আজহারকে পাঠানো হয়েছিলো যাতে ইঁট-পাটকেল ছোড়া বন্ধ হয় তার জন্য চেষ্টা করতে। হাসান হাফিজুর রহমান এবং আজহার গেলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ইঁট ছুঁড়তে বারণ না করে তাঁরা নিজেরাই ইঁটের বড় বড় টুকরো নিয়ে পুলিশের প্রতি ছুঁড়তে থাকেন।[৮]★

এই সময়কার ঘটনাবলী সম্পর্কে ২২শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয় :

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও বিভাগীয় ডীনগণ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্রগণ বেলা ১১টায় গেটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে দেখা যায়। এই সময় পাহারারত পুলিশগণ বিশ্ববিদ্যালয় গেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে কিছুসংখ্যক ছাত্র দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে দৌড়াইয়া মেডিকেল কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত অবশিষ্ট ছাত্রগণ ঘেরাও করা এলাকার মধ্যে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের (যিনি এই ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।) নিকট পুলিশের এই আচরণের জন্য প্রতিবাদ জানায়। ভাইস-চ্যান্সেলর সেই সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান যে, ছাত্রগণ ১৪৪ ধারা অমান্য করায় এবং তাঁহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করায় তাঁহারা কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাইস-চ্যান্সেলর ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীগণ জানান যে, ছাত্রদের পক্ষ হইতে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরিচয় তাঁহারা পান নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে মেডিকেল কলেজের গেট পর্যন্ত পুরো রাস্তা জুড়ে এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা ছড়িয়ে পড়ছিলেন এবং রাস্তার উপরই তাঁদের

একটি লেখা আমাকে দেন। মূল রচনাটি ইংরেজীতে ছিল। সেজন্য আমি নিজে তার বাংলা অনুবাদ করে গণশক্তিতে প্রকাশ করি।–ব.উ.

★সাইয়িদ আতীকুল্লাহ সহ আরও কয়েকজন সাক্ষাৎকারের সময় আমার কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করেন।–ব.উ.

www.pathagar.com

উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো। রাস্তার উপর এই পরিস্থিতি সম্পর্কে নীচে তিনটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হলো :

(ক) শাফিয়া খাতুন : ইতিমধ্যে বেশ কিছুদূর এগিয়েছি। কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করেছে। মিছিলের মাঝে মাঝে মেয়েদের সাথে বোধ হয় কিছু ছেলেও ঢুকে গিয়েছিল। আরেকটু এগিয়ে আমরা মধুর রেস্তোরাঁর পাশে (বর্তমান মেডিকেল কলেজের পূর্ব দিকের বাউন্ডারী দেয়ালের কাছে) এসেছি, এমন সময় একজন পুলিশ আমার পেছন দিয়ে এসে আমাকে আঘাত না করে আমার পাশে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলেকে সজোরে লাঠির আঘাত হানলো। পরে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। এ সময় আমাদের মিছিলে রওশন আরা বাচ্চু লাঠির আঘাত পায়। পেছনেও লাঠির আঘাতের ফলে মিছিল বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এলোমেলো হচ্ছিলো। এ বাধার মধ্যেও আমরা বর্তমান মেডিকেল কলেজের মেইন গেটের কাছে এসেছি এমন সময় আমাদের উপর টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া শুরু হলো। টিয়ার গ্যাসের ফলে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কে যেন আমাকে ধরে নিয়ে রাস্তার অপর দিকের পানের দোকানের কাছে নিয়ে চোখে পানির ছিটা দিচ্ছিল। কিন্তু টিয়ার গ্যাস খুব 'সিরিয়াসলি এ্যাফেক্ট' করেছিল। তখন কে একজন আমাকে মেডিকেলে 'ফার্স্ট এইডের' জন্য নিয়ে গেলো।[৯]

(খ) সুফিয়া ইব্রাহিম : আমরা কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরই কাঁদুনে গ্যাস ও পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে পরিস্থিতি বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো। ঐ দিকে ছেলেরাও দেয়াল টপকে মিছিলে যোগ দিচ্ছিল। কেউ বা পুলিশের সাথে ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছিল। আমরা ছুটে গেলাম ডঃ ওসমান গনির বাসার দিকে।[১০]

(গ) শামসুন্নাহার : আমরা আরেকটু এগিয়ে দেখি বর্তমান শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে দেয়াল টপকে ছেলেরা রাস্তায় নামছে। আর সামনে ইঁট ছুঁড়ে পুলিশকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে ছুটাছুটি। টিয়ার গ্যাসের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। আমাদের মধ্যে রওশন আরা সহ কয়েকজন লাঠির আঘাত পেয়েছে। আমরা ছুটে গেলাম ডঃ গনির বাসার দিকে আশ্রয় নেয়ার জন্য। বর্তমান সাইন্স এনেক্সের এরিয়াতে তখন তাঁর বাসা ছিল। বাউন্ডারী এরিয়ায় কাঁটা তারের বেড়া। ভেতরে যাওয়া মুশকিল। ঐ দিকে ইঁট আসছে অবিরামভাবে। সারা তাইফুরের গায়ে ইঁটের আঘাত লাগলো মারাত্মকভাবে। এমন সময় ফরমানউল্লাহ কোথা থেকে যেন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি কাঁটা তারের বেড়া ফাঁক করে আমাদের ভেতরে যেতে সাহায্য করলেন।[১১]

৪. মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ

২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পর ছাত্রদের পরিষদ ভবন ঘেরাও করার কথা ছিলো। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর

www.pathagar.com

হচ্ছিলেন। এ সময়ে বস্তুতপক্ষে কোন ১৪৪ ধারা আর কার্যকরভাবে বলবৎ ছিলো না।

কিন্তু ছাত্রেরা পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেও সেদিকে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ পরিষদ ভবনের চারদিকে কড়া পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা ছিলো। তাছাড়া পরিষদ ভবনের আগেই মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের কাছে ছাত্রেরা পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন।

এ জন্য ছাত্রদের মূল সমাবেশ বেলা ১টার মধ্যেই দাঁড়িয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে সরে গিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেটের সামনে। মেডিকেল হোস্টেলের ভেতরেও এই সময় জমায়েত বেশ বৃদ্ধি পায়। এর একটি কারণ ছিলো এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত বহু সংখ্যক ছাত্রসহ সেদিনকার মূল নেতারা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল হাসপাতালের মধ্যবর্তী ভাঙ্গা দেয়াল পার হয়ে মেডিকেল হাসপাতালের ভিতর দিয়ে সরাসরি মেডিকেল হোস্টেল এলাকায় চলে এসেছিলেন।[১]

এই সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে এলিস কমিশন রিপোর্টে বলা হয়,

> ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী অপরাধীদের ৯১ জনকে গ্রেফতার করার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে সকলে ভীড় করে বের হতে থাকে। "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই", "পুলিশ জুলুম চলবে না" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে জনতা পরিষদ ভবনের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করে। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে বলেন যে, তারা বেআইনীভাবে সমবেত হয়েছে এবং তারা সরে না গেলে তাদেরকে সরানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হবে। তারা সরে না যাওয়ায় তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গ্যাস শেল ও গ্যাস গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। গ্যাস আক্রমণের ফ ল ছাত্রেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা আবার মেডিকেল কলেজ এলাকায় এবং সেক্রেটারিয়েট সড়কের অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সমবেত হচ্ছিলো। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এলাকা থেকে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ এলাকায় পার হয়ে যেতে পারছিলো কারণ তাদের মধ্যেকার দেওয়ালটি ভাঙ্গা ছিলো এবং তার ফলে সেক্রেটারিয়েট সড়কের দিকে বেরিয়ে না এসেও শারীরিকভাবে সম্ভব ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার এক প্রাঙ্গণ থেকে অন্য প্রাঙ্গণে পার হয়ে যাওয়া। গ্যাস আক্রমণের ফলে জনতা সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়েছিলো কিন্তু ইতিমধ্যে অতিরিক্ত সিটি এস.পি. মাসুদ মাহমুদ আহত হয়েছিলেন, একটি জীপ গাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিলো এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও মেডিকেল কলেজ এলাকা থেকে পুলিশ বাহিনীর উপর মাঝে মাঝে ইট পাটকেল ছোঁড়া হচ্ছিলো। পরিস্থিতিকে যথেষ্ট গুরুতর মনে করায় ঢাকা রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, মিঃ এ. জেড. ওবায়দুল্লাহকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর দেওয়া হল। তিনি বেলা ১টার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং দেখলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও

www.pathagar.com

মেডিকেল থেকে শুরু করে পরিষদ ভবনের সামনে পর্যন্ত সারা রাস্তায় জনতা সমবেত হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সতর্কবাণী কেউই গ্রাহ্য করছিলো না এবং পুলিশের উপর নিজেদের আক্রমণ তীব্র করে জনতা তাদের প্রতি প্রবলভাবে ইট-পাটকেল বর্ষণ করছিলো। গ্যাস আক্রমণের দ্বারা ছত্রভঙ্গ হলে তারা সাময়িকভাবে তাদের আশ্রয় স্থল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পিছিয়ে যাচ্ছিলো এবং নোতুন আক্রমণের জন্য পুনরায় সমবেত হচ্ছিলো। দেখা গেলো যে, হাঙ্গামার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মেডিকেল কলেজ গেট এবং সেই অনুযায়ী স্থির হলো পুলিশ বাহিনীকে কলেজ গেটে কেন্দ্রীভূত করা কারণ সেখানেই এর প্রয়োজন দেখা দিল সব থেকে জরুরী।[২]

পুলিশের উপরোক্ত তৎপরতা এবং তাদের কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ছাত্ররাও মেডিকেল কলেজের নার্স কোয়ার্টার-এর কাছে স্তূপীকৃত ইট-রীলে করে মেডিকেল হোস্টেলের গেটের সামনে জড়ো করছিলেন এবং সেগুলি পুলিশের দিকে নিক্ষেপ করছিলেন।[৩]

এদিকে পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার সময় যতই এগিয়ে আসছিলো ছাত্রদের উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং তাঁরা পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পুলিশ ক্রমাগত রাস্তায় তাঁদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে, লাঠি চার্জ করে ও সেই সঙ্গে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে তাঁদেরকে বাধা দেওয়ায় তাঁদের পক্ষে পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। সেই অবস্থায় ছাত্রেরা পরিষদ ভবনের দিকে গমনকারী কোন কোন পরিষদ সদস্যকে মাঝে মাঝে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মধ্যে ডেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করছিলেন।[৪]

এই পরিষদ সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলিম লীগের আওলাদ হোসেন। পুলিশ সূত্র থেকে অভিযোগ করা হয় যে, ছাত্রেরা তাঁকে জোরপূর্বক মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে দিয়ে একটা কাগজ সই করিয়ে নেওয়া হয় যাতে লেখা থাকে যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। তাছাড়া তাঁকে ভয় দেখিয়ে আরও লিখিয়ে নেওয়া হয় যে, তিনি সচক্ষে পুলিশ কর্তৃক লাঠিচার্জ ও কয়েকজন ছাত্রের শরীরে আঘাত দেখেছেন, যদিও বাস্তবত তিনি সেসব কিছুই দেখেন নি। পুলিশ থেকে আরও অভিযোগ করা হয় যে, আওলাদ হোসেনকে সেদিন রাত্রি নয়টা পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আটক রাখা হয়।[৫]

পুলিশ কর্তৃক এই ধরনের অভিযোগ করা হলেও আওলাদ হোসেন নিজে পত্রিকায়, অথবা ২২শে ফেব্রুয়ারী পরিষদের অধিবেশন চলাকালে এ ধরনের কোন অভিযোগ ছাত্রদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন নি।

এইভাবে যেসব পরিষদ সদস্য ২১শে ফেব্রুয়ারী গুলি চালনার পূর্বে

www.pathagar.com

মেডিকেল হোস্টেলের ভিতর যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী। তাঁরা যখন রিক্সা★ যোগে বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় মেডিকেল হোস্টেলের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনের দিকে যাচ্ছিলেন তখন হোস্টেলের ভিতর থেকে ছাত্রেরা তাঁদেরকে ভিতরে গিয়ে অবস্থা দেখে আসার জন্য আহবান করেন। সেই অনুযায়ী তারা ভিতরে যান। ছাত্ররা তাঁদেরকে বলেন যে, পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে এবং পুলিশ আক্রমণে তারা অনেকে আহত হয়েছেন। ছাত্রেরা তাঁদেরকে কয়েকটি কাঁদুনে গ্যাসের শেলও দেখান। ধীরেন দত্তরা যাতে পরিষদের মধ্যে এইসব ঘটনা সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনেন তার জন্য ছাত্রেরা তাঁদের কাছে দাবী জানান। এই সব ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রেরা তাঁদেরকে পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করারও দাবী জানান। তাঁরা যখন বলেন যে, তাঁরা এইসব ঘটনা সরকারের দৃষ্টিগোচর করবেন তখন ছাত্রেরা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে ছেড়ে দেন এবং তাঁরা পরিষদ ভবনের দিকে চলে যান।[৬]

এই সময়কার ঘটনাবলীর উপর দৈনিক আজাদ নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রদান করেন।

> একদল ছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিক হইতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' 'পুলিশ জুলুম চলবে না' প্রভৃতি ধ্বনিসহ মেডিকেল কলেজ অভিমুখে আসিতে দেখা যায়। এই সময় ছাত্রগণও মেডিকেল কলেজের গেটের সম্মুখে ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মধ্যে থাকিয়া গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে নানা প্রকার ধ্বনি করিতে থাকে। রাস্তার উপর এই সময় বহু পথচারী ও স্থানীয় দোকান কর্মচারীকে জমায়েত হইতে দেখা যায়।
>
> বেলা অনুমান দুই ঘটিকায় পরিষদের সদস্যগণ পরিষদ অভিমুখে গমনকালে ছাত্রদল পথ রোধ করিয়া পরিষদে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আলোচনা করার ও পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ জানায়। হোস্টেল প্রাঙ্গণের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এই সময় রাস্তায় আসিলে পুলিশ তাহাদিগকে ভাড়া করে। একদল ছাত্র ও কিছুসংখ্যক পথচারী রাস্তা হইতে সরিয়া যাইতে অসম্মত হইলে পুলিশ পুনরায় কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশ এই সময় হোস্টেল গেটে ও রাস্তায় দণ্ডায়মান ছাত্র ও পথচারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। অতঃপর মন্ত্রী জনাব হাসান আলী ও জনাব বাকী সাহেব মোটরযোগে পরিষদ ভবনে যাইবার কালে কতিপয় ছাত্র তাঁহাদিগকে মোটর হইতে নামাইয়া ছাত্রদের প্রতি পুলিশের জুলুম সচক্ষে দেখিয়া যাইবার অনুরোধ করে। একটি ছোট বালক এই সময় মন্ত্রী সাহেবের মোটরের চাকার পাম্প ছাড়িয়া দেয়। পুলিশ তাহাকে প্রহার করায় ছাত্রগণ ক্ষেপিয়া ওঠে ও একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র পুলিশের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে। প্রস্তরের আঘাতে পুলিশ দলের কয়েকজন সামান্য আহত হয়। পুলিশকেও ঐ সময় ছাত্রদলের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে দেখা যায়।[৭]

★এর থেকে বোঝা যায় যে ২১শে ফেব্রুয়ারী গুলি চালানোর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহরে কোন হরতাল হয় নি এবং যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিলো।–ব.উ.

www.pathagar.com

মন্ত্রী হাসান আলী এই সময় নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের দ্বারা সামান্য আহত হন বলে পি.টি.আই-এর একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।[৮] এলিস কমিশনের রিপোর্টে পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনার অল্প কিছুক্ষণ পূর্বের এই ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয় নিম্নলিখিতভাবে,

> এই পর্যায়ে মাননীয় মিঃ হাসান আলী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল্লাহ-হিল-বাকী এম.এল.এ.এম.সি.এ.কে সাথে নিয়ে মোটরগাড়ীতে চড়ে পরিষদের দিকে যাচ্ছিলেন। জনতা কর্তৃক গাড়িটি থামান হয় এবং তাঁর চাকার হাওয়া বের করে দিয়ে সেটিকে অচল করে দেয়া হয়। দুইজন যুবক গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে, একজন বাম এবং অন্যজন ডাইনের দরজা দিয়ে। তারা মাননীয় মন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীকে তাদের সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বলে এবং জোর করতে থাকে। সেই অনুযায়ী তাঁর সঙ্গী গাড়ী থেকে বের হয়ে পড়েন কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী এবং তাঁর চাপরাশী তাঁকে টেনে গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়ে নেয় কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে চারিদিকে যেভাবে ইঁট-পাটকেল ছুড়াছুড়ি হচ্ছিলো তাতে তাঁর পক্ষে যাওয়া নিরাপদ ছিলো না।
>
> পুলিশ মাননীয় মন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীকে একটি পুলিশের গাড়ীতে তুলে দিয়ে তাঁদেরকে পরিষদ ভবনের দিকে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু জীপটি চলে যাওয়ার সময় একটি ইঁটের দ্বারা মাননীয় মন্ত্রী মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।
>
> এই সময়ের মধ্যে পুলিশের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়েছিলো এবং ডি.আই.জি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং অতিরিক্ত সিটি এস. পি সকলেই ইট-পাটকেলের দ্বারা আহত হয়েছিলেন। পুলিশ বাহিনীর অপরাপর লোকরাও আহত হয়েছিল। এই অসুবিধা সত্ত্বেও তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো।[৯]

কলকাতার ইংরেজী দৈনিক স্টেটসম্যানের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আবদুল ওয়াহাব একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই সময়কার ঐ একই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

> তখনকার আর একটা ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। রাস্তার ধারে দাঁড়ানো কোন এক মন্ত্রীর গাড়ীর চাকার পাম্প ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটি অল্পবয়স্ক ছেলে চেষ্টা করছিলো। সে সময় একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মচারী পিছন থেকে সেখানে উপস্থিত হয়ে খুব জোরে তার ঘাড় ধরে ফেলায় তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য সে ধ্বস্তাধস্তি শুরু করলো এবং সেই সঙ্গে কান্নাও জুড়ে দিলো। এর কিছুক্ষণ পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে ভাঙ্গাভাঙ্গা উর্দুভাষী ঢাকার স্থানীয় এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে ছেলেটির উপর হামলার প্রতিবাদ শুরু করলো। ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেলো পরিপূর্ণ একাত্মতাবোধ।[১০]

যদিও বেলা তিনটার দিকে ঢাকায় কোন হরতাল ছিলো না, তবু ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের খবর শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় অনেক লোক এ সময়ে মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি, বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের

www.pathagar.com

উল্টোদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে উপস্থিত হন এবং ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এছাড়া মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ড বয়, বেয়ারা, মেডিকেল হোস্টেলের সামনে ও রাস্তার উপর অবস্থিত হোটেল রেস্টুরেন্টের বয় বেয়ারাও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এইভাবে জনতার আকার বেশ কিছুটা বৃদ্ধিলাভ করে।[১১] সংঘর্ষ এই সময় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[১২]

৫. ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ

পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশন বিকাল ৩-৩০ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা ছিল। এজন্য পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো ছাত্রেরা পরিষদ ভবনের সামনে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা জোরদার করেন। এই সময় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেটের সামনে ছাত্রেরা সমবেত হয়ে গেটের বাইরে বের হয়ে আসার উদ্যোগ নিতে থাকলে পুলিশ তাঁদের প্রতি কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে এবং তার জবাবে ছাত্রেরাও ভিতর থেকে পুলিশের উপর সমানে ইট-পাটকেল বর্ষণ করে চলেন।

এ ছাড়া বেশ কিছু ছাত্র এবং অছাত্র রাস্তার উল্টোদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে এবং রাস্তার ধারে সমবেত হয়ে পুলিশের সঙ্গে ঐ একই ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই অবস্থায় পুলিশ বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মাঝে লাঠিচার্জও করতে থাকে।

এই সব সংঘর্ষ চলাকালে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের সুযোগে পুলিশ কয়েকবার মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেট অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ছাত্রদের উপর এলোপাথাড়িভাবে লাঠি চালায়। পরে ছাত্রদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ফলে তারা আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই আকস্মিকভাবে পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের সামনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সমবেত ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণের ফলে উভয় দিকেই অন্তত একজন করে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হন আরও অনেকে।

এই গুলিবর্ষণের উপর দৈনিক আজাদ নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রদান করেন,

> ইত্যবসরে কিছু সংখ্যক ছাত্র মেডিকেল কলেজ হইতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল অভিমুখে আসিবার চেষ্টা করে। অপর একদল ছাত্র পরিষদ ভবন অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করিলে পুলিশ পুনরায় উপর্যুপরি কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিবার পর ছাত্রদল পুনরায় বিক্ষোভ শুরু করে এবং পুলিশের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য ছাত্রদল পরিষদ ভবনের দিকে যাইতে চাহিলে হঠাৎ একদল পুলিশকে হোস্টেল অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে দেখা যায় এবং তাহারা হোস্টেলের ভিতরে ও বাহিরে গুলি

www.pathagar.com

চালাইতে থাকে। ছাত্রগণকে এই সময় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে ও আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন করিতে দেখা যায়। গুলি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলের ভিতর কয়েকটি শেডের বারান্দায় কয়েকজন ছাত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ১২নং শেডের বারান্দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সালাহ্উদ্দীনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি বুলেট তাহার কপালে বিদ্ধ হইয়া মাথার খুলি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রচুর রক্তে ১২ নম্বর শেডের বারান্দার প্রশস্ত অংশ রঞ্জিত হইয়া উঠে। বহু ছাত্রকে আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় ২০ নম্বর শেডের বারান্দায় ও হোস্টেল প্রাঙ্গণে ইতস্তত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কয়েকটি বুলেট ২১ নং শেডের দেয়াল ভেদ করিয়া কামরার মধ্যে প্রবেশ করে। সৌভাগ্যবশত তখন ঐ কামরায় কেউ ছিল না। কয়েকটি কামরায়ও রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। মেডিকেল কলেজ ও হোস্টেলের মধ্যে কাঁদুনে বোমার কষ্টের আধিক্য হেতু ভিতরে প্রবেশ করা দুরুহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।[১]

মেডিকেল কলেজের গেটের দিকে দুইবার গুলিবর্ষণ করা হয়। প্রথমবার গুলিবর্ষণের সময় ছাত্রেরা ইতস্তত কিছু ছুটাছুটি করেন এবং অনেক হোস্টেলের শেডগুলির মধ্যে মেঝের উপর শুয়ে পড়েন।★ কারণ গুলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিলো। কিন্তু এ সময় গুলিতে কাউকে আঘাত পেতে না দেখায় গুলিবর্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ blank fire blank fire বলে চীৎকার করেন এবং ছাত্রেরা অনেক সংখ্যায় বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিছুসংখ্যক আবার গেটের দিকে অগ্রসর হন। ঠিক এই সময় দ্বিতীয়বার গুলি বর্ষণ হয়। দ্বিতীয় বারের এই গুলিবর্ষণ অধিকতর বড়ো আকারে হওয়ার ফলে অনেক ছাত্র এতে হতাহত হন। ১২ নম্বর শেডের সামনে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান আবুল বরকত।[২]

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতরের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে শামসুল বারী (মিঞা মোহন) যে লিখিত বিবরণ দেন তা হলো এই,

আমরা অনেকেই আঘাত পেলাম এবং লাঠি ও চাপে বিপন্ন হয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের তারকাটার বেড়ার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আমি ২০নং ব্যারাকে আঃ সালাম চৌধুরীর ঘরের সামনে শফিকুর রহমান-এর দেখা পেলাম। এ সময়ে পুলিশ হোস্টেল গেট ঘেরাও করে দাঁড়ায়, তারা আমাদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য টিয়ার গ্যাস শেল ছুড়তে আরম্ভ করল। চোখের জ্বালা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা হাড়ি কলসী সংগ্রহ করে তাতে পানি রেখে রুমাল ভিজিয়ে নিলাম। ব্যারাকের বারান্দায় আমরা ও বয়-বাবুর্চিরা ইঁট ভেঙ্গে জমা করে পাহারায় রইলাম, যাতে পুলিশ ভেতরে ঢুকতে না পারে। ব্যারাকে বাঁশের চালার মধ্যে শেল ঢুকছিলো আবার কেউ কেউ শেল ফাটাবার আগেই ধরে পুলিশের দিকে ছুঁড়ে মারছিলেন। ওদের কাছে পানি না থাকায় ওরা ছুটে যাচ্ছিল উত্তর দিকে আবার একটু পরেই ফিরে আসছিল দ্রুতবেগে। এমনিধারা চলছিল ঘণ্টা দুই তিন ধরে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে তখন অনেক ছাত্র এসে গেছে,

---

★এই সময় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ব্যারাকগুলির মেঝে এবং তিন ফুট আন্দাজ কামরার দেয়াল পাকা হলেও তার উপরের অংশ ছিলো বেড়ার। ছাদ ছিলো টিনের।—ব. উ.

www.pathagar.com

আটকা পড়ে গেছি সবাই বুলেট ও ইটের লড়াইয়ে। কারো চোখে ভীতির চিহ্ন নেই–আছে ঘৃণা আর উন্মত্ততা, প্রতিশোধের, শ্লোগান, আর শ্লোগান বাংলা ভাষার দাবীতে। ছাত্র সবাই কারিগরী, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কলা সবাই লড়ছি ইট দিয়ে, কোনক্রমেই পুলিশদের হোস্টেল চত্বরে আসতে দেওয়া হবে না। প্রতিরোধ ভাঙবার জন্য বার বার তারা চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। সিগ্রেট ধরিয়ে ২০নং ব্যারাকের মাঝামাঝি কামরার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছিলাম। আমার দিকে এগিয়ে এলেন বরকত, ডাক নাম, আবাই। বীরভূম জেলার সিউড়ির সৈয়দ জাকির সাহেবের আত্মীয়, জাকির সাহেব ফরিদপুরের চাকুরিকালে আবাই মামুর সাথে পরিচয়। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি কিন্তু পড়ে গেলেন সাথে সাথে আমার হাতখানেক দূরে। পুলিশ ঢুকে পূর্বদিক থেকে সোজা গুলি ছুঁড়ছে। শফিকুর রহমান (বর্তমানে লন্ডনে ডাক্তারী করেন) ১৭ নম্বরে থাকতেন, দৌড়ে এসে পানি ঢেলে দিলেন, ভেবেছিলেন টিয়ার গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। আমি গুলির কথা বললাম, ততক্ষণে পানির সঙ্গে রক্ত দেখা দিয়েছে বারান্দার মেঝেতে। তলপেটে লেগেছে গুলি। গায়ে ছিল তার নীল রঙের ফ্লাইং হাফ শার্ট, পরনে খাকী প্যান্ট, পায়ে কাবুলী স্যান্ডেল। তখন তার দুই ঠ্যাং শফিকুর রহমান কাঁধে তুলে নিলেন আর মাথা নিলাম আমার কাঁধে। আমরা পশ্চিম দিক দিয়ে একটু ঘুরে দৌড়াতে লাগলাম তার দীর্ঘ সুঠাম দেহটা নিয়ে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তারও কোমর নীচের দিকে ঝুলে দুমড়ে, টপটপ করে রক্ত ঝরছিলো। আমার কাছে পানি চাইল কিন্তু কোথায় পানি, সময় নাই, পুলিশ দেখলে কেড়ে নিতে পারে, তাই পড়ি মরি করে ছুটছি। ভেজা রুমালটা দিলাম চুষতে। হোস্টেলের পায়খানাগুলোর কাছ দিয়ে হাসপাতালে যাবার যে ছোট গেটটা ছিল তার কাছে আসতে দু'তিনজন এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে, আমি আমার কাঁধ দিলাম তার কোমরে। সে বলল খুব কষ্ট হচ্ছে, বাঁচব না। বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টনে সংবাদ পৌছে দেন'।

তাকে নিয়ে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে নামলাম : কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। একজন নার্স 'কাপুরুষ' বলে গালাগালি দিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য গেটে যেতে বললেন। আমি দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই স্ট্রেচারে করে একজনকে মৃতদেহ আনতে দেখলাম। মাথার খুলি উড়ে গেছে। নীচের দিকে খানিকটা ঘিলু ঝুলছে। শুধু দাঁতগুলি দিয়ে হাসছে যেনো আমাদের দিকে তাকিয়ে।[৩]★

মোস্তফা রওশন আখতার এই সময়কার যে বিবরণ দেন তা হলো,

আমি শেডের সামনে বারান্দার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিলাম এবং চীৎকার করছিলাম lie down, কারণ অধিকাংশ ছেলে দৌড়াচ্ছিলো। গুলীর আওয়াজ পাচ্ছিলাম কিন্তু কেউ মারা গেছে বুঝতে পারি নি। তবে গুলি হওয়ার পরই আমি সোজা এমারজেন্সীতে দৌড়ে গিয়ে বললাম গুলি হয়ে গেছে আপনারা স্ট্রেচার বের করেন। প্রায় ৪০টার মতো স্ট্রেচার বের হয়েছিলো। আমি ফিরে যখন গেলাম তখন অবশ্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল দেখে মনে হচ্ছিলো মধ্য যুগীয় রণক্ষেত্র।

আমি যাকে Carry করে নিয়ে গিয়েছিলাম তার কোন skull ছিলো না। তাকে

★বরকত গুলি লেগে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময় আমিও ১২ নম্বর শেডেই ছিলাম। আমার মনে হয় তাঁর জানুতে গুলিতে লেগেছিল। তাঁকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় হাসপাতালের গেট পর্যন্ত গিয়ে আমি সেখান থেকে আবার হোস্টেলের দিকে ফিরে আসি।–ব. উ.

www.pathagar.com

আমি মেডিকেল কলেজ হোস্টেল-এর লনে পেয়েছিলাম। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের menial রা বডিটা তুলেছিলো। কোন রক্ত ছিলো না, কিন্তু মগজটা আলাদা পড়েছিলো। একজন ধাঙড় সেই মগজটা হাতে করে তুলে স্ট্রেচারে রেখেছিলো। আমি আর একজন একদিকে, অন্যজন একজন ধাঙড়। এই বডিটা এমার্জেন্সিতে অনেকক্ষণ ছিলো। সেটাকে এককোণে রেখে কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়েছিলো। নার্সরা সেটা দেখে খুব উত্তেজিত হয় এবং কান্নাকাটি করে।[৪]*

পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এলিস কমিশন গুলি চালনার ঘটনা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেন,

প্রায় এই সময়ে বিকেল ৩ টের পর থেকে পুলিশ দেখলো যে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় সমবেত জনতার উপর বিকেল ৩টের সময় পুলিশ দ্বিতীয়বার ও শেষবারের মতো দৃঢ়ভাবে লাঠিচার্জ করলো। যাই হোক, এবার লাঠিচার্জের আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেল না এবং পুলিশ দেখলো যে জনতা পিছিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজেদেরকেই পিছিয়ে যেতে হলো কারণ তাদের উপর যে ভারী ইটপাটকেল ছোড়া হচ্ছিলো সেটার মুখোমুখি তারা দাঁড়াতে পারছিলো না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারদের হিসাব মতো এই সময়ে জনতা ছিল ৫ হাজারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের কোণা এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেল দুই দিক থেকে তারা ভীতিপ্রদভাবে পুলিশের দিকে এগিয়ে আসছিলো। পুলিশ দল ঘেরাও ও পরাভূত হওয়ার মতো বিপদের সম্মুখীন হয়েছে দেখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডি. আই. জি ও এস.পি এ বিষয়ে একমত হলেন যে, পরিস্থিতি এমন মরীয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে গুলিবর্ষণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে চূড়ান্তভাবে একবার সতর্ক করা হলো, কিন্তু যেহেতু এর কোন ফলই হল না তাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচালনায় এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সরাসরি নির্দেশে পুলিশ দল দাঙ্গাকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করলো। গুলি বর্ষণকারী দলটিতে ছিলো ৩জন হেড কনস্টেবল ও ৩০ জন কনস্টেবল যারা মেডিকেল গেট এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেট-এর মধ্যবর্তী রাস্তার উপর একটি চতুর্ভূজের আকারে দণ্ডায়মান হলো।

বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেল-এর মুখোমুখি দুই সারির প্রত্যেকটিতে ৫ জন করে হাঁটু গেড়ে বসলো। বাকী অন্যেরা উত্তর-পশ্চিমের দিকে মুখ করে থাকলো। সঠিক formation -এর ব্যাপারে ডি. আই. জি ও এস.পি'র স্মৃতির মধ্যে মিল নেই কিন্তু যেহেতু এস. পি.ই বাস্তবতঃ কমাণ্ডে ছিলেন সেজন্য তার স্মৃতিই সঠিক হওয়া বেশী সম্ভব। পুলিশ দলের অন্য সদস্যরা এবং এস.পি নিজে চতুর্ভূজের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন। এস. পি দুই সারিকে এক রাউন্ড করে গুলী চালনার নির্দেশ দেন এবং তারা তা করে। বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দিকে জনতা পিছিয়ে পড়ে কিন্তু মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে জনতা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে আবার ইট পাটকেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসে। এবং তারপর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মুখোমুখি সারিটিকে এস.পি. নির্দেশ দেন দ্বিতীয় বার গুলিবর্ষণ করতে। যখন এইদিকে জনতা পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো তখন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট

---

*এই মৃতদেহটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সালাহুদ্দীনের

www.pathagar.com

গুলিবর্ষণ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। গুলীবর্ষণের পর রসদ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সব শুদ্ধ ২৭ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দিকে দাঙ্গাকারীদের উপর ৫ রাউন্ড এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের দাঙ্গাকারীদের উপর ২২ রাউন্ড। গুলিবর্ষণের সময় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের কোণার কাছে একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাকে এ্যামবুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু যেহেতু দাঙ্গাকারীরা তখনো পর্যন্ত উত্তেজিত এবং উন্মত্ত অবস্থায় ছিলো সেজন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, গুলিবর্ষণের ফলে হতাহতের সংখ্যা ছিলো নয় যার মধ্যে তিনজন ছিলো ছাত্র এবং ছয়জন বহিরাগত। দুই জন সেই রাত্রে ৮টার দিকে মারা যায়, যার মধ্যে একজন ছিলো ছাত্র। আঘাতের ফলে তৃতীয় এক জন মারা যায় তদন্ত চলাকালে। এমন কি গুলিবর্ষণের পরেও জনতা ইট পাটকেল ছোড়া থেকে বিরত থাকে নি। মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একটি মাইক ফিট করে সেখান থেকে সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া হতে থাকে। জনতার উত্তেজনাকে চরম পর্যায়ে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সামনে রক্ত রঞ্জিত কাপড় চোপড় দেখানো হয়। এবং বিকেল ৪-৩০ বা ৫টার দিকে পরিষদের দিকে যাওয়ার আর একটা প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়।[৫]

উপরে উদ্ধৃত এলিস কমিশনের এই বিবরণ যে ঘটনাবলীর সরকারী ভাষ্যেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ সেটা গুলিবর্ষণের উপর ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে প্রদত্ত নিম্নলিখিত সরকারী প্রেস নোট থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে,

একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের স্বাভাবিক জীবন রুদ্ধ করার পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টার ফলে শান্তি গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা অনুযায়ী একটি আদেশে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে চারজনের বেশী লোকের জমায়েত, সভা অনুষ্ঠান এবং মিছিল বের করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই আদেশ ঢাকার সর্বত্র ব্যাপকভাবে ঘোষণা করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী সকালে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভার অনুষ্ঠান করে। ভাইস চ্যান্সেলর, প্রভোস্ট, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন আইন ভঙ্গ না করার জন্য তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু ছাত্রেরা তাঁদের কথা না শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৪৪ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য তারা পাঁচ জনের বেশী সংখ্যায় বের হয়ে আসে। অতি জঘন্য ভাষায় তারা কর্তব্যরত পুলিশদেরকে গালাগালি করে এবং সারাদিন ধরে তা চালিয়ে যায়। কতকগুলি স্থানে শহরের মধ্যে চলাচলকারী লোকদেরকে নিগৃহীত করা হয়, যানবাহনের উপর আক্রমণ চালানো হয় ও সেগুলিকে অকেজো করা হয় এবং যে সব দোকানদার নিজেদের দোকান খোলা রাখতে চায় তাদেরকে জোরপূর্বক দোকান বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। প্রায় মধ্যদিনে বিরাট একদল ছাত্র রাস্তার উপর নেমে আসে, মিছিল গঠন করে এবং ইট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে যার ফলে কয়েকজন কনস্টেবল এবং অন্যেরা আহত হন এবং পুলিশের গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা পুলিশের দিকে

www.pathagar.com

ভীড় করে এগিয়ে আসে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাদেরকে আইন ভঙ্গ করতে নিষেধ করেন। তারা তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করে এবং এক পুলিশ দলের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে চলে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক দেখে জনতাকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরে যেতে বলেন এবং লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তারা যদি সেই অনুযায়ী কাজ না করে তাহলে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হবে। এই সতর্কবাণী কেউ শুনলো না এবং পুলিশ দলের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হতে থাকলো। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করা হলো। অল্প কিছুক্ষণ পর জনতা আবার একত্রিত হলো, রাস্তার উপর এসে পড়লো এবং দ্রুত মেডিকেল কলেজ ও পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে গেলো।

ইট পাটকেল নিক্ষেপ অব্যাহত থাকলো যার ফলে ডি.আই.জি, পুলিশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, বিশেষ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, এ.ডি.এস.পি., দুইজন সার্জেন্ট, একজন ইন্সপেক্টর সহ প্রায় সব পুলিশ অফিসার এবং বেশ কিছু সংখ্যক কনস্টেবল আহত হলেন। জনতা রাস্তার উপর যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলো এবং পুলিশ দলের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকলো। যখন তারা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত সতর্কবাণী শুনতে রাজী হলো না তখন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লাঠিচার্জ করার আদেশ দিলেন। এর ফল খুব সাময়িক হলো এবং অল্প কিছুক্ষণ পর জনতা আবার একত্রিত হয়ে পুলিশের দিকে এগিয়ে এলো। পুলিশ দলের উপর এক ঝাঁক ইট-পাটকেল বর্ষিত হলো এবং কয়েকদিক থেকে জনতা পুলিশ বাহিনীকে ঘেরাও ও পরাভূত করার জন্য এগিয়ে এলো। রাস্তার উপর সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হলো। মিঃ হাসান আলী ও ডাইরেক্টর অব ল্যান্ড রেকর্ডস, যাঁরা পরিষদ ভবনের দিকে যাচ্ছিলেন, তাঁদের গাড়ী আক্রমণ করা হলো এবং জনতা তাঁদের উপর হামলা করলো যার ফলে তাঁরা আহত হলেন।

এই পর্যায়ে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং জনতা কর্তৃক পুলিশ দল পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই বলে তাদেরকে সতর্ক করলেন যে, যারা বেআইনীভাবে জমায়েত হয়েছে তারা যদি সরে না যায় তাহলে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তিনি গুলিবর্ষণ করতে বাধ্য হবেন। এই সতর্কীকরণের জবাব হলো ইঁট-পাটকেল বর্ষণ এবং জঘন্য গালিগালাজ। যেহেতু এই সতর্কীকরণ অগ্রাহ্য হলো এবং জনতা ভীতিপ্রদভাবে পুলিশ দলের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকলো সেজন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হলো। তারপর গুলিবর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু সরে না গিয়ে জনতা পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তীব্র গতিতে এগিয়ে এলে আরও কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হলো যার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে গেলো।

সরকার দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, একজন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বুলেটের আঘাতপ্রাপ্ত অপর ৯ জন যাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে রাত্রি প্রায় ৮টার দিকে ২ জনের আঘাতের ফলে মৃত্যু ঘটে। লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারের ফলে আহত ব্যক্তিরা হাসপাতালে

www.pathagar.com

চিকিৎসা লাভ করে এবং সেই ধরনের নয়টি কেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো। এখন হাসপাতালে অবস্থানরত ব্যক্তিদের কারও অবস্থা গুরুতর নয় এবং তারা সকলেই সন্তোষজনকভাবে সেরে উঠছেন।

এ পর্যন্ত সরকারের হাতে যে খবর আছে সেই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অপর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তিই মুখ্য প্ররোচক হিসেবে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তার পরিণতিতে সংঘটিত হয়েছে আজকের দুঃখজনক ঘটনা। বিষয়টি এখন গভীরভাবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।[৬]

২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণের উপর এই সরকারী প্রেস নোট ও পুলিশের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত এলিস কমিশন রিপোর্টের বক্তব্যের মিল খুব লক্ষ্যণীয়। এই উভয় বক্তব্যেই পুলিশ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ এমনভাবে পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন যাতে মনে হবে ঐ দিন অপরাহ্নে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে পুলিশ গুলিবর্ষণ না করলে ছাত্রজনতা মারমুখী হয়ে পুলিশদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করতো এবং পরিষদ ভবনের দিকে গিয়ে মন্ত্রী পরিষদকে আক্রমণ করতো।

বাস্তব অবস্থা কিন্তু মোটেই সে ধরনের ছিলো না। একথা সত্য যে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ইট-পাটকেল ছোঁড়া এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের লড়াই মোটামুটি একটানাভাবে চলছিল এবং ছাত্রেরা মাঝে মাঝে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিলেন।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই সময় ছাত্রেরা সংখ্যায় এতো অধিক এবং এতখানি শক্তিশালী ছিলেন যাতে করে পুলিশ এবং ই.পি.আর. বাহিনীকে★ পরাস্ত করে পরিষদ ভবন আক্রমণ করতে পারতেন।

এভাবেই অবশ্য পুলিশ পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। কারণ সেটা না করলে ঐ দিনকার গুলিবর্ষণের সাফাইস্বরূপ কোন যুক্তি খাড়া করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। তারা ঐ সময় ছাত্র জনতার সংখ্যা ৫ হাজার বলে উল্লেখ করলেও আসলে ঐ সময় তাঁদের সংখ্যা অনেক কম ছিলো। যদিও বিকেলের দিকে অছাত্র সাধারণ লোকেরা কিছু সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের দিকে জমায়েত হয়েছিলেন কিন্তু মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতরে ছাত্র সংখ্যা তখন অনেক পাতলা হয়ে এসেছিলো। কারণ সকাল থেকে নানা ধরনের সংঘর্ষের মধ্যে লিপ্ত থেকে অনেক ছাত্র আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তা ছাড়া বেলা ২টা আড়াইটার দিকে অধিকাংশ ছাত্রই ক্লান্ত অবস্থায় দুপুরের খাওয়ার জন্য হোস্টেল এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন এবং গুলিবর্ষণের সময়, বিকেল ৩টা সোয়া ৩টা পর্যন্ত ফিরে

★ ২১ শে ফেব্রুয়ারী পরিষদ ভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনির মোতায়েন করা হয়েছিল।– ব.উ.

www.pathagar.com

আসেন নি।

২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলি চালনার ফলে এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চালনার ফলে হতাহতের যে সংখ্যা সরকারী ভাষ্যে দেওয়া হয়েছিলো তার মধ্যেও বিশেষ কোন সত্যতা ছিলো না। গুলিবর্ষণের পূর্বেই হাসপাতালে বহু ছাত্র ও সাধারণ নাগরিক আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ সম্পর্কে দৈনিক আজাদ একটি রিপোর্টে বলেন ;

> গ্যাসে অসুস্থ কয়েকশত ছাত্রকে ইতিপূর্বেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। লাঠি চালনার ফলে আহতদের লইয়া যখন হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সগণ ব্যতিব্যস্ত ছিলো, ঠিক সেই সময় গুলি চালনার ফলে আহত, মৃত ও মুমূর্ষু ছাত্র ও পথচারীগণকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতে থাকে। ডাক্তারগণ তখন লাঠিচার্জে আহতগণকে ছাড়িয়া গুলির আঘাতে আহত ও মুমূর্ষুগণকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন।[৭]

গুলির আঘাতে মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'আজাদ' পত্রিকার একটি রিপোর্টে বলা হয়,

> বৃহস্পতিবারের* ঘটনা সম্পর্কে শহরে প্রবল গুজব যে, ঐদিন ৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয় কিন্তু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হয়। একটি কিশোর সম্পর্কে অনুরূপ গুজব শুনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, বালকটি মেডিকেল কলেজ ও পরিষদ ভবনের মধ্যে ফুলার রোডে গুলির আঘাতে নিহত হয় এবং তার লাশ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর নিকট হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে।

পুলিশ কত রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেছিলো সে বিষয়ে এলিস কমিশন রিপোর্টে যা বলা হয়েছে সেটাও মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ গুলিবর্ষণকারী পুলিশের সংখ্যা রিপোর্টে ৩০ জন উল্লেখ করা হলেও দুই দফায় গুলির হিসাব দেওয়া হয়েছে ২৭ রাউন্ড। পুলিশ যেভাবে সব তথ্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছিলো তাতে কত রাউন্ড গুলি তারা আসলে বর্ষণ করেছিলেন সে বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো।

পুলিশদের আহত হওয়ার ব্যাপারে সরকারী প্রেস নোট এবং এলিস কমিশন রিপোর্টে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলা হয়েছিলো। কারণ গুলিবর্ষণের যৌক্তিকতা দেখানোর জন্য তার প্রয়োজন ছিলো। স্টেটসম্যানের প্রতিনিধি আব্দুল ওয়াহাব পুলিশের আক্রমণে ছাত্রদের অবস্থা এবং ছাত্রদের আক্রমণে পুলিশের অবস্থা সম্পর্কে বলেন,

> তসদ্দুক আহমদ নামে একজন সহ-সাংবাদিকের সাথে আমি একের পর এক

---

* ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, বৃহস্পতিবার ছিলো।– ব.উ.

www.pathagar.com

ঘটনার পরিবর্তন লক্ষ্য করে আসছিলাম। আমার মনে হয় না সে দিন আমরা দুপুরে খেয়েছিলাম। তাই বিকেল প্রায় তিনটের দিকে উভয়ই কিছু খাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। এই উদ্দেশ্যে আমরা পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল) রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খাওয়ার পর সবেমাত্র চা শেষ করেছি এমন সময় গুলির আওয়াজ শোনা গেল। আমরা দৌড়ে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে মেডিকেল হোস্টেলে পৌছানোর পর কয়েকজন ছাত্র আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেলো। যে দৃশ্য আমরা দেখলাম তার ফলে ছাত্রেরা সঙ্গত কারণেই খুব উত্তেজিত বোধ করছিলো। টেবিলের উপর একটা লাশ চাদর দিয়ে ঢাকা ছিলো। চাদরের একটা দিক তুলে ধরলে খুলি উড়ে যাওয়া মাথার একটা অংশ দেখা গেলো। সেখানে আরেকটা লাশও ছিলো। সেদিন পুলিশের গুলিতে আরও দুজন মারা যায়।

আমরা যখন মেডিকেল হোস্টেলের থেকে বের হয়ে আসছিলাম সে সময় সিটি পুলিশ সুপার খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে তাঁদের পক্ষে যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদেরকেও দেখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি নিজে খোঁড়াচ্ছিলেন (সেটা আমার কাছে সামান্য আঘাত মনে হয়েছিলো); এছাড়া একজন হাবিলদার তার মাথার টুপী খুলে একটা ক্ষত দেখালো।[৮]

২২শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক আজাদে গুলীবর্ষণে নিহত এবং আতহদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী নিহত হয়েছিলেন (১) সালাহুদ্দীন (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), (২) আব্দুল জব্বার (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), (৩) আবুল বরকত (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) এবং (৪) রফিক উদ্দীন (বাদামতলীর কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র)।

আহতদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারুল এসলাম (৫) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ; এ. আর. ফৈয়াজ (১৯) জগন্নাথ কলেজ ; সেরাজুদ্দিন খান (২২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; আবদুস সালাম (২৭) সরকারী শুল্ক বিভাগের পিওন ;★ এম. এ. মোতালেব (১৪) ; এলাহী বকস (৪০) ; মনসুর আলী (১৬) ; বছিরউদ্দীন আহমদ (১৬) ; তাজুল এছলাম (১৯) ; মাসুদুর রহমান (১৬) ; আবদুস সালাম (২২) ; আখতারুজ্জামান (১৯) ; এ. রেজ্জাক (১৭) ; মোজাম্মেল হক (২৬) ; সুলতান আহমদ (১৮) ; এ. রশিদ (১৪) এবং মোহাম্মদ।

৬. গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে

গুলিবর্ষণের সময় বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন, অলি আহাদ, মাহবুব জামাল জাহেদী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর

★আবদুস সালাম ৭ই এপ্রিল, ১৯৫২ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান (সাপ্তাহিক নওবেলাল, ১০ই এপ্রিল, ১৯৫২)।

www.pathagar.com

রেস্তোরায় ছিলেন।★ গুলিবর্ষণ এবং তার ফলে নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়েই তাঁরা দৌড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের মধ্যবর্তী ভাঙ্গা দেওয়াল পার হয়ে ঘটনাস্থল উপস্থিত হন।[১] মেডিকেল কলেজ ও হোস্টেলের মধ্যবর্তী দেয়ালের কাছে পৌঁছানো মাত্র তাঁরা দেখতে পান যে আহতদেরকে হাসপাতালের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাঁদেরকে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সে সময় ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা বিরাজ করছিলো।[২]

ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে সকলেই অনেকটা বিহবল হয়ে পড়েন। আবদুল মতিন এমার্জেন্সির সামনের লনে বসে পড়ে কাঁদতে থাকেন এবং সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তের সঠিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে চিন্তা আসে।[৩] এ ধরনের কান্না সেদিন শুধু আবদুল মতিন অথবা হাসপাতালের নার্স এবং অন্য কর্মীদেরই নয়, নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের অনেককেই কাঁদতে দেখা যায়।[৪]

আবদুল মতিন হাসপাতালের লনে বসে থাকা অবস্থাতেই কয়েকজন ছাত্র এসে তাঁকে বলেন যে তৎক্ষণাৎ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা দরকার। তাঁরা আরও জানান যে একটি ইস্তাহারের খসড়াও তৈরী করা হয়েছে কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব তাতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছেন। কাজী গোলাম মাহবুব তখন এমার্জেন্সিতে ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে মতিন ইস্তাহারে স্বাক্ষর দেওয়ার কথা বলে কাজী গোলাম মাহবুব স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে তাঁকে গালাগালি করতে শুরু করেন এবং বলেন যে যা ঘটেছে তার সব কিছুর জন্য কমিউনিষ্টরাই দায়ী। তর্কাতর্কি না করে আবদুল মতিন আবার তাঁকে ইস্তাহারটিতে স্বাক্ষর করতে বললে কাজী গোলাম মাহবুব বলেন যে, তাঁরা সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করার ফলেই পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই। কাজী গোলাম মাহবুবের অস্বীকৃতির পর আবদুল মতিন নিজেরই বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে ইস্তাহারটিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন।[৫]

গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিক থেকে দলে দলে ছাত্র পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে এসে ভীড় করতে থাকেন এবং এ সময় তাঁদের মধ্যে শোক এবং উত্তেজনার অনেক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,

★কেউ বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেও গুলিবর্ষণের পূর্ব পর্যন্ত মধুর রেস্তোরাঁ থেকেই খুব সম্ভবত সেদিন কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি কাজ হচ্ছিলো। এবং সেজন্য আবদুল মতিন এবং অলি আহাদ ঐ সময় সেখানে ছিলেন। অলি আহাদ, তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' নামক গ্রন্থ (পৃঃ ১৫৬) লিখেছেন যে, গুলিবর্ষণের সময় তিনি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছিলেন এবং আহত বরকতকে হাসপাতালে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ ধরনের কোন কথা মিএরা মোহন, মোস্তফা রওশান আখতার, রফিকুল ইসলাম প্রভৃতি যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেউই বলেন নি। আমি নিজেও সেখানে ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু অলি আহাদের উপস্থিতির কোন কথা আমার মনে পড়ে না। এক্ষেত্রে মতিন ও জাহেদীর কথাই সঠিক বলে মনে হয়।—ব. উ.

www.pathagar.com

শহরের লোকজন এবং পরিষদ সদস্যেরা কেউ কেউ গুলির অব্যবহিত পরই হাসপাতালে উপস্থিত হন। পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য মনোরঞ্জন ধর পরিষদ অধিবেশনে যাওয়ার পথে এবং অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ৩-৩০ মিঃ এর আগে হাসপাতালে যান এবং সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুক্ষণ পরই পরিষদে বিবৃত্তি প্রদান কালে বলেন,

> আমি এবং মিঃ ব্যানার্জী (গোবিন্দলাল ব্যানার্জী-ব.উ.) হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম দেহে বিভিন্ন ধরনের আঘাত প্রাপ্ত প্রায় ২০০ ছাত্র সেখানে শুয়ে আছে। এক ক্ষেত্রে আমি একটি বিভীষিকাময় চিত্র দেখলাম। তার মাথার খুলি উড়ে গেছে এবং মগজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। অনেকের মাথায়, পায়ে ও পেটে কাটা এবং আঘাত রয়েছে। আমরা পুলিশ কর্তৃক ছাত্রদের উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণের আওয়াজ শুনলাম। আমরা দুজনকে মৃত এবং তিনজনকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দেখলাম।[৬]

এছাড়া পরিষদে কংগ্রেস দলীয় নেতা বসন্তকুমার দাসও ঐ সময় হাসপাতালে যান এবং কিছুক্ষণ পর পরিষদে বিবৃতি দেওয়ার সময় বলেন,

> আমার মাননীয় বন্ধু মিঃ ধর বলেছেন যে তিনি নিজে কয়েকটি মৃতদেহ দেখেছেন। কিন্তু সেখানে এমন ভীড় ছিলো যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে সকলের কাছে যেতে পারিনি। কিন্তু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে আমি অন্ততঃ পাঁচজনকে খুব গুরুতর আহত অবস্থায় দেখেছি।[৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আয়ার, ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রভৃতি প্রথম দিকেই হাসপাতালে যান। প্রফেসর আয়ার ছাত্রদের অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করেন। সে সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডক্টর এলিংসনও এসে উপস্থিত হন এবং পরপর অনেকগুলি অপারেশন করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সেদিন বেশ কয়েকজন ছাত্রের প্রাণ রক্ষা হয়।[৮]

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে গুলি চালনার অল্প কিছুক্ষণ পরের অবস্থা এবং সালাহুদ্দীনের লাশ এবং ছবি তোলার কথা প্রসঙ্গে কাজী মহম্মদ ইদরিস বলেন,

> ২১শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে গুলি চলার খবর যখন পেলাম তখন আমি প্রাদেশিক সেক্রেটারীয়েটে আমার অফিসে। বেলা তখন চারটার কাছাকাছি। এ খবর পাওয়ামাত্র আমি অফিস থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপতালের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম অনেকে উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে ডক্টর শহীদুল্লাহ, বসন্ত কুমার দাস, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নেলী সেনগুপ্তা এঁদের কথা মনে পড়ছে। আহত ছাত্রদের অনেকে তখনো হাসপাতলে মেঝের উপর শোয়া। চারিদিকে একটা দারুণ উত্তেজনা।
>
> এই সময় নুরুদ্দীনের স্ত্রী হালিমার সঙ্গে আমার দেখা, হালিমা তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। অ্যাপ্রন পরা অবস্থায় সে তখন খুব ব্যস্ত। কিন্তু তার মধ্যেই সে আমাকে বললো যে, যে ছাত্রটির মাথার খুলি উড়ে গেছে তার দেহটা হাসপাতালের পেছন দিকে একটা ঘরে রাখা আছে এবং সেখানে শুধু একজন

www.pathagar.com

মেথর ছাড়া অন্য কেউ নেই। হালিমা আমাকে বললো যে ইচ্ছে করলে সে আমাকে মৃতদেহটা দেখাতে পারে। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম এবং হালিমা আমাকে খুব সাবধানে পেছন দিকের সেই নির্দিষ্ট কামরায় নিজে হাজির করলো যেখানে মৃতদেহটি একটি খাটের উপর চাদর ঢাকা অবস্থায় শোয়ানো ছিলো। আমি দেখলাম, ছেলেটের মাথার খুলি একেবারে উড়ে গেছে। দেখে আমার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

আমি তখন হালিমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মৃতদেহটির ছবি তোলা যায় কিনা এবং তার ব্যবস্থা সে করতে পারবে কিনা। তাতে সে বললো যে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি এক মিনিটের মধ্যে কেউ যদি সে কাজ করতে পারে তবে তার পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব।

*আমানুল নামে একজন ফটোগ্রাফার তখন ইডেন বিল্ডিংএ চাকরি করতো। হাবিবুল্লাহ বাহার তাকে সেখানে চাকরি দিয়েছিলেন। সে এর পূর্বে কলকাতায় ছিলো। আমি মেডিকেল কলেজের বারান্দা থেকে সামনের মাঠের মধ্যে এসে আমানুলের দেখা পেলাম। তখন সে একটা ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট পরেছিলো এবং সেই শার্টের মধ্যে তার একটা ক্যামেরা লুকানো ছিলো। ছবি তোলার জন্য সে ক্যামেরাটি এনেছিলো। কিন্তু ছবি তোলা সে সময় বিপজ্জনক হতে পারে মনে করে ক্যামেরাটি সে লুকিয়ে রেখে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটি বর্ণনা করে ছবি তোলার কথা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে তখনই রাজী হয়ে গেলো। এর পর আমি হালিমার সাথে কথা বললাম। ঠিক হলো যে, আমি আমানুলের সাথে যাবো না। সে একাই হালিমার সাথে যাবে এবং মেডিকেল কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হালিমা ইশারা করলে আমানুল তার কাছে যাবে। ইতিমধ্যে আমানুল তার ক্যামেরা ঠিকঠাক করে আনতে কোন জায়গায় গিয়েছিলো। সে ফিরে এলে তাকে আমি সব বললাম এবং হালিমাকে দূর থেকে চিনিয়ে দিলাম। এরপর হালিমা একবার ইশারা করায় সে হালিমার কাছে গেলো এবং তারপর ভিতরের দিকের কামরাটায় গিয়ে ছবিটি তাড়াতাড়ি তুলে আনলো। ঘুরে এসে সে বললো যে ছবি ভালই আসবে। আমাকে সে সন্ধেবেলা তার বাড়িতে যেতে বললো ছবিটি নেওয়ার জন্য। সে তখন পলাশী ব্যারাকে ফায়ার বিগ্রেডের অফিসের কাছে একটা বাড়িতে থাকতো।[৭]

সালাহুদ্দীনের লাশের ছবিটি তোলার বর্ণনা এইভাবে দেওয়ার পর কাজী ইদরিস ছবিটি** সম্পর্কে আরও বলেন,

সন্ধ্যের সময় আমানুলের বাড়ী গিয়ে দেখলাম যে, ছবিটি খুব ভালো উঠেছে। ছবিটির কয়েক কপি করা হয়েছিলো। তার মধ্যে এক কপি নিয়েছিলো স্পোর্টস ফেডারেশনের এ. এস. এম. মোহসিন (সাজু)। একটি কপি দেওয়া হয়েছিলো মাজেদ খাকে (ইসলামের ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং আর একটি আজাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কারণ এই সময় আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রাদেশিক পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলে শোনা

---

*আমানুল হক।–ব.উ.

**আমিনুল হক ঐসময় সালাহুদ্দীনের লাশ এবং অন্ততঃ দুটি ছবি তুলেছিলেন। কারণ তিনি আমাকে ১৯৭০ সালের সালাহুদ্দীনের লাশ এর দুটি ছবি দিয়েছিলেন যার একটি শুধু মাথার অংশের এবং অপরটি স্ট্রেচারে শোয়ানো অবস্থায় পুরো লাশের। এর মধ্যে প্রথমোক্ত ছবিটিই ১৯৫২ সালে ও পরে সাধারণভাবে প্রচারিত হয়েছিলো। –ব. উ.

www.pathagar.com

গিয়েছিলো। তাছাড়া আজাদে ২১শের ঘটনার সত্য বৃত্তান্ত ছাড়া হবে একথাও শুনেছিলাম। এইসব বিবেচনা করে আজাদে কপি পাঠানো হয়েছিলো। আজাদে ওটা ছাপাবার ব্যবস্থাও হয়েছিলো। ছবিটির ব্লকও এসেছিলো। কিন্তু রাত প্রায় দুটোর সময় কর্তৃপক্ষের, হয় মওলানা আকরম খান নয়তো সদরুল আলম খানের (খলিল মিঞার) আপত্তিতে সেটা শেষ পর্যন্ত আর আজাদে ছাপা হয়নি। মাজেদ খানের কাছে সে কপিটি ছিলো তার থেকেরও ব্লক তৈরী করা হয়েছিলো। সে ব্লকটি মাজেদ খানের মাধ্যমেই ছাত্রদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কারণ সে সময় বাইরের লোকদের কোন হলে মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিলো না। এই কপিটি থেকে তৈরী ব্লকের ব্যবহারও হয়েছিলো। ছাত্রেরা একটি প্রচারপত্র লিখে তাতে ছবিটি ছেপেছিলো। এই প্রচারপত্র পরে পুলিশের হাতে পড়ায় সমস্তগুলি সীজ করে বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিলো।[১০]

৭. পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অভ্যন্তরে

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের উপর যে সময় গুলিবর্ষণ হয় তখন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ ভবনে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক বসেছিলো। গুলি চলার পর সেই বৈঠক ভেঙ্গে যায় এবং সদস্যেরা কেউ কেউ বাইরের দিকে এসে দাঁড়ান। এই সময়কার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলিম লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেন,

> ২১শে ফেব্রুয়ারী অ্যাসেম্ব্লী হলে আমাদের পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং বসেছিলো। সেই মিটিং এর মধ্যেই গুলির আওয়াজ শুনলাম। তারপর ছাত্রেরা আসেম্ব্লীর সামনে রক্তমাখা কাপড় নিয়ে চীৎকার করতে থাকলো এবং আমাদেরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো 'বেরিয়ে আসুন, দেখুন' ইত্যাদি। এই সময় অ্যাসেম্ব্লী অধিবেশন শুরু হওয়ার ঘন্টা পড়লো।[১]

বিকেল ৩-৩০ মিনিটে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে কিছুক্ষণ পূর্বে ছাত্রদের উপর গুলি চালনার প্রেক্ষিতে পরিষদের অধিবেশন সেদিনের জন্য স্থগিত রাখ.র দাবী জানিয়ে প্রথমেই আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেন,

> জনাব স্পীকা' সাহেব প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা যারা আমাদের ভাবী আশাভরসাস্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করছে সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে enquiry তারপর House চলবে।

এর পর কংগ্রেস সংসদীয় দলের ডেপুটি লীডার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তখনকার পরিস্থিতির উল্লেখ করে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবী জানিয়ে বলেন যে, যে অবস্থায় শত শত ছাত্র পুলিশের আক্রমণে আহত হয়েছে এমন কি ছাত্রেরা নিহত পর্যন্ত হয়েছে, সে অবস্থায় পরিষদের কাজে অংশগ্রহণ তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। মনোরঞ্জন ধরও হাসাপতালে নিহত এবং আহত ছাত্রদেরকে স্বচক্ষে দেখে আসার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নূরুল আমীনকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি স্বচক্ষে

www.pathagar.com

দেখে আসার জন্যে দাবী জানান।

পরিষদের স্পীকার আবদুল করিম সকলকে শান্ত হওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করা এবং নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও পরিষদের আবহাওয়া ক্রমশঃ অধিকতর উত্তপ্ত হতে থাকে এবং বিরোধী দলীয় সদস্যেরা, এমনকি মুসলিম লীগ দলীয় কোন কোন সদস্যও, পরিষদের অধিবেশন মূলতবী ঘোষণার দাবী করতে থাকেন। বিশেষ করে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এ সময়ে বারবার দাবী করতে থাকেন যে, আগে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে হাসপাতালে গিয়ে অবস্থা দেখে এসে পরিষদে বিবৃতি প্রদান করতে হবে এবং একমাত্র তার পরই পরিষদের অধিবেশন বসতে পারবে তার পূর্বে নয়।

এই পর্যায়ে নূরুল আমীন বলেন যে তিনি মনোরঞ্জন ধরের বক্তব্য শুনেছেন এবং সেটা তাঁর কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে, কারণ তিনি চারজন নিহত হওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি নিজের চোখে কয়েকটি মৃতদেহ দেখে এসেছেন একথা জোর দিয়ে মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমীনকে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন এবং আরও বলেন যে, নূরুল আমীন জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এ সবের জবাবে নূরুল আমীন বলেন,

> এটা জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়, পরিষদ অবগত আছেন কিভাবে এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। সেটা হলো এই। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গত সন্ধ্যায় ১৪৪ ধারা জারী হয়েছিলো। (হৈ চৈ ও বাধা প্রদান) ১৪৪ ধারা জারী সঠিক হয়েছিলো কিনা সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কিন্তু আদেশ যখন জারী করা হয়েছিলো তখন এ দেশের নাগরিকদেরকে তা মেনে চলতে হবে। ১৪৪ ধারা জারীর যথার্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যেতে পারে এবং এই আদেশের প্রতিবাদ করার অনেক উপায় আছে। কিন্তু সেটা না করে জনগণের একটা অংশ যদি নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয় এবং এই আদেশ লঙ্ঘন করে তাহলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে। (বাধা প্রদান) সকাল ১০থেকে ছাত্রেরা আমি যতদূর জানি অ-ছাত্র কিছু যুবকদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে পুলিশের ঘেরাও ভেঙ্গে ১৪৪ ধারা অমান্য করে শহরে মিছিল করার চেষ্টা করছিলো। পুলিশ এলাকাটি পাহাড়া দিচ্ছিলো যাতে করে তারা রাস্তায় আসতে না পারে এবং জনগণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। পুলিশ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেনি। (মিঃ গোবিন্দলাল ব্যানার্জীঃ তারা প্রবেশ করেছিলো) আমি যতদূর খবর রাখি যে, সব লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো তাদের উপর ইঁটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। তাদের গাড়ী ভাঙ্গা হয়েছিলো। (মিঃ মনোরঞ্জন ধরঃ পুলিশ হোস্টেলের একটি ব্লকে হামলা করেছিলো। ছাত্রেরা যখন নিজেদের এলাকা ছেড়ে পথচারীদের গাড়ী থামাবার জন্য রাস্তায় নেমেছিলো তখন পুলিশ তাদেরকে বাধা দিতে বাধ্য হয়েছিলো। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সহ কয়েকজন দায়িত্বশীল ও সম্মানিত ব্যক্তি আহত হয়েছিলেন। পুলিশের কিছু লোকও আহত হয়েছিলো। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আহত হয়েছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিলো (একটি কণ্ঠস্বর ঃ বুলেটের সম্পর্ক কি

www.pathagar.com

বলেন?) বুলেট ব্যবহার করা হয়েছিলো কিনা সেটা আমি এখনো পর্যন্ত জানি না।★ (কিন্তু আমার মনে হয় লাঠি চার্জ করা হয়েছিলো। বুলেটের ব্যাপারে আমি তদন্ত করছি এবং শীঘ্রই আমি হাউসের কাছে সে ব্যাপারে রিপোর্ট করবো। সুতরাং প্রশ্ন হলো এই যে, ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিলো ছাত্র যুবক অথবা বয়স্ক ব্যক্তি যেই হোক, জনগণের কোন অংশের দ্বারাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সঠিক হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের এলাকার মধ্যে থেকে শ্লোগান দেওয়া ইত্যাদি কাজে লিপ্ত ছিলো ততক্ষণ তাতে বাধা দেওয়ার কোন যুক্তি পুলিশের ছিলো না। এটা ভাষার প্রশ্ন নয়, এটা হলো আইন ভঙ্গের প্রশ্ন। ইতিপূর্বেই পর পর দুইবার তারা যখন শান্তিপূর্ণভাবে দুটো মিছিল বের করেছিলো তখন পুলিশ কোন রকম বাধা প্রদান করেনি।

নূরুল আমীনের এই বক্তৃতার পর গোবিন্দলাল ব্যানার্জী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কাঁদুনে গ্যাস কোথায় নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, রাস্তার উপর না এলাকার মধ্যে। এর জবাবে নূরুল আমীন বলেন যে, ছাত্রেরা যখন রাস্তার উপর এসেছিলো তখনই তাদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া হয়েছিলো। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর খবর অনুযায়ী পুলিশদেরকে ঘেরাও করে তাদের উপর যখন ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া হচ্ছিলো তখনই তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছিলো।

এরপর পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা বসন্তকুমার দাস শ্লেষের সঙ্গে বলেন যে, তখনকার পরিস্থিতি কয়েকজন পরিষদ সদস্য যেভাবে বর্ণনা করেছেন তারপরেও যে শান্তভাবে অবলম্বন করে নূরুল আমীন তাঁর বিবৃতি প্রদান করলেন তিনি সেটার প্রশংসা করেন। বসন্তদাস আরও বলেন যে, তাঁর এই শান্তভাব তাঁর হৃদয়হীনতা থেকে আসছে না বলেই তিনি আশা করেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে সবকিছু নিজের চোখে দেখে আসার জন্য তিনিও নূরুল আমীনকে বলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরাও তাঁর সঙ্গে যেতে প্রস্তুত বলে জানান। এ ব্যাপারে সাহস সঞ্চয় করার জন্য তিনি নূরুল আমীনের প্রতি আহবান জানান। বসন্তকুমার দাসের এইসব বক্তব্যের জবাবে নূরুল আমীন বলেন,

এটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে যাওয়ার প্রশ্ন নয়। কারণ আমাকে জানতে হয় যদি কোন ঘটনা ঘটে থাকে তার কারণগুলি কি। আসল ব্যাপার না জেনে শুধু মেডিকেল হাসপাতালে গেলে তার দ্বারা কিছুই হবে না। সুতরাং আমাদেরকে জানতে হবে কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা এবং কিভাবে সে ঘটনা ঘটেছে এবং কাকে এর জন্য দায়ী করা যায় এবং কোন পুলিশ অফিসার কোন রকম বাড়াবাড়ি করেছে কিনা। আমি তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং খুব কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। পুলিশ কোন বাড়াবাড়ি করে না। কেউ যদি তা করে থাকে তাহলে তাদের আমি সেটা দেখবো এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবো। এটা যারা আহত হয়েছে তাদের

★এক ফার্লং এর কম দূরত্বে, যেখান থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিলো সেখানে গুলি চলার প্রায় এক ঘন্টা পর নূরুল আমীন একথা বলছেন। – ব, উ.

www.pathagar.com

প্রতি সহানুভূতির অভাবের ব্যাপার নয়। কিন্তু যাদের উপর প্রশাসন চালু রাখার দায়িত্ব আছে তাদেরকে দেখতে হবে এবং পেছনের কাহিনীটি কি এবং কিভাবে এর উৎপত্তি হলো। তখন এবং কেবলমাত্র তখনই তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। অন্যথায় আমি যদি ইতিহাস থেকে শুধু একটিমাত্র পাতা তুলে নেই তাহলে তার দ্বারা আমরা কিছুই করতে পারবো না। সে জন্যই আমি বলি যে, প্রথমে আমি একটা তদন্ত করবো এবং তার পরই আমি একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

নূরুল আমীনের এই বক্তব্যের পর বসন্তকুমার দাস বলেন,

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সেটা কোন যোগ্য কাজ নয়। আমরা যদি সেখানে যাই এবং আহতদেরকে দেখি তাহলে কি ক্ষতি হয়? তিনি তদন্ত করুন এবং নিজের চোখে ছাত্রদের অবস্থা দেখুন। কোন আদালতের সামনে প্রধানমন্ত্রীর এর আচরণ তাঁর খুব বিরুদ্ধেই যাবে।[১০]

এরপর পরিষদে এমন হট্টগোল শুরু হয়ে যায় যে স্পীকার আবদুল করিম ১৫ মিনিটের জন্য পরিষদের অধিবেশন মূলতবী রাখার কথা ঘোষণা করেণ।[১১] অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে নূরুল আমীন বলেন,

স্যার, পরিষদের কয়েকজন মাননীয় সদস্যের থেকে, যাঁরা হাসপাতালে গিয়েছিলেন, আমি খবর পেয়েছি। তাঁদের খবর অনুযায়ী কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছে। ঘটনার বিকাশ সম্পর্কেও আমি রিপোর্ট পেয়েছি। যে বিষয়টি আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে তা হলো–।

নূরুল আমীন এই পর্যন্ত বলার পর আলী আহমদ খাঁন তাঁকে বাধা প্রধান করে বলেন,

মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন যে পুলিশের গুলি চালনার ফলে মৃত্যু ঘটার সংবাদ তিনি পেয়েছেন কিনা। তিনি কয়েকজন ছাত্রের আহত হওয়ার কথাই কেবল উল্লেখ করছেন কিন্তু আমার কাছে নিশ্চিত তথ্য আছে যে, কয়েকজন ছাত্র হাসপাতাল প্রাঙ্গণে নিহত হয়েছে।

এরপর পরিষদে আবার হৈচৈ শুরু হলে স্পীকার সকলকে চুপ করতে বলে নূরুল আমিনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে নির্দেশ দেন। নূরুল আমিন এরপর বলেন,

মাননীয় সদস্যরা চেয়েছিলেন যাতে আমি হাসপাতালে যাই এবং আহত ব্যক্তিদেরকে দেখি। স্যার, আমি মনে করি না হাসপাতালে গিয়ে এবং হাসপাতালে যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই আহত ব্যক্তিদেরকে দেখে কোন ফায়দা হবে। কারণ আমি কয়েকজন মাননীয় সদস্যের থেকে খবর পেয়েছি যাঁদের অবিশ্বাস করার কোন কারণ আমার নেই।

এরপর নূরুল আমীন তাঁর বক্তৃতায় তদন্তের ব্যাপারে পরিষদকে আবার আশ্বাস দেন কিন্তু পুলিশের গুলি চালনার ফলে কেউ নিহত হয়েছে কিনা সে কথা স্বীকার করার ব্যাপারটি বারবার এড়িয়ে যান। তিনি সদস্যদের কাছে বলেন যে, তাঁরা সব সময় ভাবপ্রবণতার দ্বারা চালিত হতে পারেন না।

www.pathagar.com

নূরুল আমীনের এই বক্তব্যের পর আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রদানের পর নিদারুণ ক্ষোভে সঙ্গে পরিষদগৃহ পরিত্যাগ করেন,

> যখন আমাদের চক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা, ৬জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত, তখন আমরা পাখার নীচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আমি জালেমের এ জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার (স্পীকারের-ব.উ.) মধ্যস্থতায় সকল মেম্বারের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।

অবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এইভাবে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগের ঠিক পরই স্পীকার আসরের নামাজের জন্য ১৫ মিনিটকাল পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন। অধিবেশনের কাজ আবার শুরু হলে শামসুদ্দীন আহমদ বলেন,

> আমি এই মাত্র এই পরিষদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের একটি বক্তৃতা শুনেছি। স্যার, আমি এ্যাসেমব্লীতে আসার পথে হোস্টেল প্রাঙ্গণে এবং মেডিকেল কলেজের মধ্যে গিয়েছিলাম। হোস্টেল প্রাঙ্গণের মধ্যে দুইজন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ব্যক্তি খুব গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ছাত্রেরা যখন হোস্টেল প্রাঙ্গণে নিহত হচ্ছে তখন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এখন কি আমাদের দরকার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া? স্যার, আমার ৩৫ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে আমি বৃটিশ রাজ্যের রুদ্র-মূর্তি দেখেছি কিন্তু কলকাতা অথবা অন্য কোথাও আমি শুনিনি যে, পুলিশ কোন হোস্টেল প্রাঙ্গণে অথবা কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকতে এবং ছাত্র হত্যা করতে সাহস করেছে। স্যার, এ সব কিছু ঘটে যাওয়ার পর ঠিক এখনই আমাদের পক্ষে ফ্যানের নীচে বসে বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করা সম্ভব নয় যখন আরও গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা এই পরিষদের বাইরে ঘটে যাচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি একটি ছেলের মাথা বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে।

এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বেসরকারী তদন্ত কমিশন নিয়োগের কথা বলে শামসুদ্দীন আহমদ পরিষদের অধিবেশন তৎক্ষণাৎ মুলতবী রাখার দাবী জানান। এরপর বসন্তকুমার দাসও সেই একই দাবী আবার জোরের সঙ্গে উত্থাপন করেন। কিন্তু নূরুল আমীন সে দাবী আগ্রাহ্য করে বলেন যে, এইভাবে অধিবেশন মুলতবীর কোন পূর্ব উদাহরণ বিভাগ পূর্ব বাঙলার পরিষদে ছিলো না এবং তিনি এখন সে কাজ করলে একটি খারাপ উদাহরণই স্থাপন হবে।

এর জবাবে বসন্তকুমার দাস বলেন যে এটা একটা অস্বাবিক ঘটনা এবং এরকম ক্ষেত্রে পূর্ব-উদাহরণের কোন প্রয়োজন নেই কাজেই পরিষদের অধিবেশন মূলতবী রাখা হোক। কিন্তু নূরুল আমীন সেদিনকার পরিষদের পূর্ব-নির্ধারিত কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মত পরিবর্তন না করায় এই পর্যায়ে বিরোধী দলীয় সদস্যেরা পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করে বাইরে চলে যান। বিরোধী দলীয় সদস্যেরা অধিবেশন বর্জনের পর সরকার পক্ষের

www.pathagar.com

সদস্যদের উপস্থিতিতে সেদিন পরিষদে অন্য কতকগুলি পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু হয় এবং বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

৮. গুলিবর্ষণের পর বিভিন্ন এলাকার তৎপরতা

গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ২০ নম্বর শেডের মধ্যে থেকে মাইকে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে প্রচার কাজ শুরু হয়েছিলো।[১] তাছাড়া ঐ সময় গুলিতে হতাহত ছাত্রদের রক্তাক্ত জামা-কাপড় তুলে ধরে পুলিশী নির্যাতনের নিদর্শনস্বরূপ সেগুলি সমবেত জনতার সামনে প্রদর্শন করা হচ্ছিলো।[২]

কিছুক্ষণ এইভাবে প্রচার কাজ চলার পর প্রথমে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং পরে খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন আলী আহমদ খান প্রভৃতি পরিষদ অধিবেশন বর্জন করে বাইরে আসেন। তর্কবাগীশ এই সময় কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে দিয়ে মেডিকেল হোস্টেলের মধ্যে এসে ২০ নম্বর শেড থেকে ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে একটি ছোট কিন্তু বেশ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন।[৩] এ বিষয়ে তর্কবাগীশ বলেন,

> আমি বেরিয়ে আসার পর ছাত্রেরা আমাকে একটি কামরার মধ্যে নিয়ে গেলো। সেখানে আমি মাইকের সামনে বক্তৃতা করলাম। এরপর আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। সেখানে আসলাম বা সালাম নামে একজন খুব সুন্দর ছেলে গুলির আঘাত পেয়ে হাত পা বাঁধা অবস্থায় খাটে শুয়েছিলো। ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করছিলেন। আমাকে দেখে সে চীৎকার করে 'তোমরা আমাদের দুশমন' ইত্যাদি বলে নানা রকমভাবে গালাগালি বকাবকি করতে লাগলো। তার শারীরিক অবস্থায় এতে আরও অবনতি হবে ভেবে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলাম।[৪]

গুলির পর শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার লোক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতরে ও আশেপাশে একে একে জড়ো হচ্ছিলো। তারা হতাহতদের সম্পর্কে এবং আন্দোলনের বিষয়ে খবরাখবরের জন্য মাইকের বক্তৃতা সেদিন সন্ধ্যার পর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন। পরে অবশ্য পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে যায়।[৫] এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিষদ ভবনের আশেপাশে এলাকায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং অনেক রাত্রেও তাদেরকে টহল দিতে দেখা যায়।[৬]

একুশ তারিখে গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করা হয়। মাইকযোগে সেখান থেকেই ছাত্রনেতা ও কর্মীরা একের পর এক বক্তৃতা করতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে নির্দেশ দেওয়া হতে থাকে। এইসব বক্তার মধ্যে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্মী শহীদুল্লাহ কায়সারও ছিলেন।[৭]

www.pathagar.com

ঐ দিন সন্ধ্যাতেই মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং যুবলীগের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে (ক) ২২শে ফেব্রুয়ারী ভোর সাতটায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গায়েবী জানাজা এবং (খ) গায়েবী জানাজার পর জনসভা ও মিছিলের কর্মসূচী নির্ধারণ করেন এবং তা 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' থেকে মাইক যোগে প্রচার করা হয়।[৮]

এরপর ঐ দিন রাত্রি ৯টার সময় অলি আহাদের উদ্যোগে মেডিকেল কলেজের ৪ নম্বর ব্যারাকের ৩নং কামরায় ভাষা আন্দোলনের যে সব কর্মী কাছাকাছি ছিলেন তাঁদের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা ছাত্র-সংসদের সদস্য গোলাম মাওলাকে অন্তবর্তীকালের জন্য অস্থায়ী সম্পাদক করে নোতুন কমিটি গঠন করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঠিক সেই মুহূর্তে অকার্যকর হয়ে পড়ার কারণেই আন্দোলনের তাগিদে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৯] অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা আবদুল মতিন, এমাদুল্লাহ প্রভৃতি এই বৈঠকে উপস্থিত থেকে পরদিন গায়েবী জানাজা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। [১০]

সন্ধ্যার দিকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় পুলিশের গুলি চালনার ফলে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। এ ছাড়া কয়েকটি প্রস্তাবও সেই সভায় গৃহীত হয়। সেগুলিতে শহীদ ছাত্রদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন পর্যন্ত কালো ব্যাজ ধারণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয় এবং পুলিশী নির্যাতনের ও গুলি বর্ষণের তীব্র নিন্দা করে দোষী সরকারী কর্মচারীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবী জানানো হয়।[১১]

গুলিবর্ষণের অল্প কিছুক্ষণের পরই হাসান হাফিজুর রহমান আমীর আলী সহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উল্টো দিকে ক্যাপিটাল প্রেসে চলে যান। সেখানে গিয়ে হাসান নিজেই একটি লিফলেটের খসড়া তৈরী করেন এবং সেটা ছাপার ব্যবস্থা করেন। লিফলেটটির সাইজ ছিলো ১/১৬। ক্যাপিটাল প্রেস সেদিন এ ব্যাপারে খুব সহযোগিতা করেছিলো এবং দুই তিন ঘন্টার মধ্যেই 'মন্ত্রী মফিজউদ্দীন এর আদেশে গুলি' শীর্ষক এই লিফলেটটি ছাপার কাজ সম্পূর্ণ করে হাসান হাফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফিরে এসেছিলেন। লিফলেট ছিলো দুতিন হাজার। চকবাজার, নাজিরাবাজার এবং ঢাকার অন্য সব এলাকাতেও লিফলেটগুলি কর্মীদের মাধ্যমে ঐ দিনই ছড়িয়ে দেওয়া হয়।[১২]

মন্ত্রী মফিজউদ্দীনের সঙ্গে আসলে গুলিবর্ষণের কোন সম্পর্ক ছিলোনা।

www.pathagar.com

হাসান হাফিজুর রহমান নিজেই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং নিজেরই উদ্যোগে এই লিফলেটটি রচনা ও প্রচার করেছিলেন।[১৩]

সন্ধ্যার মধ্যেই সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল প্রভৃতি ছাত্রাবাসগুলিতে ছাত্ররা 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করেন এবং পরদিন গায়েবী জানাজা ইত্যাদির কর্মসূচী প্রচার করতে থাকেন। পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ছাত্রেরা মাইকে এ সময় অনেকেই বক্তৃতা করেন।

গুলিবর্ষণের খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায় এবং রিক্সা বাস ইত্যাদি চলাচলও বন্ধ হয়। সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এই সব ধর্মঘটই ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত।[১৪]

এ ছাড়াও শহরের লোকে বিভিন্ন মহল্লায় ছোট ছোট প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান করেন এবং বিকেলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হন।

পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনার অল্প কিছুক্ষণ পরই ঢাকা বেতারের শিল্পী ও কর্মচারীরা নাজিমুদ্দীন রোডে অবস্থিত রেডিও কেন্দ্রের উল্টো দিকে আবন মিঞার রেস্টুরেন্টে সমবেত হন এবং গুলির প্রতিবাদে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, সায়ীদ সিদ্দিকী, আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ প্রভৃতি লেখক ও শিল্পীরা এই ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[১৫] এর ফলে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের ঐ দিনের তৃতীয় অধিবেশনের সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায় এবং সে সময়ে শুধু রেকর্ডের সঙ্গীতই শোনানো হয়।[১৬]

গুলিবর্ষণের কিছুক্ষণ পরে আবুল হাশিম, কমরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব আবদুল গফুর প্রভৃতি ফজলুল হকের কে, এম, দাস লেনস্থ বাড়ীতে গুলিবর্ষণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য মিলিত হন। কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই তাঁদেরকে খবর দেয়া হয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার জন্য। কবিরউদ্দীন আহমদ সহ কমরুদ্দীন আহমদ সেখানে গিয়ে দেখেন মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, খোন্দকার গোলাম মোস্তফা, মাহবুব জামাল জাহেদী প্রভৃতি ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে যে বৈঠক হয় তাতে একটি ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া তহবিল, মাইক্রোফোন ক্রয় লিফলেট ছাপা ইত্যাদি বিষয়েও সেই বৈঠকে আলোচনা হয়।[১৭] এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সেদিন রাত্রে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গোলাম মাওলাকে আহবায়ক করে একটি নোতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।

২১শে তারিখে রাত্রে মহম্মদ তোয়াহা বাসায় না ফিরে বাইরে রাত্রি যাপন করেন। তাজউদ্দীন সে সময় মহম্মদ তোয়াহার বাসায় থাকতেন এবং ঐ

www.pathagar.com

রাত্রে তিনি সেখানেই ছিলেন। যুব লীগের অফিসও ঐ বাড়ীতেই অবস্থিত ছিলো। শেষ রাত্রির দিকে পুলিশ যুব লীগের অফিস ঘেরাও এবং খানাতল্লাসী করে। এ বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ডায়েরীতে লেখেন,

> পুলিশ বাহিনী রাত্রি প্রায় ৩-৩০ মিনিটের সময় আমাদের বাসা ঘেরাও করে এবং যুব লীগের অফিস খানাতল্লাসী করে। তারা অপরাধমূলক অথবা আপত্তিকর কিছুই পাই নি। আমি যুব লীগের অফিসের সংলগ্ন আমার শোয়ার কামরা থেকে সরে গিয়ে ছিলাম। এবং তারা আমার কোন গন্ধ পায় নি। তারা ভোর ৪টের দিকে চলে যায়।[১৮]

৯. দৈনিক সংবাদ অফিস ও বর্ধমান হাউজের অভ্যন্তরে

১৯৫২ সালে দৈনিক সংবাদ ছিলো ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের মুখপত্র। এ সময় খায়রুল কবীর ছিলেন সংবাদ এর সম্পাদক। এ ছাড়া সংবাদে কর্মরত এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিতদের মধ্যে ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দীন তসদ্দুক, আহমদ, খোন্দকার গোলাম মোস্তফা, সরদার জয়নুদ্দীন, কাজী মহম্মদ ইদরিস প্রভৃতি।

২১শে তারিখে সরকার একটি প্রেস নোট জারী করে অন্য সব পত্রিকার সঙ্গে সংবাদেও তার কপি পাঠান। সেই প্রেস নোটে ছাত্র জনতা হত্যার কোন উল্লেখ ছিলো না। এই প্রেস নোট সংবাদ অফিসে পাঠানোর পূর্বে প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র সচিব আজফার, খায়রুল কবীরকে টেলিফোনে বলেন যে, তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রেস নোট পাঠাচ্ছেন এবং সেই প্রেস নোটটি পত্রিকায় ছাপাতে হবে।[১] এ বিষয়ে খায়রুল কবীর বলেন,

> গুলি চলার কয়েক ঘন্টা পর হোম সেক্রেটারী আমাকে বললো যে, তারা সরকারী প্রেস নোট পাঠাচ্ছে। সেটা ছাপাতে হবে। আমি রাজী হলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বললাম যে আমাদের রিপোর্টাররা যে রিপোর্ট দেবে সেটাও আমরা ছাপাবো।
>
> পরে সরকারী প্রেস নোট এলে দেখলাম যে, তাতে গুলিতে ছাত্র মৃত্যুর কোন উল্লেখ নেই। অথচ, আমাদের রিপোর্টারদের রিপোর্ট অনুসারে ছাত্রেরা মারা গিয়েছিলো। আমি হোম সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে বললাম যে, মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও প্রেস নোটে তার কোন উল্লেখ নেই। তবে আমরা আমাদের রিপোর্ট এবং প্রেস নোট দুইই ছাপবো।
>
> আমি এর পর সন্ধ্যার দিকে নূরুল আমীন সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম যে, প্রেস নোট ছাপা যাবে না কারণ তাতে মৃত্যুর কোন উল্লেখ নেই। সম্পাদক হিসেবে এত মিথ্যা কিভাবে ছাপা যায়। নূরুল আমীন সাহেব তখন আমার সাথে একমত হলেন (ইতিপূর্বে ব্যবস্থা পরিষদের আলোচনার সময় নূরুল আমীন নিজেও শেষ পর্যন্ত গুলিতে ছাত্র হত্যার বিষয়টি কিছুতেই স্বীকার করেন নি।–ব. উ.) এবং চীফ সেক্রেটারী ও হোম সেক্রেটারীকে ফোন করলেন। এরপর তারা মৃত্যু স্বীকার করতে রাজী হলো এবং পরে কাগজে অন্য একটা প্রেস নোট সেই মর্মে পাঠালো।

www.pathagar.com

খায়রুল কবীর সংবাদ অফিসে অনুপস্থিত থাকার সময় সেখানে বিরাট এক জনতা সংবাদ অফিস ঘেরাও করে রেখেছিলো। খায়রুল কবীর তখনকার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

> সংবাদ অফিসে ফিরে এসে দেখলাম যে প্রায় দুশো ছাত্র এবং অন্যান্য লোকে অফিসে চেঁচামেচি করে জানতে চাইছে সংবাদে ঘটনার কি রকম রিপোর্টিং হবে। কিছু লোক আমাকে অশ্রাব্য গালাগালি করলো। আমি তাদের সাথে কথা বললাম। আমি বললাম যে, আমি সরকার অথবা অন্য কারো সেন্সরশীপ মানতে রাজী নই। আমরা আমাদের বিবেচনা মতো খবর ছাপবো। আমি তাদেরকে আরো বললাম যে, রিপোর্টের ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ না করাই উচিৎ। তারা যদি সেটা করার চেষ্টা করে তাহলে সরকারী জবরদস্তির সাথে তার কোন তফাৎ নেই।
>
> এই কথাবার্তা চলতে থাকাকালে আমি তাদেরকে ভেতরে চা খাওয়ার জন্য যেতে বললাম। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ঢুকলো না, তবে তিরিশ চল্লিশ জন ঢুকলো। তাদের মধ্যে সকলে আবার চা খেলো না। কেউ কেউ চা খেলো এবং কথাবার্তার মধ্যে আবহাওয়া অনেকখানি শান্ত হয়ে এলো। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা।[২]

২১শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ অফিসের কর্মচারীরা ধর্মঘটের চিন্তাভাবনা শুরু করেন কারণ তাদের সন্দেহ ছিলো সে সংবাদে আসল ঘটনার কোন রিপোর্টিং হবে না। কেউ কেউ সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যও চাপ সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে কাজী মহম্মদ ইদরিস বলেন,

> সন্ধ্যার পর আমি সংবাদ অফিসে গিয়ে দেখলাম সেখানে খায়রুল কবীর, জহুর হোসেন প্রভৃতি রয়েছে। আমি তাদের তৎক্ষণাৎ কাগজ বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে বললাম। তারা তাতে সম্মত না হওয়ায় আমি অনেকক্ষণ দারুণভাবে চেঁচামেচি করতে লাগলাম। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত তাতে রাজী হলো না। আমি সে সময় সংবাদের সাথে জড়িত ছিলাম কিন্তু এর পর কয়েকদিন আর সংবাদ অফিসে যাই নি। শুধু তাই নয়, এর পর সংবাদের সাথে আমার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হলো।[৩]

নূরুল আমীনের বাসা থেকে সংবাদ অফিসে ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে খায়রুল কবীর বলেন,

> সংবাদ অফিসে এই খোন্দকার গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রভৃতিরও ধারণা ছিলো যে, আমি মুসলিম লীগ থেকে ইতিমধ্যে কোন নির্দেশ পেয়েছি। তারা বললো আমি যদি মুসলিম লীগের কথামতো চলি তাহলে কাগজ আর বের করতে দেওয়া হবে না। তারাও আশঙ্কা করছিলো যে আমি সত্য খবর ছাপতে রাজী হবো না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করায় তারা আর ধর্মঘট করেনি।[৪]

খায়রুল কবীর এইভাবে অন্যদেরকে "আশ্বস্ত করা" সত্ত্বেও ২২শে ফেব্রুয়ারী সংবাদে যে সব খবর ছাপা হয় এবং যেভাবে ছাপা হয় সেগুলি ছিলো অনেকাংশে সরকারেরই পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদে সেদিন ধর্মঘট না হওয়ার কারণ ছিলো না। এ বিষয়ে জহুর হোসেন চৌধুরী বলেন,

www.pathagar.com

> ২১শে তারিখে রাত্রে সংবাদ অফিসে স্ট্রাইক করার কথা উঠেছিলো। অনেকেই স্ট্রাইক করার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু খায়রুল কবীর তাদের সাথে মোটামুটি একটা সমঝোতায় এলেন এই বলে যে, 'সংবাদে' খবরটা এমনভাবে ছাপা হবে যাতে করে ছাত্রদেরকে বা বাংলা ভাষাকে কোন রকম আক্রমণ করা না হয়। যাঁরা স্ট্রাইকের কথা চিন্তা করছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে বললেন যে স্ট্রাইক হলে কাগজ থেকে প্রগতিশীল কর্মচারীরা বহিস্কৃত হবেন এবং তার ফল আরও খারাপ হবে। কাজেই কাগজের মধ্যে থেকে তাকে যতটা সম্ভব সংযত করা দরকার। শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক না করার সিদ্ধান্ত হয়।[৫]

প্রগতিশীল সাংবাদিক ও কর্মচারীদের চাকুরী যাওয়ার কথা বিবেচনা করেই যে শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত সেদিন বাতিল করা হয় সে বিষয়ে সৈয়দ নুরুদ্দীনের বক্তব্য থেকে আরও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি বলেন,

> আমি সেই সময় 'সংবাদের' বার্তা সম্পাদক ছিলাম। সমস্ত রিপোর্টারকে আমি সঠিক খবর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। 'সংবাদ' অফিসে সেই সময়ে প্রায় সকলে ধর্মঘট করার কথা বলছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে তখন জহুর হোসেন চৌধুরী, খায়রুল কবীর, কাজী ইদ্রিস, খোন্দকার গোলাম মোস্তফা এবং তসদ্দুক আহমদও উপস্থিত ছিলেন। তসদ্দুক আহমদ এবং খোন্দকার মোস্তফা বললেন যে, ধর্মঘট করলে জনসাধারণ কোন খবর পাবে না, কাজেই সত্য ঘটনার রিপোর্ট দিয়ে কাগজ বের করা উচিৎ।

এরপর যখন রিপোর্ট তৈরী করে প্রেসে দেওয়ার সময় হলো তখন খায়রুল কবীর রিপোর্টের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করতে চাইলেন। তখন আমি বললাম যে, সেইভাবে যদি রিপোর্ট বের হয় তাহলে ধর্মঘট না করার কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ধর্মঘট করা উচিৎ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট আর সম্ভব হলো না। কারণ অনেকে বললেন যে, সংবাদে যে সব প্রগতিশীল কর্মীরা চাকরি করছেন সে অবস্থায় ধর্মঘট করলে তাঁদের সকলেরই চাকরি যাবে। সেটা সব দিক থেকে অধিকতর ক্ষতিকর।[৬]

কাজেই শেষ পর্যন্ত 'সংবাদ' সম্পাদক খায়রুল কবীর যে সব পরিবর্তন রিপোর্টের মধ্যে করতে চেয়েছিলেন সে পরিবর্তন তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং 'সংবাদে' কর্মরত প্রগতিশীল কর্মীরা সত্য খবর প্রকাশের পরিবর্তে মিথ্যা খবর প্রকাশকে নিজেদের চাকরি যাওয়া থেকে কম ক্ষতিকর বিবেচনা করে সেদিন ধর্মঘটে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে বিরত রেখেছিলেন।

২২শে তারিখে এইভাবে মিথ্যা খবর দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে সেদিন এই পত্রিকাটি 'মর্নিং নিউজ' এর মতই জনগণের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলো। সংবাদ কর্তৃক পরিবেশিত খবরের প্রথম প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জহুর হোসেন চৌধুরী বলেন,

www.pathagar.com

বাইশ তারিখে সকালে কাগজ বের হওয়ার পর এক কপি বাইরের দেয়ালে রোজকার মতো টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারপর আমি, খায়রুল কবীর, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রভৃতি যখন অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছি তখন বংশাল এলাকার কিছু লোকজন আমাদেরকে 'সংবাদ' এর খবর ছাপার জন্যে খুব গালাগালি করতে লাগলো। তারা শুধু বলতে থাকলো, 'গলায় দড়ি কলসী জোটে না' ইত্যাদি। আমরা কোন রকমে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বের হয়ে আসি।[৭]

এ সম্পর্কে সৈয়দ নুরুদ্দীন বলেন,

খুব ভোরে কাগজ বের হওয়ার পরই বংশাল অঞ্চলের বেশ কিছু লোকে আমাদেরকে ঘেরাও করে। এদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলো যারা সংবাদ অফিস থেকে নিয়মিত টাকা পেতো সংবাদ অফিস পাহারা দেওয়ার জন্য। তারা আমাকে, খায়রুল কবীরকে এবং জহুর হোসেন চৌধুরীকে ঘেরাও করে গালাগালি দিতে থাকে। তাদেরকে আমরা বলি যে, আমাদের দোষ নাই। আমরা শুধু 'সংবাদে' চাকরি করি মাত্র। কিন্তু তারা সে কথায় বিশেষ কান না দিয়ে আমাদেরকে বলে, 'চাকরি করতে লজ্জা করে না, এমন চাকরি ছেড়ে দিতে পারো না' ইত্যাদি। বহু কষ্টে তাদের হাত থেকে আমরা রেহাই পাই।[৮]

'সংবাদ' সম্পাদক খায়রুল কবীর সেদিনকার এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, ২২শে তারিখে ভোরের দিকে আমরা যখন সংবাদ অফিস থেকে বের হচ্ছি তখন কিছু সংখ্যক লোকে আমাকে, জহুরকে এবং নুরুদ্দীনকে গালাগালি দিতে শুরু করে। তার কারণ অন্যান্য কাগজের মতো আমরা ব্যানার হেড লাইন দিয়ে খবর প্রকাশ করি নি। আমাদের খবরের কোন emotion অথবা Political angle ছিলো না।

এ জন্য লোকে আমাদেরকে গালাগালি করছিলো। তবে একথা ঠিক যে, মুসলিম লীগকে বাঁচিয়ে আমরা কোন খবর দিই নি, অথবা কোন মন্তব্য করি নি।[৯]

এইভাবে খায়রুল কবীর সেদিনকার 'সংবাদে' প্রকাশিত খবরের একটা কৈফিয়ৎ দিলেও আসলে তিনি যে রিপোর্টারদের প্রদত্ত খবরের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন করছিলেন সেটা সৈয়দ নুরুদ্দীনের বক্তব্য থেকে ভালভাবেই বোঝা যায়। তাছাড়া 'সংবাদ' কর্তৃপক্ষের টাকা-খাওয়া অফিস পাহারাদাররা পর্যন্ত পত্রিকার তিনজন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করতে পর্যন্ত যখন দ্বিধাবোধ করে নি তখন 'সংবাদের' দ্বারা পরিবেশিত খবরকে কোন দিক থেকে 'নিরীহ' বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, এইভাবে উপরোক্ত তিনজন বংশাল এলাকার লোকদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এক বিরাট জনতা 'সংবাদ' অফিস জ্বালিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির অফিস আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।★

★ ২২ ফেব্রুয়ারী 'সংবাদ' পত্রিকার কোন কপি না পাওয়ার জন্য ঠিক কি ধরনের খবর সেদিন ঐ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিলো সেটা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না–ব.উ.

www.pathagar.com

পত্রিকার খবর পরিবেশন ছাড়াও অন্যভাবে সংবাদের কর্মচারীরা নূরুল আমীনকে যে সহায়তা প্রদান করতে চেষ্টা করেছিলেন তার একটি বিবরণ খায়রুল কবীরের নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে ভালভাবে বোঝা যাবে,

> ২১শে তারিখ রাত্রিতেই খোন্দকার গোলাম মোস্তফার মাধ্যমে জন পাঁচেক নেতৃস্থানীয় ছাত্র বর্ধমান হাউসে নূরুল আমীনের সাথে সাক্ষাৎ করে। এ ছাত্রদের নাম খোন্দকার গোলাম মোস্তফার কাছে পাওয়া যাবে। এই সাক্ষাৎ খুবই গোপনে ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। নূরুল আমীনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এই ছাত্রেরা খুবই Considerate ছিলো। তারাও নূরুল আমীনকে বললো তার হাসপাতালে যাওয়া উচিৎ, বাংলা ভাষার সমর্থনে বিবৃতি দেওয়া উচিৎ ইত্যাদি।
>
> ছাত্রেরা চলে যাওয়ার পর আমরা আবার নূরুল আমীনের সাথে এ নিয়ে আলাপ করলাম। তিনি কিছুটা সম্মত হলেন, কিন্তু অন্যান্যেরা আপত্তি করলেন। এ সময়ে অবশ্য বাহার সাহেব এবং মুফিজউদ্দীন সাহেব নূরুল আমীন সাহেবকে হাসপাতালে যাওয়া ইত্যাদি করতে বলেছিলেন। অর্থাৎ আমাদেরকে সমর্থন করেছিলেন।
>
> কিন্তু এ সময় কথা হলো নিরাপত্তা সম্পর্কে দায়িত্ব কে নেবে। আমি বললাম Security Police রাই সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এ কথার পর Security Police এর কাছে এ ব্যাপারে Advice চাওয়া হলো। তারা কিন্তু এ দায়িত্ব নিতে একেবারেই সম্মত হলো না এবং ভয়ানকভাবে নিষেধ করলো। আমি, নুরুদ্দীন, মোস্তফা প্রভৃতি এরপর অতখানি দায়িত্ব ঘাড়ে করে নূরুল আমীন সাহেবকে হাসপাতালে পাঠানো ইত্যাদি করতে পারলাম না। নূরুল আমীন সাহেব এই সময় নিজের কোন মত জোর করে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তিনি শুধু এধার ওধার করছিলেন।[১০]

১০. কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার

একুশে ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণের পর ঐ দিনই পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি 'অত্যাচারী নূরুল আমীন সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা পূর্ববঙ্গব্যাপী তুমুল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন' শীর্ষক একটি সাইক্লোস্টাইল করা ইশতেহার প্রচার করেন। এই ইশতেহারটিতে বলা হয়,

> ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে ঢুকিয়া বার বার গুলি টিয়ার গ্যাস ও বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া জুলুমবাজ নূরুল আমীন সরকার ভাষা আন্দোলনের ১৪ জন দেশপ্রেমিক কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। শহীদদের খুনে আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন।
>
> নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন তাঁহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদের প্রিয় শহীদদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নূরুল আমীন সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের জবাব দিবার জন্য আগাইয়া আসুন।

www.pathagar.com

লীগ সরকার জনগণের কোন সমস্যাই সমাধান করে নাই এবং তাহাদের জীবনের সঙ্কটকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে নূরুল আমীন সরকার রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চায়। এই জুলুমবাজ সরকারের অবসান ছাড়া জনগণের বাঁচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নাই।

এরপর জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইশতেহারটিতে বলা হয়, দলমত নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণ একই সঙ্গে আওয়াজ তুলুন :

০ নাজিম নূরুল আমীন সরকার গদী ছাড়ো

০ অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই

০ হত্যাকারীর শাস্তি চাই, বেসরকারী তদন্ত কমিশন চাই, হত ও আহতদের জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই

০ অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই,

০ নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা ও সমস্ত দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই

জুলুমবাজ লীগ সরকারের অবসানের দাবীতে, হত্যাকারীর শাস্তির দাবীতে, নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট সভা শোভাযাত্রা করিয়া প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। শহীদদের অসমাপ্ত আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য শহীদদের নামে শপথ লউন।★

১১. ঢাকার বাইরে ২১শে ফেব্রুয়ারী

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলার সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট, জনসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন স্থানে হরতাল পালিত হয় এবং সে কারণে দোকান-পাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

নারায়ণগঞ্জে ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে হরতাল পালিত হয়। সমস্ত দিন দোকান-পাট, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সকল স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে এবং ছাত্রেরা মিছিল সহকারে বিভিন্ন রাস্তা শ্লোগান দিতে দিতে প্রদক্ষিণ করে। এরপর বৈকাল বেলা টানবাজার ময়দানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা প্রদান করেন।[১]

ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি চালনার সংবাদ নারায়ণগঞ্জে পৌঁছালে ছাত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গুলি চালনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বাস ও ট্যাক্সি চলাচল অব্যাহত থাকলেও গুলিবর্ষণের পর সন্ধ্যার দিকে এই রুটে বাস ও ট্যাক্সি

★ মূল সাইক্লোস্টাইল কপি থেকে গৃহীত। –ব.উ.

www.pathagar.com

ধর্মঘট হয়।[২]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের কর্মসূচী অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে এবং আরবী হরফে বাংলা লেখা প্রবর্তনের প্রচেষ্টার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সমস্ত দোকানপাট, কারখানা, সরকারী অফিস, সিনেমা হল ও স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। ছাত্র জনসাধারণ মিছিল সহকারে লালদীঘি ময়দানে সমবেত হন এবং মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে সেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। সভায় ৪০ হাজারেরও উপর লোক সমাগম হয়। মফস্বল স্কুলের ছাত্ররাও ধর্মঘট পালন করেন।[৩]

কুমিল্লা শহরেও ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবীতে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। এই উপলক্ষে সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। ছাত্র-ছাত্রীগণ মিছিল করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। এই মিছিল নুনাবাদ মোহাজের কলোনীর পাশ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় কলোনীর একদল উর্দুভাষী লোক লাঠি, ছোরা ইত্যাদি দ্বারা মিছিলকারীদের উপর আক্রমণ করেন। এর ফলে ১৫ জন ছাত্র আহত হন।[৪]

২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে রেডিও পাকিস্তান থেকে যে সংবাদ ঘোষিত হয় তাতে বলা হয় যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করে এবং তার ফলে ১ জন ছাত্র নিহত ও ৪ জন আহত হয়। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিলেট শহরে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে পথচারীরা বিস্তারিত খবরের জন্য রেডিওর চারিদিকে ভীড় করতে থাকেন।[৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে পূর্ব বাঙলার প্রায় সর্বত্রই ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও জনসাধারণের সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু শহরে ছাত্র ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট এবং যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকে। সন্ধ্যার পর যখন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার সংবাদ প্রচারিত হয় তখন ছাত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে সর্বত্রই তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী ব্যাপক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ : ২২শে ফেব্রুয়ারী

১. 'দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদকীয়

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খানের মালিকানাধীন আধা-সরকারী দৈনিক পত্রিকা আজাদ ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের উপর গুলি চালনার উপর ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'তদন্ত চাই' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়,

> গতকল্য ঢাকার বুকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের নিকটে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা যেমন মর্মন্তুদ তেমনি অবাঞ্ছিত। আইন অমান্য, নিয়মভঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এই সঙ্গে একথাও সত্য যে, আইন অমান্য হওয়ার মত ক্ষেত্র সৃষ্টি করাও কোন গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত নয়।
>
> বিগত দুই দিনের ঘটনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীর সমর্থনে ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রায় এক পক্ষ পূর্বে ধর্মঘট পালন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল। গত পরশু তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া শোভাযাত্রা ও সভাসমিতি বন্ধ করিয়া দেন। গতকাল এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র বিক্ষোভ হইয়াছে, টিয়ার গ্যাস ও গুলি চলিয়াছে, কতকগুলি হতাহতও হইয়াছে।
>
> ১৪৪ ধারা জারী করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছিল কিনা, এই প্রশ্নই সকলের আগে মনে হয়। কয়েকদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দীন যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন ঢাকার স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়াছিল; তখন শহরে শান্তিভঙ্গ হয় নাই। গতকল্য ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা হইলে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কতটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়াছিলেন, বর্তমান মন্ত্রীসভা দেশবাসীকে তাহা জানাইতে বাধ্য বলিয়া আমরা মনে করি। গতকল্যকার ঘটনার মধ্যে গুলি চালাইয়া কতগুলি ছাত্রকে হতাহত করার ব্যাপার সবচাইতে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি নাই–দেশের জনসাধারণও আশা করে নাই। গুটিকতক বালক ও যুবক যদি নিয়মবিরোধী কার্য্য করিয়াই থাকে, এমনকি যদি তাহারা কর্তৃপক্ষকে উত্তেজনার কারণও দিয়া থাকে; তাহা হইলেও গুলি চালাইবার মত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। হতাহতদের অনেকের আহত স্থান সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নির্বিচারে গুলি চালান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। কেবল টিয়ার গ্যাস ছাড়িয়া জনতা ভঙ্গ করা কি সম্ভব ছিল না? দেহের উর্ধ্বাঙ্গে গুলি চালা-

www.pathagar.com

সুবিবেচনা সঙ্গত কিনা, অথবা উহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কিনা, তাহাই আজ আমরা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। উর্ধ্বাঙ্গে গুলি চালনার কথা দূরে থাক, মোটেই গুলি চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

এরপর গুলি চালনার উপর তদন্ত দাবী করে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়,

সমস্ত অথবা বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, একটা নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ও জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটির দ্বারা এই ঘটনার বিশদ ও প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। হাইকোর্টের জজ এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের নাগরিকগণের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই তদন্ত দাবী করিতেছি। তদন্তকালে প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলির বিচার করা আবশ্যক–

(১) ১৪৪ ধারা জারী করার প্রয়োজন ছিল কিনা?

(২) বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ এলাকার মধ্যে পুলিশের আক্রমণ চলিয়াছিল কি?

(৩) গুলি চালাইবার মত অবস্থা ঘটিয়াছিল কি?

বাইশে ফেব্রুয়ারী 'দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা প্রদান করেন এবং সে প্রসঙ্গে গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের কাছে প্রেরিত একটি চিঠিতে তিনি বলেন,

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদে আমার সদস্য পদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমীন সরকারের আমিও একজন সমর্থক এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই দলের সহিত সংযুক্ত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।[১]

২. ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' এর ভূমিকা

২২শে ফেব্রুয়ারী 'মর্নিং নিউজ'-এ দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'পুলিশের গুলিবর্ষণ' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয়টিতে গুলিতে নিহত এবং আহত ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে এবং গুলিবর্ষণ ও ছাত্রদের আচরণ ইত্যাদির সঠিকতা নিরূপণ করা কর্তব্য একথা বলেই এই সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয়টি সমাপ্ত হয়। এরপর থাকে 'আশার চিত্র' নামে বাজেটের উপর একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়।

'মর্নিং নিউজ' তাদের ২২ তারিখের সংখ্যায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ও সমগ্র ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারকে ভারতের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং হিন্দুদের দ্বারা সংগঠিত ব্যাপার হিসেবে উপস্থিত করে সব কিছুকে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র

www.pathagar.com

প্রদানের চেষ্টা করে।

২১শে তারিখের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি খবর পরিবেশন করতে গিয়ে 'মর্নিং নিউজ' বলে,

> বেলা প্রায় ১-৩০ মিনিটের সময় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম.এল.এ. বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসেন ৪৫ মিনিট পরে। ঠিক তারপরই চরমপন্থীরা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ছাত্রেরা ১০ জন ১০ জন করে বের হয়ে এসে গ্রেফতার হতে থাকে।

গুলি চালনার পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'হিন্দু এম.এল.এ.রা ছাত্রদেরকে সম্বোধন করলেন' এই শিরোনামে পত্রিকাটিতে বলা হয়, গুলিবর্ষণের ঠিক পরই মিঃ মনোরঞ্জন ধর, মিসেস নেলী সেনগুপ্তা ও গোবিন্দ লাল ব্যানার্জীসহ কয়েকজন হিন্দু পরিষদ সদস্য এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন মুসলমান বিধায়ক হোস্টেল প্রাঙ্গণে বসানো লাউড স্পীকার থেকে শক্ত এবং গরম গরম বক্তৃতা করেন।

দেশবিভাগের পর এই প্রথমবার কংগ্রেস দলের সদস্যেরা একটি গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন।

এ ছাড়া '৫ জন অ-পাকিস্তানী অ-মুসলমান গ্রেফতার' শীর্ষক অপর একটি রিপোর্ট 'মর্নিং নিউজ'-এ প্রকাশিত হয়। এ.পি.পি.র চট্টগ্রাম প্রতিনিধির বরাত দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রেরিত এই রিপোর্টটিতে বলা হয়,

> জানা গেছে যে আপত্তিকর লিফলেট বিলি করার সময় এখানে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা মুসলমানের ছদ্মবেশে অমুসলমান। এখানে তদন্তের ফলে জানা গেছে যে, কিছু অ-পাকিস্তানী অমুসলমান এবং লালদের একাংশ এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

২১শের গুলিবর্ষণের উপর মামুলী ধরনের সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় এবং উপরোক্ত সব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের জন্য সরকার সমর্থক ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' এর বিরুদ্ধে জনগণ ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এবং তার ফলে ২২শে তারিখে সকালের দিকেই 'মর্নিং নিউজ' এর প্রেস জনগণের দ্বারা ভস্মীভূত হয়।

৩. ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের গায়েবী জানাজা

২১শে ফেব্রুয়ারী যাঁরা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের লাশ পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। হাসপাতালে যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের লাশও পুলিশ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলেছিলো। এই শহীদদের প্রত্যেকেরই লাশ গোপনে কবর দেওয়া হয়েছিল। কাজেই স্বাভাবিকভাবে লাশসহ যেভাবে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সেভাবে তাঁদের

www.pathagar.com

জানাজা অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২১শে রাত্রের ছাত্র বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২শে সকালে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একুশের শহীদদের গায়েবী জানাজা★ অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল থেকেই সলিমুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক হল, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল থেকে ছাত্রেরা গায়েবী জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য মাইকে সকলের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। কিন্তু তবু জানাজা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা খুব অল্প থাকায় অনেকেই গায়েবী জানাজার সাফল্য সম্পর্কে আশঙ্কান্বিত হয়ে পড়েন। কিন্তু একটু পরই কিছু দূর থেকে শ্লোগানের আওয়াজ শোনা গেলো এবং দেখা গেলো যে, সেক্রেটারীয়েটের দিক থেকে একটি বড়ো মিছিল মেডিকেল হোস্টেলের দিকে এগিয়ে আসছে। পূর্বেই মাইকযোগে আজিমপুর ও পলাশী ব্যারাকের বাসিন্দাদেরকে (যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সরকারী কর্মচারী) জানাজার খবর জানানো হয়েছিলো এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের সব ধরনের হুমকী অগ্রাহ্য করে সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীরা ধর্মঘট করে সেক্রেটারীয়েটের প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠান করে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা সেই সঙ্গে গায়েবী জানাজায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন এবং মিছিল করে বাইরে আসেন। এই সেক্রেটারীয়েট কর্মচারীদের অনেকেই তখন ছিলেন আইনের ছাত্র। ধর্মঘট ও মিছিল সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁরা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[১]

জানাজার নামাজে অংশগ্রহণের জন্য যে হাজার হাজার মানুষ সেদিন মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে জানাজার নামাজে ইমামতির জন্য নির্বাচন করা হয়।[২] তিনি নামাজ পরিচালনার পর এক দীর্ঘ ও জোরালো মোনাজাত করেন এবং সে প্রসঙ্গে বলেন,

> হে আল্লাহ, আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।[৩]

জানাজার নামাজের পর একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের যুগ্ম-সম্পাদক মহম্মদ এমাদুল্লাহ। সভাপতির ভাষণে তিনি দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণের পূর্বে একমাত্র অলি আহাদই এই সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "নুরুল আমীন সরকারের হত্যার জবাব দিব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মারফত, মাতৃভাষা বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দ্বারা।"[৪]

★ মৃত্যুর পর লাশের অবর্তমানে মৃতের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠান– ব.উ.

www.pathagar.com

২২শে ফেব্রুয়ারী গায়েবী জানাজায় ফজলুল হক এবং আবুল হাশিম উপস্থিত ছিলেন। তবে নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে মওলানা ভাসানীসহ অনেকেই মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সেদিন উপস্থিত হতে পারেন নি।★

মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ, পার্শ্ববর্তী রাস্তা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের কাছাকাছি পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ জানাজায় শরীক হন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী এবং স্থানীয় জনসাধারণই ছিলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৫] তাঁদের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা

★ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫ নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৬৬) অলি আহাদ বলেন, "শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক গায়েবী জানাজায় যোগ দেন নাই এবং জানাজার পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত মিছিলের কোন পর্যায়েই তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই।... অন্য কোন নেতারই সাক্ষাত সেদিন মেলে নাই।" ফজলুল হক সেদিন মিছিলে অংশগ্রহণ না করলেও জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। ২৩/২/৫২ তারিখের দৈনিক আজাদে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া আমি নিজেও তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। এ ছাড়া ১৮.১২.১৯৬৭ তারিখে সাক্ষাৎকারের সময় অলি আহাদ আমাকে বলেন, "ফজলুল হক জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য এসেছিলেন কিন্তু তাঁকে বলতে দেওয়া হয় নি। তিনি ৫০০ টাকা চাঁদা দিতে চাইলে আমি খুব রূঢ়ভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করি কারণ আমি মনে করেছিলাম যে তিনি সেভাবে টাকা দিয়ে আন্দোলনকে ঘুষের মাধ্যমে নিজের স্বার্থে বিপথে চালনা করতে চেয়েছিলেন।' কোন তারিখের উল্লেখ না করে ফজলুল হকের চাঁদা দেওয়ার এই ব্যাপারটি সম্পর্কে উপরোক্ত গ্রন্থে অলি আহাদ বলেন, 'এই সময় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া ৫০০ (পাঁচ শত টাকা) চাঁদা দিতে চাহেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে খবর পাঠান। সর্বজনমান্য শেরে বাংলা উপরোল্লিখিত নাগরিক কমিটির (citizens committee) অন্যতম নেতা এবং তিনি তখনও ঢাকা হাইকোর্টের নূরুল আমীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সরকারী বেতনভুক্ত এডভোকেট জেনারেল। তাই তাঁহার সহিত আন্দোলনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দেখা না করাই শ্রেয় মনে করি।' (পৃঃ ১৭১-১৭২) আসলে এই চাঁদা দিতে চাওয়ার ব্যাপারটা গায়েবী জানাজার সময়েই ঘটে এবং অতি বিপ্লবীপনার কারণে আন্দোলনের সঙ্কটময় মুহূর্তে ইত্যাদির কথা বললেও অলি আহাদ সে সময় সাহসের সঙ্গে অনেক সঠিক কাজ করা সত্ত্বেও কিভাবে পার্টি নির্দেশ পর্যন্ত অমান্য করে আন্দোলনকে সংকীর্ণ পথে চালনা করার জন্য বেপরোয়া ছিলেন এই ঘটনা তারই এক উদাহরণ। তাছাড়া 'অন্য কোন নেতারই সাক্ষাৎ সেদিন মেলে নি' একথা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

গায়েবী জানাজায় অন্যদের মধ্যে আবুল হাশিমও উপস্থিত ছিলেন। চোখে দেখতে অসমর্থ হওয়ায় এবং সেদিন পূর্ণ ধর্মঘট থাকায় তিনি আমার সাইকেলের রডে চড়ে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে মওলানা ভাসানী সেদিন ঢাকার বাইরে থাকায় জানাজায় উপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য জানাজায় অনুপস্থিত মুহম্মদ সুলতান এবং গাজীউল হক বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'একুশের সংকলন ৮০ স্মৃতিচারণ' নামক সংকলনের যথাক্রমে ৮৭ ও ১৫১ পৃষ্ঠায় ভাসানীর উপস্থিতি এবং তাঁর দ্বারা জানাজা পরিচালনার কথা ভুলবশত উল্লেখ করেছেন। –ব.উ.

www.pathagar.com

ছিলো অনেক কম। সেই সমাবেশে মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিলো তিরিশ হাজারের মতো।[৬★]

৪. মিছিল

গায়েবী জানাজা শেষ হওয়ার পর সমবেত হাজার হাজার ছাত্র এবং শহরের শ্রমিক, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী ও সর্বস্তরের জনগণ এক বিশাল মিছিল সহকারে হাইকোর্টের পথ ধরে নবাবপুর রোডের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'উর্দু বাংলার বিরোধ নাই', 'খুনী নূরুল আমীনের বিচার চাই', 'খুনের বদলা খুন চাই, ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলটি হাইকোর্টের গেটের সামনে উপস্থিত হলে সেখানে বিরাট সংখ্যক পুলিশের এক বাহিনী সেক্রেটারীয়েটের পথ রোধ করে মিছিলকে বাধা দিতে উদ্যত হয়। মিছিলটি সেক্রেটারীয়েটের পাশ দিয়ে আবদুল গণি রোড ধরে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু মিছিল গণি রোডের দিকে মোড় নিতে শুরু করা মাত্র পুলিশ মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রায় একই সঙ্গে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ শুরু করে। এর ফলে হাজার হাজার ছাত্র জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। তাঁরা অনেকেই ফজলুল হক হল, কার্জন হল, ঢাকা হল, ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ও হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১]

সেক্রেটারীয়েটের বিপুল অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী এই দিন ধর্মঘট করে বাইরে আসেন। তাছাড়া হাইকোর্টের কর্মচারীরাও ধর্মঘট ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সারা শহরে দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, যানবাহন ধর্মঘট হয় এবং এসবের ফলে এই সময় হাইকোর্টের সামনে অবস্থিত মিছিলের আকার ক্রমশ স্ফীত হয়ে ওঠে।[২] মিছিলটি এ সময় পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং অধিকাংশ মিছিলকারী তাঁদের উপর প্রাথমিক আক্রমণের পর আবার সংগঠিত হতে শুরু করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে থাকেন। মিছিল এরপর স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের গতিতেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে এবং তার উপর কারও কোন নিয়ন্ত্রণ আর থাকে না।[৩] এই অবস্থায় হাইকোর্টের সামনে

★ অনেকের সেদিনকার এই সংখ্যা এক লক্ষ, দুই লক্ষ, কয়েক লক্ষ হিসেবে উল্লেখ করলেও উপস্থিতি তিরিশ হাজারের মতোই ছিলো। বহু লোক একত্রিত হয়েছিলেন তাই সংখ্যা নির্দেশ করতে গিয়ে এ ধরনের কথা বলা স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। এ দিক থেকে তৎকালীন দৈনিক সংবাদপত্র রিপোর্টই নিঃসন্দেহে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। ২৩.২.৫২ তারিখের বিশেষ সংখ্যা নওবেলালে এই সংখ্যাকে ৫ হাজার বলে ভুলবশতঃ উল্লেখ করা হয়।–ব.উ.

www.pathagar.com

মিছিলের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে।★

এ সময় কার্জন হল, ঢাকা হল ও ফজলুল হক হলের ভিতর এবং কার্জন হলের সামনের রাস্তায় যে হাজার হাজার মিছিলকারী জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা পিছন দিকে আবার সংগঠিত হয়ে নাজিমুদ্দীন রোড ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। মূল মিছিলের অধিকাংশই এই মিছিলের মধ্যে থাকলেও অন্যেরা ফজলুল হক হলের সামনের রাস্তা দিয়ে নবাবপুর রোডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।[৪]

নাজিমুদ্দীন রোডের মিছিল ক্রমশ চকবাজার, মোগলটুলী, ইসলামপুর ও পাটুয়াটুলী হয়ে সদরঘাটে উপস্থিত হয়। এই সময় সারা পথের পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ীতে ও ঘরের ছাদে মহিলা, বৃদ্ধ, অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়ে সহ নানান ধরনের লোক মিছিল দেখতে থাকেন এবং হাত নেড়ে ও অনেক রকম ধ্বনি তুলে মিছিলকে উৎসাহ এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে থাকেন।

মিছিলটি সদরঘাট থেকে ভিক্টোরিয়া (বর্তমান বাহাদুরশাহ) পার্ক-এর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় পগোজ স্কুলের সামনে ও জগন্নাথ কলেজের পূর্ব দিকে পুলিশ বাধা প্রদান করে। এই সময় পুলিশ মিছিলকারীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করায় মিছিলটি দ্বিতীয় বারের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সামনের দিকে বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সমগ্র এলাকার উপর আগে থেকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখায় এরপর মিছিল আগের মতো আর সংগঠিত হতে না পারায় মিছিলকারীরা ছোট ছোট জোট বেঁধে নবাবপুর রোডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।[৫]

অলি আহাদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীরাও বিভিন্ন পথ ধরে মেডিকেল কলেজের দিকে ফিরে যান।[৬]

৫. 'মর্নিং নিউজ' প্রেসে অগ্নিসংযোগ

সদরঘাটে পুলিশ কর্তৃক মিছিলকে এতো দৃঢ়ভাবে বাধা দেওয়ার কারণ অল্প কিছুক্ষণ পূর্বেই ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' এর প্রেস জনগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও ভস্মীভূত হওয়া। সে সময় জুবিলী প্রেস নামক একটি প্রেসে 'মর্নিং নিউজ' ছাপা হতো। প্রেসটি ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছাকাছি তৎকালীন

★ অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি ৪৫-৭৫' নামক বইয়ে (পৃঃ ১৬৬) বলেন যে হাইকোর্টের সামনে ঐ দিন কোন গুলি হয় নাই। কিন্তু দৈনিক আজাদ (২৩.২.৫২), সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (২৪.২.৫২) ইত্যাদি পত্রিকার রিপোর্টে এবং এছাড়া অন্য অনেকেই যেমন জহুর হোসেন চৌধুরী (সাক্ষাৎকার ২০.৬.১৯৬৮), খোন্দকার গোলাম মোস্তফা (যেন ভুলে না যাই, একুশের ফেব্রুয়ারী, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত সংকলন), কবিরউদ্দীন আহমদ (একুশে ফেব্রুয়ারী, সংকলন) এই সময় গুলিবর্ষণের কথা বলেন। –ব.উ.

www.pathagar.com

লয়েডস ব্যাংকের ঢাকা শাখার পার্শ্ববর্তী জনসন রোডস্থ একটি বাড়ীতে অবস্থিত ছিলো। ২২শে তারিখের 'মর্নিং নিউজ' এ ২১শে তারিখের গুলিবর্ষণ ইত্যাদির উপর নানা ধরনের মিথ্যা ছাপায় জনগণ পত্রিকাটির উপর দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং জুবিলী প্রেসে অগ্নিসংযোগ করেন। দমকল বাহিনী প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।[১]

জুবিলী প্রেস ভস্মীভূত হওয়ার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারী মনু প্রেস ঢাকা, নামক একটি প্রেস থেকে একপাতা অর্থাৎ দুই পৃষ্ঠা 'মর্নিং নিউজ' প্রকাশিত হয়। তাতে Morning News Cannot Die শীর্ষক দীর্ঘ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। প্রেস ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে পত্রিকাটিতে নিম্নলিখিত রিপোর্ট ছাপা হয়,

> শুক্রবার প্রায় একশত দুষ্কৃতিকারী ও স্বার্থপ্রণোদিত গোষ্ঠীর অর্থপ্রাপ্ত এজেন্টরা জোরপূর্বক প্রেসের মধ্যে প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ এবং সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যাওয়ার ফলে মর্নিং নিউজ এর সম্পাদকীয় অফিস ও জুবিলী প্রেস, ঢাকা, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।
>
> আধ ডজনেরও বেশী লাইনো টাইপ মেশিন, ছাপার যন্ত্রপাতি, কয়েক হাজার পাউন্ড টাইপ, সীসা, আসবাবপত্র, রেকর্ডপত্র, টাইপ রাইটার ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং এর পাঁচ লক্ষ টাকার মতো জিনিসপত্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়।
>
> বিরাট এক জনতা অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বাইরে জনসন রোডের উপর জমায়েত হয়েছিলো যাদের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী ও বহু সংখ্যক সাদা ধুতী পরিহিত হিন্দু মিশে গিয়ে তাদেরকেও আরও দুষ্কৃতি করার জন্য উত্তেজিত করছিলো। এর পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশ উপস্থিত হয়ে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ করার পর জনতা নবাবপুর রোডের দিকে চলে যায়।...
>
> কাগজের হকাররা সকালের দিকেই আক্রান্ত হয় এবং বহু বান্ডিল খবরের কাগজ তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিনষ্ট করা হয়। একদল লোক জুবিলী প্রেসে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে না দিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর দাঁড়াবে বলে মুদ্রাকরকে শাসাতে থাকে এবং ছুরি দেখিয়ে তাঁর পকেট থেকে নগদ টাকা ও কাগজপত্র নিয়ে নেয়।
>
> সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ থানা ও হেড কোয়ার্টারে টেলিফোন করা হলে তারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও কেউই হাজির হয় না। সকাল ৯টার সময়, এক ঘণ্টা পর, প্রায় একশত লোক, মর্নিং নিউজ এর দুই দিকের দুটি গলির প্রত্যেকটি দিয়ে পঞ্চাশ জন করে, পেট্রোল সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়। তারা অফিসে ঢুকে জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করে, টাইপ রাইটার ছুঁড়ে ফেলে, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ভাঙ্গে ও তার পর পেট্রোল ছড়িয়ে সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে আকুলভাবে পুলিশকে ডাকাডাকি সত্ত্বেও তাদের থেকে কোন জবাব আসে না।
>
> ফায়ার ব্রিগেড এলে জনতা তাকে অগ্নিকাণ্ডের জায়গায় যাওয়া থেকে বিরত রাখে এবং অনেক চেষ্টা করে যখন তারা সেখানে পৌছায় তখন যে পাইপের সাহায্যে তারা নদী থেকে পানি আনছিলো সেটা কয়েক জায়গায় কেটে ফেলা হয়।

www.pathagar.com

'মর্নিং নিউজ' অফিসও জুবিলী প্রেস জ্বালিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত পত্রিকাটির উপরোক্ত রিপোর্ট পকেট মারা, হিন্দুদের ঘোরাফেরা ইত্যাদি বাদ দিলে মোটামুটি সঠিকই ছিলো। সেদিন ছাত্রদের পরিবর্তে সাধারণ লোকরাই মর্নিং নিউজ এর প্রেস আক্রমণ ও তাতে পেট্রোলের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করে এবং ফায়ার ব্রিগেডের পাইপ কেটে দিয়ে অগ্নিনির্বাপিত করার কাজে জোরপূর্বক বাধা দেয়। এ সম্পর্কে বাস ও ট্যাক্সি মালিক এ্যাসোসিয়েশনের আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া বলেন,

> ২২ শে ফেব্রুয়ারী বংশাল এলাকার কিছু যুবক সকালের দিকে 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয়। তারা ঢাকার বাস মালিকদের স্টক থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে, হতে পারে আমারই স্টক থেকে।
>
> বাইরের কোন সংগঠিত প্রচেষ্টা ছাড়াই তারা স্বতস্ফূর্তভাবে এটা করেছিলো।[২]

২৩শে তারিখের 'মর্নিং নিউজ' এর একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, জুবিলী প্রেস আক্রমণ ও ভস্মীভূত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে জনতা 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' এ ঢোকার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যাংকের গেট তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়ে ম্যানেজার সেদিন ছুটি ঘোষণা করেন।★

৬. নবাবপুর রোডের অবস্থা ও সংবাদ অফিসের কাছে পুলিশের গুলিবর্ষণ

২২শে ফেব্রুয়ারী নবাবপুর রোডের অবস্থার উপর 'দৈনিক আজাদ'-এ নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়,

> সকাল হইতেই শহরের প্রধান রাস্তা নবাবপুরের উপর লোকের ভীড় জমিতে থাকে। মোড়ে জনসমাগম হয়। নওয়াবপুর রোডে যান চলাচলেও বাধা দেওয়া হয়। সাইকেল ও মোটর সাইকেলের চাকার হাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে দশটা সাড়ে দশটার সময় তথায় সামরিক যান ব্যতীত বেসামরিক যান চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়া যায়।
>
> এই রাস্তায় পুলিশের পরিবর্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাহারা অস্ত্রশস্ত্রসহ পায়ে হাঁটিয়া এবং ট্রাকে করিয়া রাস্তায় টহল দিতে থাকে। রথখোলার মোড়ে এক ট্রাক সশস্ত্র রক্ষীকে মোতায়েন করা হয়। এদিকে নওয়াবপুরের জনতা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা কাপ্তান বাজারের মোড়ে পৌছিলে ঐ স্থানে অপেক্ষারত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ১ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। প্রকাশ, ঐ গুলিবর্ষণের ফলে কেহ হতাহত হয় নাই।
>
> নওয়াবপুর রাস্তার উভয় দিকের সমস্ত দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। প্রতিটি

★ কার্জন হলের দিক থেকে যে মিছিলটি নাজিমুদ্দিন রোড ধরে অগ্রসর হয় সেই মিছিলে আমি নিজেও ছিলাম। সে সময় আমার সাথে সর্বক্ষণ ছিলেন দর্শন বিভাগে অধ্যয়নরত সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক নামে এক বন্ধু। আমরা সদরঘাট এলাকায় পৌছানোর পর মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়। জুবিলী প্রেসের ধ্বংসাবশেষ, ফায়ার ব্রিগেডের কাটা পাইপ আমরা দেখি এবং নবাবপুর রোড ধরে মেডিকেল কলেজের দিকে যখন ফিরি তার পূর্বেই 'সংবাদ' অফিসের সামনে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে-ব.উ.

www.pathagar.com

> বাড়ীর বারান্দায় ও পথিপার্শ্বে জনসাধারণকে শান্ত ও বিষাদপূর্ণ নেত্রে দাঁড়াইয়া রাস্তার হালচাল লক্ষ্য করিতে দেখা যায়। বেলা প্রায় এগারোটার সময় রথখোলা ও 'নিশাত' সিনেমা হলের মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চলতি সামরিক ট্রাক হইতে অপেক্ষমাণ নিরীহ পথচারীদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলি চালান হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ফলে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং দুইজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি বালককে বেয়নেট দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও প্রকাশ সামরিক ট্রাকে করিয়া তাহাদের লইয়া যাওয়া হয়। সকালের দিকে নওয়াবপুরের বিভিন্ন স্থানে সামরিক লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালায়।[১]

২২শে ফেব্রুয়ারী নূরুল আমীনের পত্রিকা 'সংবাদ' যেভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারীর খবর পরিবেশন করে তাতে সাধারণ লোকেরাও খুব বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বংশাল এলাকার লোকেরা সকাল থেকেই 'সংবাদ' অফিসের সামনে নানাভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন এবং 'সংবাদ' অফিস আক্রমণের চিন্তা করেন। কিন্তু সরকার সমর্থক এই পত্রিকা রক্ষা করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ সব ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এ জন্য সেখানে বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

হাইকোর্টের সামনে দ্বিধাবিভক্ত মিছিলটির যে অংশ নবাবপুরের দিকে এগিয়ে আসে তা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ একবার গুলি চালায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিছিলকারীরা কোনমতে নবাবপুর রোড ধরে সদরঘাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং নবাবপুর-বংশাল রোডের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হলে তাঁরা অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'সংবাদ' অফিস আক্রমণ করতে উদ্যত হন। এইভাবে 'সংবাদ' আক্রমণের প্রচেষ্টা অনেক জোরদার হয়। এই সময়েই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ নবাবপুর রোডস্থ খোশমহল রেস্তোরাঁর সামনে তাঁদের উপর গুলিবর্ষণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল আউয়াল ভূঁইয়া এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

> ২২শে সকালে আমি যখন খোশমহল রেস্তোরাঁয় ছিলাম তখন নবাবপুর রোড ধরে একটি মিছিল সদরঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। নিশাত সিনেমার কাছে বংশাল রোড-নবাবপুর রোড জংশনে পুলিশ তাদেরকে বাধা দিতে শুরু করে। অবশেষে লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ না করেই খোশমহল রেস্তোরাঁর সামনে পুলিশ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। সেখানেই একজনের মৃত্যু ঘটে এবং কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে।[২]

৭. ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও পুলিশী নির্যাতন

মেডিকেল কলেজ হোস্টেল থেকে যে মূল মিছিলটি বের হয় সেটি ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ২২শে ফেব্রুয়ারী অনেক খণ্ড খণ্ড মিছিল দেখা যায়। এই ধরনের একটি মিছিল দুপুরের দিকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি

www.pathagar.com

মওলানা আকরাম খানের পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ' এর অফিস আক্রমণ করে। এ বিষয়ে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঐ পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়,

> বেলা দুইটার দিকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা লালবাগের দিক হইতে আজাদ অফিসের সম্মুখ দিয়া মোছলেম হলের দিকে যাইবার সময় শোভাযাত্রাটির কিছু সংখ্যক লোক 'আজাদ' অফিসের কর্মচারীদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শাসাইতে থাকে। 'আজাদ' কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীগণ কর্তৃক ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তর নিক্ষেপকারীগণ বিক্ষোভ করিতে থাকে। অতঃপর শোভাযাত্রার কতিপয় ছাত্রকর্মীর হস্তক্ষেপের ফলে ও তাহাদের পরামর্শে বিক্ষোভকারীগণ ক্ষান্ত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। পলাশী লেবেল ক্রসিং এর নিকট পৌঁছিলে পুলিশ তাহাদের উপর লাঠিচার্জ করে।

'মর্নিং নিউজ' অথবা 'সংবাদ' এর মতো 'আজাদ' ২২শে ফেব্রুয়ারী কোন মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে নি। উপরন্তু আন্দোলনকে ভালোভাবে সমর্থনই করেছিলো। এ জন্য এই পত্রিকাটির উপর কোন পরিকল্পিত আক্রমণই কেউ করে নি। তবে মুসলিম লীগ সমর্থক আধা-সরকারী পত্রিকা হিসেবে এই পত্রিকাটি সাধারণত যে ভূমিকা পালন করতো তার ফলে 'আজাদ' এর উপর প্রগতিশীল কর্মী ও জনগণের একটা বিক্ষোভ বরাবরই ছিলো। এই বিক্ষোভেরই একটা বহিঃপ্রকাশ উপরোক্ত আক্রমণের মাধ্যমে ঘটে। কিন্তু সেই পর্যায়ে 'আজাদ' যেহেতু একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছিলো সেজন্য এই পত্রিকাটির পরিণতি 'মর্নিং নিউজ' এর মতো হয় নি অথবা তা 'সংবাদ' এর মতো আক্রান্ত হয় নি।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এলাকায় ২২শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে দিকের একটি মিছিল সম্পর্কে 'আজাদ' রিপোর্টে বলা হয়,

> অপরাহ্ণে মুসলিম হল হইতে এক বিরাট জনতা পরিষদ ভবনের দিকে নানা প্রকার ধ্বনি সহকারে শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হয়। তাহারা পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাদের উপর তীব্র লাঠিচার্জ করে। তাহারা তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে নূরুল আমীন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধেও পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। বিকালে মোছলেম হলের নিকটও লাঠিচার্জ হয়।[১]

বিকেলের দিকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মধ্যে বহু সংখ্যক ছাত্র জমায়েত হয় এবং সেখান থেকে মাইকযোগে অনেকেই একের পর এক বক্তৃতা করতে থাকেন। সেই অবস্থায় পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যে কামরাটিতে মাইক লাগানো ছিলো সেই কামরার ছাত্র আবুল হাশিমকে বেয়নেটের খোঁচার ভয় দেখিয়ে তাঁদের থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে যায়। এ ছাড়া ঐ কামরা থেকে আবুল হাশিমের কলম, ঘড়ি ও রেডিও সেটও তারা নিয়ে যায়।[২]

একুশে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেলা ১১টার পর প্রথম

www.pathagar.com

দলটি বের হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর অলি আহাদ যুবলীগের তৎকালীন দফতর সম্পাদক জগন্নাথ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আনিসুজ্জামানকে যুবলীগ অফিসের চাবি প্রদান করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিলো যে তিনি গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন। এ বিষয়ে আনিসুজ্জামান বলেন,

> প্রথম দল বেরিয়ে যাবার পর অলি আহাদ মধুর দোকানের সামনে আমাকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ অফিসের চাবি দিয়ে বলেন যে, যে কোন মুহূর্তে তাঁরা গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন। অফিসের দায়িত্ব আমার থাকবে। অবস্থা বুঝে অফিসের কাগজপত্র অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে এবং সকল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। যুবলীগের যুগ্ম-সম্পাদক ইমাদুল্লাকে বাইরে রাখার চেষ্টা করা হবে– তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমি যেন কাজ করি। এই দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে বলে আমি যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করি। আমি তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করেছিলাম।[৩]

এরপর ২২শে ফেব্রুয়ারী আনিসুজ্জামান ও ইমাদুল্লাহ যুবলীগ অফিস থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যান। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন,

> ২২শে বা ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে★ ইমাদুল্লাহ আর আমি যুবলীগ অফিস থেকে কিছু দরকারী কাগজপত্র আর টাইপ রাইটারটা আমাদের বাসায় (৮৭, বামাচরণ চক্রবর্তী রোড) নিয়ে আসি। পরে যুবলীগ অফিস পুলিশ সীল করে দেয়। কিন্তু ইউনিটগুলোর ঠিকানা আমাদের কাছে থাকায় আমরা কিছু চিঠিপত্র পাঠাতে সমর্থ হই। সেসব চিঠি ইমাদুল্লাহ সই করেন।[৪]

২২ তারিখ দিবাগত রাতে পুলিশ দ্বিতীয়বার যুবলীগ অফিস ঘেরাও করে খানাতল্লাশী করে। এ বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন,

> আজ রাত্রেও পুলিশ আমাদের বাসা ঘেরাও করে এবং প্রত্যেকটি কামরায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খানাতল্লাশী চালায়। আমি তাদের দৃষ্টি থেকে সরে থাকতে সমর্থ হই। রাত্রি প্রায় (৩-৩০. ৪টা)[৫]

৮. যানবাহন ধর্মঘট

২২শে ফেব্রুয়ারী সারা ঢাকায় সড়ক ও রেলপথে ধর্মঘট পালিত হয়। এ জন্য ঢাকা শহরে এই দিন বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা যাতায়াত বন্ধ থাকে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে রেলওয়ে কারখানা শ্রমিকসহ সকল রেল শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করেন। এ জন্য ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লাইনে দুপুর পর্যন্ত সকল ট্রেন বন্ধ থাকে।[১]

ঢাকায় এই দিন খুব ভোর থেকে মুহম্মদ সুলতান, কাজী আজিজুর রহমানসহ কয়েকজন যুবলীগ কর্মী লোকোশেডে গিয়ে রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করার ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। রেল শ্রমিকরা খুব সকাল

★ কাগজপত্র সরানোর কাজ ২২শে তারিখেই হয়ে থাকবে। কারণ ঐ তারিখেই দিবাগত রাত্রে পুলিশ জিনিসপত্রের সন্ধানে আবার খানাতল্লাশী করে। ব.উ

www.pathagar.com

থেকে পথে বের হয়ে আসেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় তাঁদের সাথে ঢাকা রেল স্টেশনের সামনে ও নাজিরাবাজার এলাকায় পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশ লাঠিচার্জ করে।[২] শ্রমিকদের মধ্যে তখন রেল শ্রমিকরাই ছিলেন সব থেকে সচেতন ও সংগঠিত।

৯. ২১শের গুলিবর্ষণ সম্পর্কে ভাইস চ্যান্সেলরের বিবৃতি ও আইনজীবীদের প্রস্তাব

'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার প্রতিনিধি ২১শের গুলিবর্ষণ সম্পর্কে ঐ দিনই এক সাক্ষাৎকারের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেনকে যে সব প্রশ্ন করেন তার জবাবে তিনি বলেন যে, পুলিশ কর্তৃক কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ সম্পর্কে ছাত্রেরা তাঁর কাছে অভিযোগ করার পর তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের কারণ জানতে চান। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান যে, ছাত্রেরা তাঁদের প্রতি ইট-পাটকেল ছোঁড়ায় এবং তাঁদের গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত করায় তাঁরা কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন। ভাইস চ্যান্সেলর অবশ্য বলেন যে, তিনি নিজে এবং তাঁর যে সব সহকর্মী শিক্ষক তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ছাত্রদের কোনরূপ অসংযত অথবা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরিচয় পান নি। তাছাড়া কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্রেরা কোন ইট-পাটকেল পুলিশের দিকে নিক্ষেপ করেছে বলে তাঁরা দেখেন নি অথবা শোনেন নি। তিনি বলেন যে, তাঁরা ছাত্রদের শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিত্যাগ করে যেতে বলেন এবং ছাত্ররা সেভাবেই যাচ্ছিলো। কাজেই তাদের উপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করার কোন প্রয়োজনই ছিলো না।[১]

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের পর ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এবং প্রতিষ্ঠানের সভায় এই পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[২]

২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা হাইকোর্ট বার-এসোসিয়েশনের এক জরুরী সভা ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় এই সভার নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়,

> গতকল্য (শুক্রবার) জনাব এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের এক জরুরী সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয় এই সভা পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করিতেছে।
>
> বিনা কারণে শহরে ১৪৪ ধারা জারী করায় এই সভা সরকারের নিন্দা করিয়া ও অবিলম্বে ইহার প্রত্যাহার দাবী করিয়াও প্রস্তাব গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

এই সভা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের অপসারণ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই সভা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের অপসারণ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই সভা নিহত ও আহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ ও গণপরিষদে এই প্রদেশের সদস্যদের নিকট বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানায়।[৩]

২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে আবদুল লতিফ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪] ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,

(ক) গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে পুলিশের অমানুষিক ও বর্বরোচিত গুলি বর্ষণ দ্বারা শত শত নিরস্ত্র ও নিরপরাধ ছাত্রকে হত্যা ও আহত করার তীব্র নিন্দা এই সভা করিতেছে।

(খ) এই সভা দাবী করিতেছে যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিটি এস,পি,ডি,আই,জি ও অন্যান্য কর্মচারীদের চাকরি হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিয়া বেসরকারী তদন্ত কমিটি দ্বারা ঘটনার তদন্ত করা হউক।

(গ) এই সভা ঢাকা শহরে বিনা কারণে ১৪৪ ধারা জারীর তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে উহার প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।

(ঘ) এই সভা অপদার্থ নূরুল আমীন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছে এবং বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে দাবী জানাইতেছে।

(ঙ) যাহারা পুলিশের গুলিতে শহীদ হইয়াছে এই সভা তাহাদের শোকার্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ঢাকা শহরের প্রত্যেক মসজিদে জুম্মার নামাজের পর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় হাজার হাজার মুসল্লী শরীক হন। এরপর প্রায় তিন চার হাজার মুসল্লী আজিমপুর হয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে জমায়েত হন। জুম্মার নামাজের পর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এক বিরাট জনতার উপস্থিতিতে কোরান তেলাওয়াতের পর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৫]

এই সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী উল্লেখ করে ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া ঐ দিন সকালের দিকে এক বিরাট মিছিলে শান্তিপূর্ণভাবে যোগদানকারী জনতার উপর পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক বেপরোয়া গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধেও এই সভায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

www.pathagar.com

শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সভায় বিভিন্ন বক্তা জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া আহতদের চিকিৎসার জন্য রক্তদানের আবেদনও জানানো হয়।

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজে সার্জেন জেনারেলের* সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই মর্মে সভায় সার্জেন জেনারেল ছাত্রদেরকে আশ্বাস প্রদান করেন। এরপর তিনি এবং মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর এ, কে, এম আবদুল ওয়াহেদ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য নূরুল আমীনের সাথে ঐ দিনই সাক্ষাৎ করেন।[৬]

২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকার লোকেরাও বহু সংখ্যায় মিছিল করে ঢাকাতে এসেছিলেন। এ বিষয়ে মহম্মদ তোয়াহা বলেন,

> বাইশ-তেইশ দুই দিন গ্রামের লোকেরাও মিছিল করে এসেছে। বাইশে-তেইশের ব্যাপক mass upsurge এর পর পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমরা এই সময় রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াই। কেউ ধরে না। মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে একজন বড়ো পুলিশ অফিসার শামসুল হককে বলেছিলেন, 'এখন আমরা কি বলবো। আপনারাই তো ক্ষমতায় এসে গেলেন। এরপর পার্টি থেকে instruction এলো স্ট্রাইট indefinite period এর জন্য চালানো যায় না। তৈরী নয় দেশ। কাজেই গুটানোর দরকার।[৭]

১০. সরকারী মহলের তৎপরতা

২২শে তারিখে খুব সকালে 'সংবাদ' সম্পাদক খায়রুল কবির এবং জহুর হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ নুরুদ্দীন 'সংবাদ' অফিস থেকে বের হয়ে পরের দিকে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের সরকারী বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে' যান। এ সম্পর্কে এবং ঐ দিন সকালে 'সংবাদ' অফিস আক্রমণ ও শহরের অবস্থা সম্পর্কে জহুর হোসেন চৌধুরী বলেন,

> এরপর (অর্থাৎ 'সংবাদ' অফিস থেকে বের হয়ে–ব.উ.) আমি এবং খায়রুল কবীর কোর্টের সামনে একটা রেস্তোরাঁ থেকে কিছু নাস্তা করে আমাদের বাসা ৭নং হেয়ার স্ট্রীটের দিকে রওয়ানা দিই। এ সময় আমি এবং খায়রুল কবির একই বাড়ীতে থাকতাম। আমরা রাত জাগার পর খুবই ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় সরদার জয়েনউদ্দীন, সে সময় তিনি 'সংবাদ' বিজ্ঞাপন বিভাগে চাকরি করতেন, এসে খবর দিলেন যে, 'সংবাদ' অফিস আক্রান্ত হতে পারে। কারণ একটা মিছিল 'সংবাদ' অফিসের দিকে এগিয়ে আসছে। সে সময় ৯টা কি সাড়ে ৯টা বাজছিলো। আমরা তাড়াতাড়ি বাইরে বের হলাম। সংবাদ অফিসের দিকে না গিয়ে সংবাদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে

---

*খুব সম্ভবতঃ ডক্টর এলিংসন। –ব.উ.

www.pathagar.com

আমরা সেক্রেটারিয়েটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।★ ওয়্যার স্ট্রীট এ উঠে আমরা শুনলাম যে মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন দিয়েছে। তারপর টয়েনবি সার্কুলার রোড এ উঠে দেখলাম লোকজন সব তরকারীর বাজার ঠাটারী বাজার থেকে পালাচ্ছে। বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। আমার সাথে সে সময় খায়রুল কবীরও ছিলেন। স্থানে স্থানে উত্তেজিত জনতাকে একজোট হয়ে অনেক কিছু আলোচনা করতেও দেখা গেল।

সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, উপরের দিকের কিছু অফিসার ছাড়া অন্য কোন কর্মচারী সেক্রেটারিয়েটে আসে নি। ওখান থেকে দুই একটা টেলিফোন করে আমরা নূরুল আমীনের বাসার দিকে রওয়ানা হলাম।

আমরা যখন রাস্তায় তখন আবদুল গনি রোডের দিক থেকে শ্লোগান এবং বন্দুকের আওয়াজ আসছিলো। হাইকোর্টের কাছে এই সময় গুলি হয় এবং লোক মারা যায়। আমরা বহু কষ্টে অনেক ঘুরে শেষ পর্যন্ত 'বর্ধমান হাউস' পৌঁছাই।

সেখানে গিয়ে দেখলাম নূরুল আমীন সাহেব পাথর হয়ে বসে আছেন। আর একের পর এক লোক আসা যাওয়া করছে। আমরা তাঁকে বললাম যে, তাঁকে তখনই কতকগুলো কাজ করতে হবে, অন্যথায় দেশের রাজনীতি সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিয়ে হাতের বাইরে চলে যাবে। কাজগুলো হলো, (১) তৎক্ষণাৎ জুডিশিয়াল এনকোয়ারীর ব্যবস্থা করতে হবে ও গুলির জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে সাসপেন্ড করতে হবে, (২) লাশ ছাত্রদেরকে ফেরত দিতে হবে এবং হত্যার জন্য কমপ্যানসেশন দিতে হবে, (৩) নূরুল আমীন সাহেবকে ছাত্রদের কাছে এবং হাসপাতালে যেতে হবে, (৪) তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চান একথা আবার ভালোভাবে বলতে হবে।

এই আলোচনার সময় মেডিকেল কলেজের দিক থেকে মাইকে শ্লোগানের জোর আওয়াজ আসছিলো। শ্লোগানগুলো ছিলো, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাংলা-উর্দু ভাই ভাই' 'নুরুল আমীনের রক্ত চাই' ইত্যাদি। এ সব শুনে নুরুল আমীন ছাত্রদের কাছে যেতে সম্মত হলেন না। কারণ তিনি আশঙ্কা করলেন এতে তাঁর জীবন সংশয় হতে পারে। অন্য দাবীগুলি সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর তেমন আপত্তি ছিলো না।

বর্ধমান হাউসের দোতালায় আমরা এইসব আলোচনা যখন করছিলাম তখনই আজিজ আহমদ এবং জি, ও,সি এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তখন উপর থেকে নীচে নেমে এসে হাবিবুল হকের★★ ঘরে বসলাম। শুনলাম তাঁর গাড়ি নাকি ছাত্রেরা আটকেছিল। তিনি তাই তাদের উপর খুব রেগেছিলেন এবং বলছিলেন যে তাদের উপর ট্যাংক চালিয়ে দেওয়া উচিত।

আমরা হাবিবুল হকের কামরায় থাকার সময়েই সেলিম সাহেব★★★ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 'শুনছি মার্নিং নিউজ অফিসে আগুন দিয়েছে।' এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো এবং তাতে খবর পাওয়া গেল যে মর্নিং

★খুব সম্ভবতঃ এঁদের এই দ্রুত তৎপরতার ফলেই কর্তৃপক্ষ সকাল সকাল খবর পেয়ে 'সংবাদ' রক্ষার জন্য যা কিছু করণীয় সবই করেছিলো। –ব.উ.

★★মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী। –ব.উ.

★★★প্রাদেশিক মন্ত্রী খাজা সেলিম। –ব.উ.

www.pathagar.com

নিউজ অফিস খতম করে দিয়েছে। সেলিম টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশকে ডাকা হয়েছে কিনা।

উত্তর এলো, দমকল এসেছে কিন্তু তারা মর্নিং নিউজ অফিস আর বাঁচাবার চেষ্টা না করে আশে-পাশের বাড়ীগুলোতে পানি দিচ্ছে। টেলিফোনে ঠিক এই সময় খবর এলো যে, ছাত্ররা শাহ আজিজুর রহমান এবং খাজা খায়রুদ্দীনকে ধরে নিয়ে গেছে।[১]

এই শেষোক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক শাহ্ আজিজুর রহমান বলেন,

> ২২শে ফেব্রুয়ারী আমি সকাল দশটা এগারোটার দিকে ইমামগঞ্জ থেকে বের হলাম। মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে একদল মেডিকেল ছাত্র আমাকে ঘেরাও করে ধরে নিয়ে গেলো। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে আমাকে heckle করলো। আমি তাদেরকে বললাম, আমি বাংলা চাই। বাংলার জন্য আমি কি কি করছি তাদেরকে বললাম। তাদেরকে আমি বললাম যে বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে আমি ইস্তফা দেবো।[২]

উপরে জহুর হোসেন চৌধুরী 'সংবাদ' অফিস আক্রমণ ও 'বর্ধমান হাউস' এর অভ্যন্তরে যে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে সৈয়দ নূরুদ্দীন বলেন,

> 'মর্নিং নিউজ' অফিস পোড়ানোর পর 'সংবাদ' অফিসও পুড়ে যেতো। বস্তুত বেশ কিছু লোক মিছিল করে এই উদ্দেশ্যে 'সংবাদ' অফিসের দিকে যখন যাচ্ছিলো তখন বংশাল-নবাবপুর রোড তেমাথার কাছে পুলিশ গুলি চালায়। তাতে লোক মারা যায় এবং জনতাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সংবাদ অফিস পোড়ানো আর সম্ভব হয় নি।
>
> সকালের দিকে আমরা 'বর্ধমান হাউসে' নূরুল আমীনের বাসায় গেলাম। নূরুল আমীন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন সে অবস্থায় কি করা যায়। আমরা বললাম যে, ছাত্রদের কাছে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে তাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে বলা উচিত। তিনি এতে খুব আপত্তি না করে বরং কিছুটা সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু তখনই হলগুলো থেকে 'নূরুল আমীনের কল্লা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান ভেসে আসছিলো। কাজেই এ অবস্থাতে নূরুল আমীন খুব ভরসা পাচ্ছিলেন না। তিনি শুধু বলছিলেন, 'আমার চেয়ে বেশী বাংলা ভাষা কে চায়? কিন্তু ছাত্রেরা কিছুতেই আমার কথা শুনবে না।' আমরা তাঁকে বললাম যে, প্রাদেশিক পরিষদে প্রস্তাব পাশ করুন আর যাই করুন ছাত্রেরা সে সব জিনিসের কোন মূল্য দেবে না।
>
> এই সব কথাবার্তা চলার সময় আজিজ আহমদ জি,ও,সি,কে সাথে নিয়ে উপস্থিত হলেন। আজিজ আহমদের মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। আমরা তখনই বুঝলাম নুরুল আমীনের আর উপায় নেই। কঠিন নীতি এখন তাঁকে নিতেই হবে। এরপর আমরা 'বর্ধমান হাউস' ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলাম।[৩]

১১. পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন

২২শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪-৫ মিনিটে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে ৪-৪৫ মিনিটে অধিবেশন

www.pathagar.com

আবার শুরু হয়। কিন্তু নির্ধারিত কার্যক্রম কিছুক্ষণ চলার পর আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং খায়রাত হোসেন উভয়েই মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। খায়রাত হোসেন আরও বলেন যে, তাঁর মুলতবী প্রস্তাব ছাড়াও তিনি একটি শোক প্রস্তাবও উত্থাপনের জন্য স্পীকারের কাছে পেশ করেছেন। এ সবের জবাবে স্পীকার আবদুল করিম বলেন যে, শোক প্রস্তাবের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না কারণ এ ধরনের প্রস্তাব পরিষদ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সম্ভব নয়। তিনি নিয়মের নির্দিষ্ট ধারাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করেন। তাছাড়া তিনি আরও বলেন যে, এই ধরনের শোক প্রস্তাব প্রাদেশিক সরকারের এখতেয়ারভুক্ত কাজেই সেটা উত্থাপন করা উচিত এই বক্তব্যের সঙ্গেও তিনি একমত নন।

এর জবাবে খায়রাত হোসেন বলেন, আমরা ইংল্যান্ডের রাজা মরলে condolence resolution পাশ করতে পারি★ আর দেশের ছেলেরা গুলির আঘাতে মরলে তাদের বিষয়ে পারি না? এর জবাবে স্পীকার বলেন, সেটা করা হয়েছিলো অন্য রুল এর অধীনে। খায়রাত হোসেন তখন দাবী করেন যে, ইংল্যান্ডের রাজা মরলে যে আইনে শোক প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিলো এটাও সেই আইনে করা হোক। কিন্তু স্পীকার শেষ পর্যন্ত তাঁর এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

> এরপর তর্কবাগীশ তাঁর মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্প্রতি সংঘটিত একটি নির্দিষ্ট জরুরী বিষয়ে যা হলো, ২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় ১টার সময় মেডিকেল কলেজ গেটের শান্তিপ্রিয় নাগরিক ও ছাত্রদের উপরে আক্রমণের ফলে শারীরিকভাবে আহত এবং পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হওয়া– সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে আজকে ২২শে ফেব্রুয়ারীর জন্য নির্ধারিত পরিষদের কার্যাবলী মুলতুবী রাখা হোক।

এই প্রস্তাবে কারও কোন আপত্তি আছে কিনা সে কথা উপস্থিত পরিষদ সদস্যদেরকে জিজ্ঞেস করায় প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন বলেন যে, তাঁর আপত্তি আছে এবং তিনি এই মুলতবী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

তখন স্পীকার পরিষদের মতামত যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ার পূর্বে মনোরঞ্জন ধরের কথামতো তাঁর কাছে তর্কবাগীশ প্রদত্ত নিম্নলিখিত মূল প্রস্তাবটি পাঠ করে শোনান,

> জনসভা ও গণমিছিল নিষিদ্ধ করে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারার অধীনে একটি আদেশ জারী করা হয়। গতকাল ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে প্রতিবাদ দিবস। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের কিছু ছাত্র এই আদেশ লঙ্ঘন না করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা

★ ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডের রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ মারা গেলে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে একটি শোক প্রস্তাব পাশ করা হয়। ব.উ.

www.pathagar.com

> চাই' ধ্বনি তুলেছিলো। এটা নিশ্চয়ই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা নয়। কোন রকম কারণ ব্যতীতই পুলিশ ছাত্রদের উপর আঘাত করে এবং মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে এলোপাথাড়ীভাবে তাদের উপর গুলি চালায় এবং প্রাঙ্গণের মধ্যে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এটা এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং এটা আলোচনার জন্যই এই মুলতবী পেশ করতে চাই।

উপরোক্ত প্রস্তাবটি পাঠ করে শোনানোর পর স্পীকার এটি সম্পর্কে পরিষদের মতামত চাইলে ৩৫ জনের কম সদস্য অর্থাৎ অর্ধেকের কম, প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানালে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। এরপর আলী আহমদ খান তর্কবাগীশের মতো একই মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং নূরুল আমীনের ঐ একই আপত্তির পর একইভাবে তাঁর প্রস্তাব পরিষদের অধিকাংশ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। খায়রাত হোসেনও ঐ একই প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য দাবী জানান কিন্তু স্পীকার তাঁকে বলেন যে, তাঁর মুলতবী প্রস্তাব তিনি পান নি কাজেই উত্থাপনের প্রশ্ন তখন ওঠে না।

এরপর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'মর্নিং নিউজ' এ তাঁর সম্পর্কে প্রকাশিত মিথ্যা রিপোর্টের বিরুদ্ধে সরকারী পদক্ষেপ দাবী করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে স্পীকার বলেন যে, পরিষদ থেকে এ ব্যাপারে তাঁদের করণীয় কিছু নেই। মনোরঞ্জন ধর ও শামসুদ্দীন আহমদ ধীরেন দত্তকে সমর্থন করে এ বিষয়ে পরিষদের করণীয় কি তা জানতে চান। কিন্তু স্পীকার তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করতে উঠে বলেন,

> আমি প্রস্তাব করতে চাই যে, "এই পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করছে।"
>
> এই প্রস্তাব পেশ করার কারণ এই যে, জনসাধারণের একাংশের মধ্যে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, গতকাল সরকার কর্তৃক যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার কারণ হলো, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ছাত্রদের দাবী। কতকগুলি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে কারণ এই দাবীর বিষয়ে ইতিপূর্বে দুইবার দুটি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করেছিলো এবং সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই তথ্য ছিলো যে, তারা জনগণের জীবনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলো এবং সেজন্যই ১৪৪ ধারার অধীনে একটি নির্দেশ জারী করা হয়েছিলো। এখন, স্যার আমি যেমন গতকাল বলেছি, ১৪৪ ধারা অনুযায়ী আদেশ জারী করার ইতিহাস বা কারণ যাই হোক এটা ঠিক যে সরকারকে দেখতে হবে যাতে সেই আদেশ কারও দ্বারা অথবা জনগণের কোন অংশ দ্বারা লঙ্ঘিত না হয়। কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আইন লঙ্ঘন করার মনোভাবের সঙ্গেই গতকালের ঘটনা সম্পর্কিত এবং তার সঙ্গে ভাষা প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই। ভাষার প্রশ্ন এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। উদ্দেশ্য যতই বাঞ্ছনীয় ও মহৎ হোক কোন মিছিল বের করা অথবা সভা করা অথবা পাঁচ জনের অধিক সংখ্যায় বাইরে যাওয়ার বিরুদ্ধে যেখানে সরকারী আদেশ আছে সেখানে প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই আদেশ

www.pathagar.com

মান্য করা। কিন্তু তা লঙ্ঘন করা হয়েছিলো। সুতরাং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ারও দরকার ছিলো।

এখন, স্যার, এই মুহূর্তে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হলো তাদের মন থেকে এই ধারণা দূর করা যারা চিন্তা করে যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর কারণেই সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমার এবং আমার সরকারের মন থেকে এ চিন্তা অনেক দূরে। এই প্রস্তাব যাতে গৃহীত হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংবিধান সভাকে যাতে অনুরোধ করা হয় তার জন্য আমি আবেদন করছি। আমি আশা করি, যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে এটা উপলব্ধি করা হবে, ভুল ভ্রান্তি দূর হবে এবং জনগণের কাছে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হবে।

আলহাজ্ব শামসুদ্দীন আহমদ নামক একজন সরকারপক্ষীয় সদস্য নূরুল আমীনের এই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দেওয়ার পর খায়রাত হোসেন প্রস্তাবটির সঙ্গে সংশোধনী হিসেবে যোগ দিতে বলেন– 'এবং এই পরিষদকে আশ্বাস প্রদান করছে যে, ৩ দিনের মধ্যে একটি জুডিশিয়াল এনকোয়ারী বসানো হবে এবং যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।' কিন্তু খায়রাত হোসেনের এই সংশোধনী বিধিসম্মত নয়, এই কথা বলে স্পীকার সংশোধনীটি নাকচ করে দেন।

সংশোধনীটি এইভাবে নাকচ হয়ে যাওয়ার পর আলী আহম্মদ খান বলেন,

আমি এ সম্বন্ধে একটু বলতে চাই। গতকাল এই ঢাকা শহরে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে এ দেশবাসী সকলেই মর্মাহত হয়েছে। আজকে সরকার পক্ষ একটা Special motion এনেছেন প্রকৃত কথা ধামাচাপা দিয়ে লোককে বুঝাবার জন্য যে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করেছিলেন। শান্তিভঙ্গ হবে বলে apprehend করেছিলেন বলে ১৪৪ ধারার আশ্রয় তাঁরা নিয়েছিলেন। যে উদ্দেশ্যে motion এখন এনেছেন সেটা যদি আগে আনতেন তা হলে এতগুলি মানুষের অমূল্য জীবন নষ্ট হত না– এত রক্তপাত হত না। এর পূর্বে চার তারিখে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে meeting ও procession করেছিলো। তারপর এমন কি হয়েছিল যার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে একটা অনর্থ সৃষ্টি দ্বারা এতগুলি life নষ্ট করা হল? ছাত্ররা নিজেদের কলেজের হোষ্টেলের সীমানার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও হোষ্টেল এবং হাসপাতালের ভিতর যেয়ে গুলি করা হয়েছে। এখন তাঁরা সাধু উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন।

স্পীকার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও আলী আহমদ খান বলেন যে, ১৪৪ ধারা থাকার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেটা প্রত্যাহার করা হোক। নূরুল আমীন বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তৃতার সময় ১৪৪ ধারা জারীকে সমর্থন করেছেন এ কথা তিনি উল্লেখ করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর পরিষদের কয়েকজন সদস্য কুষ্টিয়ার সদস্য শামসুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে একটি নোতুন পরিষদের দল গঠন করে

www.pathagar.com

পৃথকভাবে আসন গ্রহণ করেন এবং স্পীকারকে সেই অনুযায়ী নোটিশ দেন। নূরুল আমীনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে শামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, নূরুল আমীন কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারীর কি কোন যুক্তি ছিলো? এটা কি একটা অসাধু প্রচেষ্টা নয়?

এর পর মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার (মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী) নূরুল আমীনের প্রস্তাবটি সমর্থন করতে দাঁড়িয়ে বলেন যে, পূর্ব বাঙলা পরিষদের জন্য নূরুল আমীনের প্রস্তাব একমাত্র বাস্তবসম্মত প্রস্তাব। তিনি আরও বলেন যে তাঁদের দিকের সকল দায়িত্বশীল পরিষদ সদস্যই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। সংবিধান পরিষদে বিগত অধিবেশনে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে পূর্ব বাঙলার কিছু সংখ্যক সদস্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করেছিলেন।

এর পর আবদুস সালাম ও শামসুদ্দীন আহমেদ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর খায়রাত হোসেন নূরুল আমীনের প্রস্তাবের সংশোধনী হিসেবে যোগ করতে বলেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রাভাষা করার প্রশ্নটি সম্পর্কে সংবিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু স্পীকার তাঁর এই প্রস্তাব এই যুক্তিতে অগ্রাহ্য করেন যে, কোন সদস্য একই বিষয়ে দুইবার সংশোধনী উথাপন করতে পারেন না। খায়রাত হোসেনের এই সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ার কিছু পরে আনোয়ারা খাতুন ঐ একই প্রস্তাব উথাপন করেন।

খায়রাত হোসেনের পর মনোরঞ্জন ধর তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে তাঁর সংশোধনী হিসেবে মূল প্রস্তাবটিতে যোগ করতে বলেন, "যাঁরা সাধারণ ও মুসলিম অংশ হিসেবে পরিষদের দ্বারা পাকিস্তান সংবিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদেরকে এই পরিষদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে তাঁরা এই প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ভাষার দাবীকে এগিয়ে নেন এবং গণপরিষদের সাধারণ অধিবেশনে ও সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কিত গণপরিষদের সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে সব ধরনের প্রাপ্ত সমর্থন সংগঠিত করেন।"

নিজের সংশোধনীয় সপক্ষে বক্তৃতা দানের সময় মনোরঞ্জন ধর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার সদিচ্ছার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, তাঁরা যদি সত্যি সত্যিই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী হতেন তাহলে ২১শে ফেব্রুয়ারী যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা হতো না। এর পর তিনি ২২শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী উলেখ্য করতে গিয়ে বলেন,

> আজকের অবস্থাটা কি? আজ আমরা গতকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করছি। কিন্তু আপনারা কি শোনেন নি আজ শহরে কি ঘটছে ? হাইকোর্টের কাছাকাছি এলাকায় কিছু ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গেছে যাতে একজনের মৃত্যু ঘটেছে।...আমি পরিষদের বিরোধীপক্ষীয় কয়েকজন সদস্য বন্ধুর থেকে শুনেছি যে,

www.pathagar.com

পুলিশ ও মিলিটারীর কার্যবালীর ফলে আজ প্রায় ২০ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

এর পর মনোরঞ্জন ধর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয় সরকার পক্ষীয় সদস্যদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন,

> একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার এবং তা হলো এই যে আমরা এখানে যে প্রস্তাব পাশ করবো সেটাকে সমর্থন প্রদান সংবিধান সভার সদস্যরা বাধ্যতামূলক মনে না করতে পারেন। কারণ তাঁদের মনোভাব এ ব্যাপারে আমাদের এবং পরিষদের নেতার মতো না হতে পারে। তাই প্রস্তাবের মধ্যে এ বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা দরকার। স্যার, আমি জানি এবং আমি মূলনীতি কমিটির মধ্যবর্তীকালীন রিপোর্টও দেখেছি, যাতে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।

মনোরঞ্জন ধর-এর সংশোধনীর সমর্থন প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ীর বক্তৃতার পর আনোয়ারা খাতুন তাঁর সংশোধনীর পক্ষে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে নাজিমউদ্দীনের স্বাক্ষরিত চুক্তি ও তার বরখেলাফের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন bluff দেওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা। ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের উপর পুলিশ মিলিটারীর গুলি ও নির্যাতনের উল্লেখ করার পর আনোয়ারা খাতুন সরকারকে যে পদক্ষেপগুলি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করার দাবী জানান সেগুলি হলো, (১) ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান (২) পুলিশ এবং মিলিটারীর নির্যাতনে যারা নিহত ও আহত হয়েছেন তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণ দান (৩) এই সব হত্যা, নির্যাতন দুষ্কৃতির জন্য দায়ী অফিসারদের প্রকাশ্য বিচার করা এবং (৪) সরকার কর্তৃক অন্যদের উপর নির্যাতনের নীতি বন্ধ করা।

এর পর আলী আহমদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে তাঁর পল্টন ময়দান বক্তৃতায় উর্দুর সপক্ষে বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশের জন্য প্রস্তাব করেন। স্পীকার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতার পরই ভাষা আন্দোলন আবার জীবন্ত হয়ে উঠলো। ছাত্র হত্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে 'এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চিরকালের জন্য ইতিহাসে নূরুল আমীন সাহেবের কলঙ্ক হয়ে থাকবে'।

সংবিধান সভা তার পরবর্তী অধিবেশনে যদি পরিষদের উপস্থাপিত ও গৃহীত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তাহলে পরিষদের সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন, এই মর্মে শামসুদ্দীন আহমদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ নিয়ে কিছু বিতর্কের পর ধীরেন দত্ত প্রস্তাব করেন যে শামসুদ্দীন আহমদের সংশোধনীতে "পরবর্তী অধিবেশনে" কথাটি বাদ দিয়ে শুধু বলা হোক যে সংবিধান সভায় এই প্রস্তাব বাতিল হলে পরিষদ সদস্যরা পদত্যাগ করবেন।

এর পর বক্তৃতা করেন বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী ও মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

www.pathagar.com

মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা জারী ও ২২শে ফেব্রুয়ারীর উল্লেখ করে বলেন,

> বিশ তারিখ সন্ধ্যায় যখন জানলাম ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে তখন আমার মনটা কেঁপে উঠলো। তার পর কি হয়েছে আপনারা জানেন। আজ শহরে যাঁরা ঘুরছেন তাঁরা দেখেছেন যে civil administration বলে কিছু নাই। Virtually Martial law জারী হয়েছে। কেবল military stengun আর brengun District Magistrate এর court Compound যদি কেউ দেখে থাকেন তিনি জানেন কি পরিমাণ militatry Concentration সেখানে হয়েছে। আমরা বাংলাবাজার থেকে হেঁটে এসেছি। রেল গেটের কাছে এসে কিছু লাঠিধারী সাধারণ পুলিশ দেখলাম। আর সব মিলিটারী। দেখে মনে হয় যেন military administration চলছে। আমরা একথা জানি যে প্রত্যেক জিনিস পেতে হলে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়। ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন হয়েছিলো কতশত লোক হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সে স্বাধীনতার আন্দোলন করেছিলো। কতলোক জেলে গিয়েছিল, কত লোক মার খেয়েছিল তার ইয়ত্তা নাই। আজ যখন শক্তির দ্বারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবীকে রোধ করতে চেয়েছেন- বাঙালী জীবনের ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিতে চেয়েছেন তখন বাংলার ছেলেরা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে তার দাম দিচ্ছে।

বক্তৃতার শেষে মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে ছাত্র হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেন।

এরপর বক্তৃতা করেন বিরোধী দলের নেতা বসন্তকুমার দাস। পরিষদে তাঁর প্রস্তাব উপস্থাপন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর প্রস্তাবটি আসলে ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর চাপ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। যেমনটি হয়েছিলো ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে যখন খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাঙলা পরিষদে উত্থাপন করেছিলেন তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব।

মনোরঞ্জন ধরের সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন যে ঐ সংশোধনীতে যে পথ নির্দেশ করা হয়েছে একমাত্র সে পথেই ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটি কার্যকর করা সম্ভব। প্রস্তাবটিকে সংবিধান সভায় পাশ করানোর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন যথাসাধ্য করবেন এই মর্মে আশ্বাস প্রদানের জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধ জানান।

এর পর বসন্তকুমার দাস বলেন,

> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টি স্বীকার করুন যে প্রশাসনিক দিক দিয়ে তিনি যতই ক্ষমতাশালী হোন না কেন জনগণের অকৃত্রিম অনুভূতিকে তিনি রোধ করতে পারেন না। এ বিষয়টি যদি তিনি স্বীকার করেন তাহলে অনেক যন্ত্রণাই হয়ে যাবে অতীতের ব্যাপার। এই প্রস্তাব, যা আমি মনে করি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে, এটাই প্রমাণ করে যে এ হলো এমন একটি সাধারণ প্রশ্ন যে ক্ষেত্রে আমরা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এ ধরনের আরও অসংখ্য প্রশ্ন

www.pathagar.com

> রয়েছে। এই প্রদেশের সকল প্রশ্নের ক্ষেত্রেই জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই পরিষদের সকল পার্টিই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এখন এই বাস্তব ব্যাপারটি যদি স্বীকৃত হয় তাহলে স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একথা বলতে পারি যে, একদিন আসতে পারে যখন এমন অনেক প্রশ্নে আমাদের সামনে আসবে যেগুলি সম্পর্কে কোন মত পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই নির্ভর করবে এই পরিষদে আমাদের এমন একটি পার্টির উপর যা সাম্প্রদায়িক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে নয়। অর্থনৈতিক প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে গঠিত হবে। আমি সেই দিনেরও আশা করি যখন আমরা এই পরিষদে একটি পার্টির উদ্ভব দেখবা, যে পার্টি হবে জাতি গঠনের পার্টি, যা সব জিনিষকে দেখবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের জনগণের স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

বসন্তকুমার দাস তাঁর বক্তৃতায় ছাত্রদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, যা কিছু ঘটেছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি প্রদান এবং দুঃখজনক ঘটনাবলীর বিস্তার বন্ধ করা এবং নিহতদের জন্য একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে আহ্বান জানান। এর পর সংগ্রামী ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> সকল কৃতিত্বের অধিকারী হলো ছাত্ররাই। এটা এমন এক বিজয় যা তাদের পক্ষেই লিখিত থাকা উচিৎ এ কারণে যে প্রদেশের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তারাই সত্যিকার তাগিদ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আমি আশা করি যে, ছাত্রেরা যে তাগিদ দেখিয়েছে তা আমাদের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হবে এবং বাংলাভাষা যাতে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয় তার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।

এর পর শামসুদ্দীন আহমদ শহরে ঐ দিন সন্ধ্যায় সান্ধ্যআইন জারী করার বিষয়টি উপস্থাপন করলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ের সত্যতা এবং তা সত্য হলে সেটা মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে করা হয়েছে কিনা একথা নূরুল আমীনের কাছে জানতে চান।

জবাবে নূরুল আমীন বলেন যে সান্ধ্যআইন সম্পর্কে শুধু এই সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে পরিস্থিতির অবনতির ফলে সান্ধ্যআইন জারী করা যদি দরকার হয় তাহলে তা জারী করা হবে। কিন্তু তা জারী হয়ে থাকলে ঠিক কখন থেকে তা জারী করা হয়েছে সেটা তিনি জানেন না। জনগণকে দুষ্কৃতিকারীদের কার্যকলাপের শিকার হতে দিতে তিনি পারেন না বলেও নূরুল আমীন এ প্রসঙ্গে তাঁর মত প্রকাশ করেন।

> এসময় 'দুষ্কৃতিকারী' শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে শামসুদ্দীন আহমদ প্রতিবাদ করেন এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত জানতে চান শহরের প্রশাসন সামরিক বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা।
>
> এ সবের জবাবে নূরুল আমীন বলেন, পরিস্থিতির যখন অবনতি ঘটলো তখন আমাকে সামরিক বাহিনী তলব করতে হলো। কথা হলো এই যে, পরিস্থিতির

www.pathagar.com

সুযোগ নিয়ে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ হতে পারে। রাত্রি নেমে আসছে এবং কোন একটা ব্যবস্থা না করলে গণ্ডগোল হবে। পরিষদ যদি সান্ধ্যআইন প্রত্যাহারের জন্য জোর দেন তাহলে আমি তা প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত আছি। মিস্টার শামসুদ্দীন আহমদ নিজের একটা ব্যাখ্যা খাড়া করুন সেটা আমি চাই না। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকেই এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে এবং আরও গুরুতর কিছু ঘটতে পারে। এ কারণেই এটা ঠিক করা হয়েছিলো যে, পরিস্থিতি অনুযায়ী যদি প্রয়োজন হয় এবং পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে তাহলে সান্ধ্য-আইন জারী করা হবে।★

নূরুল আমীনের এই বক্তব্যের পর আলী আহমেদ খান বলেন যে, একটু আগেই মুখ্যমন্ত্রী যা জানতেন না এখন তিনি তা জানেন বলে স্বীকার করায় তিনি খুশী হয়েছেন।

নূরুল আমীন তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় বিভিন্ন সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য জ্ঞাপন করতে গিয়ে প্রথমে বলেন,

স্যার, আমি এই সংশোধনীর বিরোধিতা করি। মিস্টার শামসুদ্দীনের রাজনীতির ধরন সকলেরই জানা আছে। "আসুন আমরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করি" একথা বলে-তিনি এখানে এমনভাবে শুরু করেছেন যাতে মনে হয় তাঁর অথবা এই পরিষদের এই ঘোষণা প্রদানের কোন এখতিয়ার আছে। একজন প্রবীণ সংসদবিদ হিসেবে তাঁর জানা উচিৎ যে, কাজের একটা বিভাগ আছে এবং সেই ধরনের দাবীর একটা যথাযথ সংস্থা আছে। সেটা হলো সংবিধান সভা কিন্তু আমরা এখানে কোন ঘোষণা প্রদান করতে পারি না। আমাদের সে ঘোষণা হবে আইনগত ভাবে বাতিল।

নূরুল আমীন এ পর্যন্ত বলার পর শামসুদ্দীন আহমদ নূরুল আমীনকে 'দুষ্কৃতিকারী' শব্দটি প্রত্যাহার করতে বললে নূরুল আমীন আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করে বলেন।

মিস্টার শামসুদ্দীন যদি "ঘোষণা" শব্দটি প্রত্যাহার না করেন তাহলে আমি 'দুষ্কৃতিকারী' শব্দটাও প্রত্যাহার করতে পারি না। এটা আমার গোচরীভূত হয়েছে যে, মিস্টার শামসুদ্দীন এখন এমন একটি পার্টির নেতা যার নাম আমার এ পর্যন্ত জানা নেই। আমরা দেখছি যে, যে পার্টির নাম আমরা এখনো জানি না সেই পার্টির নেতা প্রথম দিন থেকেই নিজের সংশোধনী সংশোধন করার ব্যাপারে মিস্টার দত্তের থেকে নির্দেশ গ্রহণ করেছেন। (হৈ চৈ) হ্যাঁ, আমি জানি যে এটা তাঁরই নির্দেশ ক্রমে। আমি দলটিকে জানি। (হৈ চৈ) তিনি মিস্টার দত্তের থেকে নির্দেশ নিয়েছেন; সকলেই সেটা জানে এবং আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে এই ক্ষুদ্র পার্টিটি মিস্টার দত্ত ও তাঁর পার্টির আদেশ অনুযায়ীই কাজ করবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তাই, স্যার, আমি এর বিরোধিতা করি। আমাদেরকে সংবিধান সভার সদস্যদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাঁরা সম্মানীয় লোক এবং এই পরিষদ থেকে যদি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহলে তাঁরা সেটা মেনে চলবেন এবং তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে এই

★২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লালবাগ, কোতোয়ালী এবং সুত্রাপুর থানা অঞ্চলে রাত্রি ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্যআইন জারী করেন (দৈনিক আজাদ, ২৩.২.১৯৫২)-ব.উ.

www.pathagar.com

পরিষদের ইচ্ছা গৃহীত হয়। সেজন্য, স্যার, এ ক্ষেত্রে পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। এখন মিসেস আনোয়ারা খাতুনের সংশোধনীয় ব্যাপারে এসে বলতে হচ্ছে যে সেটিকেও আমি গ্রহণযোগ্য মনে করি না কারণ এই বিষয়টি গণপরিষদের পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে কিনা সেটা নির্ধারণের কোন এখতিয়ারও আমাদের নেই। তাঁর সংশোধনীতে আছে, 'পাকিস্তান সংবিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ।' (গণ্ডগোল ও বাধাপ্রদান) স্যার, এই পরিষদ নির্ধারণ করতে পারে না কখন এটা সংবিধান সভা কর্তৃক উপস্থাপিত হবে। নিজের বক্তৃতার সময় মিসেস আনোয়ারা খাতুন আরও অনেক বিষয়ে কতকগুলি দাবী উত্থাপন করেছেন এবং আমি সেই একই দাবীগুলি দেখছি কর্ম পরিষদ নামে কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত একটি সাইক্লোস্টাইল করা প্যাম্ফলেটে। এ দাবীগুলি হলো হুবহু তাই যা মিসেস আনোয়ারা খাতুন কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে।

কর্ম পরিষদের এই উল্লেখের প্রতিবাদ করে মনোরঞ্জন ধর এর পর বলেন,

স্যার, তিনি যখন এই প্রস্তাব পেশ করেন তখন আপাত দৃষ্টিতে এই প্রস্তাবের বহির্ভূত কিছু বিষয় অন্যেরা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। পরিষদের মাননীয় নেতা সে সময় এই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করেছিলেন। এখন তিনি পরিষদের সামনে নিয়ে আসা একটি কমিউনিষ্ট প্যাম্‌পলেট সম্পর্কিত কতগুলির বিষয় পরিষদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।

একথা বলে মনোরঞ্জন ধর সকলকেই পরিস্থিতির উপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ প্রদান অথবা নূরুল আমীনকে প্রস্তাব বহির্ভূত বিষয়ের উল্লেখ প্রত্যাহার করতে বলেন। কিন্তু নূরুল আমীনকে তা অগ্রাহ্য করে বলেন যে প্রত্যেকেই পরিস্থিতির উপর যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা এবং তাঁর প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং অনেক যুক্তি খাড়া করেছেন, তা প্রাসঙ্গিক হোক অথবা অপ্রাসঙ্গিক।

এ কথার পর প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে তাঁর পল্টন ময়দানে প্রদত্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা সম্পর্কিত আলী আহমদের সংশোধনীর বিরোধিতা করে নূরুল আমীন বলেন যে, পল্টন ময়দানে নাজিমুদ্দীন নিজে কিছুই বলেন নি। তিনি কায়েদে আজমের বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করেছিলেন মাত্র। সংবিধান সভায় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি কি করেন সেটার দ্বারাই যথাসময়ে তাঁর আসল বক্তব্য কি সেটা বিচার করতে হবে।

এ সময়ে শামসুদ্দীন আহমদ জানতে চান বাংলার উর্দূ অক্ষর চালু করা হয়েছে কিনা। এর জবাবে নূরুল আমীন বলেন,

এটা এই সরকারের নীতিও নয় এবং এই সরকার এ বিষয়ে কিছু করছেও না। সুতরাং আমরা মাননীয় বন্ধু মনে হয় জানেন না এর সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার কতখানি সম্পর্কিত। এখন পর্যন্ত আরবী অথবা উর্দু অক্ষরের পক্ষে এই সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের নির্দেশ অথবা সার্কুলার তিনি খুঁজে পাবেন না। তার সঙ্গে এই সরকারের কোন সর্ম্পক নাই।

www.pathagar.com

এখন, স্যার, এই প্রস্তাব বহির্ভূত অনেক বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে। কিছু মাননীয় সদস্য ভাব গদ গদ হয়ে বলতে চেয়েছেন যে তাঁরাই বাংলার একমাত্র প্রেমিক ও সমর্থক, যেন তাঁরাই বাংলার একমাত্র সন্তান এবং বাসিন্দা। (এই পর্যায়ে পরিষদে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়।)

আমি বিরোধী পক্ষের মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তীর কথা বলছি। একমাত্র তফাৎ এই যে, তাঁরা চান বাংলাকে সংস্কৃত প্রভাবিত করতে, আমরা চাই তাকে মুসলমান বানাতে। (বিরোধী বেঞ্চগুলি থেকে না, না, চীৎকার)। আমি পার্থক্যটি ভাল করেই বুঝি। আমরা এই বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি এবং আমরা একে সংস্কৃত প্রভাবিত হতে দেবো না।

নূরুল আমীনের এই সব বক্তব্যের পর পরিষদে তুমুল হট্টগোল শুরু হলে মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে তিনি কোথাও বাংলাকে সংস্কৃত প্রভাবিত করা অথবা মুসলমান করার কথা বলেন নি। এর পর এ প্রশ্নে সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন,

মাননীয় প্রমুখ মহোদয়, আজ আমরা এখানে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য Constituent Assembly কে অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করছি। পূর্ব বাংলার বাংলা কিরূপ হবে তা স্থির করবার ভার দেওয়া হয়েছে East Bengal Language Rcconstruction Commitee র উপর Language Reconstruction Commitree র কাছ হতে রিপোর্ট পেলে আমরা বিবেচনা করবো তাদের মত আমরা গ্রহণ করব কি করব না। আজ আমি কি বাংলায় কথা বলি এবং Prime Minister কি বাংলায় কথা বলেন এটা বিচার করার সময় নয়। আমার মতে আজকে এ নিয়ে speech দেওয়া নিয়ম বহির্ভূত কাজ হবে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হলে কি রূপ গ্রহণ করবে তা আমার হাতে বা Prime Minister এর হাতে নেই এটা নির্ভর করবে East Bengal Language Reconstruction Commitee র উপর এবং Bengal এ যিনি বড় সাহিত্যিক হবেন বড় গ্রন্থকার হবেন তিনি যে ভাষা ব্যবহার করবেন এবং সেই সব গ্রন্থাকার হবেন তিনি যে ভাষা ব্যবহার করবেন এবং সেই সব সাহিত্যিকের হাতে, যে ভাষা স্থায়িত্ব লাভ করবে সেটাই হবে East Bengal এর বাংলা ভাষা। আমার মনে হয় এই সমস্ত কথা বলে Assembly-র সময় নষ্ট করার কোন অধিকার প্রধান মন্ত্রীরও নাই।

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই বক্তব্যের জবাব নূরুল আমীন বলেন, মিস্টার দাশগুপ্ত বলেছেন যে, বাংলা সংস্কৃত প্রভাবিত হবে না মুসলমান হবে সে প্রশ্ন আমাদের সামনে নেই। কিন্তু ঘটনা হলো এই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে ভাষায় পাঠ্য পুস্তক লেখা হচ্ছে সে ভাষার বিরুদ্ধে অসংখ্য আপত্তি তুলে আসছেন। এখন যদি সেখানে 'আজাদ' শব্দটি থাকে, যদি 'আল্লাহ' শব্দ থাকে তাহলে তাঁরা আমার কাছে আসবেন প্রতিবাদ করতে। সেজন্যই আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিতে চাই। (তুমুল হট্টগোল) তাঁদের সংস্কৃতি অপসারণ করা হচ্ছে এই মর্মে মিস্টার ধর এবং অন্যদের থেকে এই পরিষদের আমি অনেক প্রতিবাদ পেয়েছি। (পরিষদে আবার হট্টগোল)

নূরুল আমীন এইভাবে প্রস্তাব বহির্ভূত বিষয় বারবার উত্থাপন করায় মনোরঞ্জন ধর এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্পীকারের কাছে প্রতিবাদ জানালে তিনি

www.pathagar.com

বলেন যে, চারিদিকের হট্টগোলে তিনি শুনতেই পান নি আসলে নূরুল আমীন কি বলেছেন! এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরিষদের হট্টগোল সত্ত্বেও নূরুল আমীনের বক্তব্য বেশ স্পষ্টভাবেই শোনা যাচ্ছিলো এবং পরিষদ বিবরণীতে তা ঠিকমতো লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো।

এর পর নিজের প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে নূরুল আমীন বলেন যে, তাঁর অনেক দূরে পর্যন্ত চিন্তা করছেন এবং মনে করছেন যে ভাষা প্রশ্নকে অবলম্বন করে তাঁরা একটি কার্যকর বিরোধী দলে পরিণত হবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বিভক্ত করার জন্য তাঁরা নানা কৌশল অবলম্বন করছেন এবং ভাষা প্রশ্নকে অবলম্বন করে তাঁর মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে চান। এই সব বক্তব্য প্রদানের সময় পরিষদে তুমুল হট্টগোল হতে থাকে।

এর পর তিনি যে সব ছাত্র গুলিতে নিহত হয়েছে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং কোন অপ্রীতিকর ঘটনা আর যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সব কিছু করবারও প্রতিশ্রুতি দেন। এ ব্যাপারে তিনি পরিষদ সদস্যদের সকলকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

বিরোধী দলীয় সদস্যরা যে সব সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি একের পর এক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অগ্রাহ্য হওয়ার পর বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংবিধান সভার কছে সুপারিশ করে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের প্রস্তাবটি পরিষদে গ্রহণের জন্য স্পীকার ভোট প্রদান করলে সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়।

১২. ঢাকা শহরের বাইরের পরিস্থিতি

২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ এবং হত্যার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার মতো পূর্ব বাঙলার সর্বত্রই ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। অনেক স্থানেই পুলিশের সঙ্গে ছাত্র ও জনসাধারণের সংঘর্ষ ঘটে।

২২শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের ছাত্র জনসাধারণের আধ মাইল লম্বা একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিলকারীরা 'নূরুল আমীনের পদত্যাগ চাই', 'নাজিমুদ্দীন গদী ছাড়' প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে লালদীঘি ময়দানে সমবেত হলে সেখানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রফিউদ্দীন সিদ্দিকী, আবুল কাশেম খান প্রভৃতি বক্তৃতা করেন এবং ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার তীব্র নিন্দা করে ও সমগ্র ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১]

www.pathagar.com

সিলেট শহরে ২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার ভাব বিরাজ করতে থাকে। সারা শহর ও শহরতলী এলাকায় সমস্ত স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, সরকারী অফিস ইত্যাদিতে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই ছাত্র ও জনসাধারণ মিছিল করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। বেলা ১০টার সময় সিলেট রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্যেরা একটি জরুরী সভায় মিলিত হয়ে পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এর পর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিকেলে মিছিল ও জনসভার কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়। সারা শহরের দেয়াল পোস্টারে ছেয়ে যায়। বেলা ৩টার সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার মিছিল গোবিন্দ পার্কে এসে সমবেত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। খুনীদের শাস্তি দাবী করে এবং পরদিন আবার পূর্ণ হরতাল পালনের ঘোষণা দিয়ে সভা শেষ হয়। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী সভা শেষে এক প্রতিনিধি দল স্থানীয় এম. এল. এ. (ব্যবস্থা পরিষদ সদস্য) ও মুসলিম লীগ সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী তৈমুর রেজা চৌধুরীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেন। সভা শেষে এক দীর্ঘ মিছিল রাত্রি প্রায় ৮টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।[২]

২২শে ফেব্রুয়ারী খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জ থেকে ৮ মাইল দূরে একটি বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে এবং সে সময় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'খুনী নূরুল আমীনের ফাঁসি চাই' ইত্যাদি ধ্বনিতে সারা শহর মুখরিত হয়।[৩] পরে কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণে জহিরুল হক এর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পুলিশের বর্বরোচিত আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়। পূর্বদিন মিছিলকারী ছাত্রদের উপর স্থানীয় কিছু সংখ্যক মোহাজেরদের আক্রমণের ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় নূরুল আমীনের পদত্যাগ এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪] ২২শে ফেব্রুয়ারী খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জ থেকে ৮ মাইল দূরে একটি গ্রামের দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষকরা ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় ছাত্র জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ কিভাবে করেছিলেন সে প্রসঙ্গে নীচে একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত হলো। উপরে উল্লিখিত গ্রামটি ছিলো দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল এবং সেখানে তখন সরকার কৃষকদেরকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অনুযায়ী 'টেস্ট রিলিফ' এর মাধ্যমে সামান্য মজুরীতে মাটি কাটার কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই 'টেস্ট রিলিফ' এর কাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন কিউ, কিউ, এম, জহুর (কাসেদ আলী)।[৫] নীচে উদ্ধৃত রিপোর্টটিতে তাঁরই, পরদিন অথবা ২-১ দিন পরে ৮ মাইল দূরে এক গণ্ডগ্রামে টেস্ট রিলিফের

www.pathagar.com

কাজ তদারক করতে গেলাম। কাজকর্মে কেউ নেই। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম মহাদুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অশিক্ষিত কাংগালরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মর্মবেদনায় হরতাল পালন করছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরও জানতে পারলাম না কে বা কারা এই হরতালের ডাক দিয়েছেন। রেডিও মারফত খবরটা গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়বে সেটা স্বাভাবিক কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে ছয় কি আট আনা পয়সা পাওয়া রিলিফের খালকাটা কোদালমারা কোন মতে দিন গুজরানকারী ক্ষেত মজুর গরীব কৃষক ঢাকার শহীদানের জন্য হরতাল পালন করবে তাতে খুবই বিস্মিত হলাম। অচেতন মনে কিছুটা চেতনা সঞ্চারিত হলো। মনটাও ক্ষুব্ধ হলো।[৬]

২২শে তারিখে ঢাকায় যে সব বিক্ষোভ মিছিল দেখা যায় তাতে ঢাকার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের অগণিত কৃষক অংশগ্রহণ করেন।*

*ঢাকার বাইরে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র এই একই ধরনের বিক্ষোভ মিছিল, জনসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই বইয়ে তাদের প্রত্যেকটির উল্লেখ ও বিবরণ প্রদান করা হলো না।-ব.উ.

www.pathagar.com

একাদশ পরিচ্ছেদ : ২৩ শে ফেব্রুয়ারী

১. সংবাদপত্র সম্পাদকীয় ও বিবৃতি

পূর্ব বাঙলায় নূরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবী করে ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'পদত্যাগ করুন- শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে 'দৈনিক আজাদ' বলেন,

> গত দুইদিন ধরিয়া ঢাকা শহরের বুকে যেসব কাণ্ড ঘটিতেছে সে সবকে শুধু শোকাবহ নয়, বর্বরোচিতও বলা চলে। জনাব নূরুল আমীন পুলিশ জুলুম সম্বন্ধে তদন্তের কথা বলিয়াছেন এবং ১৪৪ ধারা জারীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ইতস্ততার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের কোন ব্যবস্থা হইল না এবং ১৪৪ ধারা বলবৎ রহিয়াছে; ফলে গুলিতে মানুষ হতাহত হইতেছে এবং মানুষের রক্তে পথ রঞ্জিত হইতেছে। নূরুল আমীন মন্ত্রী-সভার ব্যর্থতা চরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছি।
>
> এখন পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন চলিতেছে। সদস্যগণকে এ ব্যাপারে তাঁদের কর্তব্য পালন করিতে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি। এভাবে জুলুম কোনমতেই চলিতে দেওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের মর্যাদা পর্যন্ত রক্ষিত হইতেছে না। এর প্রতিকার করিতেই হইবে।
>
> ছাত্রেরা বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইতেছে। এই দাবী জানাইবার তাহাদের পূর্ণ অধিকার আছে। পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। এ যদি এখানকার জনমতের দাবী হয়, তবে পাকিস্তানকে তা মানিয়া লইতে হইবে। এই গণতান্ত্রিক দাবী অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কারো নাই। পূর্ব-পাকিস্তান আইন সভার সদস্যদিগকে তাদের কর্তব্য পালন করিতে হইবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে জানাইয়া দিয়া বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠা করার ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশকে আজ এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হাত হইতে তাঁরা রক্ষা করুন। পাকিস্তানের সংহতি, কল্যাণ এবং উর্দু ও বাংলা ভাষা-ভাষীদের সম্প্রীতি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করুন; আজ শোক-সন্তপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনমত আপোষহীন এই দাবীই জানাইতেছে।

করাচীর আধা-সরকারী ইংরেজী দৈনিক Dawn পত্রিকায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়,

www.pathagar.com

ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনাবলীতে সারা পাকিস্তান শোক প্রকাশ করবে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নীতির সংঘর্ষের ফলে যাঁরা নিজেদের জীবন দান করেছেন তাঁদের প্রতি প্রথমে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁদের বিশ্বাস যেভাবেই তাঁদেরকে চালনা করুক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা তীব্রভাবে যা বিশ্বাস করতেন তার জন্যই তাঁরা নিজেদের নবীন জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের স্মৃতি শ্রদ্ধার যোগ্য এবং তা স্থায়ী হবে। অন্য অনেকে যাঁরা শারীরিকভাবে আঘাত গ্রস্থ হয়েছেন তাদের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এবং সমবেদনা জানাচ্ছি।

এই মর্মান্তিক ঘটনা দ্বিগুণ মর্মান্তিক এজন্য যে ছাত্র এবং অন্যান্যদের বিপুল অধিকাংশ, যাঁরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সৎ বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যিকার পাকিস্তানী হিসেবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় এমন ধরনের লোকজন মিশে গিয়েছিলো যারা তাঁদের সৎ উদ্দীপনায় ইন্ধন যুগিয়েছিলো, যারা ছিলো আমাদের শত্রুদের এজেন্ট। সেই ধরনের লোকেরা পাকিস্তানী জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই অনুপ্রবেশ করেছে এবং পূর্ব-পাকিস্তানকেই প্রথম লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যদি প্রথম পাকিস্তানের ঐ অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে তাহলে তাদের দুরভিসন্ধিমূলক লড়াইয়ের অর্ধেকই জয় হয় যাবে। যে ভাষাকে তারা ভালবাসে তার প্রতি বোধগম্য উৎসাহের এবং সমগ্র পাকিস্তানের প্রতি তাদের আরও বড়ো ভালবাসার কারণে অনেক সৎ পূর্ব-পাকিস্তান অনুরাগী বারবার এটা ভুলে যান এবং এই বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হন। ঢাকার বর্তমান ঘটনাবলীর মর্মান্তিকতার মূলে এই গভীরতর মর্মান্তিক ব্যাপারটিই নিহিত আছে। কিন্তু প্রত্যেক কালো মেঘেরই একটি রজত রেখা থাকে এবং এই মারাত্মক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যে চূড়ান্ত জ্ঞানের উদয় হয়েছে তা হলো, পূর্ব-পাকিস্তানে আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা ভাষা প্রশ্নের প্রতি কত গভীরভাবে অনুভূতিশীল। এই জ্ঞান বেশ কিছুদিন থেকেই বিকাশলাভ করছে এবং এখন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিজে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন যে, উর্দুর সঙ্গে বাংলাও আমাদের মাতৃভূমির রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হওয়ার সম্মান লাভ করা উচিৎ। এ ভাবেই প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে গেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, যথোপযুক্ত সময়ে সংবিধান পরিষদ এই অবস্থাকে মেনে নেবেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে আশ্বাস দিতে পারি যে, শেষ পর্যন্ত উর্দুর সঙ্গে বাংলা যে সমকক্ষতা অর্জন করেছে সে ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষুব্ধ হবেন না।

সাধারণ মতৈক্যের ভিত্তিতে এই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক অধ্যায়ের উপর যবনিকা পতন হোক...শুধু এইটুকু ব্যতিরেকে যে গুলিবর্ষণের প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা সে বিষয়ে প্রতিশ্রুত তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। কোন সরকারই হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে আইন লংঘনের দ্বারা রাষ্ট্রের শান্তি বিপর্যস্ত হতে দিতে পারে না, বিশেষত যখন শত্রুর এজেন্টরা সে ধরনের বিশৃঙ্খলাকে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সদা সতর্ক থাকে। ভারতেও এমন সব নোংরা ঘটনা ঘটেছে যার জন্য নাগরিক ও ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনেকবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু সব প্রশ্নের বড়ো প্রশ্ন হলো, পুলিশ যদি গুলিবর্ষণ না করতো তাহলে কি জীবন ও সম্পত্তির কোন ক্ষয়ক্ষতি সাধিত

www.pathagar.com

হতো? যোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।★

'ডন' এর এই সম্পাদকীয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ জন্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী প্রসঙ্গে এতে সরকারী মতামতের কোন প্রতিফলন নেই। উপরন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার বিরোধী মহলের একাংশের মধ্যে যে চিন্তাভাবনা তৎকালে ছিলো এই সম্পাদকীয়ের মধ্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঢাকার সরকার সমর্থক ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, অর্থাৎ তাদের প্রেস ২২শে তারিখে অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে বিনষ্ট হওয়ার পরদিন, Morning News Cannot Die শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাদের পরিচিত মতামতেরই পুনরাবৃত্তি করে।

পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ২৩শে মার্চের দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন,

> কর্তৃপক্ষ কি করিয়া এরূপ নির্মম ও অমানুষিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা আমার পক্ষে বুঝা শক্ত। প্রতিবাদ দিবসের প্রাক্কালে ১৪৪ ধারা জারী করার কোনই যৌক্তিকতা ছিল না। ঐ বিষয়ে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া ঘটনার জন্য আমি একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য দাবী জানাইতেছি।[১]

ঐ একই দিনে যুক্ত বাঙলার প্রাক্তন মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিমের একটি বিবৃতিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন,

> আজিকার সভ্য জগতে কোন সভ্য দেশের সরকারী অফিসারগণ কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ছাত্র ও যুবকদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলি চালাইয়া তাহাদের হত্যা করিতে পারে তাহা কল্পনাতীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বিবৃতি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, পুলিশই প্রথমে আক্রমণ চালায়। ছেলেদের বুলেটের আঘাতে দাবাইয়া রাখার সরকারী সিদ্ধান্তকে নগ্ন বর্বরতারই পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যে আল্লাহ ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নির্লজ্জ সরকারী জয়ঢাক ঢাকার মর্নিং নিউজ পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেওয়ার জন্য জঘন্যভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দু এম.এল.এ.রাই দায়ী এবং হিন্দু মাড়োয়ারী ও অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাবেই নারায়ণগঞ্জের হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সত্যকে সাহসের সহিত জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি মিল্লাত, আজাদ ও

★'ডন' পত্রিকার এই সম্পাদকীয়টি ২৪শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত হয়।– ব.উ.

www.pathagar.com

ইনসাফ পত্রিকার প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছি।* এই দুই দিনে আমরা দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণ ও ছাত্রকে হারাইয়াছি। তাহাদের পবিত্র স্মৃতি পূর্ববঙ্গের জনসাধারণকে চিরদিনই অনুপ্রেরণা জোগাইবে।[২]

২. পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট ও অন্যান্য বক্তব্য

২২শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর উপর ঐ রাত্রে পূর্ববাঙলা সরকার যে প্রেসনোট প্রদান করেন সেটি ২৩শে তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়,

> অদ্য অপরাহ্নের পর শহরের অবস্থা অনেকটা আয়ত্বে আসে। অদ্য নবাবপুর রাস্তায় পুলিশের গুলি চালনার পর মোট ৪৫ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২ জন নিহত হয়। অদ্য সকালের দিকেই অবস্থা খারাপ হইয়া উঠে এবং ইসলামপুর ও নবাবপুর এলাকায় কয়েকস্থানে লোকের ভীড় হয়, গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেরা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া লুটতরাজের উদ্দেশ্যে জনতার সহিত মিশে। অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনীর সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী আনয়ন করা হয়।
>
> 'মর্নিং নিউজ' প্রেসটি জনতায় পোড়াইয়া দেয়। কার্জন হল, হাইকোর্ট, নবাবপুর রোড, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রভৃতি স্থানে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলি চালনার ফলে আহত মোট ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২ ব্যক্তি নিহত হয়।[১]

এই প্রেসনোট ছাড়াও সরকারী সূত্র থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বক্তব্যে বলা হয় যে, সামরিক বাহিনীর লোকে জনতার উপর গুলি বর্ষণ ও বেয়নেট চার্জ এবং লুটতরাজ করেছে বলে কোন কোন সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ পর্যন্ত কোন দল বা জনসাধারণের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কোনরূপ সংঘর্ষ হয় নাই। এ যাবৎ শহরের বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনার যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কোন সংস্রব নাই। শুধু পুলিশই এইসব ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো।[২]

৩. ঢাকায় হরতাল ও মিছিল

২২শে ফেব্রুয়ারীর মতো ২৩শে ফেব্রুয়ারীও ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয় এবং তার ফলে সমস্ত দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।[১]

সকালের দিকে নাজিরাবাজার পশু হাসপাতালের কাছে এক জনতার

---

*আমি দৈনিক মিল্লাত এবং ইনসাফের এই সময়কার কোন কপি দেখার সুযোগ পাই নি কারণ অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এই পত্রিকাগুলির কোনো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। –ব.উ.

www.pathagar.com

উপর পুলিশের লাঠি চালনার ফলে ৪ ব্যক্তি আহত হন। তার মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নাজিরাবাজারের এই ঘটনা ছাড়া ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় জনতা অথবা ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের অন্য কোন সংঘর্ষ ঘটে নি।[২]

ঢাকা রেল কর্মচারীরা ২৩শে তারিখে ধর্মঘট পালন করেন। তাঁরা যথারীতি অফিসে উপস্থিত হলেও কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকেন। অনেক বিভাগের কর্মচারীরা কাজে যোগদান না করে অনুপস্থিত থাকেন। রেল কর্মচারীদের এই ধর্মঘট বেলা ১টা পর্যন্ত চলে এবং ঐ দিন মাত্র ৪টি ট্রেন চলাচল করে। সকালের দিকে যে সব রেল ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করা হয়েছিলো সেগুলি থেকে পরে কয়লা ফেলে দেওয়ার ফলে নির্ধারিত ট্রেনগুলি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চালু করা সম্ভব হয় নি।[৩]

সারাদিন হাজার হাজার লোক রাস্তায় চলাফেরা এবং পরিস্থিতির উপর আলাপ আলোচনা করেন, যদিও সে সময় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিলো। মোড়ে মোড়ে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য তাদের সঙ্গে জনতার কোন সংঘর্ষ ২৩শে ফেব্রুয়ারী আর ঘটে নি।[৪]

কালো ব্যাজ পরিধান করে শত শত লোক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের দিকে প্রায় সারাদিন যাওয়া আসা করেন। সেখানে মাইকযোগে বিদ্যমান পরিস্থিতি, জনগণের কর্তব্য এবং ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ক্রমাগত বক্তৃতা, লিফলেট ও পুস্তিকা থেকে পাঠ ইত্যাদি অব্যাহত থাকে। বেলা ২টার দিকে সেলিমুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে ২২শে তারিখে যাঁরা শহীদ হন তাঁদের জন্য গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, সেলিমুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকসহ প্রায় চার হাজার লোক যোগদান করেন।[৫]

এরপর বিকেলের দিকে সেলিমুল্লাহ হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উপস্থিত হয়ে ফজলুল হক ছাত্রদেরকে শান্তি বজায় রাখার জন্য উপদেশ দেন এবং তিনি নিজে ছাত্রদের দাবী জয়যুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন।[৬]

৪. বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সভা ও প্রস্তাব

২৩শে ফেব্রুয়ারী সারাদিনব্যাপী ঢাকায় বিভিন্ন ছাত্র ও পেশাগত সংগঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেগুলিতে পরিস্থিতির উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শাফিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিন্দা এবং সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া ঢাকা সিটি ছাত্রলীগের একটি জরুরী সভাতেও সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দা এবং বেসামরিক তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানানো হয়।[১★]

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস ঢাকা ও জগন্নাথ হলের ছাত্রেরা একটি যৌথ ছাত্রসভার মাধ্যমে সরকারের বর্বরোচিত কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন। এই সভায় নূরুল আমীনের পদত্যাগ এবং ঢাকা শহরে জারীকৃত ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।[২]

সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে ঢাকা কলেজ মুসলিম হোস্টেল কমনরুমে সমবেত ছাত্রদের একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ছাত্রেরা এই মর্মে দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, তাঁরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন এবং শহীদ ভাইদের রক্তের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।[৩]

তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ এবং আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেলে ছাত্রেরা পৃথক পৃথক সভার মাধ্যমে ছাত্র ও জনগণের উপর নির্মম পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন। আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রেরা বে-সরকারী তদন্তের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে অপরাধী সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিশদের কঠোর শাস্তি দাবী করেন।[৪]

বিকেল ৫টার দিকে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে তাঁরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন,

> সরকারের কার্যকলাপের ফলে বহু ছাত্রের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং সরকারের নিকট হইতে ইহার কৈফিয়ত তলব করিতেছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য যে সকল কর্মচারী দায়ী, এই সভা অবিলম্বে তাহাদের অপসারণ দাবী করিতেছে।
>
> এই সভা তাহার সকল শাখা প্রতিষ্ঠানকে ১৪ দিন পর্যন্ত শোক দিবস পালনের এবং ভাষা আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিতেছে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করা পর্যন্ত নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ বিশ্রাম গ্রহণ করিবে না।[৫]

বিশ্ববিদ্যালয় ইকবাল হলে ছাত্রেরা একটি সভার অনুষ্ঠান করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়,

> গত শুক্রবার সমগ্র শহরের বুকে নিরীহ জনসাধারণ ও ছাত্রদের উপর ২ দিনব্যাপী পুলিশের নির্মম গুলি চালনার প্রতিবাদ করিয়া এই সভা সরকারের

★২৪শে ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও সভা দুটি অনুষ্ঠিত হয় ২২শে ফেব্রুয়ারী। ব.উ.

www.pathagar.com

চণ্ডনীতি ও বর্বরোচিত পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

এই সভা নূরুল আমীন সরকারের পদত্যাগ দাবী ও তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সভা জনগণের নিরপেক্ষ আদালতে কুখ্যাত নূরুল আমীন মন্ত্রীসভার বিচার প্রার্থনা করিতেছে।[৬]

২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের কেন্দ্রীয় দফতর একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন,

> ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশী জুলুম চালানো হইয়াছে তাহার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুষ্কার্যের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও কঠোর শাস্তি দাবী জানাইতেছি। শহীদদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ জনসাধারণকে শুধু এই শপথই নিতে হইবে বাংলা ভাষার দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি এবং পুলিশী নৃশংসতার প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত আজিকার এই সংগ্রামের বিরাম নাই।[৭]

ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের কার্যকরী সংসদের এক বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের উপস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপ করে ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ও হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে পুলিশী জুলুমের দ্বারা নূরুল আমীন সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিচার বিভাগের প্রতি যে অমর্যাদা এবং অসম্মান প্রদর্শন করেছেন তার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আদর্শ শাস্তি দাবী করা হয়।[৮]

ঢাকায় অবস্থিত ব্যাংকসমূহের কর্মচারীরা ২৩শে ফেব্রুয়ারী এক বৈঠকে মিলিত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন,

> এই সভা সরকারের জুলুমবাজী কার্যকলাপের ও ছাত্র জনসাধারণের উপর নির্মমভাবে গুলি চালনার প্রতি তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে।
>
> এই সভা সরকারকে অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করিবার দাবী জানাইতেছে।
>
> এই সভা অনতিবিলম্বে কুখ্যাত ১৪৪ ধারা শহরের বুক থেকে প্রত্যাহার এবং ধৃত ছাত্র ও জনসাধারণের মুক্তি দাবী করিতেছে।
>
> এই সভা নিরীহ জনসাধারণের উপর গুলি চালনার বেসরকারী তদন্ত দাবী করিতেছে এবং যে সমস্ত কর্মচারী এই অন্যায় গুলি চালনার মধ্যে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের অবিলম্বে অপসারণ দাবী করিতেছে।[৯]

২৩শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে ঢাকা বণিক সমিতির কার্যকরী কমিটির একটি জরুরী সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়,

> পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে যাহারা আহত বা নিহত হইয়াছেন, ঢাকা বণিক সমিতি তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছে।
>
> শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার জন্য ১৪৪ ধারা জারীই দায়ী

www.pathagar.com

বলিয়া এই সভা মনে করে এবং অবিলম্বে ইহার প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এই সভা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।[১০]

এই সব সভা ও বৈঠক ছাড়াও ২২শে ফেব্রুয়ারী কৃষক মজদুর লীগ নামে একটি সংগঠনের এক বৈঠকে সরকারের কার্যকলাপের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা এবং এ বিষয়ে বেসরকারী তদন্তের দাবী জানানো হয়।[১১]

পূর্ব বাঙলার এই সব সভা এবং সাংগঠনিক বৈঠক ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি সংগঠন বাংলা ভাষার সমর্থনে এবং ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারীর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান, সভা অনুষ্ঠান ও প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন। সমাজতন্ত্রী দল অবিলম্বে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের আদেশ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানায়।[১২]

২৩শে ফেব্রুয়ারী করাচীর গণতন্ত্রী ছাত্র ফেডারেশনের কার্য-নির্বাহক সমিতির এক সভায় ঢাকায় শান্তিপ্রিয় এবং অহিংস ছাত্রদের উপর পুলিশের নৃশংস গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছাত্রগণ কোনরূপ অশান্তি সৃষ্টি করে নাই বলে যে বিবৃতি প্রদান করেন কমিটি তার উল্লেখ করে পুলিশী জুলুম সম্পর্কে আশু তদন্তের দাবী করেন।[১৩★]

৫. পরিবহন মালিকদের সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বৈঠক

২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণের পর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বাস রুটসহ অন্যান্য রুটে পরিবহন শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন এবং সেই ধর্মঘট অনির্দিষ্টভাবে চলতে থাকে। এই অবস্থায় ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী ২৩শে ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় জেলা কোর্ট বিল্ডিং-এ অবস্থিত তাঁর অফিসে ঢাকার পরিবহন মালিকদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন। ঐ বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন এন.এ. লস্কর, মতি সর্দার এবং আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া।[১]

পরিবহন ধর্মঘট ভাঙার জন্য বদ্ধপরিকর কোরেশী পরিবহন মালিকদেরকে ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়ে বাসট্যাক্সি রাস্তায় চালু করার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তাঁরা নির্দেশমতো কাজ না করলে সরকার তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করবেন এবং অন্যান্য সব সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে। এই অবস্থায়

★উপরে উল্লেখিত বহু সংগঠনের সভা সাংগঠনিক বৈঠকের রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এ ধরনের কোন বৈঠকের সংবাদপত্র রিপোর্ট আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। -ব.উ.

www.pathagar.com

পরিবহন মালিকেরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে চুপচাপ থাকেন। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর অবশেষে মতি সর্দার, যিনি সম্ভবত পরিবহন মালিকদের মধ্যে একমাত্র অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, বলেন, "এতোদিন তো আমরা জবানের লড়াইয়ের মধ্যে আছিলাম না। কিন্তু এহন যহন দেশেই আমরা বিদেশী হইছি তখন আর কি করা।" কোরেশী বাংলা জানতেন। একথা শুনে তিনি রাগান্বিতভাবে মতি সর্দারকে জিজ্ঞেস করে, "দেশে বিদেশী হইছি একথার মানে কি?" এর জবাবে মতি সর্দার সংক্ষেপে বলেন, "আপনিই বুইঝ্যা দেখেন।" মতি সর্দার সাধারণত খুব শক্ত কথা বলার লোক ছিলেন না। কিন্তু সেদিন সকালে তিনি বেশ কঠোর মনোভাবই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ ঢাকায় গত দু'তিন দিনের ঘটনাবলী দেখে তাঁর ধারণা জন্মেছিলো যে পাঞ্জাবীরাই সবকিছু অঘটনের জন্য দায়ী।[২]

মতি সর্দারের এই জবাবের পর কোরেশী আর কিছু না বলে পুনরায় ধর্মঘট ভাঙার কথা তুললে পরিবহন মালিকেরা তাঁদের অসুবিধার কথা বলেন। তাঁরা জানান যে, গাড়ীর ড্রাইভাররা সকলে ধর্মঘট করে আছে এবং তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া তৎকালীন পরিস্থিতিতে রাস্তায় গাড়ী নামানো ভয়ানক বিপজ্জনক কারণ সেটা করলে উত্তেজিত জনতা সেগুলি পুড়িয়ে ফেলতে পারে। এর জবাবে কোরেশী বলেন যে, সেই অবস্থায় বীমা কোম্পানী তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ দান করবে। কিন্তু পরিবহন মালিকেরা তাঁকে জানান যে, তাঁদের গাড়িগুলি এ্যাক্সিডেন্ট এর জন্য বীমা করা আছে কিন্তু দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য নয়। কাজেই দাঙ্গা হাঙ্গামায় গাড়ীর ক্ষতি হলে বা তা নষ্ট হলে বীমা কোম্পানী থেকে তার কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়া আইনত সম্ভব নয়। এই সব আলোচনার সময় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ইদরিস একবার অল্পক্ষণের জন্য ভিতরে আসেন। সেদিনকার এই বৈঠক বেলা প্রায় ১টা পর্যন্ত স্থায়ী হলেও শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই ব্যতীতই তা শেষ হয়।[৩]

৬. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠক

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রের বৈঠকে এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, সেই কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ২১শে ফেব্রুয়ারী যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয় তাহলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু ২১শের গুলিবর্ষণের পরবর্তী পর্যায়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তাতে সকলেই এ বিষয়েই একমত হলেন যে, আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় কমিটিকে আবার সক্রিয় করা দরকার। সেই অনুযায়ী কাজী গোলাম মাহবুব ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩টায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে কারারুদ্ধ কর্মী আজমল হোসেনের কামরায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক আহ্বান

www.pathagar.com

করেন। বৈঠকটিতে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম।[১]

বৈঠকে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মধ্যে একটি ছিলো ঢাকা থেকে নিজ নিজ এলাকায় যে ছাত্রেরা যাবেন তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা করা। এই সব ছাত্রদের অনেকেরই ট্রেনভাড়া না থাকায় তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় পথ খরচ দেওয়ার সিদ্ধান্তও এই সঙ্গে গৃহীত হয়। এর ফলে দেশের ব্যাপকতম এলাকায় আন্দোলনের বিস্তার ঘটানো এবং সংগ্রাম কমিটির বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়।[২]

বৈঠকের এক পর্যায়ে আন্দোলন পরিস্থিতি এবং তখনকার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আবুল হাশিম এবং অলি আহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় সে সম্পর্কে অলি আহাদ বলেন,

> সভাপতির আসন হইতে জনাব আবুল হাশিম আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করেন, "অলি আহাদ, আন্দোলনকে আর কতদূর নিতে চাও এবং আর সামনে নেওয়া সম্ভব কিনা?" সভাপতির প্রশ্নের জবাবে আমি বলি যে, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সম্ভাব্য চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং আন্দোলনে ভাটার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। তদুপরি অবিরাম আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার মতো সাংগঠনিক শক্তি এই পর্যায়ে আমাদের নাই। সুতরাং honourable retreat বা সম্মানজনক পশ্চাদপসরণ আমার দৃঢ় মত।"[৩]

আন্দোলনের এই অবস্থায় তাকে আরও কিছুদূর টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার থাকায় ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট এবং ৫ই মার্চ সারা পূর্ব বাঙলাব্যাপী হরতাল আহ্বান করে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪]

৭. ছাত্রাবাস পরিস্থিতি ও শহীদ মিনার

এই সময় আন্দোলনে ভাটা পড়লেও মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এবং সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল উভয় ছাত্রাবাস থেকেই আন্দোলন যতখানি সম্ভব পরিচালনা করার চেষ্টা হচ্ছিলো। দুই জায়গাতেই কনট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছিলো। কিন্তু এই দুই কনট্রোল রুমের মধ্যে তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না। উপরন্তু দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিলো। সেলিমুল্লাহ হলে যাঁরা ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁরা ছিলেন মোটামুটি ইসলামপন্থী। অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা সম্পর্কিত ছিলেন তাঁদের কেন্দ্র ছিলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেল। আসল আন্দোলন পরিচালনার কাজ তুলনামূলকভাবে মেডিকেল হোস্টেল থেকে বেশী হলেও সেলিমুল্লাহ হল থেকে অব্যাহত মাইক প্রচারের ফলে সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল যে, ঐ হলটিই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। এ জন্য জনগণ বিপুল সংখ্যায় সেখানে মিছিল সহকারে এবং জনে জনে উপস্থিত হতেন এবং প্রায়

www.pathagar.com

সারাদিনই মাইক প্রচার চলাকালে সেলিমুল্লাহ হলের সামনে ভীড় থাকতো।[১]

সেলিমুল্লাহ হলে যে মাইকটি ব্যবহৃত হচ্ছিলো সে মাইকটি সংগ্রহের বিষয়ে হল ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হেদায়েত হোসেন চৌধুরী বলেন,

> সেলিমুল্লাহ হলে আমরা যে মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করতাম সেটা আসলে ছিলো রেজায়া করিম এ্যাডভোকেটের। তিনি সে সময় নূরুল আমীনের উপদেষ্টা ছিলেন কিন্তু আমাদের সাথেও যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর এক ভাইয়ের মাধ্যমে তাঁর বাসায় গিয়ে মাইকটা নিয়ে আসা হয়েছিলো।[২★]

বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ছাত্রাবাস চামেলী হাউসের ছাত্রীরা এই সময় পার্শ্ববর্তী আজিমপুর কলোনী অঞ্চলে গিয়ে কিছু প্রচার কাজ এবং সেই সঙ্গে তহবিলও সংগ্রহ করেন।[৩] ২৩শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আজিমপুর। কলোনীর মেয়েরা একটি প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করেন এবং কমলাপুর ও অন্যান্য দূর এলাকা থেকে এসে মেয়েরা তাতে যোগদান করেন। কয়েক হাজার মহিলা এই সভায় একত্রিত হয়ে সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।[৪]

সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মতো ঢাকার জগন্নাথ কলেজের হোস্টেলেও একটি মাইক স্থাপন করে সেখান থেকে প্রচার কাজ চালানো হয়। ২৩ শে ফেব্রুয়ারী আনিসুজ্জামান তাঁর আব্বার গাড়ীতে (ডাক্তার লেখা) করে লক্ষ্মীবাজারের একটি দোকান থেকে মাইক্রোফোন ভাড়া করে জগন্নাথ কলেজে নিয়ে যান এবং কলেজ হোস্টেলের একটি কামরায় তা স্থাপন করা হয়। সেই মাইক থেকে ছাত্রেরা বক্তৃতা করতে থাকেন। এই ছাত্রদের মধ্যে আনিসুজ্জামানও ছিলেন একজন।[৫] পরে ২৫শে তারিখে পুলিশ হোস্টেলে ঢুকে মাইকটি নিয়ে চলে যায়।[৬] ঐ একই দিনে ফজলুল হক মুসলিম হল থেকেও পুলিশ জোরপূর্বক মাইক নিয়ে যায়।[৭]

২৩শে তারিখের একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ স্মৃতি সৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ। পুলিশ শহীদদের লাশ সরিয়ে ফেলে সেগুলি গোপনে দাফন করার পর থেকে আওয়াজ উঠেছিলো 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক'। এই আওয়াজকে আরও নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য যে জায়গায় ছাত্রেরা গুলির আঘাতে প্রথম শহীদ হন সেখানে সেই ১২নং শেডের পাশে, মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা একটি শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাঁদেরই সক্রিয় উদ্যোগে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ২৩শে তারিখে রাত্রের মধ্যেই সেখানে শহীদ মিনারটি গড়ে

★এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে আন্দোলনের এই পর্যায়ে ছাত্রদের করো কারো সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের সরকার পক্ষীয় লোকের যোগাযোগ। এই ধরনের যোগাযোগের কথা খায়রুল কবীরের রিপোর্টের মধ্যেও দেখা গেছে (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩১৫)।

www.pathagar.com

উঠে। এ বিষয়ে শহীদ মিনারটির নকশা প্রণয়নকারী মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্র সাঈদ হায়দার বলেন,

> এটাকে স্বতঃস্ফূর্ত একটা পরিকল্পনা বলা চলে। দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র শহীদ মিনার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারীর রাত থেকেই শহীদ মিনার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে শহীদ মিনার তৈরীর কাজ শুরু হয়। ২৩ তারিখে বিকেল থেকে শুরু করে সারারাত সেখানে কাজ হয় (কার্ফু থাকা সত্ত্বেও)... ইট-বালির কোন অভাব ছিলো না। মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ইট বালি ছিলো। ছাত্ররাই ইট বয়ে এনেছে। বালির সঙ্গে মিশিয়েছে। দুজন রাজমিস্ত্রী ছিলো। তাদের নাম বলতে পারবো না। আমাদের মেডিকেল হোষ্টেলে প্রায় তিনশ ছাত্র ছিল। তাদের সকলেই সেদিন কোন না কোন কাজ করেছিল। আর শহীদ মিনারের নকশা তৈরী করেছিলাম আমি। শহীদ মিনারের কাজ শেষ হলে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল এবং নকশাটি সেখানেই টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিল।...
>
> শরফুদ্দীন (তাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার বলতাম। সে অঙ্ক ভালো জানতো...) শহীদ মিনার নির্মাণের কাজে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিল। এছাড়া মাওলা, হাশেম, জাহেদ, আলিম, জিয়া আরও অনেকে শহীদ মিনার নির্মাণে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। এছাড়া ছিল আমাদের অনেক বয়-বেয়ারা। এরাই ছিল সেদিনকার বড় কর্মী। নকশায় সাড়ে ৯ ফুটের পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ হওয়ার পর দেখা গেল মূল পরিকল্পনাকে তা ডিঙ্গিয়ে গেছে। মিনারটি সম্ভবতঃ ১১ ফুট তৈরী হয়েছিল। বদরুল আলমও মিনার নির্মাণে সাহায্য করেছিল। তার হাতের লেখা ছিল চমৎকার। কাগজে লিখে মিনারের গায়ে সেঁটে দিলে মর্মর পাথরের মতো দেখাতো। আজকের শহীদ মিনার যেখানে, প্রায় তার কাছাকাছি মিনারটি তৈরী করা হয়েছিল।...শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে এনে ২৪শে ফেব্রুয়ারী মিনারটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। আমি সেখানে ছিলাম।[৮]

পরে পরিষদ সদস্যপদ থেকে ইস্তফাদানকারী আজাদ সম্পাদক, আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে দিয়ে শহীদ মিনার দ্বিতীয়বার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন বলা হলেও আসলে শহীদ মিনার একটি সমাবেশ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কারণেই খুব সম্ভবত এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

৮. মুসলিম লীগ সংগঠন ও সরকারের তৎপরতা

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মধ্যেও যথেষ্ট ভয়ভীতি ও সঙ্কট সৃষ্টি করেছিলো। নূরুল আমীন এবং চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভও এই সময় মুসলিম লীগ দল ও সরকারের মধ্যে দেখা দেয়। চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ একজন আমলা হলেও তিনিই সে সময় ছিলেন পূর্ব বাঙলায় কেন্দ্রীয় সরকারের আসল প্রতিনিধি এবং সব ধরনের মূল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। নূরুল আমীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আজিজ

www.pathagar.com

আহমদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো না।

এ কথার সত্যতা ভাষা আন্দোলনের সময়কার বিভিন্ন ঘটনা এবং মুসলিম লীগ সংগঠন ও সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নানা রিপোর্ট থেকে খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

পূর্ব বাঙলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা)। সংগঠনের মধ্যে সে সময়ে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। কিন্তু আজিজ আহমদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিলো না। ২৩শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী সম্পর্কে মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ত্রাস ও দোদুল্যমানতা এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীত্বের উপর আজিজ আহমদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্পাদক মোহন মিঞার বক্তব্য এ ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য।[১]

ফরিদপুর জেলা বোর্ডের নির্বাচন উপলক্ষে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মোহন মিঞা ফরিদপুর যান এবং সেখানে ২১শে তারিখে ঢাকার ঘটনাবলীর বিস্তারিত সংবাদ পান। তারপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা রওয়ানা হন।

এ বিষয়ে তিনি বলেন,

> ২২শে তারিখের কলকাতার Statesman পত্রিকায় আমি সর্বপ্রথম একুশের ঘটনাবলীর বিষয়ে জানতে পারলাম।★ তখন ফরিদপুরে একটিমাত্র টেলিফোন ছিলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায়। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম এবং নূরুল আমীনকে টেলিফোন করলাম। সে বললো শীঘ্রই এসো। গোয়ালন্দ থেকে সে সময় স্টীমার ছাড়তো। আমি তাড়াতাড়ি তাতে উঠলাম।
>
> ২২শে তারিখে ভাগ্যকুলে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই শুনতে পেলাম দূর থেকে ভয়ানক চীৎকার আসছে। তারপর সেখানে দেখা গেলো চারদিক লোকে লোকারণ্য। তারা নূরুল আমীনের এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে। আমি ডেক-এ বের হওয়ার সাথে সাথে আমাকে দেখে আরও বেশী চীৎকার শুরু করে দিলো। আমি তখন ভেতরে ঢুকে গেলাম।

স্টীমার মুন্সীগঞ্জ পৌঁছানোর পর খুব সম্ভবত একজন মুসলিম লীগ কর্মী এসে আমাকে বললো, 'আপনি নারায়ণগঞ্জ যাবেন না। পথে আপনাকে মেরে ফেলতে পারে।' ঢাকা থেকে একটা সরকারী লঞ্চ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আমি তাড়াতাড়ি তাতেই উঠে বসলাম। রাত্রে ঢাকাতে কারফিউ ছিলো। রাত্রি গোটা দশেকের সময় আমি ঢাকাতে নবাববাড়ীর সামনে ওয়াইজ ঘাটে গিয়ে নামলাম। সেখানে তখন কয়েকজন M.L.A ছিলো। তাদেরকে নিয়ে আমি

★সে সময় কলকাতার ইংরেজী দৈনিক Statesman নিয়মিত পূর্ব বাঙলায় আসতো এবং ট্রেনযোগে তা দুপুরের মধ্যেই ফরিদপুর পৌঁছাতো। Statesman এ একুশের ঘটনাবলী জানতে পারার অর্থ খুব সম্ভবত এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিষয় জানা। কারণ রেডিওতে যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিলো তাতে গুলি চালনা এবং ১ জন ছাত্রের মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন কিছুই ছিলো না। -ব.উ.

www.pathagar.com

নবাববাড়ীর মধ্যে দাঁড়ানো একটা গাড়ীতে উঠে বর্ধমান হাউস-এ গেলাম।

এইভাবে ফরিদপুর থেকে ঢাকা পৌঁছানোর কাহিনী বর্ণনার পরে ঐ রাত্রে, অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে, বর্ধমান হাউসে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সভা এবং সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে মোহন মিঞা যে নাটকীয় বর্ণনা দেন তা হলো এই,

> নূরুল আমীনের বাড়ীতে তখন পুলিশ ভর্তি। উপরতলার একটা ঘরে পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং হচ্ছে। ফকির আবদুল মান্নান, তফজ্জল আলী প্রভৃতি বক্তৃতা দিচ্ছে। তারা বলছে যে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যাতে করে মুসলিম লীগকে বাঁচাতে হলে নূরুল আমীনের পদত্যাগ ছাড়া সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। নূরুল আমীন যদি ইস্তফা দিতে দেরী করেন তাহলে লোকের Sentiment ও feeling আমাদের বিরুদ্ধে আরও বেড়ে যাবে।
>
> দেখলাম যে মিটিংএ যে সমস্ত M.L.A★ এবং মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই কাঁপছেন।
>
> মিটিং এর অবস্থা দেখে আমি ভাবলাম এর কোন অর্থ নেই। আমি জানতাম যে, গুলি নূরুল আমীন করে নি। তার কোন দোষ নেই। নূরুল আমীন গেলেই যে মুসলিম লীগ মন্ত্রীত্বকে ছেড়ে দেবে তা নয়। নূরুল আমীন গেলে অন্যদেরকেও তারা তাড়াবে এবং তার পর মুসলিম লীগকেও। গুলি তার ভুল হতে পারে কিন্তু তাকে replace করা যেতে পারে না। কাজেই আমি উপস্থিত সকলকে বললাম যে, তাঁরা ভয় পেয়ে যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন তাতে কোন কাজ হবে না। যতদূর মনে হয় নূরুল আমীন নিজেও ইস্তফা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো। আমি বললাম যে, তাদের সকলের চিন্তা ভুল। তাঁরা মনে যতই করুন নূরুল আমীন কিন্তু আসল target নয়। নূরুল আমীন গুলি করে নি এবং সে target নয়। কাজেই মুসলিম লীগের ভালো চাইলে সকলকে শক্ত হতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।

মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এই বৈঠক সম্পর্কে সৈয়দ নুরুদ্দীন বলেন,

> ২৩শে তারিখে সন্ধ্যাতে আমরা নূরুল আমীন সাহেবের বাসাতে গেলাম। তখন সেখানে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভা বসেছিলো। একটি ফুটোর মধ্যে দিয়ে আমরা ভিতরে কি হচ্ছিলো দেখছিলাম এবং শুনছিলাম। সেই সভাতে সব থেকে বেশী জোরালো কথা বলছিলেন মোহন মিঞা। তিনি নূরুল আমীনকে তাঁর দুর্বলতা এবং দোদুল্যমানতার জন্য দোষারোপ করে বলছিলেন যে, তদানীন্তন অবস্থার মুখে পড়ে একবার নতি স্বীকার করলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। কাজেই কঠোর হস্তে সব কিছু দমন করতে হবে।[২]

এ সম্পর্কে জহুর হোসেন চৌধুরী বলেন,

> আমরা শুনেছি যে, ২৩শে তারিখে রাত্রে নূরুল আমীনের বাসাতে যে গ্রুপ মিটিং হয়েছিলো মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির তাতে মোহন মিঞা নূরুল আমীনকে জব্দ করার চেষ্টা করেছিলো। নূরুল আমীন এ জন্যই Vote of

---

★মেম্বর লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লী, পূর্ব বাংলা বিধান পরিষদ সদস্য। -ব.উ.

www.pathagar.com

Confidence দাবী করেছিলেন এবং তাঁকে তা দেওয়া হয়েছিলো।[৩]

সে রাত্রে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলে যে আস্থা ভোট গ্রহণ করা হয় সে বিষয়ে তৎকালীন মন্ত্রী তফজ্জল আলী বলেন,

> ২৩শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং-এ আমি নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলাম বলে আমার স্মরণ নেই। অন্য কাউকে দিয়ে নূরুল আমীনকে replace করার কোন চিন্তা ছিলো না। আমি শুধু বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, গুলিবর্ষণের জন্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত না হলে মন্ত্রী হিসেবে কাজ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।[৪]

নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে তফজ্জল আলী ২৩শে তারিখের বৈঠকে কিছু বলেছেন কিনা সেটা তিনি স্মরণ করতে না পারলেও তাঁর শেষ অংশের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সমালোচনা তাঁদের যথেষ্ট ছিলো এবং থাকারই কথা। এ সম্পর্কে মুসলিম লীগের তৎকালীন যুগ্ম-সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান বলেন,

> ২৩শে তারিখে পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং-এ সকলে বাংলাভাষাকে স্বীকার করে নিলো। আমি, যশোরের শামসুর রহমান, বাকী সাহেব নূরুল আমীনের imbecility র অনেক সমালোচনা করলাম। তফজ্জল আলী খুব critical মোহন মিঞা ফরিদপুর থেকে সেই রাত্রে এলেন। তিনি গোড়া থেকেই স্বীকৃতির পক্ষে ছিলেন। নূরুল আমীনকে তিনি খুব বকাবকি করলেন। তিনি বললেন, বাংলা সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং ছাত্রদেরকে face করা উচিত ছিলো ইত্যাদি।[৫]

মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এই বৈঠকে নূরুল আমীনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের চেষ্টা সম্পর্কে নূরুল আমীন বলেন,

> আমাকে অপসারণের প্রচেষ্টা কেউ করে নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেছিলাম যে আমি আর continue করবো না, পদত্যাগ করবো। কিন্তু পার্লামেন্টারী পার্টি আমাকে তাদের কাজ পরিচালনার জন্য রাখতে চেয়েছিলো এবং সে জন্য সেদিন একটা আস্থা ভোট গৃহীত হয়েছিলো।
>
> মৃত্যু এবং অন্যান্য ঘটনায় আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। যে সব ছাত্র মারা গিয়েছিলো তাদের নাম পাওয়ার জন্য আমি যথাসাধ্য করেছিলাম এবং তাদের নাম প্রকাশ করেছিলাম।[৬]

পার্লামেন্টারী পার্টির সেদিনকার বৈঠকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারীদের উপরোক্ত সব বক্তব্যে কিছু পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সেদিন নূরুল আমীনের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছিলো এবং তার ফলেই তাঁর প্রতি একটা আস্থা ভোটের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকার সে সময় নূরুল আমীনকেই বহাল রাখতে না চাইলে হয়তো তাঁর মন্ত্রীসভার পতন ঘটতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আসল প্রতিনিধি চীফ সেক্রেটারী আজীজ আহমদ নূরুল আমীনকে

www.pathagar.com

মুখ্যমন্ত্রী রূপে বহাল রাখতেই চেয়েছিলেন এবং অন্তরালে থেকে এ ব্যাপারে যা কিছু করণীয় তা করেছিলেন। আজীজ আহমদের এ কাজ করার অন্যতম প্রধান কারণ এই ছিলো যে, ঐ সময়ে ঢাকায় যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো তার পরিণতিতে নূরুল আমীন মন্ত্রীসভার পতন হলে শেষ পর্যন্ত তার দায়-দায়িত্ব বহুলাংশে তাঁর উপরই বর্তাতো।

বর্ধমান হাউসের মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি বৈঠক চলাকালে এম.এল.এ.দের মধ্যে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিলো সে বিষয়ে মোহন মিঞা বলেন,

> মেম্বাররা বললো যে, তাদেরকে ওয়াইজঘাটের পার্টি অফিসে মেরে শেষ করে ফেলবে। আমি তাদেরকে ভয় পেতে নিষেধ করলাম এবং বললাম যে, তাঁদের জীবনের নিরাপত্তার উচিতমতো ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে তাঁদেরকে শক্ত হতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।
>
> আমার এই বক্তব্যের পর আলোচনা এবং আবহাওয়ার গতি পরিবর্তিত হলো। আমি নূরুল আমীনের সাথে আলোচনা করে সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলাম। স্থির হলো মেম্বাররা কেউই সে রাত্রে ওয়াইজঘাটের পার্টি অফিসে যাবেন না। বর্ধমান হাউসেই তাঁরা খেয়ে দেয়ে রাত্রি যাপন করবেন। যাঁরা শহরে নিজের নিজের বাড়ীতে অথবা অন্যান্য বোর্ডিং ইত্যাদিতে ছিলেন তাঁদেরও নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা হলো। পার্টি হাউসের থেকে বিছানাপত্র সেই রাত্রেই পুলিশের পাহারায় বর্ধমান হাউসে নিয়ে আসা হলো।[৭]

২৩শে রাত্রে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকের পর বর্ধমান হাউসেই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠক সম্পর্কে মোহন মিঞা বলেন,

> সেই রাত্রেই বর্ধমান হাউসে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একটি emergent মিটিং হলো। এই মিটিং পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং-এর পর হয়েছিলো। মিটিং ২৪শে তারিখের ভোর পর্যন্ত চলেছিলো। এই সভাতে আমরা গুলি condemn করলাম। judicial enquiry চাইলাম। অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও আমরা সুপারিশ করলাম। এ সব খবর সংবাদপত্রে বের হয়েছিলো।[৮]

আসলে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ২৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ পর পর তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই বৈঠকের যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো তা হলো নিম্নরূপ,

> পূর্ব-পাকিস্তান মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনসাধারণকে দৃঢ় আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, গণপরিষদ কর্তৃক যাহাতে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হয় তজ্জন্য লীগ পার্লামেন্টারী দলের সোপারেশ আদায়ের অভিপ্রায়ে ওয়ার্কিং কমিটি সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন।
>
> প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিনব্যাপী বৈঠক গতকল্য (সোমবার) সমাপ্ত হইয়াছে।

www.pathagar.com

ওয়ার্কিং কমিটি ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত লোকদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণের জন্য যে সকল শত্রু চেষ্টা করিতেছে তাহাদের আক্রমণাত্মক মতলব হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করিতে জনসাধারণ ও ছাত্রবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্যের জন্যও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আবেগময় আবেদন জানানো হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হইয়াছে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে কয়েকজন ছাত্র ও সাধারণ লোক নিহত হওয়ায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং পুলিশের কাজের তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া ২৩শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই; আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য জনসাধারণ প্রকাশ্যে প্ররোচিত হইতেছে এবং পরিস্থিতিকে আরও অবনত করার জন্য হিংসাত্মক কাজ অবাধে চলিতেছে বলিয়া কমিটি গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

গভীর উৎকণ্ঠার সহিত কমিটি আরও লক্ষ্য করিতেছে যে, কম্যুনিষ্ট ও বিদেশী দালালগণ প্রচুর উপকরণ লইয়া পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশ করিতেছে এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সহযোগিতায় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আন্দোলনের মোড় ঘুরাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহারা ট্রেন লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া এবং জনসাধারণকে মৃত্যুর অথবা মারপিটের ভয় দেখাইয়া সরকারকে অচল করিয়া ফেলার জন্য পরিকল্পনা করিতেছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে ও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে তাহারা ধ্বংসাত্মক অভিযান শুরু করিয়াছে।

বিপুল ত্যাগ রক্তক্ষয় এবং কৃচ্ছ্রসাধনার মারফৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে ওয়ার্কিং কমিটি স্বদেশপ্রেমিক জনসাধারণ ও ছাত্রদের নিকট আবেদন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে শত্রুগণ পাকিস্তানকে গড়িয়া তোলার কাজে বাধাদানে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানী জনসাধারণ সর্বদাই তাহাদের বদমতলব বানচাল করিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হইয়াছে। যে ছাত্র ও জনসাধারণের ত্যাগের ফলে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে তাঁহারা যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরাইয়া আনিয়া পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন তজ্জন্য কমিটি আবেদন জানান।

ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসে ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা এত অপরিহার্য আর কখনও ছিল না। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিয়া সারা প্রদেশব্যাপী আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষ করিয়া লীগ কর্মীদের নিকট আবেদন করেন।[৭]

জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মুসলিম লীগ সংগঠন ও সরকার ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিজেদের প্রস্তাবের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেছিলো তার স্বরূপ অনুধাবন করতে সে সময় কারো অসুবিধে হয় নি। উপরন্তু তাদের এইসব বক্তব্য জনগণের থেকে

www.pathagar.com

তাদের বিচ্ছিন্নতা আরও বৃদ্ধি করেছিলো। ২৪শে তারিখে সরকার প্লেন থেকে যে লিফলেট দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়েছিলো তার কোন প্রভাবও জনসাধারণের উপর পড়ে নি।

২৩শে ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রের ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে মোহন মিঞা বলেন,

> আমি সেই রাত্রে নূরুল আমীনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সে হাসপাতালে গিয়ে আহতদেরকে দেখে এসেছিলো কিনা। সে উত্তর দিলো যে সে যায় নি। তখন আমি বললাম যে আমি যাবো। সকলে আমাকে নিষেধ করলো। বললো যে আমাকে মেরে ফেলবে। আমি বললাম, সে যাই হাক এটা আমার কর্তব্য। আমি সেই ২৩-২৪শের রাত্রে মেডিকেল কলেজে গেলাম। আমার সাথে অন্য কে গিয়েছিলো আমার মনে নেই। আমার এটুকু মনে আছে যে, আমি যখন হাসপাতালের মধ্যে ঘুরছিলাম তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা আমার দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে কটমট করে খুব তাকাচ্ছিলো। আমার Visit টার খবর প্রেসে পাঠিয়েছিলাম।[১০]

এ সম্পর্কে শাহ আজিজুর রহমান বলেন,

> সেই ২৩শে রাত্রে আমি মোহন মিঞার সাথে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত ছাত্রদেরকে দেখতে গেলাম। মুসলিম লীগ পার্টির লোকজনদের মধ্যে অনেকে বাড়ী যাওয়া সম্ভব নয় বলে বর্ধমান হাউসেই রাত্রে থেকে গেলো। সেদিনই Assembly Prorogue করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।[১১]

পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা সম্পর্কে মোহন মিঞার বক্তব্য হলো নিম্নরূপ :

> রাত্রে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বর্ধমান হাউসে ফিরে গিয়ে আমি নূরুল আমীনকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি করা যায়? সে বললো, পরদিন সে Assembly face করবে কিভাবে তা বুঝতে পারছে না। আমি বললাম Assembly Sine Die postpone করে দিতে। কিন্তু নূরুল আমীন বললো যে ২৪শে তারিখে postponed হয়ে গেলে ৩১শে মার্চের মধ্যে যদি বাজেট পাশ না হয় তাহলে মিনিস্ট্রি চলে যাবে। আমি তাকে বললাম অতদূর ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে আপাতত সেই সময়কার বিষয়ে মনোযোগ দিতে এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে। নূরুল আমীন তখন জানতে চাইলো কিভাবে Assembly postpone করা যায়। কারণ স্পীকার করিম সাহেব তো তাতে রাজী হবেন না। আমি তখন নূরুল আমীনকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে, সে ভার আমি নিচ্ছি। সেই রাত্রেই আমি করিম সাহেবের বাড়ী গিয়ে তাঁকে প্রায় জোর-জবরদস্তি এ ব্যাপারে রাজি করলাম। তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন। রেডিও, খবরের কাগজে Assembly Session postponed হওয়ার খবর প্রচার করা হলো এবং সদস্যদেরকে নিজের নিজের জেলায় ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থাও নেওয়া হলো।[১২]

২৩শে তারিখে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর মুসলিম লী গর পক্ষ থেকে প্লেনে করে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট ছড়ানো

www.pathagar.com

হয়। সরকারী প্লেনকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রচার কাজে এইভাবে খোলাখুলি ব্যবহার করতে সে সময়ে মুসলিম লীগ সরকারের কোন দ্বিধা ছিলো না।

এই লিফলেটটিতে মুসলিম লীগ ভাষা আন্দোলনকে কমিউনিষ্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের কাজ হিসেবে চিত্রিত করে জনগণের চিন্তাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তাতে তাদের কোন সাফল্য আসে নি। উপরন্তু এই লিফলেট জনগণের মনে বিক্ষোভকে আরও বৃদ্ধি ও তীব্র করেছিলো।

এ ব্যাপারে মোহন মিঞার বক্তব্য ছিলো এই যে, আসলে আন্দোলন কমিউনিষ্টরা পরিচালনা করেছিলো এই বিশ্বাস থেকেই তাঁরা উপরোক্ত সব বক্তব্য তাঁদের লিফলেটে প্রদান করেছিলেন।[১৩]

আজিজ আহমেদসহ অন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে মোহন মিঞা বলেন,

> সত্যি বলতে কি আজিজ আহমদের গণ্ডগোলের জন্য অন্য অনেক কিছু ঘটলো। সে ছিলো এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট। সে বললো যে, গুলি হয়ে গেছে কাজেই সেটাকে সমর্থন করো। নূরুল আমীন দুর্বলতাবশত তাকে সমর্থন করলো। আমি বলেছিলাম ওটা administration-এর negligence, কাজেই অফিসারদেরকে শাস্তি দেয়া উচিৎ। নূরুল আমীন কিন্তু কোন step নিতে রাজী হলো না। সে শুধু আজিজ আহমদের কথা বলতে থাকলো। এরপর কিছু ছাত্র আমার কাছে এসে বললো যে, কিছু সংখ্যক নিরীহ ছাত্র জেলে গেছে। তাদেরকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া দরকার। আমি নূরুল আমীনকে বললাম তাদেরকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আজিজ আহমদ, জাকির হোসেন,★ হাফিজউদ্দীন ★★এরা কেউই রাজী হলো না। হাঙ্গামার সময় কিছু মুসলিম লীগের লোকজনও ধরা পড়েছিলো। আমি হাফিজউদ্দীনকে বললাম তোমরা মুসলিম লীগের লোকদের ধরবে কেন? কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব হলো না। ব্যুরোক্রাসির প্রভাব কাটিয়ে নূরুল আমীন স্বাধীনভাবে নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতো না।[১৪]

৯. ঢাকার বাইরের পরিস্থিতি

ঢাকার বাইরে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলার সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল, মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বত্রই এইসব সভাতে ঢাকায় ছাত্র-জনতার উপর পুলিশী নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নীচে কয়েকটি এলাকার যে রিপোর্ট উল্লেখ করা হলো তার থেকেই সারা পূর্ব-বাঙলার একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া যাবে।

★আই.জি. পুলিশ

★★গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান

www.pathagar.com

২৩শে ফেব্রুয়ারী সিটি মুসলিম লীগের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জে একটি শান্তি স্কোয়াড সারা শহর প্রদক্ষিণ করে এবং ঢাকার ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।[১]

বিকেলের দিকে চাষাঢ়ায় তোলারাম কলেজ প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহমদ। সোলায়মান এফ. রহমান, শফি হোসেন খান, খোরশেদ আহমদ প্রভৃতি শ্রমিক নেতারা নিজেদের বক্তৃতায় পূর্ব বাঙলা মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করেন। এছাড়া নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[২]

২২শে ফেব্রুয়ারীর জনসভায় একটি প্রস্তাব অনুযায়ী ২৩ তারিখে ময়মনসিংহে একটি 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। বিকেলের দিকে স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে জেলা ও সদর মহকুমা লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সদর মহকুমা মুসলিম লীগ সভাপতি ফখরুদ্দীন আহমদ। সভার শুরুতেই উপস্থিত জনতাকে খুব উত্তেজিত দেখা যায়। তাঁরা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে নানা ধরনের শ্লোগান দিতে থাকেন। এক সময় সভাপতির বিনা অনুমতিতেই রফিকউদ্দীন ভুঁইয়া সভায় কয়েকটি প্রস্তাব উথ্থাপন করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সৈয়দ সুলতান আহমদ, রফিকউদ্দীন ভুঁইয়া, আলতাবউদ্দীন তালুকদার, জেলা ছাত্রলীগ সম্পাদক শামসুল হক, মোফাজ্জল হোসেন প্রভৃতি ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন।[৩]

যশোর জেলার শিরোলিস্তান গ্রামে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে এবং ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৩শে ফেব্রুয়ারী এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাংলাকে অবিলম্বে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার এবং নূরুল আমীন সরকারের পদত্যাগের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় যশোর জেলা থেকে নির্বাচিত পূর্ব বাঙলা পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগ দাবী করেও একটি পৃথক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৪]

২৩শে তারিখে টাঙ্গাইল শহরে অনুষ্ঠিত একটি বিরাট জনসভায় ঢাকাতে নিরস্ত্র ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের লাঠি চালনা ও গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।[৫]

ঢাকায় ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং হত্যার প্রতিবাদে ২৩শে ফেব্রুয়ারী কুমিল্লা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। যানবাহন, দোকানপাট, বাজারঘাট, সিনেমা হল এবং নিয়মিত বাস সার্ভিস

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পথঘাটও জনশূন্য হয়ে পড়ে। কুমিল্লার ইতিহাসে এই ধরনের ধর্মঘট ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি বলে সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়। সকালের দিকে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে ৫ হাজার লোকের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মীর জহিরুল হক।[৬]

সভায় বক্তৃতা করেন পূর্ব-পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক শওকত আলী, হাসান ইমাম, আবদুল গনি, আবুল হোসেন প্রভৃতি। বক্তারা পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একটি প্রস্তাবে তাঁরা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পদত্যাগ এবং ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশীর অন্যত্র অপসারণ দাবী করেন। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ত্রিপুরার সংসদ সদস্য মুফিজউদ্দীন আহমদ ও তফজ্জল আলীর পদত্যাগ দাবী করেন।[৭]

এ ছাড়া কুমিল্লা জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান এক বিবৃতিতে ঢাকায় ছাত্রদের প্রতি গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন।[৮]

www.pathagar.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়

১. সংবাদপত্র সম্পাদকীয় ও বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খানের মালিকানাধীন আধা-সরকারী পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ' ২৪শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম লীগের নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনা করে 'ভুলের মাশুল' নামক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বলেন,

> গত শুক্রবার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য করার জন্য পাক গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রধানমন্ত্রী★ জনাব নূরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে এক বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন; উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বহু বিলম্বে ও বহু অবাঞ্ছিত ঘটনার পর মন্ত্রীসভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের আংশিক শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করণে মন্ত্রীসভা ও তাঁহাদের সমর্থক কাল কতটা দৃঢ়তা দেখাইবেন এ সম্পর্কে জনমনের সন্দেহ দূর হয় নাই। বিশেষত যে সব ঘটনার পর উক্ত প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণ করা হয়, উহাই মন্ত্রীসভার উপর জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করিয়াছে।
>
> প্রস্তাব পেশ করিবার সময় জনাব নূরুল আমীন বলেন যে, গত বৃহস্পতিবার সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর বিরোধী বলিয়া মনে করার নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সে রূপ বিরোধিতা করার ইচ্ছা সরকারের নাই। ইহাই যদি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার প্রকৃত বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ২০শে তারিখের পূর্বেই উহা প্রকাশ না করার কারণ দুর্জ্ঞেয় রহস্যরূপে থাকিয়া যাইতেছে। এমনকি ২১শে তারিখের সকাল বেলাতেও এরূপ একটা বিবৃতি মন্ত্রীসভার তরফ হইতে প্রকাশিত হইলে পরবর্তী মর্মন্তুদ ঘটনা হয় তো সংঘটিত হইত না এবং আমাদের বিশ্বাস, কতকগুলি অমূল্য জীবনেরও অবসান হইত না। সুতরাং নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি যদি হইয়াই থাকে, তাহা হইলে সে জন্য জনসাধারণকে দোষ দেওয়া যায় না। শহরে ১৪৪ ধারা জারীর কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, কোনও কোনও লোক শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অচল করিতে চায়। ২২শে তারিখে প্রকাশিত সরকারী বিবৃতিতেও এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, "সরকারের হাতে যে সকল তথ্য আছে, তাতে জানা যায়, বেআইনী

★সে সময় কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদেরকেও প্রধানমন্ত্রী বলা হতো। –ব.উ.

www.pathagar.com

কার্যকলাপের দরুণ আজকের (অর্থাৎ ২১শে তারিখের) অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী এমন একদল লোক, যাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নাই।" কথাটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতদিন জনসাধারণের নিকট এসব তথ্য যতদূর সম্ভব উদঘাটন করা হয় নাই কেন? যদি পূর্বাহ্নেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে মন্ত্রীসভার মনোভাব প্রকাশিত হইত এবং দেশবাসীর নিকট রাষ্ট্রবিরোধীদের কার্যকলাপ প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে গুলি চালান দূরে থাক, ১৪৪ ধারারও প্রয়োজন হইত না। মন্ত্রীসভা আজ নিজেদের যে অবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কোন অস্পষ্ট অভিযোগ দ্বারা দেশের জনসাধারণকে আশ্বস্ত বা তাঁহাদের আস্থা অর্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। দেশের জনসাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বা রাষ্ট্রবিরোধীদের কখনও সহ্য করিবে না। ছাত্র সমাজের দেশাত্মবোধের উপরও আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সুতরাং সরকার আজ তাঁদের খোলা তাস টেবিলে রাখুন। সব তথ্য হয়তো প্রকাশ করা সম্ভব নয়; কিন্তু যথাসম্ভব প্রকাশ করুন। আমরা তাঁদের এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমাদের ছাত্রসমাজ, আমাদের দেশের জনসাধারণ দুষ্কৃতিকারীদের সমূলে উচ্ছেদ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিবে না। জনাব নূরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রীসভা ভুলের পর ভুল করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের জননেতা বলিয়া দাবী করেন। সর্বজনবিদিত যে, জননেতা তাঁরাই, যাঁদের পরিপূর্ণ যোগ আছে জনতার অন্তরের সঙ্গে, সঙ্কটকালে যাঁরা পুরোপুরি দাঁড়াইয়া জনতাকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করিতে পারেন। এই মাপকাঠিতে জনাব নূরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রীসভার বিচার করিলে তাঁদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সে যাহাই হউক বর্তমান মন্ত্রীসভার বিচার দেশের জনসাধারণই করিবে। কিন্তু আজ তাঁরা যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তার সমাধান তাঁদেরই করিতে হইবে। এখন তাঁদের ভুলে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, উহার সমাধানের জন্যও তাঁদেরই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। এটা তাঁদের ভুলের মাশুল এবং তা দেওয়া হইবে যদি তাঁরা অহেতুক প্রেস্টিজ ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেন এবং উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ ও জনসাধারণের আস্থাভাজন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে এবং দেশের কল্যাণের জন্য এছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

আওয়ামী মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'বিচার চাই' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে প্রকাশ্য গণআদালতে প্রাদেশিক সরকারের বিচার দাবী করতে গিয়ে বলেন,

রাজধানী ঢাকার রাজপথ আজ রক্ত রাঙা। মুসলিম লীগ সরকার তার অতীতের সব কুকীর্তিকে ম্লান করিয়াছে, এবার নিরীহ ছাত্র ও নাগরিকদের উপর পুলিশ ও মিলিটারী লেলাইয়া দিয়া পরিণতিও বড় ভয়াবহ। আহত ছাত্র ও শিশুর ক্রন্দনে ঢাকার আকাশ বাতাস মুখরিত। ছেলেহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদে জনতাকে আকুল করিয়াছে। আজ পাক ভূমির পাক রাজধানী এক মহাশ্মশানে পরিণত। সরকারী জেল-জুলুমে কতজন নিহত, কতজন গ্রেফতার আর কতজনই বা নিখোঁজ হইয়াছে এরও সঠিক খবর পাওয়া যাইতেছে না। তাই

www.pathagar.com

সরকারের এই বর্বরতার ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতায় সর্বত্রই আজ বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এই কারবালা কাণ্ডের? বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্ররা ইতিপূর্বে দুইবার ঢাকায় মিছিল ও সভা করিয়াছে। কোথাও কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় নাই। সরকার কেন ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারী করিল। কেন তারা নিরীহ ছাত্র ও পথচারীদের উপর বেপরোয়া গুলি চালাইয়া কতগুলি মূল্যবান জীবননাশ করিল। কেন সরকার তিন দিনব্যাপী ঢাকার বুকে রক্তের দরিয়া সৃষ্টি করিল?...

সরকার সংযোগহীন অসহায়তার এই চোরাবালিতে হোঁচট খাইয়াই ঘোষণা করিয়াছে পূর্ব বঙ্গ পরিষদ পাক গণপরিষদের নিকট বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করিতেছে। কিন্তু এই সুপারিশকে কার্যকরী করিবার সময় নির্ধারিত হয় নাই কেন? কেন শহীদদের ঘাতকদের প্রতি বিচারের ব্যবস্থা হইতেছে না। কেন শহীদদের দাফন কাফনের ব্যবস্থার জন্য লাশ ফেরৎ দেওয়া হইতেছে না। কেন শহীদদের পরিবার পরিজনের প্রতি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ঘোষিত হইতেছে না। কেন বন্দীদের মুক্তি ও কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহার সম্পর্কে জানানো হইতেছে না। কেন শহর হইতে ১৪৪ ধারা ও মিলিটারী অপসারণ হইতেছে না।

তাই দেশের অযুত কন্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া আমাদের ঘোষণা শুধু ছাত্রজনতা ঘাতক সরকারী কর্মচারীদের নয়, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের হোতা সরকারের বিচার চাই প্রকাশ্য গণ আদালতে।

কিন্তু যারা খুন দিল জীবন দিল তাদের খুন আর জীবন দানও বৃথা যাইবে না। জাতি যখন লীগ সরকারের স্বৈরাচার ও ব্যর্থতায় গুমরিয়া মরিতেছিল তখন এই শহীদদের খুনই আবার দেশের অবশ ধমনীতে জীবনের প্রবাহ দিয়াছে। তারা জীবিত তারা অমর। তাদের অমরত্বের কাহিনী কথায় প্রকাশ করা যাইবে না। কিন্তু ভাষার মত তারাও লোকের মুখে মুখে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে। এই ইনকেলাবী আওয়াজই আজ শহীদদের পরিবার পরিজনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক, জালেম সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের প্রেরণা দিক।

২৪শে ফেব্রুয়ারী 'দৈনিক সংবাদ' তাঁদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে সরকারের কোন সমালোচনা না করে শুধু অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে বলেন,

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সুকঠিন পক্ষপুটের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া দেশের মানুষকে পোকামাকড়ের ন্যায় নিরুদ্বেগে পিসিয়া মরিবার দিন যে গত ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখেই গত হইয়াছে, এই সত্যটি ভুলিয়া গিয়া যদি কোন অফিসার ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণের আদেশ দিয়া থাকেন তবে তাহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে কোনদিন কোন অফিসার এই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করেন।...

ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহন মিঞার পরিচালনাধীন দৈনিক মিল্লাত ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি সম্পাদকীয়তে বলেন,

সরকারের পক্ষেও এখন প্রধান কর্তব্য, উজিরে আলার ওয়াদা অনুসারে অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত। ছাত্রদের উপর যে গুলি চালনা নীতি বিগর্হিত

www.pathagar.com

ও অত্যাচারমূলক কাজ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। সুতরাং গুলি চালনার নির্দেশ কোন অঞ্চল হইতে কিভাবে আসিয়াছিল তাহার সবিশেষ তদন্ত করিয়া মূলত যে দোষী তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করার ব্যবস্থা হওয়া আশু কর্তব্য।[২]

২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা) সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ২৪শে তারিখে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে তিনি বলেন,

> ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড নির্বাচন উপলক্ষে আমি ফরিদপুর থাকাকালে ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হই। ছাত্রদের উপর কি করিয়া যে গুলিবর্ষণ ও লাঠিচার্জ করিতে হইয়াছিল তাহা আমার জানা ছিল না।
>
> আমি অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুলিশী জুলুমের তদন্তের নির্দেশ দানের জন্য এবং দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছি। আমি নিহতদের পরিবারবর্গকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও আবেদন জানাইয়াছি। আমি নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের মোছলেম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি যে সোপারেশ করিয়াছেন, আমি তাহার সহিত একমত। আমি জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, গণপরিষদ যাহাতে এই সোপারেশ গ্রহণ করেন তজ্জন্য পাকিস্তান মোছলেম লীগ ইহার সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করিবেন। আমি জনসাধারণ ও ছাত্রদের নিকট এই আবেদন জানাইতেছি যে, তাহারা যেন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং বিশেষত রাষ্ট্রের সঙ্কট মুহূর্তে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখেন। বর্তমান সময় অপেক্ষা ইতিপূর্বে আর কখনও আমাদের এত বেশী ঐক্য বা সংহতির প্রয়োজন হয় নাই। আল্লাহতালা আমাদের পথ নির্দেশ করুন এবং পাকিস্তানকে বাঁচাইয়া রাখুন।[৩]

পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ২৩শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন এবং পরদিন অর্থাৎ ২৪শে ফেব্রুয়ারী এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন বলে ২৪শে তারিখের সংবাদপত্রে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।[৪] কিন্তু তাঁর কোন বিবৃতি আর প্রকাশিত হয় নাই। ২৪-২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়।

২. প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির প্রস্তাব ও নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা

২৪শে ফেব্রুয়ারী "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় ২৩শে তারিখের রাত্রে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির গৃহীত যে প্রস্তাব প্রকাশিত হয় তা হলো নিম্নরূপ,

www.pathagar.com

(১) পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের মোসলেম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ইহার নেতা জনাব নূরুল আমীনের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

(২) ঢাকায় ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুলিবর্ষণের ফলে ছাত্রসহ যে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার জন্য পার্টি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং নিহতদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৩) পার্টি দাবী করিতেছে যে, ব্যবস্থা পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী হাইকোর্টের জজের সভাপতিত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। পার্টি আরও প্রস্তাব করিতেছেন যে, ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকায় যে গুলি চালনা করা হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৎসম্পর্কে তদন্ত করিতে হইবে। গুলি চালনার জন্য যাহারা দায়ী পার্টি তাহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবার দাবী জানাইতেছে।

(৪) বর্তমানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের জন্য পার্টি সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

উপরোক্ত প্রস্তাবে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নরম সুর সত্ত্বেও তদন্তের জন্য অপেক্ষা না করেই ২৪শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন একটি বেতার বক্তৃতায় সব কিছুর দায় দায়িত্ব "শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের" উপর ন্যস্ত করে সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন,

আজ ঢাকায় কোন ঘটনা দুর্ঘটনা হয় নি। ঢাকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে যে ঘটনা দুর্ঘটনা হইয়াছে ও সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সরকারী ইশতেহারে এ যাবৎ তাহার সত্য বিবরণই কেবল প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে খোলাখুলিভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কলিকাতার সংবাদপত্রে সাধারণত দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টাই করা হইয়া থাকে; কিন্তু শুধু কলিকাতার সংবাদপত্রে নয়, ঢাকায়ও কোন কোন মহলে বলা হইয়াছে যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে তাহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কেও কতিপয় উত্তেজনাকর এবং বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থানীয় সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, শুক্রবার সেনাবাহিনী নিরপরাধ জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করে, কয়েকজনকে বেয়নেট দ্বারা ঘায়েল করে এবং লুটতরাজে যোগদান করে। এই বিবরণী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

গোলযোগের ফলে, দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা আহত ও নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য যানবাহন অচল করিয়া দেওয়ার, দোকানদারদিগকে হরতাল পালনের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করার এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে কাজে যোগদান হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় বলিয়া সরকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কাজেই এ সম্পর্কে আলোচনা করা

www.pathagar.com

প্রয়োজন বলিয়া সরকার মনে করেন এবং আশা করেন যে, গত বৃহস্পতিবার হইতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের শুধুমাত্র বিবরণ দান করিলেই শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারী করা সহ যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন জনসাধারণ তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

গত বৃহস্পতিবার হইতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এই ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কিত আরও অধিক তথ্য উদ্‌ঘাটন এবং যাহারা উহার প্ররোচনা দান করিতেছিল, অথবা উহার পরিকল্পনা করিতেছিল তাহাদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে জনমত চাপা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। ১৪৪ ধারা জারী করার সহিত ভাষা সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। এক দল স্বার্থান্বেষী লোক প্রাদেশিক আইন পরিষদ অধিবেশন আরম্ভের দিন এবং যতদিন উহার অধিবেশন চলিবে ততদিন শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার পরিকল্পনা করিয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া জেলা কর্তৃপক্ষ সতর্কতা হিসাবে ১৪৪ ধারা জারী করার সিদ্ধান্ত করেন। আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার সকল প্রয়াসের মোকাবেলা করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সরকার আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ভাষা বা অন্য যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত প্রকাশে বাধা দানের কোন অভিপ্রায়ই ছিলো না। একপক্ষের অধিক কাল পূর্বে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভাষার প্রশ্নে ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে মিছিল বাহির করিতে এবং সভা ও শোভাযাত্রার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই এই উক্তির সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ভাষা আন্দোলনের দাবী কিছু নয়, আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া শান্তি নষ্ট করার জন্য যে একটা ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। ১৪৪ ধারা জারী করার পরবর্তী ঘটনা পরিস্থিতিই তাহার প্রমাণ। এই যুক্তির সমর্থনে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত শোভাযাত্রা ও জনসভা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ১৪৪ ধারা জারীতে তেমন কোন কথা ছিল না। নিষেধাজ্ঞায় বলা হইয়াছিল যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া শোভাযাত্রা ও জনসভার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারিবে। ভাষার প্রশ্ন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে জনসভার অনুষ্ঠান করা অথবা শোভাযাত্রা বাহির করিবার যদি তাহাদের ইচ্ছা ছিল তবে তাহার জন্য এই অনুমতি লওয়ার পথে কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু তাহারা কখনও এরূপ করে নাই। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশ সত্ত্বেও এখনও দৃঢ়তার সহিত ছাত্র ও জনসাধারণকে হিংসাত্মক কাজে উত্তেজিত করার ও আইন ভঙ্গের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সকল যুক্তি এবং হাঙ্গামাকারীদের কার্যকলাপ হইতে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভীষণ রকমের কোন একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিল তাহাদের প্রধান মতলব; শুধু জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের জন্যই তাহারা ইহার সহিত ভাষার প্রশ্ন যোগ করে ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মিথ্যা ও ভীষণ উত্তেজনামূলক গুজব শুধু ঢাকা শহরেই প্রচার করা হইতেছে না– সমস্ত প্রদেশেই ইহা ছড়ানো হইতেছে। আইন ভঙ্গকারীদের সমর্থন জানানোর জন্য

www.pathagar.com

মোছলেম লীগ এম.এল.এ গণকে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে। স্বাভাবিক শাসন পরিচালন কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় ছাত্রমহলকে উত্তেজিত করার জন্য প্রতি মুহূর্তে সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে। তাহাদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করা হইতেছে যে, ইহা তাহাদের জাতীয় আন্দোলন। আইনভঙ্গের জন্য তাহাদিগকে চাপ দেওয়া হইতেছে। অনুরূপ প্রচেষ্টার জন্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও তাহারা দল প্রেরণ করিতেছে।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি এবং সরকারের হাতে যে সমস্ত প্রমাণ রহিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই ষড়যন্ত্রের মূলে গভীর উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং ষড়যন্ত্রের নেতাগণ পাকিস্তানের বাহির হইতে উৎসাহ পাইতেছে। এমতাবস্থায় এই সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার কখনও ইতস্ততঃ করিবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের শুভার্থীগণও এই কাজে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন।[১]

নূরুল আমীনের এই বক্তৃতায় যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল সেটা যে তৎকালে জনগণের মনে কোন দাগ কাটে নি তার প্রমাণ বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। অনুমতি নিয়ে সভা ও মিছিল করার সুযোগ ছিল একথা বলে তিনি আন্দোলনের সমর্থকদের উপর দোষারোপ করার চেষ্টা করলেও তার দ্বারা কেউ বিভ্রান্ত হয় নি। কারণ ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে ১৪৪ ধারা জারীর পরদিন কোন সভা ও মিছিল যাতে কিছুতেই হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল সে বিষয়ে ঢাকায় এবং অন্য জায়গায় কারো কোন সন্দেহ ছিল না। নূরুল আমীনের উপরোক্ত রেডিও বক্তৃতার প্রতিবাদে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব ২৫শে ফেব্রুয়ারী একটি দীর্ঘ সংবাদপত্র বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন,

জনাব নূরুল আমীন বলিয়াছেন যে, ভাষা ও অপর কোন সমস্যা সম্পর্কে শাসনতন্ত্র মোতাবেক মতামত প্রকাশ করিলে তাহার কণ্ঠরোধ করার কোনও ইচ্ছা সরকারের নাই। তাঁর কার্যকলাপ এবং ঢাকা শহরের বুকে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক হত্যা এবং পুলিশ ও মিলিটারীর আচরণই প্রমাণ করিতেছে যে, এই উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা।... জনাব নূরুল আমীন আরও বলিয়াছেন যে, আন্দোলনকারীরা পাকিস্তানের বাহির হইতে প্রেরণা লইতেছেন। এই উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। বর্তমান আন্দোলন সমগ্র দেশবাসীর আন্দোলন এবং ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন বিভিন্ন দল ও মতাবলম্বী কর্মীবৃন্দ। জনাব নূরুল আমীন তাঁহার ঘৃণ্য কার্যকলাপ আজ আর গোপন রাখিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি এবং লীগ নেতৃবৃন্দ মিথ্যা রটনার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, যে জনতা গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছে তাহারা এই সমস্ত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না।...

জনাব নূরুল আমীন আরও বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণ জনসভা ও শোভাযাত্রা করার অনুমতি চাহিলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ রূপ অনুমতি দিতেন। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, সংগ্রাম পরিষদ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।[২]...

www.pathagar.com

৩. শহীদ সুহরাওয়ার্দীর বিবৃতি

পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দরাবাদ শহর থেকে শহীদ সুহরাওয়ার্দী ঢাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি সংবাদপত্র বিবৃতি প্রদান করে গুলিবর্ষণে নিহতদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।[১] বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন যে,

> আমি একদিকে শুনছি ছাত্ররা শান্ত ছিল এবং অন্যদিকে শুনছি তারা পুলিশের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করেছিলো। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, পুলিশ ঘটনাস্থলে কি করছিলো এবং আইনসঙ্গতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহারা কেন শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে দেয় নাই।
>
> এখন নয়, অনেকদিন পূর্বে যখন পূর্ব বাঙলায় প্রথম বিতর্ক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিলো তখনই একটি জনসভা ও সংবাদপত্র বিবৃতি মাধ্যমে জানিয়েছিলাম যে, যেভাবে এবং যে নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অনুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিত। কিন্তু একই সঙ্গে আমি বলেছিলাম যে বাংলা পাকিস্তানের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের, বস্তুতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হওয়ায় উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তাকে একটি বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে কালে কালে জনগণ উর্দুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলে এবং সরকারী কর্মচারীরা তা স্বাভাবিকভাবে পড়তে ও লিখতে পারলে তখন উর্দু তার গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমস্যাটির প্রতি এই হলো একমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে এই মর্মে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ক্রমাগত ঘোষণার ফলে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয় যার দুঃখজনক পরিণতি আজ আমরা দেখছি। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু শিক্ষার জন্য যখন কিছুই করা হচ্ছে না তখন এ প্রশ্নটি উত্থাপনের অর্থ কি হতে পারে?

উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্পর্কে কিছুই না বলে সেই দাবীর বিরোধিতা করায় পূর্ব বাঙলার সর্বত্র সুহরাওয়ার্দীর উপরোক্ত বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এমন কি আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে সিলেট জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি নূরুর রহমানের নিম্নোক্ত বিবৃতি উল্লেখযোগ্য।[২] বিবৃতিতে তিনি বলেন,

> উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ওকালতি করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব যে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। সাড়ে চার কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী যে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান হইতেও আমাদের দাবীর পক্ষে জোরালো সমর্থন আসিতেছে তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের এইরূপ উদ্দেশ্যমূলক দম্ভোক্তি শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, উপরন্তু ঘৃণার্হ। কোন রাজনৈতিক মহলের অনুরাগ বিরাগের তোয়াক্কা না রাখিয়াই জাগ্রত জনতা তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের পথে পা বাড়াইয়াছে– আমরা সংকল্প নিয়াছি আমাদের এই আন্দোলনের পথে স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বের কোন বিভ্রান্তিকর ভূমিকা আমরা কোনমতেই বরদাস্ত করিব না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব

www.pathagar.com

এই সত্যটুকু বিলম্বে উপলব্ধি করিলে মারাত্মক ভুলই করিবেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছি এইরূপ জনস্বার্থ বিরোধী বিবৃতি ঝাড়িবার জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে জাগ্রত জনমতের নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করিতেই হইবে।

পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যে কোন সম্পর্ক নেই এ কথা উল্লেখ করে বিবৃতিটিতে আরও বলা হয়,

> মতলববাজরা সোহরাওয়ার্দীর উক্তিকে আওয়ামী লীগের নীতির প্রতিধ্বনি হিসাবে অভিহিত করিয়া জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে; তাই আমি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতে চাই যে সোহরাওয়ার্দীর উক্তির সহিত আওয়ামী লীগের নীতিগত কোন প্রশ্ন জড়িত নহে, অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন সম্বন্ধ নাই-ইহা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।★

২৬শে ফেব্রুয়ারী সুহরাওয়ার্দীর বিবৃতির উপর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'দৈনিক আজাদ' বলেন,

---

★সারাদেশে এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক অসুবিধা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

"সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছরই জুন মাসে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচী যাই এবং তাঁর কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবীর সমর্থনে তাঁকে একটি বিবৃতি দিতে বলি। আমরা সেই সময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে স্বাক্ষর অভিযান করছিলাম। তাতে তিনি স্বাক্ষর করেন এবং তাঁর ইংরেজী স্বাক্ষর এর ব্লকসহ দাবীগুলো তৎকালীন সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে ছাপা হয়।"[৩]

১৯৫২ সালের ২৯শে জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে এ সম্পর্কে যা প্রকাশিত হয় তা হলো নিম্নরূপ,

"বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার স্বাক্ষর অভিযানে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহি। নিম্নে তাঁর দস্তখতের অবিকল ছবি দেওয়া হইল।

পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ স্বাক্ষর অভিযান

আমাদের দাবী :

(১) অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হউক।

(২) অবিলম্বে ইংরেজীর পরিবর্তে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষাসমূহের প্রচলন করার ব্যবস্থা করা হউক।

(৩) ভাষা আন্দোলনের ধৃত সমস্ত কর্মীকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হউক।

(৪) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক জননিরাপত্তা আইনসমূহ অবিলম্বে বাতিল করা হউক।

(৫) বিনাবিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হউক।

স্বাক্ষর

Huseyn Shaheed Suhrawardy
Karachi-7-6-52"

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে উপরোক্ত স্বাক্ষরিত দাবী জ্ঞাপন সত্ত্বেও শহীদ সুহরাওয়ার্দী নিজের পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ...প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। এ ব্যাপারে আতাউর রহমান খানের নিম্নলিখিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য,

"১৯৫৩ সালে আমি এবং মুজিব একসাথে লাহোর যাই শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করতে। সেই সময় প্রেসের লোকদের কাছে আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলি। পরদিন কাগজে এটা ওঠে।

www.pathagar.com

এই সময় মিঃ সোরাওয়ার্দী একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন এবং বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ পাকিস্তানের আদর্শের দিক দিয়া ইহাই ঠিক। কিন্তু একথা বলার পর তিনি আবার বলিয়াছেন যে, বাংলার বুকে জোর করিয়া উর্দু চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, আস্তে আস্তে পরিচিত করিয়া তুলিতে হইবে, ইত্যাদি

মিঃ সোহরাওয়ার্দীর এই বিবৃতি বর্তমান সময়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পানি যখন ঘোলা হইয়া আসে, তখন অনেকেই মাছ শিকার করিতে আসে। আজ ভাষার ব্যাপার লইয়া বিক্ষুব্ধ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে মিঃ সোরাওয়ার্দী বাছিয়া লইয়া নূতন জটিলতা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। তাঁর মতলব এই যে, এতে করিয়া তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইবে। তিনি সমস্যার সমাধান চান না, তিনি সমস্যাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চান।...

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও কর্মচারীদের সভা

২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে শিক্ষকদের কমনরুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিবাদ ও শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইংরেজীর অধ্যাপক ও কলা অনুষদের ডীন ইতরাত হোসেন জুবেরী।

এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী প্রভৃতি। সভায় বক্তৃতা করেন অর্থনীতির অধ্যাপক আয়ার, মুনীর চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ এবং সভার সভাপতি জুবেরী। সভায় পেশ করার জন্য যে প্রস্তাবটি লিখিত হয় সেটিতে murder শব্দটি রাখা নিয়ে জুবেরী আপত্তি করেন কিন্তু অন্যেরা সেটা রাখার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করায় শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি যেভাবে লেখা হয়েছিলো সেভাবেই উপস্থিত ও গ্রহণ করা হয়।[১]

ইংরেজীতে লিখিত মূল প্রস্তাবসমূহ হলো নিম্নরূপ,

১। বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হলো, এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য এই সভা পাকিস্তান সরকারের কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করছে।

শহীদ সাহেব সে সময় জাবেদ ইকবালের বাসায় থাকতেন। তিনি আমাদের সাথে এ ব্যাপার নিয়ে খুব রাগারাগি করেন। তিনি বলেন,

It is wicked of you to raise the language controversy now. There are so many important questions which should be raised at this moment.

এটা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত stupid হয়েছে, ইত্যাদি।

"আমরা দুজনেই এর জবাবে বলি যে, প্রেসের লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করায় আমরা জবাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছি এবং আমরা বিশ্বাস করি তাই হওয়া উচিত। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের Sentiment অন্য রকম। সেখানে সকলে রাষ্ট্রভাষা বাংলাই চায়।

"এ কথা শুনে তিনি আমাদেরকে বলেন, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে এসেছ কেন। তোমরা সেখানেই থাকো, এদিক দিয়ে আর এসো না। তিনি মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে আমাদের উপর ভয়ানক অসন্তুষ্টই হন।"[৪]

www.pathagar.com

২। বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তন করার উদ্দেশ্য বাস্তবসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জ্ঞাপন করছে।

৩। সমিতির এই সভা ২১শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক ছাত্রদের জঘন্য হত্যা ও তাদের উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পবিত্রতা বিনষ্ট করার তীব্র নিন্দা করছে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় একদিন বন্ধ রাখার জন্য একজিকিউটিভ কাউন্সিলের কাছে প্রস্তাব করছে।

৪। এই সভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশের প্রবেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে।

৫। ২১শে ফেব্রুয়ারী ও তার পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্তের জন্য অবিলম্বে একজন হাইকোর্ট বিচারপতির সভাপতিত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য এই সভা দাবী জানাচ্ছে।

৬। ২১শে এবং পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী অফিসারদেরকে অবিলম্বে সরাসরিভাবে বরখাস্তের জন্য এই সভা দাবী জানাচ্ছে।

৭। এই সভা শহর থেকে অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার দাবী জানাচ্ছে।

৮। এই সভা শহর থেকে অবিলম্বে পুলিশী চৌকী ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করার জন্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের লিখিত অনুমতি ব্যতীত সেই সব প্রতিষ্ঠানে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য দাবী জানাচ্ছে।

৯। এই সভা সংবাদপত্রের উপর সকল নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে।

১০। নিহত এবং আহতদের পরিবারকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য এই সভা দাবী জানাচ্ছে।

১১। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের অবিলম্বে ও বিনাশর্তে মুক্তি প্রদানের এবং যে পর্যন্ত তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় সে পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে জেলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য এই সভা দাবী জানাচ্ছে।

১২। এই প্রস্তাবসমূহের কপি সরকার, ভাইস-চ্যান্সেলর এবং সংবাদপত্রের কাছে পাঠানো হবে।

উপরে উদ্ধৃত এই প্রস্তাবাবলী ডক্টর আই, এইচ জুবেরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা একটি পৃথক সভায় মিলিত হয়ে ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশ হামলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় তাঁরা যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাতে বলা হয়,

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশের অহেতুক ও বেপরোয়া আক্রমণে শিক্ষায়তনের

www.pathagar.com

পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়াছে। এই সভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট ভবিষ্যতে ইহার পুনরুক্তি যাহাতে না হয়, তাহার প্রতিশ্রুতি দিতে এবং সরকারকে তাহাদের কৃতকার্য্যের জন্য ক্ষমা চাহিতে বলিতেছে।...

এই ঘটনার জন্য দায়ী সরকারী কর্মচারীগণকে অবিলম্বে সাসপেণ্ড করা হউক এবং উচ্চ পর্যায়ের ও দেশের আস্থাভাজন ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত একটি কমিটি দ্বারা প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া দোষী ব্যক্তিগণের প্রতি কঠোরতম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হউক এবং অন্যায়ভাবে আটক ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হউক।[৩]

৫. বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদ

সিভিল লিবার্টি কমিটির আহ্বায়ক কমরুদ্দীন আহমদ ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে বলেন,

> সিভিল লিবার্টি কমিটি জানিতে পারিয়াছেন, বিগত কয়েকদিনের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের জন্য যাহারা দায়ী তাহারা নিজেদের গা বাঁচাইবার জন্য চর ও অনুচরদিগকে দিয়া বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। ঢাকার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয় শ্রেণীর নাগরিকই জানেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বরাবর শান্তি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বিরাজিত আছে। কোন দিন কোন কারণে এই সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হয় নাই এবং কোন দিন কেহ তাহা ক্ষুণ্নও করিতে পারিবেন না। যাহারা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের শত্রু। এই কমিটি সকল নাগরিককে সাবধান করিয়া দিতেছে, যেন তাঁহারা স্বার্থান্বেষী বিভেদ সৃষ্টিকারীদের মিথ্যা প্ররোচনায় পতিত না হন। এই সঙ্গে কমিটি আরও জানাইতেছে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর মধ্যে কোন বিভেদ নাই।[১]

পুলিশের কাজের প্রতিবাদে গাইবান্ধা লীগের সম্পাদক সৈয়দুর রহমান, বগুড়া লীগের সম্পাদক ফজলুল বারী, নীলফামারী লীগের সভাপতি কাজি আবদুল কাদের, বগুড়া লীগের সহ-সভাপতি আবদুল বারী, যশোর লীগের সম্পাদক শামসুর রহমান এবং বগুড়া লীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।[২] এ ছাড়া ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য (গাইবান্ধা, রংপুর) আহমদ হোসেন, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এবং প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা প্রদান করেন।[৩]

পূর্ব পাকিস্তান সোশালিস্ট পার্টি এক বিবৃতিতে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ করেন এবং একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবী জানান।[৪]

এ ছাড়া আরও বহু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সভাতেও ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশী জুলুম ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জ্ঞাপন করা হয়। এগুলির মধ্যে পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কার্যকরী কমিটি, কলতাবাজার কলেজ হোস্টেল, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ভেটারনারী কলেজ হোস্টেল, পূর্ব পাকিস্তান কাঁচা বেলার সমিতি, নিখিল পাকিস্তান শ্রমিক সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে তোলাবায়ে আরবীয়া, কুর্মিটোলা হাই স্কুল, সেন্ট্রাল ক্লাবস কমিটি, আরমানিটোলা আজাদ মোসলেম ক্লাব, আজিমপুরবাসী মহিলারা, পূর্ববঙ্গ পুস্তক বিক্রেতা সমিতি প্রভৃতি পৃথক পৃথক বিবৃতি অথবা সভা সমিতির মাধ্যমে এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[৫]

৬. ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের অবস্থা

২৪শে ফেব্রুয়ারী শেষ রাত্রে পুলিশ নিরাপত্তা আইনে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এম.এল.এ. কে গ্রেফতার করে। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমকেও ২৫শে তারিখে ভোরে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। এ ছাড়া মনোরঞ্জন ধর এম.এল.এ. ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জী এম.এল.এ.কেও পুলিশ ঐ একই দিন ভোরে গ্রেফতার করেন।[১]

২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার ঢাকা শহরের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। সব ধরনের যানবাহন, দোকানপাট, ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিস, সিনেমা, খেলাধুলা ইত্যাদি সব কিছুই বন্ধ থাকে। শহরে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও কোন পুলিশী হাঙ্গামা ও ছাত্রজনসাধারণকে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে নি।

সকাল থেকেই সেলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল প্রাঙ্গণে ছাত্র ও জনসাধারণকে জমায়েত হতে দেখা যায়। ঐ সময় বিভিন্ন বক্তা মাইকযোগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, ১৪৪ ধারা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা, পুলিশী জুলুম বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করতে থাকেন। এই অবস্থা বেলা ১১টা পর্যন্ত চলতে থাকার পর পুলিশ এবং ই.পি.আর, বাহিনী হল থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং হলটি ঘিরে ফেলে। কিন্তু হলের গেট ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় তাদের পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না।[২]

সেলিমুল্লাহ হল পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হওয়ার সংবাদ পেয়ে হলের প্রভোস্ট ডক্টর ওসমান গণি দুজন অধ্যাপক সহ সেখানে উপস্থিত হন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে ডক্টর গণি মাইক তাঁর হাতে অর্পণ করার জন্য ছাত্রদেরকে অনুরোধ জানালে তারা তাঁর হাতে মাইক অর্পণ করেন। ডক্টর গণি মাইকটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়ার পর পুলিশ ও ই.পি.আর. বাহিনী হল এলাকা পরিত্যাগ করে

www.pathagar.com

চলে যায়।[৩]

এই ঘটনার পর প্রায় চার হাজার লোক সেলিমুল্লাহ হল থেকে মিছিল করে পথে বের হন এবং মিছিলটি মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত এসে শেষ হয়। শহরের অনেক জায়গাতেই ছাত্রেরা মাইকযোগে বক্তৃতা করেন। পুলিশ এই সব মাইক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তবে জগন্নাথ ও ফজলুল হক হলে প্রবেশ করে পুলিশ মাইক কেড়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[৪]

২৫শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকায় শ্রমিকরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। শহরে যানবাহন ও দোকানপাট সহ সব কিছু বন্ধ থাকে। সকাল থেকেই জনসাধারণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। এই সব বিক্ষোভে মহিলারাও যোগদান করেন।[৫]

২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের পরিস্থিতি সম্পর্কে ঐ দিনই তাজউদ্দীন আহমেদ তাঁর ডায়েরীতে লেখেন,

> সাধারণ ধর্মঘট। রেল চলাচল ব্যতীত অন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য। সেক্রেটারীয়েট যোগদান করেছিলো। যদিও মিছিলের জন্য কোন নির্দেশ ছিলো না তবু স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা হয়েছিলো। প্রায় ১০ হাজার লোক ঢাকার প্রধান রাস্তাগুলি দিয়ে মিছিল করেছিলো এবং বিকেলের দিকে এস.এম. হলের সামনে জমায়েত হয়েছিলো। বাবুপুরা থানার কাছে সাতজনকে গ্রেফতারের কথা শোনা গেছে। ১৪৪ ধারা মান্য করাকে কেউ গ্রাহ্য করে নি। সামরিক বাহিনীও তা মেনে চলতে বাধ্য করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। প্রত্যেক রাস্তাতেই হাজার হাজার লোক চলাফেরা করেছে। শহর জনগণের দয়ার উপর ছাড়া ছিলো কিন্তু কোন হাঙ্গামা কোথাও হয় নি। তবে নূরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধ ছিলো।
>
> আবুল হাশিম, খয়রাত হোসেন, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী এম.এল.এ.কে গতরাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।
>
> আজ বিকাল ৩-৩০ মিনিটে পরিষদের যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিলো সেটা গভর্ণর কর্তৃক নাটকীয়ভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।
>
> খুব সকালে সামরিক বাহিনী ফজলুল হক মুসলিম হলে প্রবেশ করে হল থেকে জোরপূর্বক মাইক নিয়ে গেছে। জগন্নাথ কলেজ হোস্টেলেও ঐ একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।
>
> সকাল ১০-৩০ মিনিটের সময় বাহিনী সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ঢুকে তাদের মাইক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রভোস্ট হস্তক্ষেপ করেন এবং তারা বেলা প্রায় দুটোর সময় এই শর্তে বের হয়ে আসে যে প্রভোস্ট মাইকটি নিজের দখলে রাখবেন এবং তা ব্যবহার করা হবে না।
>
> নূতন নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাত্রি ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী থাকবে।

২৫ তারিখ রাত্রে প্রচারিত একটি সরকারী ইশতেহারে বলা হয় যে, ঐ দিন ঢাকা শহরে কোন গোলাগুলি হয়নি এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে

www.pathagar.com

কোথাও কোন মিছিল বের করা হয় নি।★ ইশতেহারটিতে আরও বলা হয়,

> প্রদেশে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের ষড়যন্ত্রের কয়েকজন নেতা এবং ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত আরও কয়েক ব্যক্তিকে অদ্য গ্রেফতার করা হইয়াছে।
>
> রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক হুমকির বিরুদ্ধে সরকার আরও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। অদ্য শহরে কোন কোন জায়গায় হরতাল পালিত হয়। যাহারা দোকানপাট খুলিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে, যদি তাঁহারা দোকানপাট খোলেন তবে তাঁহাদের পুত্র ও শিশু সন্তানদের উপর দৈহিক বলপ্রয়োগ করা হইবে। ঢাকার সাম্প্রতিক গোলমালের ষড়যন্ত্রের চরগণ দ্বারাই এই ভীতি প্রদর্শন চলে। সরকার এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখিতেছেন এবং এই সম্পর্কে অপরাধী ব্যক্তিগণকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। আগামীকল্য সকল দোকানপাট খোলা এবং যানবাহন পুনরায় চালু করার জন্যও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে।৬

৭. প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

২৫শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি একটি সভায় বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়,

> পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে কয়েকজন ছাত্র ও সাধারণ লোক নিহত হওয়ায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং পুলিশের কাজের তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া ২৩শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই। আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য জনসাধারণ প্রকাশ্যে প্ররোচিত হইতেছে এবং পরিস্থিতিকে আরও অবনতি করার জন্য হিংসাত্মক কাজ অবাধে চলিতেছে বলিয়া কমিটি গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।
>
> গভীর উৎকণ্ঠার সহিত কমিটি আরও লক্ষ্য করিতেছেন যে, কম্যুনিষ্ট ও বিদেশী দালালগণ প্রচুর উপকরণ লইয়া পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশ করিতেছে এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সহযোগিতায় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আন্দোলনের মোড় ঘুরাইবার চেষ্টা করিতেছে।
>
> তাহারা ট্রেন লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া এবং জনসাধারণ মৃত্যু অথবা মারপিটের ভয় দেখাইয়া সরকারকে অচল করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা করিতেছে। দেশে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়া পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে ও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে তাহারা ধ্বংসাত্মক অভিযান শুরু করিয়াছে।
>
> বিপুল ত্যাগ, রক্তক্ষয় এবং কঠোর সাধনার মারফত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে ওয়ার্কিং কমিটি স্বদেশপ্রেমিক জনসাধারণ এবং ছাত্রদের নিকট আবেদন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে শত্রুগণ

★এ দিন শহরে ছোট বড়ো মিছিল হওয়া সত্ত্বেও মিছিলের ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই সরকারী ইশতেহারে এভাবে বলা হয়। -ব.উ.

www.pathagar.com

> পাকিস্তানকে গড়িয়া তোলার কাজে বাধাদানে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানী জনসাধারণ সর্বদাই তাহাদের বদমতলব বানচাল করিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হইয়াছে।[১]

এরপর যে ছাত্র ও জনসাধারণের ত্যাগের ফলে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে তাঁরা যাতে নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে এনে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন তার জন্য কমিটি আবেদন জানান। পরিশেষে সারাদেশে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক লীগ কর্মীদের প্রতি আবেদন জানান।[২]

প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ২৫শে ফেব্রুয়ারীর এই প্রস্তাবের মধ্যে হুমকীর যে ভাব দেখা যায় সেটা তাঁদের ২৩শে তারিখের প্রস্তাবে ছিলো না। উপরন্তু, পূর্বের প্রস্তাবটি ছিলো যথেষ্ট নমনীয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভাটার লক্ষণই যে প্রস্তাব দুটির মেজাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিলো তাতে সন্দেহ নেই।

৮. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বিবৃতি ও নির্দেশ

২৫শে ফেব্রুয়ারী বেলা ২টা থেকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এবং সিভিল লিবার্টি কোঅর্ডিনেশন কমিটির এক যৌথ বৈঠক হয়। বৈঠক চলে বিকেল ৫-৩০ মিনিট পর্যন্ত। বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কমরুদ্দীন আহমদ, আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাক আহমদ, এম.এ. রহিম, তাজউদ্দীন আহমদ, এস.এম.হক, কে. এস. হাই, শামসুদ্দীন আহমদ এম.এল.এ। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান।[১]

এ বৈঠকে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় তা হলো (১) ২৬.২.৫২ তারিখ থেকে সাধারণ ধর্মঘট স্থগিত রাখা (২) নূরুল আমীনের কাছে ৯ দফা চরমপত্র প্রদান (৩) ৫ই মার্চ শহীদ দিবস ও সাধারণ ধর্মঘট (৪) ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত রাখা।[২]

এই বৈঠকের পর ঐ দিনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন,

> আমরা আশ্চর্য হইতেছি যে গত পাঁচদিন অবিরাম ধর্মঘট, ৩৯টি অমূল্য জীবনদান, এত রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্মপরিষদের প্রচারিত গণদাবীর লড়াইয়ে যে অবিসংবাদিত জনমত ও প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করিয়াছেন, দেউলিয়া নূরুল আমীন সরকার আজো তাহা মানিয়া লইতে দ্বিধা করিতেছে। সরকারের এই গণবিরোধী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়া কর্ম-পরিষদ বর্তমান অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেছে :

www.pathagar.com

(১) কর্মপরিষদ প্রদত্ত সাধারণ ধর্মঘট পালনে প্রদেশের সর্ব শ্রেণীর জনগণ যে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়াছেন সেজন্য কর্মপরিষদ তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। অবিরাম ধর্মঘটের ফলে আমাদের অপেক্ষাকৃত গরীব ভাইয়ের আর্থিক অসুবিধা হইবে বলিয়া কর্মপরিষদ সিদ্ধান্ত করিতেছে যে কেবল শিক্ষ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সাধারণ ধর্মঘট স্থগিত রাখা হইবে।

(২) কর্মপরিষদ ৯ দফা দাবী মানিয়া লইবার জন্য সরকারকে ৯৬ ঘণ্টা সময় দিতেছে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে সরকার কর্তৃক দাবীসমূহ মানিয়া না নেওয়া হইলে কমিটি পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবে।

(৩) কমিটি আরো সিদ্ধান্ত করিতেছে যে আগামী ৫ই মার্চ প্রদেশের সর্বত্র "শহীদ দিবস" পালন করা হইবে। উক্ত দিবসে সর্বত্র শান্তিপূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হইবে।

(৪) এই কর্মপরিষদ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ অকস্মাৎ স্থগিত রাখায় এবং ৪ জন এম.এল.এ. ও অন্যান্যদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিতেছে। এই কমিটি মনে করে যে ব্যবস্থা পরিষদে জনাব নূরুল আমীন তাঁহার পার্টির আস্থা হারাইতেছিলেন বলিয়া এবং শাসন ব্যবস্থা চালাইতে অসমর্থ হইয়া উক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।[৩]

৯. ২৬শে ফেব্রুয়ারী

২৬শে ফেব্রুয়ারী খুব ভোরের দিকে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষককে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর পি.সি. চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। এ ছাড়া ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহ এবং সতীন সেন এম.এল.এ. কেও ঐ একই দিন গ্রেফতার করা হয়।[১]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী ২৬শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যসব কিছু খোলা হয় এবং কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলে। কিন্তু ঐ দিনই পুলিশ দুটি বড়ো রকমের অভিযান চালিয়ে সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলে প্রবেশ করে এবং পরে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনারটিকে ধ্বংস করে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী দুপুরের দিকে পুলিশ বাহিনী সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল ঘেরাও করে। হলের বাইরে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর তারা ভিতরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে এবং পশ্চিম দিকের বন্ধ গেট ভেঙ্গে ফেলে। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন, সেলিমুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট ডক্টর ওসমান গণি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল হাদি তালুকদার হলের সামনে উপস্থিত থাকলেও পুলিশ তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তাঁরা দর্শকের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

থাকেন।[২]

পুলিশ সেলিমুল্লাহ হলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী খানা তল্লাশী করে এবং সরকারী ভাষ্য মতে ২৮ জনকে গ্রেফতার করে।[৩] এই গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে হলের হাউস টিউটর ডক্টর মফিজউদ্দীন আহমদও ছিলেন।[৪]

এ প্রসঙ্গে সেলিমুল্লাহ হল ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হেদায়েত হোসেন চৌধুরী বলেন,

> সেলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করার সময় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিলো। তার মধ্যে ইউসুফও (পরে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সদস্য) ছিলো। হলের দোতলায় যে জায়গায় মাইকটা ছিলো সেখানে পুলিশ ইউসুফকে জিজ্ঞেস করে ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি কোথায়। ইউসুফ বলে যে সে জানে না। এতে করে পুলিশ তাকে বাইরের লোক মনে করে গ্রেফতার করে। পুলিশের গ্রেফতারের নমুনা প্রায় এক রকমই ছিলো সেদিন। আমাদের কয়েকজনকে পুলিশ ধরতে পারে নি কারণ আমরা তখন ভুঁইয়া সাহেবের★ বাসাতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম।
>
> পুলিশ মুসলিম হল বন্ধ করে দেওয়ার পর আমরা ২৭/২৮ জন হলে গোপনে থাকতাম। চারিদিকের জানালা বন্ধ থাকায় কেউ আমাদের অস্তিত্ব টের পেতো না। আমাদের মধ্যে মুজিবুল হকও★★ ছিলো। আমরা মার্চ মাসে যখন গ্রেফতার হই তখনো আমরা এইভাবে মুসলিম হলেই থাকছিলাম।[৫]

সেলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করে পুলিশ যাদেরকে গ্রেফতার করে তার মধ্যে করাচীর ইংরেজী দৈনিক 'ইভনিং টাইমস' এর সম্পাদক জেড.এ. সুলেরীও ছিলেন। থানা থেকে তিনি চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে আজিজ আহমদ তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে আজিজ আহমদ বলেন,

> তিনি কোন এক থানা থেকে টেলিফোন করে জানান যে, ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা আছে এবং তিনি সেটি রক্ষা করতে উৎগ্রীব আছেন। তিনি আসলে আমাকে অনুরোধ করেন যাতে আমি পুলিশকে তাঁর মুক্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করি। আমি তৎক্ষণাৎ পুলিশকে তাঁর মুক্তির জন্য নির্দেশ দিই যাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যথাসময়ে সাক্ষাৎ করতে পারেন।[৬]

সুলেরীর পূর্ব বাঙলা সফর ও তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে নূরুল আমীন বলেন,

> 'করাচী টাইমস' এর★★★ সম্পাদক হিসেবে সুলেরী আমাকে এবং ফজলুর রহমানকে সব সময়েই নিকৃষ্টতম প্রাদেশিকতাবাদী বলে আখ্যায়িত করতো। বাস্তবত সেই সময় আমরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য লড়ছিলাম এবং সেজন্য পত্রিকাটি বলতো যে আমরা নাজিমুদ্দীন ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সুলেরী ছিলো পাঞ্জাবী গ্রুপের প্রতিনিধি।
>
> আমাদের কাছে খবর ছিলো যে গোলাম মোহাম্মদ, গুরমানী এবং চৌধুরী মহম্মদ

★হাউস টিউটর। –ব.উ.

★★সেলিমুল্লাহ হল ইউনিয়নের তৎকালীন সহ-সভাপতি। –ব.উ.

★★★ইভনিং টাইমসকে এখানে নূরুল আমীন ভুলবশত 'করাচী টাইমস' বলে উল্লেখ করেন। –ব.উ.

www.pathagar.com

> আলী তার পত্রিকাতে অর্থ যোগান দিতেন। ভাষা আন্দোলনের সময় সে ঢাকা এসেছিলো আমার বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। করাচীতে গিয়ে সে তার পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে লেখে এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে আমি পাকিস্তানে অগ্নিকাণ্ড শুরু করেছি। আমি পরিস্থিতির মোকাবেলা সঠিকভাবে করতে পারি নি বলে আমার উপর দোষারোপ করে এবং বলে যে, আমার দুর্বল নেতৃত্বের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে।[৭]

সুলেরীর ভূমিকা সম্পর্কে নূরুল আমীনের এই বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আজিজ আহমদ বলেন,

> সুলেরীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার কিছুই মনে নেই। আমার মনে হয় না যে, সুলেরী সেটা করতে পারতো। বস্তুতপক্ষে যেদিন তাঁকে সেলিমুল্লাহ্ হল থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিলো সেদিনই সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার ছিলো।[৮]

যেদিন জেড, এ. সুলেরী সেলিমুল্লাহ হলে গ্রেফতার হয়ে আজিজ আহমদের নির্দেশে মুক্তিলাভ করেন এবং সন্ধ্যার দিকে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেই দিনই অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁর একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন,

> বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করিয়া নেওয়ার দ্বারা বাস্তবকেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। ইহা সুবিধাদানের ব্যাপার নহে। ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়ার ফলে পাকিস্তানী জাতি হিসেবে আমাদের সংহতিই বৃদ্ধি পাইবে।... পাঞ্জাবের অধিবাসী হিসেবে উর্দু আমার নিকট প্রিয় হইলেও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মানিয়া লওয়ার জন্য আন্দোলনকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা যাহাতে গণপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় সে জন্য আমি চেষ্টা করিব। পশ্চিম পাকিস্তান বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিতে গররাজী হইবে বলিয়া মনে করি না।[৯]

তাঁর পূর্ববঙ্গ সফরের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পাকিস্তান সম্পাদক পরিষদের তরফ থেকে তাঁকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।[১০]

২৭শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলা সরকার একটি প্রেস নোটে সেলিমুল্লাহ হলের খানাতল্লাশী সম্পর্কে বলেন,

> যে কেন্দ্র থেকে শহরে ও প্রদেশের অন্যত্র ছাত্র এবং অছাত্রদের দ্বারা তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছিলো সেই সেলিমুল্লাহ হলে আজ পুলিশ খানাতল্লাশী করেছে। বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাত্মক ইশতেহার এবং অন্য অপরাধমূলক কাগজপত্র এবং একটি বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে। কিছু ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।[১১]

সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলে জোরপূর্বক প্রবেশ করা এবং বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বিকেলের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সদ্য নির্মিত শহীদ মিনার ধ্বংস করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়

www.pathagar.com

এবং সন্ধ্যার মধ্যেই মিনারটিকে তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে।[১২] এ সময়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও হোস্টেল প্রাঙ্গণে অনেক ছাত্র উপস্থিত থাকলেও এই হামলা প্রতিরোধ করার মতো কোন অবস্থা তাঁদের ছিলো না। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন,

> নেতাদের নামে হুলিয়া বেরিয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে তাঁরা খানিকটা আত্মগোপন করেছিলেন। শহীদ মিনার পুলিশ যখন ভেঙে দেয়, তখন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। আমার মনে পড়ে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ইমাদুল্লাহ★ "ক্যামেরা ক্যামেরা" বলে চীৎকার করছিলেন; বলছিলেন, 'ওরা মিনার ভাঙছে–কেউ একটা ছবি তুলে রাখো।'।[১৩]

পাকিস্তান সংবিধান সভায় কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংবিধান সভার অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে করাচী যাওয়ার পথে ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, পূর্ব বঙ্গ সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি যদি কোন শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তাঁদের উচিৎ অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত পূর্ববঙ্গ পরিষদ সদস্যদেরকে মুক্তি প্রদান এবং পরিষদের অধিবেশন আহ্বান। তিনি আরও বলেন,

> সংখ্যায় অল্প হলেও কংগ্রেস দল করাচী এবং ঢাকা উভয় পরিষদেই গঠনতান্ত্রিক বিরোধিতার নীতি ব্যতীত অন্য কোন নীতি অনুসরণ করেন নাই। তারা কখনোই কোন ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করেন নাই। এম.এল.এ.দের গ্রেফতার অগণতান্ত্রিক। সরকারের মনে রাখা দরকার যে, আলোচনার মাধ্যমেই গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। অন্য পথটি হলো বেয়োনেট ও একনায়কত্বের পথ।[১৪]

২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের এক সভায় ২৭ তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৩০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হোস্টেলগুলিতে অবস্থানকারী ৯০০ ছাত্রছাত্রীকে অবিলম্বে তাদের ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশও কাউন্সিল প্রদান করেন।[১৫]

১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির তহবিল

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নোতুনভাবে শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির কোন নির্দিষ্ট তহবিল নীতি ছিলো না এবং তৎকালীন পরিস্থিতিতে সে ধরনের কোন নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করাও সম্ভবপর ছিলো না। যা কিছু সংগ্রহ হতো সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হতো এবং খরচও হতো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে।

★পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের তৎকালীন যুগ্ম সম্পাদক। পরে তিনি যুবলীগের সম্পাদক থাকাকালে অল্প বয়সে বসন্ত রোগে মারা যান। –ব.উ.

www.pathagar.com

১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'পতাকা দিবস' এর কর্মসূচীর মাধ্যমে কিছু তহবিল সংগৃহীত হলেও ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের পর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা প্রদান অনেক বৃদ্ধি পায়। এই সব টাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির নেতাদের কারও কারও কাছে জমা হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলিতে, বিশেষত সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলে, দলে দলে মানুষ জমায়েত হতে থাকেন এবং তাঁরাও বিপুল সংখ্যায় চাঁদা প্রদান করেন। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে শহীদ মিনার নির্মিত হওয়ার পর সেই মিনারের পাদদেশেও দলে দলে মানুষ টাকা পয়সা এবং গহনা পর্যন্ত চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। ঢাকার বিভিন্ন পাড়ায় কর্মীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েও চাঁদা সংগ্রহ করেন।

এই সব চাঁদা সংগৃহীত হওয়ার ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নীতি ও নিয়মকানুন না থাকায় সংগৃহীত চাঁদা কার কাছে কত জমা ছিলো তারও কোন নির্দিষ্ট হিসেব বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির সক্রিয় কর্মী ও নেতাদের কারও কাছে ছিলো না। যেভাবে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেইভাবেই এই অর্থ ব্যয় হয়েছে। অনেক সময় কোন টাকা পয়সা ব্যতীতই প্রেস মালিক এবং অন্যরা আন্দোলনের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

এই সময় মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এবং সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলে বস্তুতপক্ষে আন্দোলনের দুটি কেন্দ্র সক্রিয় ছিলো। এই দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতার থেকে রেষারেষির সম্পর্কই বেশী থাকায় চাঁদার ব্যাপারেও কোন যৌথ নীতি গ্রহণ এ দুই কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য,

> আমরা ২৩ তারিখে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে একটি বৈঠক করি। যে সব ছাত্র নিজেদের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হচ্ছিলো তাদের মাধ্যমে ইস্তাহার পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদের কারো কারো কাছে ট্রেন ভাড়া ছিলো না, কাজেই তার ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হয়েছিলো। এর ফলে আন্দোলন সারা প্রদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা সহজ হয়েছিলো।
>
> সে সময় সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মাইকযোগে প্রচার চলছিলো। তার
> ৯ জন্য নীলক্ষেতের লোকদের ধারণা জন্মেছিলো যে সেলিমুল্লাহ হলই ছিলো আন্দোলনের কেন্দ্র। বস্তুতপক্ষে আন্দোলন পরিচালনার জন্য তারা নিজেরা একটা ইনফরমাল কমিটি খাড়া করেছিলো।
>
> আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আলোচনার জন্য সেলিমুল্লাহ হল যেতে চেয়েছিলো কিন্তু প্রধান গেটটি বন্ধ থাকায় ভেতরে ঢোকা সম্ভব ছিলো না। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অবশেষে আমি হলের ভেতর ঢুকতে সক্ষম হই। মুজিবুল হক ও হেদায়েত আমার উপস্থিতি পছন্দ করে নি এবং বাস্তবত তারা তহবিল সংক্রান্ত বিষয় আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। মৌখিকভাবে তারা আমাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা বললেও আসলে কিছুই করেনি। সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইসলামী উপাদানের (আওয়ামী লীগ নয়) নিয়ন্ত্রণে ছিলো এবং সেই হল ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সব সময়ই বিরাজ করছিলো।

সেলিমুল্লাহ হলের লোকেরা অনেক তহবিল তুলেছিলো কিন্তু সেটা আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে তারা রাজি হলো না। সেই অর্থের অধিকাংশ তারাই স্বেচ্ছায় দিয়েছিলো যারা সেলিমুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে জমায়েত হতো এবং মাইকের বক্তৃতা ও ঘোষণা শুনতো। অবশেষে আমি চামেলী হাউসে★ গেলাম এবং কয়েকটি মেয়েকে আমাদের জন্য চাঁদা তোলার কথা বললাম। তারা সেটা করতে সম্মত হলো এবং আজিমপুর কলোনী থেকে অর্থ সংগ্রহ করলো। পরদিন আমি তাদের সঙ্গে দেখা করলে তারা আমাকে এক হাজার টাকা দিলো। মেয়েরা আমাকে বললে যে, যখন তারা আজিমপুরে চাঁদা তুলছিলো তখন সেই এলাকার মহিলারা তাদেরকে মহিলাদের একটি বিক্ষোভ সংগঠিত করার কথা বলে যাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে। আমি মেয়েদেরকে বললাম যে, সে সময়ে তার দরকার নেই এবং এ বিষয়ে পরে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। পরে মেয়েরা আমাদেরকে বলেছিলো যে, মহিলাদের ঐ বিক্ষোভ সংগঠিত না করার জন্য আজিমপুরের মহিলারা আমাদেরকে কাপুরুষ বলে গালাগালি করেছিলো।

প্রথম দিনে মাত্র চার পাঁচজন ছাত্রী এক হাজার টাকা তুলেছিলো। পরের দিন সন্ধ্যায় যখন আমরা তাদের কাছে গেলাম তখন তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো আমরা কে এবং কোন কমিটির আমরা প্রতিনিধিত্ব করি। তারা মনে করেছিলো যে, সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলের কমিটিই আসল কমিটি যারা আন্দোলন পরিচালনা করছিলো। তারা তাদের কাছে এসে তহবিলের কথা বলেছিলো এবং তারা তাদের কাছেই অর্থ হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, আমাদের কাছে নয়।

আমি তখন তাদের কাছে ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছিলাম যে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বলে তখন কিছু ছিলো না এবং তখন কর্তৃত্বে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি যার আহ্বায়ক ছিলাম আমি। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের কথা বিশ্বাস করে এবং আমাদেরকে টাকা দিতে সম্মত হয়। সে রাত্রে তারা আমাদেরকে ২৫০০ শত টাকা দিয়েছিলো।

এইভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত সেলিমুল্লাহ হল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মধ্যকার রেষারেষি চলতে থাকে। বস্তুতপক্ষে তখন ছিলো দুটি কমিটি, দুই তহবিল এবং আন্দোলনের দুটি কেন্দ্র। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে বাতিল হয়ে গিয়েছিলো কারণ আন্দোলনে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নি।

আমরা প্রায় ১০,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। গ্রেফতারের সময় আমার কাছে ১৫০০ শত টাকার মত ছিলো। মোট সংগ্রহের মধ্যে ছিলো ফজলুল হক হল, মেয়েদের হোস্টেল, জগন্নাথ হল ইত্যাদির সংগ্রহ।

সেলিমুল্লাহ হলের তহবিল সংগৃহীত হয়েছিলো আজিমপুরের একাংশ, পলাশী

★তখনকার একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীবাসের নাম। –ব.উ.

www.pathagar.com

ব্যারাক, নীলক্ষেত ব্যারাক থেকে। সেলিমুল্লাহ হলে কতো টাকা সংগৃহীত হয়েছিলো সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জেনেছিলাম যে সেলিমুল্লাহ হল খানা তল্লাসীর সময় পুলিশ প্রায় ২০,০০০ টাকা পেয়েছিলো।[১]

আবদুল মতিনের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তহবিল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। সেলিমুল্লাহ হলের তহবিল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং আন্দোলনের সময় ঐ হল কেন্দ্রের অন্যতম নেতা হেদায়েত হোসেন চৌধুরী তাঁদের তহবিল সম্পর্কে বলেন,

> টাকা কড়ি সব প্রথম দিকে খালেক নওয়াজের★ কাছে জমা থাকতো। তিনি তখন ইকবাল হলে থাকতেন। কিন্তু মুসলিম হলের সাথে এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পরে টাকা হাউস টিউটর ভুঁইয়া সাহেবের কাছে রাখা হয়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে টাকা জমা থাকে আখতারুদ্দীন★★এর কাছে। তারপর টাকাকড়ির কি অবস্থা হয় আমি জানি না।[২]

১১. মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও পদত্যাগ

২১শে ফেব্রুয়ারী ও তার পরবর্তী পর্যায়ে নূরুল আমীন সরকার ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই ব্যাপক বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই এই বিক্ষোভের কোন আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ না ঘটলেও বহু সংখ্যক মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মী পূর্ব বাঙলার সর্বত্র বক্তৃতা, বিবৃতি ও পদত্যাগের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

অবিভক্ত বাঙলার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং গাইবান্ধার মুসলিম লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য আহমদ হোসেন ভাষা আন্দোলনে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এবং প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা প্রদান করে একটি বিবৃতি দেন।[১]

ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি মোসাহেব আলী খান মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশ যে নির্মম ও অমানুষিক গুলি চালিয়েছে তার জন্য তিনি দুঃখিত। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।[২]

★পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। –ব.উ.

★পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার। –ব.উ.

www.pathagar.com

পূর্ব বাঙলা পরিষদ ও পাকিস্তান গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এ.এম. আবদুল হামিদ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সেই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো তাঁর কর্তব্য। তিনি এ সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, তিনি যদি এ কাজে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি গণপরিষদ থেকে অবশ্যই পদত্যাগ করবেন।[৩]

চট্টগ্রামের মুসলিম লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য নূর আহম্মদ ২০শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের সভাপতির কাছে একটি নোটিশ পাঠান।[৪]

অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মোয়াজ্জেমউদ্দীন হোসেন এক সংবাদপত্র বিবৃতিতে বলেন,

> জনাব প্রধানমন্ত্রীর মতে এই আন্দোলন ও বিক্ষোভের পিছনে অন্যের উস্কানী রহিয়াছে। একমাত্র ছাত্রগণই এই জন্য দায়ী নহে। যদি তাহাই হয়, তবে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা নেহায়েৎ বিকৃত মস্তিষ্কেরই পরিচায়ক মাত্র।
>
> জনাব নূরুল আমীন যে সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দ্বারা জনসাধারণকে আর বিভ্রান্ত করা চলিবে না। গত দুই সপ্তাহের সংবাদপত্র পাঠে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে একটি বিশেষ জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে তাহারা জনসাধারণ ও স্থানীয় অধিকাংশ সংবাদপত্রের পূর্ণ সমর্থন পাইতেছে। এই আন্দোলন শুরু করিবার জন্য ছাত্র ও জনসাধারণ বাহির হইতে কোন উস্কানী পায় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সরকার আশঙ্কিত কোন অশান্তি দমনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন নাই। প্রকারান্তরে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার যে সার্বজনীন আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাই দমন করিবার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।[৫]

ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ সাহেবে আলম এক বিবৃতিতে বলেন যে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে কয়েকজন ছাত্র ও নাগরিক নিহত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছেন। তিনি পুলিশের এই নৃশংস কাজের নিন্দা করেন এবং এই ঘটনার জন্য অবিলম্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান।[৬]

নারায়ণগঞ্জ সিটি লীগের সভাপতি নাজিরউদ্দীন আহমদ ঢাকার ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত কর্মচারীদেরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা এবং একটি নিরপেক্ষ কমিশন দ্বারা ঘটনার তদন্ত দাবী করেন।[৭]

খুলনা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও পূর্ব বাঙলার পরিষদ সদস্য আবদুস সবুর খান এক সংবাদপত্র বিবৃতিতে বলেন,

www.pathagar.com

জনাব নূরুল আমীন গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার বেতার বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা জারীর যে কারণ দর্শাইয়াছেন তাহার উৎস কোথায় তাহা অনুমান করা শক্ত নহে; গত কয়েকদিন ধরিয়া ঢাকার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিক বিদেশী মজুর ও ভারতীয় এজেন্টদের এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু ষড়যন্ত্রের আওয়াজ তুলিয়া ছাত্র ও জননেতাদের উপর জুলুমের রথচক্র চালাইবার যে হীন পরামর্শ দিতেছিলো, জোনাব নূরুল আমীন তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। ক্ষমতার লোলুপতা ত্যাগ করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে তিনি নিজের অহমিকায় দেশকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন।[৮]

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও আহমেদ হোসেন ব্যতীত আরও যাঁরা মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন তারা হলেন মোবারক আলী এম.এল.এ, ওসমান আলী এম.এল.এ. এবং খন্দকার মনিরুদ্দীন এম.এল.এ.।[৯] সিলেট জেলায় বহু সংখ্যক মুসলিম লীগ কর্মী ও নেতা এই সময় মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাহমুদ আলী, এ. জেড. আবদুল্লাহ, আবদুর রহিম ও মতসির আলী।[১০]

১২. নারায়ণগঞ্জের ঘটনাবলী

নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ জন্য ২৯শে ফেব্রুয়ারী[১] তাঁকে গ্রেফতার করে স্থানীয় এস.ডি.ও.র কোর্টে হাজির করা হয়। এরপর মমতাজ বেগমের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিপুলসংখ্যক ছাত্র ও জনসাধারণ কোর্ট এলাকা ঘেরাও করেন এবং বিনাশর্তে তাঁর মুক্তি দাবী করতে থাকেন। সরকার পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, মমতাজ বেগমকে তাঁর স্কুলের সেক্রেটারীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলের তহবিল আত্মসাতের কারণে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু উপস্থিত ছাত্র ও জনসাধারণ সরকারের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে বলেন যে, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কাজেই তাঁকে অবিলম্বে ও বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করতে হবে।[২]

এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ মমতাজ বেগমকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন এবং পুলিশ ভ্যানে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সমগ্র শহরে উত্তেজনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনতা চাষাড়া স্টেশনের কাছে পথের মধ্যে বিরাট বিরাট গাছ কেটে ফেলে দিয়ে পুলিশ ভ্যানের গতিরোধ করে এবং ভ্যানটিকে ঘেরাও করে।[৩]

এই ঘেরাওকারীদের মধ্যে সব ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তি ছাড়াও এক

www.pathagar.com

বিরাট অংশ ছিলো সাধারণ মানুষ। পুলিশ কয়েকবার লাঠিচার্জ করলেও তারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়। সেই সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর মুসলেহউদ্দীন ও দারোগা তালুকদার পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে না পারায় ঢাকা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ নারায়ণগঞ্জে নিয়ে আসা হয়। তখনো পর্যন্ত জনতা পথ না ছাড়ায় এবং মমতাজ বেগমকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকায় সন্ধ্যার দিকে পুলিশ ভয়ানক জোর লাঠিচার্জ করে এবং তারপর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে তারা পুলিশ ভ্যানসহ মমতাজ বেগমকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ত্যাগ করে।[৪]

২৯শে ফেব্রুয়ারী যাঁদেরকে আটক করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় কর্মী মহম্মদ আওয়াল। তিনি ঐ দিনের গ্রেফতার সম্পর্কে বলেন,

> আমাকে ও বিনয় রায়কে হাজতে না ঢুকিয়ে থানার ভিতরে একটা কামরায় বসালো। থানায় আমি যখন বসে আছি তখন নারায়ণগঞ্জের পাঞ্জাবী এস.ডি.ও. ইমতিয়াজী ফোন করলো ঢাকাতে, হোম সেক্রেটারী আজফারকে। ৭৫ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করার কথা জানালে আজফার বললো 'Make it hundred. as far as possible Hindus.। টেলিফোন হাতে রেখেই ইমতিয়াজী থানার ও.সি.কে বললো, ২৫ জন হিন্দু ধরতে পারো? শেষ পর্যন্ত এক হোসিয়ারীতে গিয়ে ২৫ জন হিন্দুকে ধরে নিয়ে এলো আমরা থানায় থাকতে থাকতে।[৫]

এই সব ঘটনার পর ২৯শে তারিখেই নারায়ণগঞ্জের প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা ও পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য ওসমান আলীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর বাড়ী খানাতল্লাশী ও বাড়ীর আসবাবপত্র তছনছ করা হয়।[৬] এর কিছুদিন পর নারায়ণগঞ্জের নেতৃস্থানীয় আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী এবং ওসমান আলীর পুত্র শামসুজ্জোহাকেও গ্রেফতার করা হয়।[৭]

এই ঘটনার পরদিন ১লা মার্চ নারায়ণগঞ্জে আততায়ীর গুলিতে সৈয়দ জোবায়েদ নামক একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত এবং খলিল আহমদ নামক একজন আনসার গুরুতরভাবে আহত হয়।[৮]

এই কনস্টেবল নিহত হওয়ার প্রসঙ্গে মহম্মদ আওয়াল বলেন,

> যে আনসারকে★ মারা হলো সে দাঁড়িয়েছিলো সিটি আওয়ামী লীগ সম্পাদক আলমাসের বাড়ীর সামনে। একটা বুলেট এসে তার বুক বিদ্ধ করে আলমাসের দোকানে এসে পড়ে। পুলিশ ইন্সপেক্টর নবিউল হক চৌধুরী তদন্ত করে, ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী। সে রিপোর্ট দেয় যে, যে বুলেটটা পাওয়া গেছে তাতে মার্ক ছিলো বেঙ্গল পুলিশ এবং তৎকালে ব্যবহৃত হচ্ছিলো ই.পি.আর. এর দ্বারা। ঘটনার পর পুলিশ আমার এবং আলমাসের বন্দুক সীজ করেছিলো। কিন্তু এই তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের পর বন্দুক আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়।[৯]

নারায়ণগঞ্জের এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বলেন যে,

---

★আসলে আনসারটি আহত হয় এবং নিহত হয় একজন কনস্টেবল। –ব.উ.

www.pathagar.com

সেখানে ঐ সময়ে গুলিতে কোন আনসারের নিহত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর কিছু স্মরণ নেই।[১০] কিন্তু চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় নিম্নলিখিতভাবে তিনি এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেন,

> প্রশ্ন: এটা সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে নারায়ণগঞ্জে একজন আনসারের হত্যাকাণ্ড সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছিলো। বিশেষত আপনার এবং হোম সেক্রেটারী মিষ্টার আজফারের দ্বারা এবং তা আমাদের বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী মিস্টার দোহার★ ব্যক্তিগত তদারকিতেই করা হয়েছিলো। একথা কি সত্য?

উত্তর : আমরা তা করি নি। কেন আমরা তা করবো? তখন এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলা ও গণ্ডগোল ছিলো।

প্রশ্ন: সম্ভবত আপনারা তা করতে চেয়েছিলেন কারণ আপনারা তখন চাইছিলেন 'ভারতীয় এজেন্ট' ও কমিউনিষ্টদের উপর দোষ চাপাতে। আপনারা বলেছিলেন যে তারাই ভাষা গণ্ডগোলের জন্য দায়ী ছিলো।★★

উত্তর : না, সেটা সত্যি নয়।

প্রশ্ন : যদি সেটা সত্যি না হয়, তাহলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নিহত আনসারটির পরিবারের জন্য দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ কিভাবে ঘোষণা করতে পারলেন? আপনারা এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম কানুন নিশ্চয়ই অনুসরণ করেন নি।

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিলাম। সেটা আমাদেরকে করতে হয়েছিলো আনসারদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য। তারা নিয়মিত বাহিনীর লোক অথবা অন্য কোন সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত ছিলো না। সুতরাং তাদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য আমাদেরকে দ্রুত কাজ করতে হয়েছিলো। যদি নিহত ব্যক্তি পুলিশের লোক হতো তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতাম।★★★

প্রশ্ন : এটা সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টের থেকে জানা গিয়েছিলো যে, যে বুলেটটির দ্বারা আনসারটি নিহত হয় সেটি ইষ্টার্ন

★এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ২৮.৬.১৯৬৮ তারিখে। সে সময় পাকিস্তানের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন মিস্টার দোহা (এঁর পুত্র পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব)। ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন ডাইরেক্টর, আনসার, পূর্ব পাকিস্তান। –ব.উ.

★★নূরুল আমীন তাঁর ৩রা মার্চের রেডিও বক্তৃতা এবং এপ্রিল মাসের পরিষদ অধিবেশনে বক্তৃতার সময় নারায়ণগঞ্জের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য 'ভারতীয় এজেন্ট' এবং কমিউনিষ্টদের দায়ী করেন। –ব.উ.

★★★সাক্ষাৎকারের সময় আমি আওয়াল সাহেবের কথা অনুযায়ী নিহত ব্যক্তিকে আনসার হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম। পরে সংবাদপত্রের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, একজন আনসার ঘটনাস্থলে আহত হলেও নিহত হয়েছিলো একজন পুলিশ কনস্টেবল। এ ক্ষেত্রে আমার ভুলের সুযোগ নিয়ে আজিজ আহমদ তাঁর উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। –ব.উ.

www.pathagar.com

রাইফেলস এর দ্বারা ব্যবহৃত বুলেটের মতো একই টাইপের। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন?

উত্তর : ঐ ধরনের কোন রিপোর্ট সম্পর্কে আমার কিছু স্মরণ নেই। আমার মনে হয় অনেক রকম ভুল তথ্য রয়ে গেছে।[১১]

১৩. ঢাকার বাইরের অন্যান্য এলাকার পরিস্থিতি

২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলি চালনার পর থেকে ঢাকার সঙ্গে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলাতেও আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনে শুধু যে শহরের মধ্যবিত্ত এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ অংশগ্রহণ করেন তাই নয়। গ্রামের জনগণও বিপুল সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং মিটিং মিছিল ও বিক্ষোভে অংশ নেন। ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী এবং ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অরাজনৈতিক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়।

কুমিল্লা, চাঁদপুর, যশোর, নোয়াখালী, খুলনা এবং প্রদেশের অন্যত্র মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ এবং সাধারণ জনসভার পক্ষ থেকে স্থানীয় এম.এল.এ. দের পদত্যাগ দাবী করে অসংখ্য প্রস্তাব ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে গৃহীত হতে থাকে।[১] এছাড়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দাউদকান্দি, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর জেলার শিবচর, রাজশাহী, মাইজদী, রংপুর, সোনাইমুড়ী, খিলপাড়া, খুলনা, পাবনা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, সন্দ্বীপ, ঈশ্বরগঞ্জ, বালিমুড়ি ইত্যাদি শহর, গঞ্জ ও গ্রাম এলাকাতে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সভাসমিতি মিছিলের খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[২] বস্তুতপক্ষে এই ধরনের সভাসমিতি ও বিক্ষোভের এতো রিপোর্ট ঢাকার সংবাদপত্রগুলিতে এসে পৌছাতে থাকে যেগুলি সব পত্রিকায় প্রকাশ করা সে সময় সম্ভব হয় না। ঢাকার বাইরের এইসব ঘটনাবলীর রিপোর্ট স্থানীয় পত্রিকাগুলিতেই বেশী প্রকাশিত হয়।

এই ধরনের একটি স্থানীয় পত্রিকা নওবেলালে গ্রামাঞ্চলের উপর যে রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হয় তার থেকে নীচে কয়েকটি উল্লেখিত হলো :

> পূর্ব বাংলায় আজ যে গণ আন্দোলন চলছে তা শুধু শহরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রকর্মী ও যুবকদের তৎপরতায় আন্দোলন আজ সাফল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।
>
> গোলাপগঞ্জ অঞ্চলে আন্দোলনের বিশেষ সাড়া দেখা গিয়াছে। ঢাকায় বীভৎস ও মর্মন্তুদ ঘটনায় ছাত্র ও জনসাধারণ খুবই মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে, গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে এক সপ্তাহকাল পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। তারা কালো ফিতে ও ব্যাজ ধারণ করে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে এবং প্রতিবাদ সভা করে জনসাধারণ গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের এ

www.pathagar.com

আন্দোলনকে দরদপূর্ণ সহযোগিতা করে দূর-দূরান্তের গ্রামের লোকেরা বাজারে সমবেত হয়ে সভা করে সরকারের এ ঘৃণ্য কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানায়, শহীদ ছাত্রদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়, এবং জালিম সরকারের আশু অবসানের জন্য কঠোর দাবী জানায়। জনসাধারণ আজ সব অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।... গোলাপগঞ্জ, ঢাকা দক্ষিণ, রণকেলী, ভাদেশ্বর প্রভৃতি জায়গায় একইভাবে সাড়া পাওয়া গিয়াছে।... এমনি আর কখনো গ্রামাঞ্চলে সাড়া দেখা যায় নি।[৩]

১৪. গ্রেফতার ও গ্রেফতারী পরোয়ানা

ঢাকার বাইরে এই সময় ব্যাপকভাবে ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদেরকে গ্রেফতার করা হয়। অনেকের নামে হুলিয়া জারী হলে তাঁরা আত্মগোপন করেন। কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণের এক শান্তিপূর্ণ জনসভায় পুলিশ আওয়ামী লীগের জেলা সম্পাদক আবদুর রহমান খান সহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করে। ৫ই মার্চ বগুড়া শহরের গোলাম মহীউদ্দীন, আটপাড়ার হারুনর রশীদ, শেরপুরের সুবোধ লাহিড়ীকে গ্রেফতার করা হয়। ২রা মার্চ দিনাজপুরে রহিমউদ্দিন আহমদ, নূরুল হুদা কাদের বক্স (সম্পাদক, জুলফিকার), ছাত্র কর্মী আসলেহুদ্দীন আহমদ ও আবদুল হাফিজকে গ্রেফতার করা হয়। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে পুলিশ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক বদরুদ্দীন হোসেন এবং আওয়ামী লীগের জেলা সম্পাদকসহ আরও দুজনকে গ্রেফতার করে। এছাড়া তারা আনন্দমোহন কলেজ হোস্টেল ও মেডিকেল স্কুল হোস্টেলসহ ১৪ জায়গায় তল্লাশী চালায়। ৫ই মার্চ তারা ময়মনসিংহে আবার কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। তার মধ্যে ছিলেন হাতেম আলী তালুকদার, মহবুব আনাম, জাহেদুল আবেদীন এবং আরও কয়েকজন, রাজশাহীতে গ্রেফতার করা হয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মুসলিম লীগ পরিষদ সদস্য মাদার বকস এম.এল.এ. সহ ১৬ জনকে।[১]

এ ছাড়া পুলিশ ময়মনসিংহে হাশিমুদ্দীন আহমদ ও মোয়াজ্জেম হোসেনকে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আবদুল বারীকে গ্রেফতার করে। ঢাকার হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে চিকিৎসাধীন পাঁচজন সরকারী কর্মচারীকে। তাঁরা হলেন ফজলুল হক, আনোয়ারুল ইসলাম, কাজী শামসুল হুদা, আবদুর রহমান এবং মখলেসুর রহমান। ঢাকার আরও যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয় তাঁরা হলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক খোন্দকার মুশতাক আহমদ, আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কর্মী শওকাত আলী।[২]

বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ছাত্র এবং ভাষা আন্দোলনের কর্মী মাহবুব জামাল জাহেদী ১৩ই মার্চ তারিখে ঢাকায় গ্রেফতার হন।[৩] প্রাদেশিক যুবলীগের সভাপতি খায়েজ আহমদকে ১২ই এপ্রিল ফেনীতে গ্রেফতার করা হয়। ১৩ই মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান

www.pathagar.com

ভাসানীর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয় এবং ১০ই এপ্রিল তিনি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।[৪]

২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যার ঘোষণা অনুযায়ী জন নিরাপত্তা আইনের ১৭ ধারার ৪নং উপধারার 'খ' বিধান মতে ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয় তাঁরা হলেন কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নওয়াজ খান, শামসুল হক, অলী আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, এ.এম.এম. নূরুল আলম, আজিজ আহমদ এবং আবদুল আওয়াল। গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করার পূর্ব থেকেই এঁরা সকলেই আত্মগোপন করেন।[৫]

এঁদের মধ্যে কুমিল্লার আবদুল আওয়াল প্রথমে গ্রেফতার হন। পরে শামসুল হক ও খালেক নওয়াজ খানকে ৭ই মার্চ ঢাকাতে গ্রেফতার করা হয়। অন্যেরাও ৭ই মার্চ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির একটি বৈঠক চলাকালে ঢাকার শান্তিনগর এলাকার একটি বাড়ী থেকে গ্রেফতার হন।★

১৫. নিহতদের সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য

সরকারী সূত্র থেকে ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী নিহতদের পরিচয় ও বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয় যে, তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনই ছাত্র। নিহতদের মধ্যে দুইজন মটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন বলেও উল্লেখ করা হয়। এঁদের নামাজে জানাজা এবং দাফন সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়। এই সূত্র অনুযায়ী যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন,

> ১। আবুল বরকত, ছাত্র। পিতার নাম জনাব শামসুদ্দীন, পশ্চিম বাঙলা, থানা ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ), গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আজিমপুর মসজিদের হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল গফুরের ইমামতিতে জানাজা পড়া হয়। জানাজায় উপস্থিত আত্মীয়গণের মধ্যে এল.এস.জি. ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব এ. কাশেম এবং এসিসটেন্ট একাউন্টস অফিসার জনাব মালিক ছিলেন।
>
> ২। রফিকউদ্দিন, পিতা কমার্শিয়াল প্রেসের মালিক। রফিকউদ্দীন ছাত্র নহেন, গুলির আঘাতে নিহত হন। উক্ত ইমামের ইমামতিতে জানাজা নামাজ পড়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ওবায়দুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।
>
> ৩। আবদুল জব্বার, পিতার নাম আবদুল কাদের, গ্রাম পাঁচুয়া পোঃ আঃ গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। উক্ত হাফেজ ও ম্যাজিস্ট্রেট জানাজায় ছিলেন।
>
> ৪। শফিকুর রহমান, পিতা হাইকোর্টের কেরানী মাহবুবুর রহমান। বুলেটের আঘাতে নিহত। পিতা ও ভ্রাতা জানাজায় উপস্থিত ছিলেন।

★এই গ্রেফতারের বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে। –ব.উ.

www.pathagar.com

৫। আবদুল আওয়াল, পিতা মোহাম্মদ হাসিম। মটর দুর্ঘটনায় নিহত।

৬। ১০ বৎসর বয়স্ক বালক। সম্ভবত মটর দুর্ঘটনায় নিহত।[১]

১৬. কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতি, ইশতেহার ও সার্কুলার

২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ কমিটি একটি বিবৃতি প্রদান করেন যা ইশতেহার আকারে ছেপে ২৪ তারিখ থেকে প্রচার করা হয়। 'শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলুন' এই নামে প্রচারিত বিবৃতিটিতে বলা হয়,

> বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী নিয়ে ছাত্র জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নূরুল আমীন সরকার রাইফেলধারী পুলিশ ও মিলিটারী লেলিয়ে ঢাকা শহরে এক নৃশংস রক্তাক্ত বিভীষিকা সৃষ্টি করেছেন। গুলি মেরে ২৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। মাতৃভাষার ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য অত্যাচারী লীগ সরকারের বুলেটে যাঁরা জীবনদান করলেন সেই বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শহীদদের পবিত্র স্মৃতি দেশবাসীর মনে চিরজাগরুক থাকবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদের যে বীজ তাঁরা দেশের মাটিতে বপন করে গেলেন জীবনের বিনিময়ে তা প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীকে আগামী দিনের আজাদী ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।
>
> নরহত্যার প্রতিবাদে ভাষার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য রেল শ্রমিক থেকে শুরু করে শহরের বস্তীবাসী, কর্মচারী ও ছাত্রজনতার যে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠের বজ্র কঠোর ঘোষণা ঢাকার অলিতে গলিতে ধ্বনিত হয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টি তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। সর্বশ্রেণীর জনতার এহেন সংগ্রামী ঐক্য পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। বহু পরীক্ষিত ও শক্তিশালী হাতিয়ার এই ঐক্যের জোরেই জনতার দাবী হাছিল হবে, আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন এই ঐক্যকে সংহত ও শক্তিশালী করা। কিন্তু স্বৈরাচারী লীগ সরকার ও ভাড়াটিয়া প্রেস এই ঐক্যকে ব্যাহত করার জন্য নানা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। সরকার দেখেছে লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাসের সামনে জীবন তুচ্ছ করে এগিয়েছে সংগ্রামী জনতার কাফেলা। জনতার ঘৃণাকে রক্তের বন্যায় ডুবাতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। এই নূতন উদ্যমে আজ জনতার মনে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

এরপর কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে সরকারী প্রচারণা সম্পর্কে বিবৃতিতে বলা হয়,

> সরকারী প্রেসনোটে অহরহ প্রচার চালাচ্ছে ছাত্র জনসাধারণ অবাঞ্ছিত শক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পুলিশকে ঘেরাও করার ফলেই গুলি চলে। ইহা সত্যের অপলাপ। প্রকৃত ঘটনা দেশবাসী জানেন যে, পুলিশ ও মিলিটারীই মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে গুলি চালিয়েছে ছাত্র হত্যা করেছে। ইউনিভার্সিটির কার্জন হলে টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চালানো হয়। সরকার পুষ্ট মর্নিং নিউজ পত্রিকা অপপ্রচার চালাচ্ছে কমিউনিষ্টরাই এই হাঙ্গামার উস্কানীদাতা। জনতার ন্যায্য

www.pathagar.com

সংগ্রামে সাহায্য করার জন্যই কমিউনিষ্ট পার্টির সৃষ্টি, তাই গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পার্টি গর্ব অনুভব করে। গণ আন্দোলন থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যই এবং নিজেদের গদী টিকিয়ে রাখার জন্যই সরকার পার্টিকে কার্যত গত ৩ বছর পর্যন্ত বেআইনী করে রেখেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরোধী। পার্টি জনতার আন্দোলনকে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতেই পরিচালনা করে। কিন্তু লীগ সরকারই পার্টি ও গণআন্দোলনের উপর হিংস্র দমননীতি চালিয়ে আসছে।

সরকার ও প্রতিক্রিয়ার এই ধরনের প্রচার বা গণআন্দোলনের উপর হিংস্র আক্রমণ এই নতুন নয়। '৪৭ সনের অগাস্ট মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করে শাসনতান্ত্রিক জমিদার গোষ্ঠী ও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য পাকিস্তানের গদীতে বসেই লীগ নেতারা দেশের মধ্যে বুলেট লাঠির নীতি প্রচলিত করেছে। সাড়ে চার বছর লীগ সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে অনাহার ও চরম দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি করেছে; এই জনস্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদেই পূর্ব বাংলার শহরে গ্রামে গড়ে উঠছে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

এরপর জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিটিতে আরও বলা হয়,

কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটি যে সমস্ত দাবী দাওয়া প্রচার করেছেন আমরা তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমরা সমস্ত জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি,

সরকারী বিভেদনীতিকে পরাস্ত করার জন্য অবাঙ্গালী ভাইদের মধ্যে অবিভ্রান্ত* প্রচার চালান যে বর্তমান আন্দোলন উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে নয়– এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী পদলেহী লীগ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে।

সর্বত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন। প্রদেশের সর্বত্র আন্দোলনের ঢেউ নিয়ে যান। ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নিকট আমাদের আবেদন-গণসংগ্রামের পুরোভাগে স্থান নিন। দেশের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন ও সমস্ত দল মতের সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তুলুন।

পরিষদ সদস্য বিশেষতঃ বিরোধী সদস্যদের নিকট আমাদের আহ্বান লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গণদাবী মিটাতে সক্ষম এমন এক শক্তিশালী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করুন, নূরুল আমীন সরকারকে পদত্যাগ করাতে ও জনতার দাবী মানতে বাধ্য করুন।

ছাত্র জনসাধারণ ও সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করি,

★ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই,

★ গুলি চালনার বেসরকারী তদন্ত কমিশন চাই,

---

*ছাপার ভুলের জন্য ইস্তাহারটির এখানে 'অবিভ্রান্ত' শব্দটি ছাপা হয়েছে। আসলে এটা হবে অবিশ্রান্ত। –ব.উ.

www.pathagar.com

★ ১৪৪ ধারা ও মিলিটারীর প্রত্যাহার চাই,
★ শহীদদের ক্ষতিপূরণ দাও,
★ বন্দীদের মুক্তি দাও, নিরাপত্তা আইন নাকচ কর,
★ নূরুল আমীন সরকার পদত্যাগ কর।

ভাইসব, আপনাদের সুদৃঢ় সংকল্প ও অজেয় সংকল্পের মুখে লীগ সরকার ইতিমধ্যেই পশ্চাদপসরণ করেছে। পূর্ব বাংলা পরিষদে বাংলা ভাষার ন্যায্যতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দেশবাসীর ন্যায্য দাবীগুলি মিটাতে সরকার এখনো গড়িমসি করছে। কিন্তু শহীদগণের জীবন উৎসর্গের প্রেরণায় নতুন সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলুন, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকে সফল করুন। আপনাদের ন্যায্য দাবী মানতে সরকার বাধ্য হবে। শহীদদের পবিত্র সংকল্প জয়যুক্ত হবে।

ঐ দিনই অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির অপর একটি পৃথক সাইক্লোস্টাইল করা ইস্তাহার প্রচার করেন। 'সালাহউদ্দীন-জব্বার-বরকত-রফিকউদ্দীন প্রমুখ বীরদের হত্যার জবাব দিন' শীর্ষক ইস্তাহারটিতে অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালনা ও হত্যা সম্পর্কে বলা হয়,

...ঢাকার ছাত্র ও যুব সমাজ অশান্তি চায় নাই। ভাষার অধিকারের জন্য গত ৩১শে জানুয়ারী ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও যুব সমাজ শান্তিপূর্ণভাবেই শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারীও তাহারা শান্তিপূর্ণভাবেই শোভাযাত্রা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু নূরুল আমীন সরকারই অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে, এই সরকারের পুলিশ অফিসাররাই ২১শে ফেব্রুয়ারী গোলমাল বাধাইবার জন্য শান্তিপূর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উপর বার বার লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চালাইয়াছে, এই সরকারের হুকুমেই পুলিশ গুলি করিয়া সালাহউদ্দীনের মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়াছে, এই সরকারের পুলিশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের ভিতরও গুলিবর্ষণ করিয়াছে। এই সরকারের পুলিশ বাহিনী ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একবার নয়, দুবার নয়, বার বার হাইকোর্টের সামনে, মিটফোর্ড স্কুলের সামনে, ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে, কাপ্তানবাজারের মোড়ে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি চালাইয়া কিশোর বালকদের কচি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। সঙ্গীন বিদ্ধ করিয়া, গুলি করিয়া আবার নিরাপরাধ নাগরিকদের হত্যা করিয়াছে। এই জালেম সরকারই মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী শোষকদের মুনাফার জন্য পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে অনাহার ও দুঃখের অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। গণসমর্থন হারাইয়া নূরুল আমীন সরকার নিজের গদী টিকাইয়া রাখার জন্য আজ ঢাকাবাসী সন্তান সন্ততিদের তাজা খুনে ঢাকার রাস্তাঘাট লাল করিয়া দিতেছে। নূরুল আমীন সরকার আজ এত ঘৃণিত হইয়াছে যে তারা পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা চাপিয়া যাইতেছে★ এবং মৃত ব্যক্তিদের দাফন কাফন করার সুযোগ না দিয়া তাহাদের লাশ গায়েব করিয়াছে। পৈশাচিক নৃশংসতায় নূরুল আমীন সরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও হার মানাইয়াছে। মুষ্টিমেয় শোষকদের এই লীগ সরকারের এখনই অবসান প্রয়োজন।

★ সরকারী প্রেসনোটে নিহতদের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছিলো তাতে সালাহউদ্দিন, যাঁর মাথার খুলি পুলিশের গুলিতে উড়ে গিয়েছিলো, এবং অন্যদের কোন উল্লেখ ছিলো না। –ব.উ.

www.pathagar.com

কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে মর্নিং নিউজ এর মাধ্যমে সরকার প্রচারণা জোরদারভাবে চালাতে থাকার বিরুদ্ধে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ কমিটি ২৪শে তারিখে অর্থাৎ প্রথমোক্ত বিবৃতিটির পর দিনই একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিটিও মুদ্রিত হয়ে ইস্তাহার আকারে প্রচারিত হয়। এতে বলা হয়,

> শহীদের তাজা খুনে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববঙ্গবাসীর সংগ্রাম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জাতির ঐতিহাসিক আন্দোলনকে বিকৃত রূপ দেওয়ার জন্য সাংবাদিক সততা বিসর্জন দিয়ে নির্লজ্জের মতো "মর্নিং নিউজ" পত্রিকা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করছে।
>
> ২১শে তারিখের বিবরণে "মর্নিং নিউজ" লিখেছে- শুধুমাত্র হিন্দুদের দোকানগুলি বন্ধের ভিতর দিয়েই ঐদিন হরতাল পালিত হয়। এরূপ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানির জন্যই 'মর্নিং নিউজ' প্রেস জনতা কর্তৃক ভস্মীভূত হয়। প্রথম থেকেই পত্রিকাটি আন্দোলনকে বিকৃত করা ও জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য পরিকল্পিত অপপ্রচার চালায়। সরকারী প্রেস নোটের প্রতিধ্বনি করে তারা বুঝাতে চায় যে, এই আন্দোলনের নেতা হিন্দু ও কিছু কম্যুনিষ্ট; জনসাধারণ আন্দোলনে বিশেষ কোন অংশগ্রহণ করে নি- ইহা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর আন্দোলন নয়।
>
> ২৩শে ফেব্রুয়ারী "মর্নিং নিউজ" এই একই উদ্দেশ্যে অপর একটি মিথ্যা খবর প্রকাশ করে যে ভারত থেকে ১০০ জন কম্যুনিষ্ট পূর্ববঙ্গে এসেছে এবং ২১শে তারিখ রাত্রে নেতৃস্থানীয় কম্যুনিষ্টরা সভা করে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মিথ্যা খবর দিয়ে তারা বলতে চেয়েছে যে ভারত থেকে এসে কম্যুনিষ্টরা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে। আরো প্রচার করা হয়েছে যে, হিন্দুরা পাকিস্তানে যানবাহন অচল করে দেবার জন্য রেলগাড়ি চলাচল বন্ধ করেছে।
>
> দেশবাসী জানেন যে, এই আন্দোলন সারা পূর্ববঙ্গবাসীর আন্দোলন; বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। আর যারা শহীদ হয়েছেন তারা এই দেশেরই সন্তান। যারা বুলেটের সামনে বুক পেতে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে পরিগণিত হচ্ছেন। সরকারের ভাড়াটিয়া "মর্নিং নিউজ" এদেরকেই বলছে- "গুণ্ডা"। আজ আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব করছেন তারা বিভিন্ন দল ও মতের প্রতিনিধি। কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীরাও অন্যান্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনতার পাশে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি চিরদিনই সংগ্রামী জনতার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, জেলে গিয়েছে, শহীদ হয়েছে। সরকার এটা জানে বলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির শত শত কর্মী ও নেতাকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক রেখেছে।
>
> জনসাধারণের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য লীগ নেতারাও মর্নিং নিউজের মতো তাদের ভাড়াটিয়া পত্রিকাগুলি অহরহ প্রচার করে থাকে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি "দেশের শত্রু"-"সন্ত্রাসবাদী" ইত্যাদি। কিন্তু গত ৪ বছরে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও কোটিপতি ব্যবসায়ীর স্বার্থে এবং ইংরেজের নেতৃত্বে পরিচালিত লীগ সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ গত কয়েকদিনের নরহত্যা ও রক্তপাত প্রকাশ করেছে কারা দেশের শত্রু। সাম্রাজ্যবাদের বদলে লীগ সরকারই দেশদ্রোহিতার নীতি অনুসরণ করেছে। অপরদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি হলো

www.pathagar.com

সকল দলমত–শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, জাতীয় ধনীক শ্রেণীর সম্মিলিত "মোচ্চা" গঠন করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা ও পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা।

২৫শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি পার্টি কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি সার্কুলার (নং ১১) পাঠান। নূরুল আমীন সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা সত্ত্বেও দাবী পরিপূর্ণভাবে আদায় এবং সেই সঙ্গে পার্টি সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে করণীয় কাজগুলি নির্দেশ করতে গিয়ে সার্কুলারটিতে বলা হয়,

> এখনও এই সংগ্রামের আরও কয়েকটি দাবী আদায় করা বাকী রহিয়াছে। "রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ" সেই দাবীগুলি উথ্থাপন করিয়াছেন। এই সব দাবী আমরাও পূর্ণ সমর্থন করি। সেই দাবীগুলি হইল,
>
> (১) এই আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের ও আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার, আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি, (২) ১৪৪ ধারা ও কারফিউ প্রত্যাহার, (৩) গুলিবর্ষণের তদন্তের জন্য বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন ও হত্যাকারীদের শাস্তি, (৪) আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য কোন সরকারী কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান না করা, এবং পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহতদের জন্য যোগ্য ক্ষতিপূরণ।
>
> এই দাবীগুলি হাসিলের জন্য এই গণসংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সংগ্রামকে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগ্রামকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য সেই কর্মপদ্ধতিটিও আমরা উপযুক্ত বলিয়া মনে করি এবং সেই কর্মপদ্ধতিতেই সারা পূর্ববঙ্গে সংগ্রামকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য আমরা সকল কমরেডকে আহ্বান করিতেছি।
>
> দ্বিতীয়ত, এখন প্রয়োজন আরও সংগঠিত নেতৃত্ব ও আরও সংগঠিত সংগ্রাম। সেজন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জোরদার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন এবং সে সব কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সংঘবদ্ধ করুন। সমস্ত কমরেডই বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে কাজ করুন এবং সংগ্রাম পরিষদগুলিকে জনগণের ঐক্যের ও সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে গঠন করিয়া তুলুন।
>
> তৃতীয়ত, সরকার আন্দোলনে বিভেদ আনার জন্য যে অপপ্রচার করিতেছে যেমন "এই আন্দোলন পাকিস্তানের বাইরের লোকদের প্রেরণায় চলিতেছে" প্রভৃতি ঘৃণ্য প্রচারের জবাব দিন। পোষ্টার, ইস্তাহার, বৈঠক, সভা প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনগণকে বলুন যে সরকারের এই অপপ্রচার পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী জনতা ও সংগ্রামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রটনা। জনগণ নিজের ভাষার ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার জন্য নিজেদের প্রেরণায় সংগ্রাম করিতেছেন এবং লীগ সরকারই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার তাবেদার দেশের মুষ্টিমেয় শোষকদের স্বার্থে পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর বল্গাহীন অত্যাচার চালাইতেছে। এইরূপ প্রচার দ্বারা লীগ সরকারের আসল মুখোশ খুলিয়া দিন ও লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণাকে আরও তীব্র করিয়া তুলুন।

উপরোক্তভাবে সারা পূর্ববঙ্গে এই সংগ্রামকে আগাইয়া নিলে আমাদের

www.pathagar.com

উপরোক্ত পাঁচটি দাবী নিশ্চয়ই হাসিল হইবে।

এই সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে– (১) নূরুল আমীন মন্ত্রীসভা গদী ছাড়, (২) অবিলম্বে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে ও যুক্ত নির্বাচন প্রথায় অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সর্বত্র সভা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করুন ও এই দাবীগুলিকে পূর্ব বাংলার জনগণের দাবীতে পরিণত করুন। বর্তমান সংগ্রাম হইতেই নূরুল আমীন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ, বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী সজোরে উঠিয়াছে। আইন সভায় লীগ দলেরও বিরাট ভাঙ্গন আসিয়াছে। সেই পটভূমিকায় উপরের দুইটি শ্লোগানের ভিত্তিতে দেশে বিরাট গণআন্দোলন সৃষ্টি করিয়া নূরুল আমীন সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারিলে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আন্দোলনে বিরাট অগ্রগতি হইবে।

পরিশেষে আজ যে সমস্ত কর্মী এই আন্দোলনে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের ভিতর পার্টি সাহিত্য প্রচার করুন, তাঁহাদিগকে পার্টির প্রতি টানিয়া আনুন এবং তাঁহাদিগকে পার্টি গ্রুপে গ্রুপে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করুন। এই বিরাট গণসংগ্রামের ভিতর দিয়া জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করার পথে আরও অগ্রসর হইবে, পার্টির শক্তি বাড়িবে এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি দুর্বলতর হইয়া পড়িবে– এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া সকল কমরেড ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

উপরে উল্লিখিত এবং উদ্ধৃত বিবৃতি, ইস্তাহার ও সার্কুলারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সে সময় কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে সব ধরনের দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষপাতি ছিলো। শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এই আন্দোলন পরিচালনা করুক– এই ধরনের চিন্তা ও কর্মের তাঁরা বিরোধী ছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীই তৎকালে সঠিক ছিলো কারণ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির মাধ্যমে দেশব্যাপী জনগণের ঐক্য গড়ে তোলা এবং তাকে শক্তিশালী ও সংহত করা সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিলো যে, ২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলি চালনার পর পরিস্থিতি যেভাবে মোড় নিয়েছিলো এবং আন্দোলন যেভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিলো তাতে করে তাকে আয়ত্তে রাখা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনার কথা ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী গুলি চালনার পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা চিন্তা করেছিলেন তাঁরাও গুলি চালনার পরবর্তী পর্যায়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন ও তাকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মার্চ এপ্রিলের ঘটনাবলী

১. নূরুল আমীনের ৩রা মার্চের বেতার বক্তৃতা

নারায়ণগঞ্জের ২৯শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চের ঘটনাবলীর ঠিক পরই ৩রা মার্চ নূরুল আমীন ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার খসড়া কিভাবে প্রস্তুত হয় সে সম্পর্কে সরকারের প্রচার বিভাগে কর্মরত কাজী মুহম্মদ ইদরিস যে বিবরণ দেন তা হলো এই :

> আমি সেদিন সকালে সেক্রেটারীয়েটে কাজে যাওয়ার পর আমাদের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের সকলকে নূরুল আমীন সাহেবের বাসাতে নিয়ে যাওয়া হলো। শুনলাম নূরুল আমীন বেতার বক্তৃতা দেবেন, সেজন্য আমাদেরকে যেতে হবে। আমরা গেলাম। গিয়ে দেখলাম, দোতলায় আজিজ আহমদ, আজফার, ফজলে করিম ফজলী প্রভৃতির সাথে নূরুল আমীন তাঁর খসড়া তৈরী করছিলেন। আমরা নীচের তলায় অপেক্ষা করতে থাকলাম।
>
> ওপরে খসড়াটি শেষ হলে নীচে আমাদেরকে সেটি বাংলা করতে বলা হলো। সেই সময় ফজলী সাহেব নীচে নেমে এসে আমাদেরকে বললেন যে, ইংরেজী বক্তৃতাটির মধ্যে একটা কথা নেই সেটা যোগ করে বাংলা ভাষ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। কথাটি হলো এই যে, সেদিন নারায়ণগঞ্জে একটি প্রসেশন হয়েছে এবং সেই প্রসেশনের মধ্যে 'যুক্ত বাংলা চাই' এই শ্লোগান দেওয়া হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সমস্ত ভাষা আন্দোলনটি এ দেশের ছাত্রদের সৃষ্টি আসলে নয়। এটা হলো বিদেশী দুশমন এবং তাদের দালালদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এ সময় স্বাধীনতা কাগজেও লিখেছিলো যে, কমিউনিষ্টরাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সত্যিকার নেতা ইত্যাদি। নূরুল আমীনের কাছে সে কাগজও ছিলো, যার জন্য তিনি বলেছিলেন যে, সমস্ত আন্দোলনটিই আসলে কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র। স্টেটমেন্টটি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর নূরুল আমীন সাহেব একটি জীপে চড়ে দু'ধারে পুলিশ পাহারার মধ্যে রেডিও অফিসে তাঁর বক্তৃতা দিতে গেলেন।[১]

নূরুল আমীনের উপরোক্ত ৩রা মার্চের রেডিও বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ হলো নিম্নরূপ :

> আমি শোকাভিভূত অন্তঃকরণে বক্তৃতা দান করিতেছি। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ

www.pathagar.com

সপ্তাহে ঢাকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা আমাকে গভীর আঘাত ও দুঃখ দিয়াছে। আমি আপনাদেরই একজন, আপনারা আমাকে প্রধান খাদিমের মর্যাদা ও সুযোগ দান করিয়াছেন। বিবেকের নির্দেশ অনুসারে যতদূর সম্ভব আপনাদের খেদমত করাই আমার কর্তব্য। বলাবাহুল্য সে ছাত্র হউক বা না হউক সকল পাকিস্তানীর জীবনই অপর পাকিস্তানীর ন্যায় আমারও নিকট অতীব প্রিয়। উহা জাতির সম্পদ বলিয়াই আমি গণ্য করি এবং মনে করি যে, উহার হানি যুগপৎ জাতীয় এবং ব্যক্তিগত ক্ষতি। ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগের ফলে যাঁহারা উপদ্রুত হইয়াছেন, আমার হৃদয় তাঁদের জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়াছে। আমি পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, সময়ে গুলিবর্ষণ সম্পর্কেও পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হইবে এবং উহাতে যদি কাহাকেও দোষী বলিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক আকার ধারণ করিতেছে এবং গত কয়েক দিনের ঘটনায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইতেছে, কাজেই এই সম্পর্কে শান্তভাবে ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। জনস্বার্থের খাতিরে পূর্বেকার বিবৃতিতে আমি খোলাখুলি কিছু বলিতে পারি নাই। আমার মনে হয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত সরকারের পক্ষে যে গত্যন্তর ছিল না, আপনারা যাহাতে তাহা বুঝিতে পারেন সেই জন্য আর একটু খোলাখুলি আপনাদের নিকট কথা বলা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য কতিপয় কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বিদেশী দালাল এবং অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সরকারী ব্যবস্থার ফলে, তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের পটভূমিকা ও উহার উদ্দেশ্য এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আমি কিছু বলিতে চাই।

যে সকল শক্তি পরদার আড়ালে থাকিয়া চাবিকাঠি ঘুরাইতেছে, পূর্ববর্তী বেতার ভাষণে আমি তৎসম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াছি। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অল্প পূর্বে সরকার সংবাদ পান যে, যাহারা পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত শুনিতে পারিত না, যাহারা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে তাহাদের কন্টকস্বরূপ মনে করিয়াছে এবং যাহারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করিয়া ফেলার চিন্তা কখনও মন হইতে দূর করিতে পারে নাই, তাহারা গুঢ় উদ্দেশ্যে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইহাও জানিতাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে গোলমাল রহিয়াছে। অনিষ্টকারী দল আমাদের ছাত্রদিগকে ভুলপথে পরিচালিত করিয়াছে এবং গোলমাল বাধাইবার জন্য জোর চেষ্টা করিতেছে। দেশে গোলমালের সৃষ্টি এবং শাসন ব্যবস্থাকে জোর ক্রমে বানচাল করিয়া দিবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা চলিতেছিল। তাহারা শুধু সুযোগের প্রতিক্ষায় ছিল। কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লাতের জীবদ্দশায় তাহারা নিষ্ক্রিয় ছিল। কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাৎ তাহাদিগকে সে সুযোগ আনিয়া দেয় এবং ভাষা সমস্যাটি আমাদের ভাবপ্রবণ ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করে বলিয়া ইহার আড়ালে নিজেদের দুরভিসন্ধি লুকাইয়া রাখে। সবকিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে শুধু ইহাই মনে হয় যে, প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশনের তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন দরকার হয়, ততদিন পর্যন্ত গোলমাল, বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সরকার ইহা বুঝিতে পারিয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঢাকায় ১৪৪ ধারা

www.pathagar.com

জারী করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার স্বীকৃতির দাবীকে দাবাইয়া রাখিবার কোন প্রশ্নই উহার মধ্যে ছিল না। ঘটনার মাত্র পক্ষকাল পূর্বেও ঢাকায় ও অন্যান্য জায়গায় এ সম্পর্কে সভার অনুষ্ঠান এবং শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোথাও কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৪৪ ধারায় এ ধরনের সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ নহে। জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া উহা করা যাইত। কিন্তু এরূপ কোন অনুমতি চাওয়া হয় নাই। অধিকন্তু পরবর্তী ঘটনা হইতে সরকারের এই কথারই সমর্থন পাওয়া যাইতেছে যে, দুষ্কৃতিকারীরা ভাষা সমস্যাকে তেমন কোন গুরুত্বই দেয় নাই। যতটুকু দিয়াছে, তাহা শুধু জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্যই।

পাকিস্তানের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষীদের মত আমিও আশা করিয়াছিলাম যে, আমাদের জনগণ তাহাদের সহজাত বুদ্ধি, ইসলাম প্রীতি ও পাকিস্তানের প্রতি মমত্ববোধ নিজেদের স্থানীয় বাদবিসম্বাদ ভুলিয়া যাইবে এবং বুদ্ধিমান ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে ঐক্যবদ্ধভাবে ঢাকার সাম্প্রতিক গোলমালের ন্যায় জাতীয় বিপদ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইবে। ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রুরা অতি সাময়িকভাবে হইলেও কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং আমাদের তরলমতি যুবক ও জনসাধারণের মধ্যেও কিছু লোককে বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে দেখিয়া আমি খুবই বেদনা বোধ করিতেছি। ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগের পিছনে যাহারা আছে, তাহারা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং যেভাবে তাহাদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছে তাহাতে অতি সহজেই বুঝা যায়– তাহাদের আসল উদ্দেশ্য কি। কিন্তু আমি অত্যন্ত বেদনাবোধ করিতেছি যে, জনগণের কতক অংশ আমাদের শত্রুদের আসল উদ্দেশ্য ও পাকিস্তানের বিপদের কথা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের ফাঁদে পা দিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা সমস্যাকে এতদিন সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই এই জন্য যে, আরও বহু বৎসর ধরিয়া উর্দু বা বাংলার বদলে ইংরেজীই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্থান দখল করিয়া থাকিবে। এ অবস্থায় সময় এবং স্বাভাবিক অবস্থা বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সমস্যার মীমাংসা করাই সঙ্গত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আপনারা জানেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আমাদের জাতীয় জীবনে নবীন প্রাণধারার সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহার ফলে উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষারই নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে।

উর্দু ভাষী ও বাংলাভাষী লোকদের মিলনের ফলে দুইটি ভাষারই উন্নতি হইতেছে এবং এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার সঙ্গে মিশিয়া এই দুই ভাষা-ভাষীদের মধ্যস্থিত ব্যবধান দ্রুত কমাইয়া আনিতেছে। ইহারই জন্য মরহুম কায়েদে আজম বা কায়েদে মিল্লাত কেহই অপরিণত সময়ে এ সম্পর্কে গণপরিষদের নিকট হইতে কোন সিদ্ধান্ত করণের প্রয়োজন মনে করেন নাই। পূর্ববঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে অনুমোদন করেন যে, ভবিষ্যতে বাংলাভাষা অবশ্যই প্রদেশের সরকারি ভাষা হইবে এবং এই ভাষার সর্বাধিক উন্নতির জন্য সরকার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দান করেন। এই ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তান এবং বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে সরকার উৎসাহিত করেন।

যাহা হউক, গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার বুকে যে দুর্ভাগ্যপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব

www.pathagar.com

হয় তাহা বিবেচনা করিয়া আমি ভাষা-বিতর্ককে রাজনীতি হইতে পৃথক করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি এবং ইহার দ্বারা আমি প্রমাণ করিতে চাই যে ভাষার প্রশ্নটাই আসল প্রশ্ন নহে বলিয়া আমি সব সময় যে ধারণা পোষণ করিতেছিলাম তাহাই আজ বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে। ভাষা বিতর্কের অ'ওতায় একটি নিগূঢ় দুরভিসন্ধি রহিয়াছে।

অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া সরকারকে ধ্বংস করিবার জন্য শত্রুর চর এবং দুশমনরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। তারপর দিনই আমি ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব করি যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্থান দেওয়ার জন্য গণপরিষদের কাছে সোপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হউক। আমার এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যাহারা আইন অমান্যের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ভাষা সমস্যা ছাড়া যদি অন্য কোন বিশেষ মতলব তাহাদের না থাকিত তবে পরিষদের এই ব্যবস্থায় তাহারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইতো।

কিন্তু আমরা কি দেখিয়াছি? এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভকারীরা অন্যান্য দাবী উত্থাপন করিতে থাকে। তাহাদের আইন অমান্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি একটি নব প্রেরণা লাভ করে। সরকার যাহা পূর্ব হইতেই জানিতেন তাহা শীঘ্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ এবং প্রয়োজন হইলে আইনভঙ্গ করিয়া সরকারকে ধ্বংস করা হইবে এবং সেখানে নিজেদের মনোনীত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের দ্বারা পূর্ব বঙ্গকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একত্র করার মূল উদ্দেশ্য হাসেল করিয়া লওয়া হইবে। সকলেই জানেন যে, ঐ ঘটনার সময় নারায়ণগঞ্জের একটি মিছিলে প্রকাশ্যভাবে "যুক্ত বাংলা চাই" এবং "জয় হিন্দ" প্রভৃতি ধ্বনি করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তাহারা কোন সাহসে আজ এসব শ্লোগান দিতে সাহস পাইল তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকারের কাছে যে সব তথ্য ছিল তদ্দারা সব কিছুই আজ নিশ্চয় বলিয়া প্রমাণিত হইল। দুরভিসন্ধি হাসেলের জন্য তাহারা যে পন্থা গ্রহণ করে তাহা সত্যই অভিনব। সকলেই জানেন যে, তাহারা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে হত্যা করার ধাতানি দিয়া মোছলেম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করাইবার প্রয়াস পায়। সরকারের প্রচেষ্টা ব্যাহত এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র সমর্থন করাইবার জন্য সংবাদপত্রগুলির মালিক এবং সাংবাদিকগণকেও তাহারা অনুরূপ ধাতানি দেয়। তাহাদের পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে তাহারা "মর্নিং নিউজ" প্রেসটি পোড়াইয়া ফেলে এবং ইহার দ্বারা অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করে।

এরূপভাবে সরকারী কর্মচারীগণকেও ধমকানি দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে অফিসে যাইতে বারণ করা হয়। শাসন কার্য্যে অচলাবস্থা সৃষ্টির চেষ্টাও করা হয়। তিনদিন ধরিয়া বহু দোকানপাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা জোরপূর্বক বন্ধ রাখা হয়। এবং তাহাদিগকে হরতাল পালন করিতে বাধ্য করা হয়। টেলিফোন এবং ট্রেন চলাচল ব্যবস্থায়ও বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য অনুরূপ চেষ্টা করা হয়। ফলে এইসব রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপের মোকাবেলা করিবার জন্য সরকারকে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এইভাবে বুঝিতে পারেন যে বাংলা- অন্যতম

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা হইবে কিনা প্রকৃত প্রশ্ন মোটেই তা ছিল না। বরং সরকার একদল লোককে সাফল্যের সঙ্গে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করিতে দিতে পারেন কিনা তাহাই ছিল সত্যিকার প্রশ্ন। এরূপ জরুরী অবস্থায় সরকার কি করিবেন বলিয়া আপনারা আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

এই ধরনের দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত কোন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইলে যে কোন সরকার কি করিতেন? এখানকার খুব অল্প সংখ্যক লোক ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধি ও মোছলেম লীগ সরকারকে পদত্যাগ করার জন্য বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন করার প্রয়াস পাইতেছেন। এইরূপ ঘটিতে দেওয়া হইলে আমার সরকার দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিতেন; কারণ, ইহার ফলে সমগ্র পাকিস্তান ও প্রকৃতপক্ষে এছলাম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িত। আমার সহকর্মীগণ ও আমি যদি এই ভীতি প্রদর্শনের ফলে আমাদের কর্তব্য কার্য সম্পাদনে বিরত হইতাম এবং এই বিশৃঙ্খলা দমনে দৃঢ়তা অবলম্বন না করিতাম তবে আমরা দেশবাসী ও এছলামের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইয়াছি বলিয়া আপনাদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কাছে অপরাধী হইতাম। একমাত্র শাসনতান্ত্রিক উপায়েই সরকারের পতন ঘটানো যাইতে পারে। আইন-পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী ভোটের দ্বারাই সরকারের পতন ঘটাইতে পারে। আইন পরিষদের এই সদস্যগণ যাহাতে কোন ব্যাপারে স্থিরভাবে নিজেদের মতামত প্রদান করিতে পারেন তজ্জন্য তাহাদিগকে নির্বিঘ্নে ও বিপদ-আপদশূন্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। অন্যথায়, গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারে না এবং বিশৃঙ্খলার রাজত্ব শুরু হয়।

সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে যদিও শান্তিভঙ্গের আশু বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে তথাপি আমাদের আজাদীর বিপদ এখনও সম্পূর্ণভাবে কাটে নাই।

প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত রাখিতে হইবেই। আমার সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস এই ব্যাপারে আমরা পাকিস্তানের যে কোন দরদীর আন্তরিক সমর্থন লাভ করিব।

সরকারকে সমর্থন করার জন্য এবং প্রদেশে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে এবং মিথ্যা গুজব আতঙ্ক রটাতে লিপ্ত দুষ্কৃতিকারীগণকে দমন করার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য আমি সকল পাকিস্তানীর নিকট আবেদন জানাইতেছি।

আপনারা আমাদের সীমান্তের অপর পারের প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং বর্তমানে আমাদের সম্মুখে কি বিপদ রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করুন। কেবলমাত্র পাকিস্তান নয়, এমন কি এছলামও এখন এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। আমরা এই দাবী করিতেছি যে এছলাম কোন ধর্মীয়, ভৌগোলিক, জাতিগত অর্থনৈতিক ও ভাষাগত বৈষম্য বা বাধা স্বীকার করে না এবং ইহার অতীতের সুবর্ণ যুগের ন্যায় বর্তমান সময়েও বিশ্ব-শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে পারে। আর আমাদের এই পাকিস্তানেই আমরা ইহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছি। এছলামকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মত্যাগের ফলে পাকিস্তান কায়েম

www.pathagar.com

হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও ধর্মাবলম্বীদের বাসভূমি এই পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশকে একমাত্র এছলামই একত্রিত রাখিতেছে।

আমাদের দৃঢ় সংহতি আমাদের শত্রু ও মিত্রের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা সারা মোছলেম জাহানকে জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে এবং ইহা এছলামের পুনরুত্থানশীল শক্তিকে জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে।

দুনিয়ার নিকট আমাদের প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে এছলাম আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে এবং মরহুম কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাতের প্রত্যক্ষ পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মহান লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম। এই ব্যাপারে পাকিস্তানের অন্যান্য বাসিন্দাদের চেয়ে আমাদের উপর অধিকতর দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানে যত মুছলমানের নিবাস, দুনিয়ার আর কোথাও এত বেশী সংখ্যক মুছলমান বাস করেন না। সুতরাং বিশ্ব মোছলেম সংহতির বন্ধন বজায় রাখার এবং ইহাকে আরও দৃঢ়তর করার দায়িত্ব আমাদেরই।

মোছলেম জাহানের এই সংকট মুহূর্তে আমরা কি পাকিস্তান ও এছলামের প্রতি আমাদের এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতে অসমর্থ হইব? নিশ্চয়ই না। ইনশাল্লাহ্, এছলাম, পাকিস্তান ও মোছলেম জাহানের প্রতি আমাদের পবিত্র কর্তব্য পালনে আমরা কোনদিনই পশ্চাদপদ হইব না।[২]

২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের গ্রেফতার

২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় যে ৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিরও সদস্য। এঁদের মধ্যে তোয়াহা সহ অনেকেই ২৮শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই আত্মগোপন করেন।

এই হুলিয়া জারী এবং আত্মগোপনের সময়কার বিবরণ দিতে গিয়ে মহম্মদ তোয়াহা বলেন,

সম্ভবত ২৩শে রাত্রে মেডিকেল কালেজ হোস্টেলে খোন্দকার মোস্তাক আহমদ বললো নিজেদের কাদা ছোড়াছুঁড়ি বন্ধ করতে হবে, cool সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তখন সেখানে সিদ্ধান্ত করতে হলো যে, রেজায়া করিমকে* go between করে সমঝোতা করা হোক। রেজায়া করিমকে সরকারও পাঠালো unofficially রেজায়া করিমকে সিলেক্ট করা হলো এজন্য যে, সব মহলেই তার গতায়াত ও প্রতিপত্তি ছিলো। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে মিটিং এর পর

*তৎকালে ঢাকার প্রখ্যাত উকিল এবং নূরুল আমীনের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি।-ব.উ.

www.pathagar.com

২৪-২৫শে কোন সময় তিনি এলেন।★

রেজায়া করিমের সাথে আমাদের কথা হলো। আমরা কতকগুলো দাবী উত্থাপন করলাম। বন্দীদের মুক্তি, ক্ষতিপূরণ, দোষীর শাস্তি, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য চূড়ান্ত কমিটমেন্ট-এগুলো করলে strike call off করতে রাজী। এর কতকগুলো টাইপ কপি তৈরি করা হলো। একজন টাইপ করে নিয়ে এলো। এই আলোচনার সময় আমি, অলি আহাদ, মেডিকেল কলেজের ছাত্র (কুমিল্লা বাড়ী) কয়েকজন ছিলাম।

এই আলোচনার সময়েতেই পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল raid করলো। আমরা কিন্তু আগে সন্দেহ করে watch রেখেছিলাম আলী আকসাদকে। যে সময়ে ব্যারাকে বসে আমরা negotiate করছিলাম তখন পুলিশ raid করে। আলী আকসাদ দৌড়ে গিয়ে বললো : পুলিশ, পালান। রেজায়া করিমকে ফেলে আমরা পালালাম। কিন্তু typed কাগজের অন্য কপিগুলো ফেলে গেলাম। সেগুলো-পুলিশ সীজ করলো। গভর্নমেন্ট তার থেকেই আমাদের টার্মস্-

জানতে পারে এবং দুর্বলতা কিছুটা জানতে পেরে হুলিয়া দেয় আমাদের নামে কারণ আমরা negotiated settlement চাই এটা এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়ে গেল।

পুলিশের জানা ছিলো না যে, নার্সদের কোয়ার্টারের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যেতো। পুলিশ চারিধারে ঘিরেছিলো শুধু ওই দিকটা ছাড়া। আমরা সন্দেহ করি রেজায়া করিমের সাথে যোগাযোগটা leak out হয়েছিলো। রেজায়া করিমও করে থাকতে পারতো। পিছন দিক দিয়ে আমি এবং অলি আহাদ পালিয়ে গেলাম।...তখন থেকে বুঝলাম প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো safe নয়। তখন আণ্ডার গ্রাউণ্ড চলে গেলাম।[১]

৫ই মার্চের ধর্মঘট ঢাকার বাইরে প্রায় সর্বত্র সফল হলেও ঢাকায় ব্যর্থ হয়েছিলো। তারপর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি সভা ডাকা হয় ৭ই মার্চ তারিখে। ৮২নং শান্তিনগরে ডক্টর মুত্তালিব নামে একজন চিকিৎসকের বাসায় এই বৈঠকের স্থান নির্ধারিত হয়। এই স্থানটি নির্ধারণ করেন হাসান পারভেজ যিনি নিজে সংগ্রাম কমিটি সদস্য ছিলেন না।[২]

এই বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন-মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুল মতিন, মুজিবুল হক, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, সাদেক খান, মীর্জা গোলাম হাফেজ এবং হাসান পারভেজ।★★

★মেডিকেল কলেজ রেজায়া করিমের এই উপস্থিতি এবং তার সঙ্গে সংগ্রাম কমিটির এই ধরনের আধা-আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে একটা রফায় আসার ব্যাপারটি অন্য কেউ তেমন উল্লেখ করেন নি। তবে হেদায়েত হোসেন চৌধুরী রেজায়া করিমের সঙ্গে এই ধরনের যোগাযোগের কথা সেলিমুল্লাহ হলের মাইক প্রসঙ্গে বলেছেন।-ব.উ.

★★অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৮১) উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল লতিফ এবং আনিসুজ্জামানও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল লতিফের কথা মুজিবুল হকও উল্লেখ করেছেন। তবে আনিসুজ্জামান সেখানে ছিলেন একথা একমাত্র অলি আহাদ তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থটিতে ছাড়া অন্য কেউ কোথাও বলেন নি। ব.উ.

www.pathagar.com

আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কোন কার্যকর ভূমিকাই আর ছিলো না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিরও কোন আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম ছিলো না। এ বিষয়ে মহম্মদ তোয়াহা বলেন,

> এর পূর্বে সর্বদলীয় কমিটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। প্রগতিশীল কর্মীদের একটি কমিটি করে কাজ চালিয়ে যাই।* Non Party element কে** আমরা ডাকতাম না। আমরা এটা follow করতে থাকি। CommInttee of Action এর নামে সব কাজ করা হচ্ছিলো। এতে অন্যান্যেরা আপত্তি করতে পারে এইজন ninth*** এর মিটিং ডাকা হয়েছিলো। এর পূর্বে আমরা ঠিক করতাম যে মিটিং হবে এটা জানানো হবে কিন্তু তাদেরকে এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলা সত্ত্বেও নেবো না। এটাই আমরা করতাম।**** তাদেরকে নিতাম না যদিও notify করা হতো মিটিং এর ব্যাপারে।[৩]

এ পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চের বৈঠক নানা ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিলো এবং গোপনীয়তা পুরোপুরি রক্ষা করার যথাসাধ্য ব্যবস্থাও এই বৈঠকের সংগঠকরা গ্রহণ করেছিলেন। বৈঠকে যাওয়ার পূর্বে তোয়াহা খোন্দকার গোলাম মুস্তফার কমলাপুরস্থ বাসায় গিয়ে খোকা রায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।[৪] বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁরা কিভাবে বৈঠকের স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে মুহম্মদ তোয়াহার বিবরণ হলো নিম্নরূপ :

> ৯ই তারিখ সাদেক খান কিন্তু ভুল করলো। তার সাথেই আমার টেকনিক্যাল যোগাযোগ ছিলো। আমি তখন ডাক্তার করিমের বাসায় ছিলাম। সেদিন ভোরে আমি সেখানে যাই। সন্ধ্যার সময় সাদেক এলো নিতে, সে জানতো আমি থাকবো করিমের বাসায়। আমি মতিঝিলের (এখন ডি. আই. টি. এবং মতিঝিলের মধ্যে রাস্তা) দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম শান্তিনগরের দিকে। আমরা দু'জনে সাইকেলে যাচ্ছিলাম। যখন শুনলাম সাদেক মুজিবুল হক ও হেদায়েতকে খবর দিয়েছে তখন আমি সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। যাবো না বললাম। কিন্তু সাদেক বললো, না সেটা হবে না। সে insist করলো। কিন্তু আমার মন বলছিলো তারা পুলিশকে বলেছে আমরা ধরা পড়বো।
>
> মিটিংএ গেলাম অবশেষে। সেখানে সাদেকের সঙ্গে গিয়ে দেখলাম উপস্থিত : কাজী গোলাম মাহবুব অলি আহাদ, হেদায়েত, মুজিবুল হক, হাসান পারভেজ, মীর্জা গোলাম হাফেজ। মীর্জা কমিটির সদস্য ছিলেন না কিন্তু একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি হিসেবে পরামর্শের জন্য তাঁকে উপস্থিত হতে বলেছিলাম।[৫]

---

*আসলে এটাও কোন আনুষ্ঠানিক কমিটি ছিলো না। কয়েকজন কর্মী একত্রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন মাত্র। এবং কাজ বলতেও সে সময় তেমন কোন বিশেষ তৎপরতা বোঝাতো না। -ব.উ.

**অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির বাইরের লোক এবং পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন লোক। -ব.উ.

***এখানো ৭ই মার্চকে ভুলবশত ৯ই মার্চ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। -ব.উ.

****এই ধরনের 'কৌশল' কমিউনিস্ট পার্টির নামে এখানে অবলম্বিত হলেও তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। কারণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কাউকে ধোকা দেওয়ার বিরোধী। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁরা অন্যদেরকে খবর না দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন কিন্তু বৈঠকে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে নিয়ে যাওয়ার ভাঁওতাপূর্ণ ব্যবস্থা করতে পারেন না। -ব.উ.

www.pathagar.com

যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় কিভাবে শান্তিনগরে বৈঠকের জায়গায় উপস্থিত হলেন সে সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন,

> বোধহয় ২৫/২৬ তারিখে অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন ও ভাষা আন্দোলনের অন্যান্য নেতার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি কাগজে বেরিয়ে যায়। তাঁরা আত্মগোপন করেন। অলি আহাদের ভাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ আবদুল করিম আমার বাসায় এসে খবর দেন যে, অলি আহাদ আত্মগোপন করেছেন। তবে চিরকুটে কেউ বিশেষ কোন শব্দ লিখে আনলে আমাকে বুঝতে হবে যে, অলি আহাদ তাকে পাঠিয়েছেন। আমি প্রথম বার্তা পাই চিকিৎসক ডাঃ করিমের মাধ্যমে। তিনি এককালে জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন, তখন যুবলীগে ছিলেন, পরে কিশোর মেডিক্যাল হল নামে নবাবপুরে একটি ফার্মেসী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভাসানী ন্যাপে সক্রিয় হন। এই বার্তায় কিংবা তার পরে কয়েকটি বার্তায় নির্দেশ ছিল একজনের সঙ্গে যাবার জন্য। তিনি আমার এক ক্লাস উপরে পড়তেন বোধহয়। যাই হোক, তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যায় র‍্যানকিন স্ট্রীটের উল্টোদিকে ভূতের গলিতে একটা বাসায় যাই। অলি আহাদ সেখানে ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, শান্তিনগরের ডাক্তার মোতালেবের বাসায় তাঁকে পৌছে দিতে হবে। সে বাসা আমি চিনতাম, তা তিনি কোনভাবে জানতেন। ডাক্তার মোতালেবের অনুজ আবদুল মালেকের সঙ্গে আমার এক সময়ে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল– তিনি এককালের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট দলে সক্রিয় ছিলেন। আমি রিকশায় করে অলি আহাদকে সেখানে পৌছে দিই। তখন আমি জেনেছিলাম যে, ভাষা আন্দোলনের নেতারা সেখানে বৈঠকে বসবেন। আমি যেহেতু সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলাম না, সেহেতু ঐ বৈঠকে আমার উপস্থিত থাকবার কোন প্রশ্নই ওঠে নি। অলি আহাদকে পৌছে দিয়েই আমি চলে আসি।[৬]

শহীদুল্লাহ্ কায়সার সে সময় কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে সংগ্রাম কমিটির মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং পার্টির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ তাঁদেরকে জানাতেন। কমিটির সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও ৭ই মার্চের বৈঠকে যাওয়ার জন্য তিনিও প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি ঘটনাস্থলে পৌছবার সময়েতেই পুলিশ বৈঠকের জায়গা ঘেরাও করে ফেলে। এ সম্পর্কে তাঁর বিবরণ হলো নিম্নরূপ :

> ৭ই মার্চের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য মাহবুব জামাল জাহেদীকে সঙ্গে করে আমি রওয়ানা হয়েছিলাম। নিজে বাড়ীটিতে ঢোকার পূর্বে আমি জাহেদীকে বলেছিলাম বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখে আসতে সেখানে কোন বাইরের লোক কিম্বা অপরিচিত কোন লোক উপস্থিত আছে কিনা। আমাকে এটা করতে হয়েছিলো কারণ তখন আমি আত্মগোপন অবস্থায় ছিলাম সুতরাং অপরিচিত লোকদের সামনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করার অসুবিধা ছিলো। আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে জাহেদী বাড়ীটির

www.pathagar.com

কাছাকাছি গিয়ে দেখলো যে, সেটা পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হতে চলেছে। বাড়ীর বাইরে পুলিশের একটা গাড়ী দাঁড় করানো ছিল। পরে জাহেদী আমাকে বলেছিলো যে সে, সে-সময় একটা নৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলো এবং সে জন্য সে দ্রুত পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে নি। সে যদি নিজে ভিতরে যেতো এবং আমি অনির্দিষ্টকাল দাঁড়িয়ে থাকতাম তাহলে পুলিশ আমাকে ধরে ফেলতে পারতো। অন্যদিকে, সে যদি ভিতরে গিয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করে না দিতো তাহলে তারা সকলেই গ্রেফতার হয়ে যেতো। জাহেদীর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় থাকাকালে পুলিশ বাড়ীটি ঘেরাও করে ফেলে এবং সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের একে একে গ্রেফতার করে। এই পর্যায়ে আমার কাছে ফিরে আসা ছাড়া জাহেদীর করার কিছু ছিলো না এবং সে তাই করেছিলো। তারপরই আমরা সঙ্গে সঙ্গে এলাকাটি ত্যাগ করে চলে আসি।[৭]★

শহীদুল্লাহ কায়সার উপরোক্ত এই বিবরণ প্রদান করলেও তাঁর বিবরণের সঙ্গে মাহবুব জামাল জাহেদীর বিবরণের কোনই মিল নেই। এ প্রসঙ্গে জাহেদী বলেন,

৭ই মার্চের সর্বদলীয় কমিটির শান্তিনগর বৈঠকের পূর্বে কমলাপুরে কে. জি. মুস্তফার বাসায় একটা বৈঠক হয়েছিলো কমিউনিষ্ট পার্টির লোকদের। আমি সেটাতে যাই নি, আমার সেখানে যাওয়ার কোন প্রশ্ন তখন ছিলো না। তবে তোয়াহা আমাকে বলেছিলেন যে, শহীদুল্লাহ কায়সার আমার সঙ্গে কি কারণে দেখা করতে চান। তিনি বললেন শহীদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নিয়ে আসতে। শহীদুল্লাহ তখন কমলাপুরে ছিলেন। কিন্তু আমি সেখানে যাই নি। আমি তখন আমাদের ৫নং পুরানা পল্টনের বাসায় ছিলাম, যদিও সে সময় আমি থাকতাম অন্য এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলো সুলতান, ইমাদুল্লাহ প্রভৃতি। শহীদুল্লার সঙ্গে আমি শান্তিনগরের বৈঠকের কাছাকাছি জায়গায় যাই নি, বাসাতেই মনে হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো এবং তিনি বলেছিলেন শান্তিনগর যাবেন না।

এরপর রাত্রি প্রায় ১০টার দিকে আমাদের বাসার সামনে দিয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি আওয়াজ শোনা গেল পুলিশের গাড়ী থেকে। সন্দেহ হলো পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ তোয়াহারা জানতো যে, ঐ সময় আমরা আমাদের পুরানা পল্টনের বাসায় থাকবো।[৮]

এ সম্পর্কে সাদেক খান বলেন,

আমি কমিটি অব এ্যাকশনের সদস্য ছিলাম না। আমি তখন ছিলাম কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জেলার সম্পাদক। শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সেই হিসেবে তিনি আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

★শহীদুল্লাহ কায়সারের এই বিবরণের সঙ্গে মাহবুব জামাল জাহেদীর বিবরণের কোন মিল নেই। সেজন্য এখানে উভয় বিবরণই উল্লেখ করা হলো। কিন্তু শহীদুল্লাহ কায়সার যে বিস্তৃত বিবরণ এ প্রসঙ্গে দিয়েছেন তাতে তিনি জাহেদী না হলেও (এ ব্যাপারে জাহেদীরও স্মৃতিভ্রম হতে পারে) মনে হয় অন্য কারো সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং কিছুটা স্মৃতিভ্রমের জন্য সেই অন্য টেক কর্মীর নাম মনে করতে না পেরে তাঁকে জাহেদী বলেই ভুল করেছিলেন। –ব.উ

www.pathagar.com

শান্তিনগরের বৈঠকটি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ছিলো। প্রথম দিকে জাহেদী পার্টির সদস্য না হওয়ায় সত্ত্বেও শহীদুল্লাহ, জাহেদী এবং আমি অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে নিতাম। তোয়াহা তখন একজন সাধারণ সদস্য ছিলেন।

শহীদুল্লাহ শান্তিনগরের বৈঠকটি ডাকতে চেয়েছিলেন। কর্মীরা এ ধরনের বৈঠকে প্রথম দিকে কিছু আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়। কারণ অন্য সকলের মত ছিলো যে এ ধরনের একটা বৈঠক ডাকা দরকার। মীর্জা গোলাম হাফেজও কমিটির সদস্য ছিলেন।

শান্তিনগরের বৈঠকের কথা আমি হেদায়েত ও মুজিবুল হককে জানিয়েছিলাম। সে সময় রহিম চৌধুরী নামে হেদায়েতদের এক বন্ধু ছিলো। তার সঙ্গে ওদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো। হতে পারে হেদায়েত তাকে বৈঠকের কথা সেই ঘনিষ্ঠতার কারণে বলেছিলো এবং সেই পুলিশকে খবর দিয়েছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

শান্তিনগরের বৈঠকে শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে জাহেদীর যাওয়ার কোন কথা ছিলো না। কথা ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জেলা সম্পাদক হিসেবে আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো এবং উপস্থিত ছিলামও।

আলোচনার মাঝখানেই বাড়ী ঘেরাও হয়ে গেলো পুলিশের দ্বারা। আনিসুজ্জামান বৈঠকে ছিলো না। হাত কাটা মালেক বলে একজন ছিলো। শান্তিনগরের বাড়ীতে তার যাওয়া-আসা ছিলো। হতে পারে সেখান থেকেই খবর পেয়েছিলো। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না।[৯]

৭ই মার্চের বৈঠকে যাওয়ার ব্যাপারে হেদায়েত হোসেন চৌধুরী বলেন,

মার্চ মাসে শান্তিনগরের এক বাড়ীতে মিটিং করতে গিয়ে আমরা ধরা পড়ি। কে জায়গা ঠিক করেছিলো জানি না। মিটিং এর আগে আমাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছিলো। আমি এবং মুজিবুল হক মেডিকেল হোস্টেলের গেটের সামনে নাজমা রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছিলাম। কিছুক্ষণ পর একজন এসে আমাদেরকে সাথে করে শান্তিনগরে নিয়ে গেলো। রাস্তাতেই মুজিবুল হক আমাকে বলেছিলো যে তার মনে হচ্ছিলো কে যেন আমাদেরকে অনুসরণ করছিলো।[১০]

বৈঠক কিছুক্ষণ চলার পরই বৈঠকের স্থান ৮২নং শান্তিনগর পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হয় এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা গ্রেফতার হয়ে যান। এ সম্পর্কে মহম্মদ তোয়াহার বিবরণ হলো নিম্নরূপ,

মিটিংএ একটা প্রস্তাব হলো। Movement call off করে একটা বিবৃতি দেওয়া হলো। এটা approved হলো। নূরুল আমীনের বিবৃতির★ প্রতিবাদে আমি সেটা লিখে এনেছিলাম। সেটা খুব বড়ো ছিলো না। দুই তিন পৃষ্ঠার মতো। সেটা পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং approved হয়েছিলো। By this time বাড়ী rounded up হয়েছিলো টের পাই নি। এ সময় অলি আহাদ, মীর্জা প্রভৃতি সকলে বলেছিলো তাড়াতাড়ি disperse করা দরকার। মিটিং বেশীক্ষণ হয় নি। ওটা আমি না পড়লেও সেদিন arrest হয়ে যেতাম।

বশীর আহমদকে (ডি.আই.বি. ইন্সপেক্টর, আমার সাথে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা

★৩রা মার্চের রেডিও বক্তৃতা। –ব.উ.

www.pathagar.com

ছিলো) তখনই আমাদের arrest এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম খবর পেলে কি করে? সে বললো বেশী বলতে কি পারি তবে এটুকু বলি যে আপনাদের মধ্যে থেকেই খবর পেয়েছি। কাজেই না পড়লেও arrest হয়ে যেতাম। কারণ তারা তো information আগেই দিয়ে রেখেছিলো। এর পূর্বে তাদেরকে কখনো ডাকা হয় নি। এদেরকে এই প্রথমই ডাকা হলো।

সেদিন চাঁদনী রাত ছিলো। সকলে তাড়াহুড়ো করে এধার ওধার ছুটোছুটি করছিলো। অলি আহাদ লুকিয়েছিলো খাটের নীচে। আমরা তখন অনভিজ্ঞ ছিলাম। মনে করি নি পরিচিত লোক identify করতে আসবে। বাড়ীর মেয়েদেরকে বললাম জিজ্ঞেস করলে বলবে আমাদের মামা। এরপর আমি ভিতরে খাটের উপর বসে থাকলাম।

তোপখানা রোডের ডি.আই.বি. অফিসের প্রধান লোক। খুব সম্ভবত D.I.I খুব ভদ্রলোক। বললেন, I have got respect for you, কিন্তু কি করবো unpleasant duty । নাম-ধাম টুকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন আর একটি লোক কোথায়– কাজী গোলাম মাহবুব? বশীর বার বার বলছে কাজী গোলাম মাহবুব ছিলো কোথায় গেছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না।

বাড়ীর সেই মেয়েটি আমাদেরকে বের করার সময় বললো, মামাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? বশীর বললে, চিন্তা নাই মা তোমার মামা ভাল থাকবে।[১১]

গ্রেফতারের সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে কাজী গোলাম মাহবুব বলেন,

সর্বদলীয় কমিটির শান্তিনগর বৈঠক সম্ভবত ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তোয়াহা, অলি আহাদ, মুজিবুল হক, মীর্জা গোলাম হাফিজ ও আমি উপস্থিত ছিলাম। মূল আলোচনার পর তোয়াহা একটা বিষয় উত্থাপন করে কথা বলতে থাকলেন। তার ফলে বৈঠক বিলম্বিত হতে থাকলো। একটা সন্দেহের আবহাওয়া ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো এবং অন্যেরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা এর পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। বৈঠক প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়েছিলো। তারপর বাড়ীটি পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হয়ে গিয়েছিলো এবং আমি ছাড়া অন্য সকল উপস্থিত সদস্যই গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলেন। ঘেরাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি আলমারীর উপর চড়ে সেখানে রাখা একটি হোল্ডঅলের ভিতরে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। পুলিশ আমার কোন পাত্তা করতে পারে নি। প্রায় এক মাস পর এপ্রিলের ৭ অথবা ৮ তারিখে আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করি। আমার মনে হয় আমাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আনিসুজ্জামানের হাত ছিলো।[১২]

কিভাবে সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা গ্রেফতার হলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে হেদায়েত হোসেন চৌধুরী বলেন,

মিটিং এর দিনে শান্তিনগরের বাড়ীটিতে আমি, মুজিবুল হক, মীর্জা গোলাম হাফেজ, তোয়াহা, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। মিটিং চলার সময়েতেই মীর্জা গোলাম হাফেজ তাড়াতাড়ি মিটিং শেষ করার জন্য বলছিলেন। কারণ দেরী হলে বিপদ হতে পারে। কিন্তু তোয়াহা সাহেবের জন্য দেরী হতে লাগলো। তিনি কি একটা লিখে

www.pathagar.com

এনেছিলেন। খুব সম্ভবত একটা কাগজে কতকগুলো পয়েন্ট। তারই ভিত্তিতে আলোচনা করছিলেন এবং তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সভা শেষ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। ৮-৪৫ মিঃ এর সময় আমরা বললাম যে, তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার কিন্তু তোয়াহা সাহেব ৯-১৫ মিঃ পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা চালাতে থাকলেন। সময়টা আমার খুব ভালভাবে মনে আছে কারণ সে সময় আমি বার বার ঘড়ি দেখছিলাম এবং সময়ের কথা সবাই বলছিলো। কে একজন বলছিলেন যে ৯-১৫ মিঃ এরপর মিটিং করার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। কাজেই তার পূর্বেই যেমন করে হোক শেষ করা দরকার। যাই হোক, এইভাবে মিটিং চলতে থাকাকালে ৯-৩০ মিঃ এর সময় সে বাড়ীতে একটা ছোট মেয়ে এসে আমাদেরকে বললো, পুলিশ এসেছে। এ কথাতে মিটিং তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেলো এবং আমরা সেই ঘরের মধ্যেই সকলে যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম। অলি আহাদ সাহেব দৌড়ে আলমারীর মধ্যে লুকালেন, তোয়াহা সাহেব ছাদের উপর উঠে গেলেন। বাকী অন্যদের লুকানোর জায়গা না থাকায় তারা পুলিশের সামনে পড়লো। সেদিন চাঁদনী রাত ছিলো। তোয়াহা সাহেবকে খুব সম্ভবত ছাদের উপরে বাইরে থেকে লক্ষ্য করে পুলিশদের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে বললো ছাদের উপর ভালো করে সন্ধান করতে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তোয়াহা সাহেব এবং অলি আহাদও ধরা পড়লো।[১৩]

এ ব্যাপারে সেলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের তৎকালীন সহসভাপতি এবং সর্বদলীয় কমিটির সদস্য মুজিবুল হকের বক্তব্য হলো,

বৈঠকের দিন যতদূর সম্ভব আমরা সেলিমুল্লাহ হল থেকেই গিয়েছিলাম। হেদায়েতের মাধ্যমে সাদেক খান সম্ভবত আমাদেরকে বৈঠকের খবর দিয়েছিলো। কিন্তু বৈঠক কোথায় হবে সেটা আমি জানতাম না। রিক্সায় চড়ে আমরা গিয়েছিলাম। তবে হেদায়েত ছাড়া অন্য কেউ আমাদের সঙ্গে সে সময় গিয়েছিলো কিনা আমার মনে নেই। তবে যাওয়ার সময় আমার একটু সন্দেহ ছিলো, যেহেতু পুলিশ তখন আমাদেরকে খুঁজছিলো। এখন মনে হয় সেই সন্দেহের কারণ মানসিক ছিলো। কারণ গোপন থাকার বা চলার কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিলো না। মনে হচ্ছিলো যেখানে যাচ্ছি Is it safe? ঠিক কোথায় আমরা যাচ্ছিলাম সেটা না জানলেও একটা indication ছিলো শান্তিনগরের এক বাড়ীর, যার মালিকের নাম ছিলো ডক্টর মোত্তালেব।

সে সময় কোন কমিটিই কাজ করছিলো না। কমিটি বিচ্ছিন্ন। যে বাড়ীটিতে বৈঠক হয়েছিলো সেটা ছিলো ভুতুড়ে বাড়ীর মতো। প্রথম থেকেই আমার একটা অস্বস্তি ছিলো। মনে হচ্ছিলো এই অবস্থায় বৈঠক না করে অন্য জায়গায় কোন হলের মধ্যে হলেই ভালো হতো। কোন আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির অভিজ্ঞতা না থাকাতেই বোধহয় এইসব প্রশ্ন আমার মনে আসছিলো। বাড়িতে মোমবাতি বা হারিকেনের বাতি ছিলো। আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে আসছিলো এমন সময় তোয়াহা একটা lengthy draft পড়তে শুরু করলেন। এমন সময় কে একজন বললো যাকে গার্ড হিসেবে রাখা হয়েছে সে শীঘ্র চলে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোয়াহা বললেন যে তাঁর লেখাটা দেখা দরকার। লেখাটা হয়তো ততো বড়ো ছিলো না। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে সেটাকে খুব বড়ো মনে হচ্ছিলো।

তোয়াহা সাহেবের পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই একটি অল্প বয়স্ক স্কুলের মেয়ে এসে

www.pathagar.com

বললো যে বাড়ী পুলিশ ঘেরাও করে ফেলেছে। এরপর কিছুটা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু হলো। বারান্দায় আমরা চার পাঁচজন বসে পড়লাম।

আমরা মেঝেয় বসে মিটিং করছিলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখি পুলিশ চারিদিকে। খুব দূরে সম্ভবত একটা পুলিশের গাড়ী। এরপর হুইসেলের শব্দ হলো। একটু পরেই পুলিশ অফিসার ঢুকে বললো, আপনাদের সকলকেই এ্যারেস্ট করা হলো।

আমরা ৮ জন উপস্থিত ছিলাম। তার মধ্যে আমি ও হেদায়েত ছাড়া উপস্থিত ছিলাম অলি আহাদ, তোয়াহা, মতিন, সাদেক, গোলাম মাহবুব এবং খুব সম্ভবত লতিফ নামে একজন যে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি পড়তো।[১৪]

৭ই মার্চের শান্তিনগর বৈঠকের বিবরণ দান করতে গিয়ে অলি আহাদ বলেন,

৫ই মার্চ আহূত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ হরতাল, মিছিল ও সভা সরকারী কঠোর দমননীতির জন্য আশানুরূপভাবে সফল হইতে পারে নাই। এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণ কল্পে ৭ই মার্চ শুক্রবার রাত্রি সাতটায় ৮২নং শান্তিনগরে যাওয়ার পথে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র যুবলীগ কর্মী আনিসুজ্জামান আমার পথ প্রদর্শক ছিলেন। সভায় আমি ব্যতীত কাজী গোলাম মাহবুব, জনাব আবদুল মতিন, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব মুজিবুল হক, (সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ), হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রসংসদ) এবং মোহাম্মদ তোয়াহা উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত মোঃ সাদেক খান ও আবদুল লতিফ, হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামানও উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সভা সমাপ্ত প্রায়, এমন সময় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ৮২নং শান্তিনগর ঘেরাও করে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পুনঃপুন অনুরোধ সত্ত্বেও জনাব মোঃ তোয়াহার অতিরিক্ত বক্তব্য ও একই বক্তব্য বার বার বলার প্রচেষ্টায় সভার কাজে অনর্থক কালক্ষেপন হইয়াছিল। জনাব তোয়াহার অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘায়িত বক্তব্যই এই দুর্ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। পুলিশের পদধ্বনি পাওয়া মাত্র তাকাইয়া দেখি আমরা পুলিশ পরিবেষ্টিত। তথাপি পুলিশের গ্রেফতারী এড়াইবার চেষ্টায় কেহ চাকর সাজিয়া, কেহ বা ঘরের কোণায় গৃহবাসী হইয়া পুলিশকে ফাঁকি দিতে চাই; কিন্তু কিছুই হয় নাই। তবে কাজী গোলাম মাহবুব ঘরের বাঁশের মাচার উপর এমনভাবে শয়ন করিয়াছিলেন যে, পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিও তাঁহাকে আবিষ্কার করিতে পারে নাই; যদিও সংবাদদাতার তালিকায় কাজী গোলাম মাহবুবের নাম ছিল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামান (পরবর্তীকালে ডক্টরেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) কে গ্রেফতার করে নাই। বাকী সবাইকে নিয়ে কোতওয়ালী থানা হাজতে আটক রাখা হয়।[১৫]

উপরোক্ত বিবরণীতে অলি আহাদ আনিসুজ্জামান এবং হাসান পারভেজ সম্পর্কে বক্রোক্তির মাধ্যমে সন্দেহের উদ্রেক করার চেষ্টা করলেও তিনি কিন্তু সাক্ষাৎকারের সময় গ্রেফতারের যে বিবরণ দেন তাঁতে তাঁর পথ প্রদর্শক আনিসুজ্জামানের বৈঠকস্থলে উপস্থিতির কোন উল্লেখই করেন নি এবং হাসান পারভেজকে কেন পুলিশ সে সময় গ্রেফতার করে নি সে বিষয়েও খুব স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। অলি আহাদের সাক্ষাৎকারের এ সম্পর্কিত অংশটি নীচে উদ্ধৃত হলো;

www.pathagar.com

বৈঠকের শেষ দিকে যখন তোয়াহা তাঁর কথা বলে চলেছিলেন তখন মীর্জা গোলাম হাফেজ, মুজিবুল হক এবং হেদায়েত চৌধুরী বৈঠক শেষ করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন কারণ, তাঁরা বলছিলেন যে, পুলিশের দ্বারা তাঁদের ঘেরাও হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। আর একজনও বলেছিলো যে, সে গলায় কমফার্টার জড়ানো একজন লোককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলো তাকে চেনা যাচ্ছিলো না কিন্তু তার গতিবিধি দেখে সে নিশ্চিত ছিলো যে, লোকটি একজন গোয়েন্দা বিভাগের ওয়াচার।

শেষে কমিটির সদস্যরা চলে যাওয়ার পূর্বেই বাড়ীটি পুলিশের দ্বারা ঘেরাও হয়ে গেলো। ইতিমধ্যেই সব সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়ে গিয়েছিলো। পুলিশ হাসান পারভেজ ছাড়া প্রত্যেককেই গ্রেফতার করে ফেললো।* আমি এবং অন্য সকলে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য জোরালোভাবে অনুরোধ জানালাম এই যুক্তি দেখিয়ে যে, সে সংগ্রাম কমিটির সদস্য ছিলো না এবং তার সঙ্গে বৈঠকেরও বস্তুতপক্ষে কোন সম্পর্ক ছিলো না। পুলিশ একথা বিশ্বাস করায় তাকে আর গ্রেফতার করে নি।[১৬]

১৯৬৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর এই সাক্ষাৎকারের সময় হাসান পারভেজকে গ্রেফতার না করা সম্পর্কে এই বক্তব্য এবং বৈঠকে আনিসুজ্জামানের উপস্থিতি এবং তাঁর গ্রেফতার না হওয়া সম্পর্কে কোন বক্তব্যই উপস্থিত না করা সত্ত্বেও পনেরো বৎসর পর তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিতে তিনি উপরোক্ত দুজন সম্পর্কে যে বক্রোক্তি করেছেন সেটা যদি ইচ্ছাকৃত কুৎসা না হয়ে থাকে তাহলে স্মৃতিভ্রম হিসেবেই সেটাকে ধরা যেতে পারে। যাই হোক, এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের নিম্নলিখিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য,

অলি আহাদকে পৌঁছে দিয়েই আমি চলে আসি। পরে কাজী গোলাম মাহবুব ছাড়া সভার আর সকলেই ধরা পড়েন। মাহবুব সাহেব পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মাচায় উঠে লুকিয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। শুনেছি, গ্রেফতারের সময় পুলিশ নাকি অলি আহাদকে জিজ্ঞেস করে : Was that boy your courier বা who was your courier boy? এর থেকে গোলাম মাহবুব আমাকে সন্দেহ করেন এবং জেলে গিয়ে তাঁর সন্দেহের কথা অলি আহাদকে বলেন। অলি আহাদ তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করে আমার সম্পর্কে তোয়াহা সাহেবের কাছে তাঁর সন্দেহের কথা ব্যক্ত করেন। তোয়াহা সাহেব সে কথা বিশ্বাস করেন নি এবং অলি আহাদকেও বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন। তোয়াহা সাহেবের ধারণা ছিল যে, মুজিবুল হক বা হেদায়েত হোসেনের কাছ থেকে খবর বেরিয়েছে (গত বছরের একুশের সংকলনে তাঁর সন্দেহের কথা তিনি লিখেছেন)। কেউ কেউ মনে করেছিলেন, সাদেক খান যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করায় সভার স্থান জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। কেউ কেউ মালেক সাহেবকেও সন্দেহ করেছিলেন– মালেক সাহেব আমাকে একবার তিরস্কারও করেছিলেন যে, আমি তাঁর নামে এমন রটিয়েছি, যদিও এ বিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব ছিল না। যাই হোক, জেল থেকে বেরিয়ে অলি আহাদ আমাকে বলেন

*কাজী গোলাম মাহবুবকে যে গ্রেফতার করা হয় নাই এ কথা অন্য সকলে বললেও সাক্ষাৎকারের সময় অলি আহাদের সে কথা স্মরণ ছিলো না। –ব.উ.

www.pathagar.com

যে, গোলাম মাহবুবের কথায় তাঁর আমার সম্পর্কে সন্দেহ হয়েছিল এবং এই মিথ্যে সন্দেহের জন্য তিনি আমার কাছে মাফও চান। এখন শুনছি, তাঁর স্মৃতি কথায় আমার সম্পর্কে একটা বক্রোক্তি আছে। অলি আহাদের পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে আমার তীব্র বিরাগ থাকলেও ভাষা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বের জন্যে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। প্রকাশ্যে তাঁর নাম বহু সভায় বলেছি– যখন তাঁর কথা ভুলে সবাই শেখ মুজিবুর নাম বলছিলেন। আমার সম্পর্কে এই অমূলক ও অন্যায় খোঁচা দিয়ে তিনি আমাকে দুঃখ দিয়েছেন, শুধু এটাই বলি।[১৭]

৩. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পুনর্গঠন

৭ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সক্রিয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর কমিটি পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় কমিটির যেসব সদস্য তখনো পর্যন্ত গ্রেফতার হন নি তাঁরা ১৪ই মার্চ শুক্রবার একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে তৎকালে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে সর্বদলীয় কমিটি পুনর্গঠন করেন। বৈঠক সর্বসম্মতিক্রমে আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক এবং সৈয়দ আবদুর রহিম ও কমরুদ্দীন আহমদকে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচন করে।[১]

ঢাকায় সর্বদলীয় কমিটির সদস্যেরা গ্রেফতার হলেও মার্চের এই সময়ে ঢাকার বাইরে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তৎপরতা অব্যাহত ছিলো। বিভিন্ন জেলায় এবং এলাকায় সর্বদলীয় কমিটি বৈঠকে মিলিত হওয়া, দাবী দাওয়ার ব্যাপারে প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া, পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি কাজ বন্ধ রাখেন নি। এই উপলক্ষে সিলেট জেলার সর্বদলীয় কমিটির ৭ই মার্চের বৈঠকটি উল্লেখযোগ্য। এই বৈঠকে তাঁরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুলি দাবী উত্থাপন করা ছাড়াও একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবে অন্যান্য অনেক বিষয়ের উল্লেখ করে তাঁরা বলেন,

> প্রাদেশিক সরকার একদিকে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের ওয়াদা করিয়া অপরদিকে ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের যেভাবে ব্যাপক গ্রেফতার এবং পূর্ব বাংলার ৪৪ কোটি জনতার ন্যায্য শান্তিপূর্ণ ভাষা আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা দোষারোপ করিয়া জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাইতেছেন তদ্দৃষ্টে কর্মপরিষদ ভাষার দাবী স্বীকারকে সরকারের আন্তরিকতাহীন ভাওতা বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে। তদুপরি সরকার ও তদীয় বংশবদ মুসলিম লীগ বাঙ্গালী অবাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রচার চালাইয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করার যে অপচেষ্টা চালাইতেছেন কর্ম পরিষদ সতর্কতার সহিত তাহা লক্ষ্য করিতেছে এবং দেশবাসী যে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের হাত হইতে আজও মুক্ত রহিয়াছে তজ্জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।[২]

ঢাকার বাইরে শুধু সিলেটে নয়, পূর্ব-বাংলার প্রায় সর্বত্রই এই সময় পর্যন্ত

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের তৎপরতা অল্প বিস্তর অব্যাহত ছিলো এবং সর্বদলীয় কমিটিও ছিলো বেশ কিছুটা সক্রিয়।

২৭শে মার্চ তারিখে সাপ্তাহিক নওবেলালে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ শমশের আলী ও খোন্দকার ওয়ালীউল্লাহ্‌র এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে তাঁরা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত তদন্ত কমিশনের★ সম্পর্কে বলেন,

> তদন্ত কার্য প্রকাশ্যে চালান হউক, ইহা ন্যায্য অপরিহার্য এবং যুক্তিসঙ্গত দাবী। পূর্ব-বঙ্গ সরকার এই দাবীগুলি মানিয়া না লইলে তদন্ত ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা সম্বন্ধে জনগণের মনে এক বিরাট সন্দেহের সৃষ্টি হইবে এবং তদন্ত এক বিরাট প্রহসনে পরিণত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তদন্ত কার্য্যে অসহযোগীতা প্রদর্শন করিতে ও নিজেদের উদ্যোগেই পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট আইনবিদদের লইয়া একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিতে বাধ্য হইবে।

সরকারী তদন্ত কমিশন বর্জন করার যুক্তি হিসেবে বিবৃতিটিতে সর্বদলীয় কমিটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে,

> এই ক্ষেত্রে মাননীয় বিচারপতি মিঃ এলিসের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। তবে তদন্ত কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহার সহিত দুই একজন বেসরকারী নিরপেক্ষ লোক থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও ধরপাকড় দ্বারা সরকার তদন্তের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেই পর্যন্ত সরকার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কর্মী, নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলনের সহিত জড়িত থাকার অজুহাতে ধৃত ব্যক্তিদের বিনা সর্তে অবিলম্বে মুক্তি না দিবে এবং যাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা রহিয়াছে তাহাদের উপর হইতে গ্রেফতারী পরোয়ানা উঠাইয়া না লইবে, সেই পর্যন্ত প্রকৃত বিচার হইতে পারে না। মাননীয় বিচারপতি সত্বর তদন্ত কার্য্য সমাপন করিবার নির্দেশ দিয়া সরকার এই সকল বিষয়গুলি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে ও কেবলমাত্র দেশের লোককে ধাপ্পা দিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত এবং আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। তদন্ত কার্য নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গভাবে চালাইতে হইলে আটক ব্যক্তিদের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রেরও সাক্ষ্য দিতে হইবে। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সাপেক্ষে তদন্ত কার্য স্থগিত রাখা দরকার। সর্বোপরি ঢাকায় গুলি চালনার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ আনসারের উপর রহস্যজনক গুলিবর্ষণেরও তদন্ত হওয়া দরকার এবং তাহার ভার এই কমিশনের উপরই দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল কিনা তাহাও তদন্ত করিতে হইবে। প্রকাশ্য ঘটনার রুদ্ধদ্বার কক্ষে তদন্ত আন্তরিকতাহীনতার পরিচয় দিতেছে।

এই বক্তব্যের পর তদন্ত সম্পর্কিত প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চম ও শেষ দফা দাবীর সঙ্গে তাঁরা বিবৃতিটির মাধ্যমে তদন্ত কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত অন্য চারটি দাবীও উত্থাপন করেন,

---

★ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এলিসকে দিয়ে পূর্ব বাঙলা সরকার ১৩ই মার্চ, ১৯৫২ তারিখে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। –ব.উ.

www.pathagar.com

১। মাননীয় বিচারপতি মিঃ এলিসকে সাহায্য করিবার জন্য বেসরকারী নিরপেক্ষ দুইজন বা একজন লোক নিয়োগ করা হউক;

২। আন্দোলনকারী ও আন্দোলনের সহিত জড়িত থাকা সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের বিনাশর্তে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া এবং অন্যান্যদের উপর হইতে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হউক;

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সাপেক্ষে তদন্ত কার্য্য স্থগিত রাখা হউক, অথবা তদন্ত কার্য্য চালাইবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করা হউক;

৪। নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও আনসারের উপর রহস্যজনক গুলি বর্ষণের তদন্তও কমিশনের কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হউক এবং ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করার পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল কিনা তাহার তদন্ত করা হউক।

২৮শে মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের এক বৈঠকে পরিষদের ২৩শে ও ২৭শে মার্চ তারিখের প্রস্তাব* সরকার মেনে না নেওয়ার কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এলিস কমিশন সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে,

কমিশনের তদন্তের পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় এবং উহার অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকায় পরিষদ উহাতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৩]

১২ই এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪] সেই সভায় তাঁরা ২৭শে এপ্রিল ঢাকায় একটি সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়,

১। কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের এই সভা পাকিস্তান গণ-পরিষদ কর্তৃক রাষ্ট্রভাষা সমস্যার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন নীতির তীব্র নিন্দা করিতেছে। পূর্ব-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য পাকিস্তান গণ-পরিষদে সুপারিশ করার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে গণ-পরিষদ কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবকে বাতিল করা পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারের কার্য পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া এই সভা মত প্রকাশ করিতেছে যে, সরকার রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন।

২। এই সভা আগামী ২৭শে এপ্রিল তারিখে ঢাকার বার লাইব্রেরী এসোসিয়েশনে বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিষদ সদস্যগণ লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছে।

৩। এই সভা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের বিভিন্ন শাখার সভ্যগণকে তাহাদের স্ব স্ব শাখা, জেলা ও মহকুমা হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার নির্দেশ দিতেছে।

৪। বিগত গুলি বর্ষণে আহত জনাব আবদুস সালামের মৃত্যুতে (ঢাকা মেডিকেল

---

*এই দুই তারিখের বৈঠকের কোন বিস্তারিত সংবাদপত্র রিপোর্ট আমি পাই নি। তবে উপরে কেন্দ্রীয় কমিটির দুইজন সদস্যের যে বিবৃতিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে বর্ণিত শর্তগুলিই এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে। –ব.উ.

www.pathagar.com

কলেজ হাসপাতালে) এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছে।★

৫। এই সভা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ধৃত বন্দীদের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দিবার জন্য দৃঢ় দাবী জানাইতেছে।

এই বৈঠকের পূর্বেকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নিখিল চীনা ছাত্র ফেডারেশনের একটি তারবার্তা। এটি ঢাকায় পৌছায় ১২ই মার্চ।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের★★ কাছে পাঠানো এই তারবার্তায় বলা হয় যে, "ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে যে সব ছাত্র শহীদ হইয়াছেন এবং যাঁহারা আহত ও গ্রেফতার হইয়াছেন চীনের ছাত্র সমাজ তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। বিশ্বের ছাত্রসমাজ, বিশেষ করিয়া এশিয়ার ছাত্রসমাজ আপনাদের এই গণতান্ত্রিক ও জাতীয় সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।"[৫]

৪. নূরুল আমীনের পরিষদ বিবৃতি

ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব-বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত রাখার পর ১৯৫২ সালের ২৪শে মার্চ পরিষদের বাজেট অধিবেশন আবার শুরু হয়। ঐ দিনই পূর্ব-বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন।[১] এই বিবৃতিতে তিনি তাঁর ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৩রা মার্চ এর বেতার বক্তৃতার বক্তব্যের কথাগুলি অধিকতর আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা পরিষদের এই বিবৃতিতে উপস্থিত করেন। এই বিবৃতিতে তিনি কিছু কিছু নোতুন সরকারী তথ্য পরিষদকে সরবরাহ করেন। এই বিবৃতিটি পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং তৎকালীন সরকারী নীতি সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক বক্তব্য। এই কারণে ইংরেজীতে প্রদত্ত এই সমগ্র বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত করা হলো,

মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু বাজেট অধিবেশন চলাকালেই এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়েছিল সে জন্য যে সকল ঘটনা ও পরিস্থিতির কারণে সরকারকে ঐ ধরনের পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল সেগুলি যতটা সম্ভব এখানে পরিষদকে জানানো আমার কর্তব্য বলে বিবেচনা করি। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ঢাকাতে যে গণ্ডগোল হয়েছিল তার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এবং সেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে কি সব পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল সে বিষয়গুলিও আমি এখানে আলোচনা করবো। এটা করতে গিয়ে আমার ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং ৩রা মার্চ এর বেতার বক্তৃতায়

★২১শে ফেব্রুয়ারী গুলিতে আহত ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের পিওন আবদুস সালাম ৭ই এপ্রিল সোমবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান (নওবেলাল ১০.৪.১৯৫২)

★★কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত এই ছাত্র সংগঠনটির কোন কার্যকরী ভূমিকা এই সময় না থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি। –ব.উ.

www.pathagar.com

জনগণের সামনে যে সকল তথ্য আমি তুলে ধরেছিলাম সেগুলির কিছু কিছু এখানে আবার আমাকে উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু আজকে আরও কিছু তথ্য পরিষদের সামনে উপস্থিত করবো যা পূর্বে করা হয় নি।

প্রথমেই পরিষদকে একথা আমার জানাতে হবে যে, বাহ্যত যেটাকে খুব একটা নিরীহ এবং বাংলার স্বপক্ষে বাস্তবিকই একটি ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন বলে মনে হয়েছিলো আসলে সেটা ছিল সরকারকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করা, সমগ্র প্রদেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তার উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাকে আড়াল রাখার একটি কৌশল মাত্র। সরকারের হাতে যে সব প্রমাণ রয়েছে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যা এখন সকলেরই জানা, তার থেকে এটা সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুষ্টিমেয় কমিউনিষ্ট এর অন্য বিদেশী এজেন্টরা এবং হতাশাগ্রস্ত রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

যদিও ঢাকার জনগণ তাদের এই পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রথম লক্ষণসমূহ ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই প্রথম দেখতে পান কিন্তু তা হলেও এ প্রস্তুতি ঐ তারিখের আগে থেকেই চলে আসছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে সরকারের কাছে এই মর্মে সংবাদাদি আসছিল যে পাকিস্তানের ধারণা যাদের কাছে অভিশাপের মত ছিল তারা দেশের মধ্যে অবস্থিত কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে শুধু এই প্রদেশে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে শুধু দুর্বল করতে নয় ধ্বংস করতেও চেষ্টা করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে তারা দীর্ঘ এবং বিস্তারিত প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিল। গত কয়েক মাস ধরে আমাদের ছেলেদেরকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় ছিল। একটি উপযুক্ত সুযোগের জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। ভাষা প্রশ্নের শক্তিশালী আবেগময় আবেদনের কারণে তারা এই সুযোগ এবং তাদের দুষ্কৃতিমূলক পরিকল্পনাকে আড়াল করে রাখার উপায় এই উভয়ই লাভ করেছিল। সব রকম তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা গিয়েছিল যে এই পরিষদ ঢাকাতে বসলেই তারা তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করবে। সরকারের হাতে এই তথ্য থাকার ফলেই শান্তি যাতে বিঘ্নিত হতে না পারে তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড এর ১৪৪ ধারা অনুযায়ী ঢাকায় নির্দেশ জারী করা হয়েছিল।

যারা সরকার উৎখাত করার চক্রান্ত করেছিলো তারা তৎক্ষণাৎ এই নির্দেশকে সরকার কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করছিলো। এটা যে একটা মিথ্যা অভিযোগ ছিলো এবং সরকারকে ভীতগ্রস্ত করে উৎখাত করার জন্য আইনভঙ্গ করার যে পরিকল্পনা তারা করেছিলো ও তা কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর ছিলো এবং সেই উদ্দেশ্যে জনগণের সহানুভূতি লাভের জন্যই করেছিলো সেটা নিম্নলিখিত ঘটনাবলী থেকে বোঝা যাবে। একুশে ফেব্রুয়ারীর এক পক্ষেরও অল্প সময় পূর্বে ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যত্র ভাষা প্রশ্নের উপর সভা ও মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিলো, কোন জায়গাতেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন বাধা ব্যতিরেকেই। ১৪৪ ধারা সেই সকল সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করে নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে তারা তা সংগঠিত করতে পারতো। কিন্তু সে

www.pathagar.com

অনুমতি কখনই চাওয়া হয়নি।★ তাছাড়া বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও আইন লঙ্ঘনের সংগঠকরা হাত গুটিয়ে থাকেনি। বস্তুতঃপক্ষে, তারা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে গিয়েছিলো। এর থেকে একথা খুবই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, যারা এই গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিলো তাদের কাছে ভাষার প্রশ্ন কোন আসল ব্যাপার ছিলো না, তারা এটাকে ব্যবহার করেছিলো নিজেদের অপরাধমূলক পরিকল্পনার সপক্ষে জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি অর্জনের উদ্দেশ্যে।

এ কথাও বলা হয়েছিলো যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী শান্তিভঙ্গ শুরু হওয়ার কারণ ছিলো ১৪৪ ধারা জারীর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ কারণ তা ছিলো বাংলার পক্ষে আন্দোলনের জন্য জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের সামিল। এটাও যে মিথ্যা ছিলো তা নিম্নে উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হবে। ১৪৪ ধারার নির্দেশ জারী করা হয়েছিলো ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে। পরদিন সকালের মধ্যেই দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এবং সরকারকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা চালু করা হয়েছিলো। সরকারের হাতে পূর্বেই প্রস্তুত পরিকল্পনাটি সম্পর্কে যে তথ্য ছিলো সেটা ছাড়াও এই পরিকল্পনাটি নিজেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, তা রাতারাতি তৈরী করা সম্ভব ছিলো না।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও জনতার একটি অংশকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করা হয়। তিনজন নিহত হয়েছিলো যার মধ্যে দুইজন নয়, যা পূর্বে ভ্রান্তভাবে সরকারের কাছে বলা হয়েছিলো, মাত্র একজন ছিলো ছাত্র।★★ কিন্তু তার পর চোখের নিমিষে সারা শহরে নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে উন্মত্ত প্রচারণা ছড়ানো হয়েছিলো। নিহত ও আহতদের সংখ্যা ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে বলা হয়েছিলো এবং পরদিনের মধ্যেই শহর ধ্বংসাত্মক ইস্তাহারে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিলো। কমিউনিষ্টসুলভ পদ্ধতিতে লাল কালিতে উত্তেজনামূলক প্ল্যাকার্ড লিখে প্রতিশোধ দাবী করা হচ্ছিলো। একটি সংবাদপত্র বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী নিহতের সংখ্যা ১৭ বলে উল্লেখ করেন। ময়মনসিংহ এবং প্রদেশের অন্য কিছু জায়গায় প্ল্যাকার্ডে নিহতের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছিলো ১৬৫, যার মধ্যে বালিকার সংখ্যা ছিলো ১১। এইসব ধ্বংসাত্মক ইস্তাহার যে রাতারাতি অথবা ১৪৪ ধারা জারীর পর ছাপা হয় নাই সেটা এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এ ধরনের অনেকগুলি ইস্তাহার সন্দ্বীপের মতো দূরবর্তী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রচারিত হয়েছিলো।

২১শে ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণের অব্যবহিত পরেই ঢাকার সব পত্রিকাকেই পৃথকভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছিলো যাতে করে সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা

★ নূরুল আমীন তাঁর বেতার বক্তৃতাতেও একথা উল্লেখ করার পর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক একটি সংবাদপত্র বিবৃতির মাধ্যমে বলেছিলেন যে, ঢাকায় তাঁরা সে অনুমতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে চাওয়া সত্ত্বেও তা দেওয়া হয়নি। (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৯৩)। -ব.উ.

★★ আসলে মাত্র একজন ছাত্রের মৃত্যুর কথাই নূরুল আমীন নিজে এবং তাঁর সরকারের পক্ষে বলে আসা হচ্ছিলো। কিন্তু সালাহুদ্দীন, যাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিলো, তিনিও ছিলেন ছাত্র। তাঁর লাশ, পুলিশ কর্তৃক গায়েব করে দেওয়ায় তাঁর কোন উল্লেখ কোন সরকারী ভাষ্যে নেই। -ব.উ.

www.pathagar.com

জানানোর জন্য তাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

পাছে এইসব সংবাদপত্রগুলি মনে করে যে তাদের হুমকি শূন্যগর্ভ সেজন্য পরদিনই 'মর্নিং নিউজ' প্রেসে অগ্নিসংযোগ করে তা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হয় যাতে তার থেকে অন্য পত্রিকাগুলিও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

একই সাথে পরিষদের সদস্যদেরকেও শারীরিকভাবে আঘাত করার জন্য হুমকি দেওয়া হয় যাতে তাঁরা মুসলিম লীগ পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। সরকারী কর্মচারীদের অনেকের কাছেও ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে তাঁদেরকে নিজেদের কর্তব্য থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছিলো যাতে করে প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। তিন দিন ধরে প্রায় সকল দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় সব জন-পরিবহনকে রাজী করিয়ে অথবা হুমকি দিয়ে হরতাল পালন করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। স্থানীয় টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ এবং স্থানীয় ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অনুরূপ চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিলো। সেই সঙ্গে পাকিস্তান রেডিওকেও সক্রিয় না রাখার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিলো।

এইভাবে এ কথা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো, যা আমার সরকারের কাছে প্রথম থেকেই পরিষ্কার ছিলো যে এখানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে কি হবে না সেটা কোন ইস্যু ছিল না। যারা গণ্ডগোলের পরিকল্পনা করেছিলো তারা প্রকৃতপক্ষে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর ছিলো। প্রয়োজন হলে তারা হিংসাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে হলেও এমন একটি পুতুল সরকার গঠন করার চেষ্টা করতো যে সরকার তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের থেকেই নির্দেশ নিতো। পরিষদের এ বিষয়টি জানা আছে যে নারায়ণগঞ্জে মিছিলকারীদের মধ্যে অনেকেই "জয়হিন্দ" বলে চীৎকার করেছিলো এবং "যুক্ত বাংলা চাই" বলে যুক্ত বাংলার পক্ষে শ্লোগান দিয়েছিলো। পাকিস্তানের দুশমনরাও দেশ বিভাগের পর থেকে এই প্রথমবারের মতো যে এই ধরনের সাহস সঞ্চয় করেছিলো সেটাই ছিলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এটা তাদের বাকী পরিকল্পনার সাথেও ছিলো সঙ্গতিপূর্ণ।

এই পর্যায়ে সরকার বিবেচনা করেছিলেন যে, আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে যা সোজাসুজি একটি হুমকিতে পরিণত হয়েছে, কঠোরভাবে তার মোকাবেলা করা। যাতে এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চক্রান্তের প্রতি সরকারের অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় তার জন্যই পরিষদ স্থগিত রাখা হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং বাইরে অবস্থিত এই চক্রান্তের মূল নেতাদের কয়েকজনকে এরপর ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন এই পরিষদের পাঁচজন সদস্য– মেসার্স মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দ লাল চৌধুরী, সতীন সেন, খায়রাত হোসেন এবং আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলো এবং তার ফলে সেখানে খোলাখুলিভাবে আইনের বরখেলাপ করা ও মাইক্রোফোনের মাধ্যমে হিংসাত্মক কাজের প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছিলো ছাত্র ও বহিরাগত উভয়ের দ্বারা সে জন্য পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করেছিলো এবং মাইক্রোফোনগুলি সীজ করেছিলো। এই আইন-শৃঙ্খলাবিরোধী পরিস্থিতির মোকাবেলার উদ্দেশ্যে অন্যান্য যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিলো তার মধ্যে ছিলো যে কেন্দ্র থেকে আইনশৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনা করা হচ্ছিলো সেই সেলিমুল্লাহ-

www.pathagar.com

মুসলিম হলের তল্লাশী। এই তল্লাশীর সময় বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাত্মক ইস্তাহার যা নিশ্চয় দীর্ঘ দিন ধরে মুদ্রিত ও সংগৃহীত হয়েছিলো সেগুলি এবং একটি লাইসেন্সবিহীন বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছিলো।★

সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে জেলা কর্তৃপক্ষ এবং সামরিক ও পুলিশ বাহিনী যে দক্ষতা ও ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করেছিলেন তার ফলে ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে, ঠিক যখন থেকে সরকার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন তখন থেকে, কোন প্রকাশ্য শক্তি প্রয়োগ না করেই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিলো। পরিষদ এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করবেন যে, এটা ছিলো একটি খুব উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এবং যেভাবে একটি নাজুক ও বিস্ফোরণমুখী পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণভাবে দক্ষতা ও পরিপূর্ণতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে আইন শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তার জন্য সরকার অভিনন্দনের যোগ্য। কোন ধরনের বলপ্রয়োগ না করে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা যেভাবে করেছিলো তার জন্য এই দায়িত্ব কার্যকর করার ভার যাদের উপর অর্পিত হয়েছিলো সেই সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর কৃতিত্বই সব থেকে বেশী।

প্রাদেশিক রাজধানীর বাইরে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যাপারটি শুধু নারায়ণগঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো যেখানে একদল লোক তহবিল তসরুফের মামলায় ধৃত একজন মহিলা শিক্ষয়িত্রীকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনীর উপর সাফল্যজনকভাবে একটি আক্রমণ চালিয়েছিলো। যারা এইসব গণ্ডগোলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন পদ্ধতিসমূহের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এই ঘটনা থেকে যে, জনগণকে এই বলে বিভ্রান্ত করা হয়েছিলো যে এই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো জনগণের তহবিল তসরুফের জন্য নয়, বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনের জন্য।★★ এই প্রসঙ্গে পরিষদের অপর একজন সদস্য মিঃ ওসমান আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। তাঁর বাড়িটিই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপের কেন্দ্র। তাঁর বাড়ী থেকে বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাত্মক ইস্তাহার উদ্ধার করা হয়েছিলো এবং যাদের ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন হিন্দু যুবক ছিলো যারা সম্প্রতি এই প্রদেশে এসেছিলো এবং মুসলমান হিসাবে ঘোরাফেরা করছিলো।

এই ধরনের বিদেশীদেরকে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মতো দূরবর্তী স্থানেও গ্রেফতার করা হয়েছিলো।

এই চক্রান্ত প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় কার্যকর করার পূর্বেই এর মূল

★এইভাবে উদ্ধারকৃত বন্দুকটি সম্পর্কে সেলিমুল্লাহ হল ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সহ-সভাপতি জিবুল হক বলেন, "একটা বন্দুক পেয়েছিলো পুলিশ। সেটি ছিলো জলিল সাহেব নামক পুলিশের এক দারোগার ছেলে রুহুল আমীনের ভাঙ্গা বন্দুক। মেরামত করার জন্যই সেটি ঢাকায় নিয়ে এসে রুহুল আমীন হলে রেখেছিলো। এই বন্দুকটির উল্লেখ করেই বলা হয়েছিলো যে, সেলিমুল্লাহ হলে সে সময় অস্ত্র আমদানী করা হয়েছিলো।"[২]

★★ আসলে ঐ সময় মর্গান হাইস্কুলের উল্লিখিত শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের মহিলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পরবর্তীকালে কারারুদ্ধ অবস্থায় অনেক নির্যাতন ভোগ করেন। মুচলেকা দিয়ে মুক্তিলাভ করতে অস্বীকৃতি হওয়ার কারণে তাঁর স্বামীও তাঁকে শেষে তালাক প্রদান করেন। –ব.উ.

www.pathagar.com

নেতাদেরকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে সরকার ঢাকায় যে সকল সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য সরকারকে, এবং যে সকল স্থানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সতর্কতার কারণে জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে নি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হয়।

যাই হোক, কোন কোন জায়গায় অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে ট্রেন চলাচল বিলম্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছিলো।★ অন্যত্র জনসভা অনুষ্ঠিত করে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছিলো।

ঢাকায় যেভাবে হয়েছিলো সেইভাবে অন্য অনেক শহরে হাজার হাজার ধ্বংসাত্মক ইস্তাহার বিতরণ করা হয়েছিলো। এই ইস্তাহারগুলিতে ঢাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনাও দেওয়া হয়েছিলো। বরিশালে এবং প্রদেশের অন্যত্র বিতরিত এই ধরনের একটি টিপিক্যাল ইস্তাহারে বলা হয়েছিলো যে, ২১শে তারিখে পুলিশের গুলিবর্ষণের সময় স্টেনগান ব্যবহার করা হয়েছিলো এবং তার ফলে ৫০ জন নিহত হয়েছিলো। আসল ঘটনা হলো এই যে মাত্র তিন ব্যক্তি মারা গিয়েছিলো যার মধ্যে মাত্র একজন ছিলো ছাত্র এবং কোন ষ্টেনগানই ব্যবহার করা হয় নাই। এতে বলা হয়েছিলো যে ২২শে ফেব্রুয়ারী ট্রাকভর্তি সৈনিকেরা স্টেনগান নিয়ে সব সময় গুলি বর্ষণ করেছিলো। আসলে কোন সময়েই সামরিক বাহিনী একটি গুলিও বর্ষণ করে নি অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে নি। এতে পরিষদের সদস্যদেরকে– পূর্ব-বাঙলার দালাল এম.এল.এ. বলে উল্লেখ করা হয়েছিলো এবং এই প্রদেশের জনগণের প্রতি বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে ঢাকায় তারা যাকে "বিপ্লব" বলেছিলো তাতে যোগদানের জন্য বলা হয়েছিলো। এতে বলা হয়েছিলো যে ঢাকার রাস্তাঘাট শহীদদের রক্তের বন্যায় ভেসে গিয়েছিলো। এর শেষ দিকে জোর দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, ইস্তাহারটির রচয়িতারা "রক্তের বদলে রক্তের" শপথ গ্রহণ করেছে এবং তারা বিপ্লবের কোদাল দিয়ে সরকারের কবর রচনা করবে। আমার সরকারের একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এই ইস্তাহারগুলোর অধিকাংশই এই দেশে বাইরে থেকে এসেছিলো।

একইভাবে, জেলাগুলিতে সম্পূর্ণ মিথ্যা গুজব ছড়ানো হয়েছিলো, বলা হচ্ছিলো যে, সরকার টলমল করছে তার পতন ঘটছে, ময়মনসিংহে আমার বাড়ী জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, বাঙালী পুলিশকে নিরস্ত্র করা হয়েছে কারণ সরকারী নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদেরকে আর বিশ্বাস করা চলে না, শত শত লোককে ঢাকায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, লরিতে করে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী রাস্তা থেকে মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, যে ছাত্রের মারা গেছে তাদেরকে গোপনে কবর দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য কোন জানাজার নামাজ হয় নি ইত্যাদি। এই গুজবগুলির প্রত্যেকটিই মিথ্যা। যার দুঃখজনকভাবে তাদের জীবন হারিয়েছে তাদের দাফন সম্পর্কে আসল ঘটনা হলো নিম্নরূপ : ২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণের ফলে একজন ছাত্রসহ তিনজন মারা গিয়েছিলো এবং গুলির ফলে অপর একজন মারা গিয়েছিলো পরদিন। এছাড়া আবার দুই ব্যক্তি ২২শে ফেব্রুয়ারী মারা গিয়েছিলো মটর দুর্ঘটনার ফলে, যার সঙ্গে গণ্ডগোলের কোনই সম্পর্ক ছিলো না। এই ছয়জনেরই জানাজার

★এই বক্তব্য থেকে ভাষা আন্দোলনে রেল শ্রমিকদের ভূমিকা অনেকখানি বোঝা যায়। –ব.উ.

www.pathagar.com

নামাজের ইমামতি করেছিলেন হাফিজ মওলানা আবদুল গফুর। ছাত্রটিসহ অন্যদের আত্মীয়েরা, যাঁদেরকে পাওয়া গিয়েছিলো, দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন। দাফন দুইজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মেসার্স মহম্মদ ইউসুফ এবং ওবায়দুল্লাহর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছিলো।

এ সবই অবশ্য ছিলো পরিচিত কমিউনিষ্ট পদ্ধতিতে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনগণকে হিংসার পথ অবলম্বন করতে প্ররোচিত করা ও জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার পরিকল্পনারই একটি অংশ বিশেষ। এই চক্রান্তে সরকারকে উৎখাত করার ক্ষেত্রে কমিউনিষ্টরা কি ভূমিকা পালন করেছিলো সে বিষয়ে আমি এই পার্টির মুখপত্র কলকাতার দৈনিক 'স্বাধীনতা' থেকে উদ্ধৃত করেছি। এর বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত ১০ই এবং ১১ই মার্চের দুটি প্রবন্ধে এই পত্রিকাটি বিবরণ প্রদান করেছে কিভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ববাঙলায় জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে পরিস্থিতিকে কিভাবে ব্যবহার করেছে। ঢাকার সাম্প্রতিক গণ্ডগোলের বিষয়ে এসে প্রবন্ধটি এইভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলনকে প্রত্যেক জেলায় ব্যাপকতা দানের উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি সহায়তা করেছে। প্রবন্ধটির শেষে বলা হচ্ছে যে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনকে বিভিন্ন চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে পরিণত করার অনেকখানি কৃতিত্ব হচ্ছে সেখানকার★ কমিউনিষ্টদের। আমি কাগজটি থেকে এবার বাংলায় পড়ে শোনাবো (এটা হলো ১১ই মার্চ ১৯৫২ তারিখের "স্বাধীনতা")। আমি শেষ অংশটি পড়ে শোনাবো ঃ

"কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা

পূর্ববঙ্গের কমিউনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনকে প্রথম থেকে সঠিক পথে চালনা করতে সাহায্য করে। প্রত্যেক জেলাতে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনে সর্বদলীয় কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়, ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুলতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে ৩টি বিপদ সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রথম থেকে সতর্ক করে দেয়, হিন্দু বিরোধী এবং কমিউনিষ্ট বিরোধী সরকারী বিভেদ প্রচেষ্টা সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টি হুঁশিয়ারী দেয়। আজ যে পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন নানা চক্রান্ত এড়িয়ে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে তার অনেকখানি কৃতিত্ব যে পূর্ব-বঙ্গের কমিউনিষ্টদের এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

তারা যে ভাষা আন্দোলনে কতদূর জড়িত ছিলো এই হলো তাদের নিজেদের পত্রিকার স্বীকৃতি। পাকিস্তানকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের প্রত্যেকের মতো আমিও এটা লক্ষ্য করে খুবই বেদনাবোধ করেছি যে পাকিস্তানের দুশমনরা অল্প সময়ের জন্য হলেও ঢাকায় আমাদের ছাত্র এবং জনগণের একটি অংশকে বিভ্রান্ত করে পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি বিপদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলো। এখানে এমন নগণ্য সংখ্যক সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলো যারা চেষ্টা করেছিলো পরিষদে মুসলমান জনগণের প্রতিনিধি ও মুসলিম লীগ সরকারকে জবরদস্তিমূলকভাবে নিজেদের পক্ষে

★স্বাধীনতা পত্রিকায় এই "সেখানকার" কথার অর্থ হলো পূর্ব-বাঙলার। কারণ তারা বাইরে থেকে এ দেশের আন্দোলন সম্পর্কে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলো। –ব.উ.

www.pathagar.com

ইস্তফা দানে বাধ্য করতে। এটা ঘটতে দেওয়ার অর্থ আমার সরকারের পক্ষে হতো জনগণ কর্তৃক আমাদের উপর অর্পিত আস্থা ভঙ্গ করা এবং দেশের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করা। এটা গণতন্ত্রকে পরিণত করতো একটা প্রহসনে। যদি আমি ও আমার সহকর্মীরা আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি এই হুমকীর মোকাবেলা করতে, দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং বিশৃঙ্খলা দমন করতে ব্যর্থ হতাম তাহলে আমরা পরিষদের কাছে এবং আমাদের জনগণের ও দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে জঘন্য ব্যর্থতার জন্য উত্তরসূরীদের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতাম।

এটাকে আমাদের জনগণের একটা কৃতিত্বই বলতে হবে যে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং ৩রা মার্চে আমার বেতার বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণের সামনে যখন পরিস্থিতির আসল রূপটি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিলো তারপর থেকেই তাঁরা এক ধ্বংসাত্মক আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত করে পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। বিদেশী এজেন্টরা পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভাষা প্রশ্নটিকে ব্যবহার করছে এটা উপলব্ধি করার মুহূর্ত থেকেই যে দ্রুততার সাথে আমাদের জনগণ দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন সে কথা মনে করলে আমার অন্তর গর্ব এবং প্রশংসায় পূর্ণ হয়ে উঠে। এই বিষয়টি আমাদের দেশের দুশমনদের মনে নিশ্চয়ই অনুশোচনা এবং হতাশার সৃষ্টি করেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের দেশের জনগণের হৃদয় সুস্থ ও সবল, তাঁরা দেশের নিরাপত্তার প্রতি কোন হুমকি সহ্য করবেন না, সেটা যে জায়গা থেকেই আসুক অথবা যতই আকর্ষণীয় ছদ্মবেশে দেখা দিক। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রদেশের জনগণের এই অপূর্ব সাড়া ও সহযোগিতা যদি না থাকতো তাহলে যারা আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চক্রান্ত করেছিলো তাদের দুষ্ট পরিকল্পনা বানচাল করার ব্যাপারে আমার সরকারের কাজ অনেক বেশী কষ্টকর হতো।

যারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো সেই সব ধ্বংসাত্মক লোকজনদের সম্পর্কে আমরা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছি তার দ্বারা আমার সরকার এই প্রদেশকে দুর্দশা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেছে। যথার্থভাবেই আমরা একটি অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ হুমকি থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছি; আমরা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করেছি। এই লক্ষ্য অর্জনের কৃতিত্ব বহুলাংশে আমাদের এই প্রদেশের জনগণেরই প্রাপ্য। কিন্তু যদিও এই প্রদেশের শান্তির ক্ষেত্রে আশু বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া গেছে তা সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা ক্ষেত্রে বিপদ থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হই নি। কিন্তু আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিরা এখনো ছাড়া রয়েছে এবং তারা আবার একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এ রকম ইঙ্গিতও আমরা পাচ্ছি যে পাকিস্তানকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য তারা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিতে পারে। নারায়ণগঞ্জের গণ্ডগোল দমন করা এবং তার মূল নেতাদেরকে গ্রেফতার করার ঠিক পরেই কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি কর্তৃক একজন কনস্টেবল নিহত এবং একজন আনসার আহত হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে হঠাৎ করে ঢাকার একটি বাসায় একটি দেশে তৈরী বোমা বিস্ফোরণ হয়। এটা খুবই সম্ভব যে, আমাদের স্বাধীনতার দুশমনরা জনগণকে বিভক্ত অথবা পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্য পন্থাও অবলম্বন করতে

www.pathagar.com

পারে। ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে যদি একটিও শিক্ষা গ্রহণ করার মতো থাকে তা হলো এই যে, আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি না। এ শিক্ষা আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না। স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন। পাকিস্তান অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ জীবন এবং আরও অনেক লক্ষ লক্ষ বাড়ীঘর বিসর্জন দিতে হয়েছিলো। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করে চলা তার থেকেও কঠিন। একে রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে অবিরাম সতর্কতা এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।

নূরুল আমীনের এই দীর্ঘ পরিষদ বক্তৃতার মধ্যে কমিউনিষ্ট এবং ভারতীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এসবকে দমন করার জন্য তাঁর সরকারের অপরিসীম কৃতিত্বের বারংবার ঘোষণা ব্যতীত আর কিছুই যে নেই সেটা খুবই স্পষ্ট। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৩রা মার্চে তাঁর বেতার বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে "আসল" ব্যাপারটি জানতে পারার পর জনগণই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর সরকার এবং পাকিস্তানকে রক্ষা ও শক্তিশালী করেছে এ ধরনের বক্তব্য এই পরিষদ বক্তৃতায় উল্লেখ করতেও নূরুল আমীন কোন দ্বিধাবোধ করেন নি। এর অন্যতম কারণ অবশ্য এই ছিলো যে, উপরোক্ত দুই বেতার বক্তৃতা এবং তাঁর পরিষদ বক্তৃতার খসড়াও তাঁর একান্ত নিজস্ব ছিলো না। এসব খসড়া তৈরীর ব্যাপারে চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ, হোম সেক্রেটারী আজফার এবং শিক্ষা সচিব ফজলীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতান্ত্রিক এবং এক অর্থে প্রকৃত রাজনৈতিক এজেন্টদের যথেষ্ট হাত এবং চূড়ান্ত নির্দেশও সে সময়ে ছিলো।

নূরুল আমীনের এই পরিষদ বক্তৃতার পর পরিষদের বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস বক্তৃতাটির উপর একটি আলোচনা ও বিতর্কের দাবী জানালে সেটা নূরুল আমীন এবং স্পীকার উভয়ের দ্বারাই অগ্রাহ্য হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দোলন চলাকালে আকস্মিকভাবে পরিষদ অধিবেশন বাতিল করার কারণ সম্পর্কে বসন্ত দাস স্পীকারকে জিজ্ঞাসা করলে পরিষদের স্পীকার আবদুল করিম জানান যে, পরিষদ স্থগিত তিনি নিজে করেন নি। পরিষদের অধিবেশন যে স্থগিত করা হচ্ছে এ সংবাদটি শুধু তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।[৩]*

৫. শহীদ বরকত ও রফিকের মামলা

২৫শে মার্চ তারিখে শহীদ আবুল বরকতের পক্ষ থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মাসুদ, ডি.আই.জি. ওবায়দুল্লাহ এবং আরও কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ঢাকার সদর মহকুমা হাকিমের

---

*পরিষদে অধিবেশন স্থগিত করা যে স্পীকারের দ্বারাই হয়েছিলো এবং এ কাজ তাকে দিয়ে করাতে অনেক কষ্ট হয়েছিলো একথা মোহন মিঞা তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় বলেছিলেন। যদিও স্পীকারের এই বক্তব্যই যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। –ব.উ.

www.pathagar.com

এজলাসে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়। ২৭শে মার্চ শহীদ রফিকুদ্দীন ভুঁইয়ার পক্ষ থেকেও উপরোক্ত এজলাসে অপর একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়। মহকুমা হাকিম এন. আহমদ উভয় আবেদনই অগ্রাহ্য করেন। মহকুমা হাকিম বলেন যে ঘটনাস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কার্যরত ছিলেন সুতরাং আইন অনুযায়ী সরকারের অনুমতি ব্যতীত অভিযোগ গ্রহণ করা যায় না।[১]

তৎকালীন 'সংগ্রাম' পত্রিকায় বরকতের মামলা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী বরকতের ছোট ভাই আবুল হাসনাত উপরোক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে আবেদন করতে গিয়ে বলেন,

> আবুল বরকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক এম.এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন।
>
> তিনি গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অপরাহ্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজে তাঁহার বন্ধু মোরশেদ নেওয়াজের সহিত দেখা করিতে যান। তথায় উভয়ের সাক্ষাৎকারের সময় বাহির হইতে নানারূপ শ্লোগান শুনিয়া আবুল বরকত হোস্টেলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান এবং কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশকে হোস্টেলের এলাকায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় পুলিশের গুলিতে আহত হইয়া পড়েন।
>
> আহত আবুল বরকতকে হাসপাতালে নেওয়া হইলে ডাঃ নূরুল হক সরকার তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। আহত অবস্থায় আবুল বরকত হাসপাতালে কার্যরত মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট তাঁহার আহতের বিবরণ দান করেন এবং সন্ধ্যা অনুমান সাড়ে সাতটায় ঐ আঘাতের ফলে মারা যান।
>
> পুলিশ আবেদনকারীর অনুরোধ সত্ত্বেও মৃত ৬ জন ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া এবং ময়না তদন্ত না করিয়া ঐ রাত্রেই লাশ দাফন করে।[২]

৬. এপ্রিল কনভেনশন

২৭শে এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক আহূত কনভেনশন বা সম্মেলনের পূর্বে 'ভাষা আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি' শীর্ষক একটি বিবৃতি পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নোতুন আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ৭ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত এই বিবৃতিটিতে তিনি সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের তৎকালীন পরিস্থিতির একটি ইতিহাস ও পর্যালোচনা কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত করেন। বিবৃতিটির পূর্ণ বিবরণ নীচে উদ্ধৃত হলো :

> ভাষা আন্দোলন শুরু হইবার পর প্রায় মাসাধিককাল অতিবাহিত হইতে চলিল, সরকার এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমননীতির দ্বারা দমিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টায় দিবারাত্রি বিকৃত, অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাইয়াছে। বিরোধী দলের সকল প্রকার সংবাদ এবং মতবাদ সরকার বিশেষ তৎপরতার সহিত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলনের আদ্যোপান্ত আলোচনা আবশ্যক। ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ঢাকার ময়দানে পাকিস্তানের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া উক্তি করায়, বর্তমান ভাষা আন্দোলনের শুরু হয়। এই আন্দোলন ১৯৪৮ সাল হইতে চাপা পড়িয়া ছিল। খাজা সাহেব তখন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতির পর আরবী হরফে বাংলা প্রবর্তন করার এক ব্যর্থ চেষ্টা চলিতে থাকে। সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই অথচ অযথা বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব-বঙ্গবাসী কিছুতেই এই সকল অদ্ভুত পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায় রাজী ছিলেন না।

ঢাকার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ওয়াদা খেলাফ করিয়া সমগ্র দেশকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার উক্তিকে নিন্দা করিয়া পূর্ব বঙ্গের সর্বত্র সভা ও ধর্মঘট শুরু হয়। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে খাজা সাহেবের উক্তির নিন্দায় যে শোভাযাত্রা ঢাকার রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে তাহার তুলনা হয় না। এত লোক একসঙ্গে ইহার পূর্বে এই শহরে এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন মিছিলে যোগ দেয় নাই। ৩১শে জানুয়ারী তারিখে মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী) সাহেবের সভাপতিত্বে সকল রাজনৈতিক দল, কৃষ্টি সংস্থা ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিনিধিত্বমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কেবলমাত্র মুসলিম লীগ দল যোগ দেয় নাই। ভাষা আন্দোলনকে শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করার জন্য সকল দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম-পরিষদের আহ্বানে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের এক বৈঠকে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী "রাষ্ট্রভাষা দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১১, ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'পতাকা দিবস' অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের আহ্বায়ক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের সহিত কর্ম-পরিষদের কতিপয় সদস্য সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া একটি পত্র লেখেন। কিন্তু সেই পত্রের কোন জবাব দেওয়া হয় নাই এবং উক্ত সাক্ষাৎকারও সম্ভব হয় নাই। উক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে হঠাৎ ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শহরের সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেন। ১৪৪ ধারা জারীর কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও উহা জারী করায় সকলে বিস্মিত হইয়া পড়ে। কর্ম-পরিষদের এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করিয়া অতঃপর শোভাযাত্রা ও জনসভা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা হইতে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে থাকেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদ করিয়া আইন সভার সদস্যদিগকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিতে চাহেন। কিন্তু সশস্ত্র পুলিশ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরিয়া ফেলে। ১১টার সময় ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ছোট ছোট দলে গেটের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এমন সময় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে বহু ছাত্র আহত হয়। ছাত্রগণ ছুটাছুটি করিয়া মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভাইস-চ্যান্সেলর পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান যে, ছাত্ররা পুলিশের প্রতি ইট নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়া ভাইস চ্যান্সেলর ও উপস্থিত অন্যান্য প্রফেসরগণ বিস্মিত হন। অতঃপর ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রদিগকে প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিতে বলেন এবং তাহারা বাহিরে আসিতে থাকেন। তখন

www.pathagar.com

পুলিশ গেটে ছাত্রদিগকে গ্রেফতার করিতে আরম্ভ করে। ট্রাক ও ভ্যানে বন্দী ছাত্রদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় গেটে বহু ছাত্র জমিয়া উঠে এবং বহু লোকও তথায় আসে। তখন পুলিশ পুনরায় কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের ছাত্রবৃন্দ পুলিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করিতে থাকে। এই সময় আইনসভার কতিপয় সদস্য পরিষদে যাইতেছিলেন। ছাত্রগণ তাহাদিগকে পুলিশ জুলুম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিলে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পিছাইয়া দেয় এবং অনেকগুলি সশস্ত্র পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া বেপরোয়াভাবে গুলি ছোড়ে। এই গুলির আঘাতে কতিপয় ছাত্র ও জনসাধারণ হত এবং বহু লোক আহত হয়। কোন কোন আহত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে এবং কেহ কেহ রাত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বহু ছাত্র আহত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। মৃতদের আত্মীয়-স্বজনের অপেক্ষা না করিয়া এবং ময়না তদন্ত না করিয়াই লাশগুলি সরাইয়া ফেলে। পর দিবস সমগ্র শহরে তীব্র উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। শহরবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুলিশের জুলুমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং সমগ্র শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। এই দিনও পুলিশ গুলি চালনা করে এবং উক্ত গুলিতে ছাত্র ও জনতার কেহ কেহ হতাহত হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী জনাব নূরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করার জন্য পরিষদে এক প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইলেন। ২৫শে পর্যন্ত পরিষদ মুলতুবি রহিল এবং ইতিমধ্যে গুলি চালনার প্রতিবাদে এম.এল.এ গণও লীগ দল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, নূরুল আমীন প্রমাদ গণিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হইল। মন্ত্রিসভার গদি ত্যাগ দেশব্যাপী দাবী ঠেকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে জনাব নূরুল আমিন অকস্মাৎ 'ষড়যন্ত্র' আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, তিনি বলিলেন কমিউনিষ্ট বিদেশী দালাল এবং ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণই আন্দোলনের পিছনে রহিয়াছে। মুসলিম লীগও সাথে সাথে উপরোক্ত লাইনে প্রস্তাব গ্রহণ করিল, সরকার নিজের মিথ্যা দোষারোপকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে বেপরোয়াভাবে ধরপাকড় শুরু করিয়া প্রদেশব্যাপী ত্রাসের সঞ্চার করিল, অপরপক্ষে সরকারের নির্দেশে বিরোধীদলের মতামত সংবাদপত্রে ছাপা বন্ধ হইয়া গেল, সরকারের দমননীতি এমন অবস্থার সৃষ্টি করিল যে একটি হ্যাণ্ডবিল ছাপাইবারও প্রেস শহরে পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাতারাতি নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে সরকারের কিছুমাত্র দ্বিধা হইলো না। S.M. Hall তল্লাশীর সময়ে লাইসেন্সসহ বন্দুক পাওয়া সত্ত্বেও একমাস পরে জনাব নূরুল আমীন পরিষদে বলেন যে উক্ত হলে লাইসেন্সহীন বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা এবং প্রদেশের সর্বত্র আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদিগকে গ্রেফতার করা হইল। ইহা সত্ত্বেও ৫ই মার্চ প্রদেশে সর্বত্র যথাযথভাবে শহীদ দিবস প্রতিপালিত হয়। আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য নানাবিধ আখ্যা দেওয়া হইল এবং আন্দোলন হইতে বিশেষ উদ্দেশ্যে ছাত্রদের আলাদা করিবার অপচেষ্টা চলিল, বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে আন্দোলনের সহিত যুক্ত করিয়া সরকার তাহাদের 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের' প্রমাণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কোথায় এক কনস্টেবল মারা গেল, কেন মারা গেল তাহার কোন খোঁজ খবর না লইয়া ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ

www.pathagar.com

মঞ্জুর করা হইল। কোথায় এক আতসবাজীওলার দোকানে বিস্ফোরণ হইল তাহাকে টানিয়া আনিয়া ভাষা আন্দোলনে যুক্ত করা হইল। সরকারের এই পুরাতন নীতি আমরা অবগত আছি। এই নীতি আজ কার্যকর হইবার নহে। সরকার তাহাদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও বাদ দেয় নাই। নূরুল আমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও দোষারোপ করিয়াছেন। সরকারের এই কার্য্যে কতকগুলি সংবাদপত্র বিশেষ সহায়ক। ঢাকার তথাকথিত 'ভয়েস অব দি নেশান' মর্নিং নিউজ আগে হইতে সব ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করে এবং সরকার তারই অনুসরণ করে। সরকারের এবং মুসলীম লীগের এসব বিভ্রান্তিকর প্রচারণা পর্যালোচনা করিয়া স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে ঢাকার এই নৃশংস কার্যাবলীর জন্য দায়ী কে। ১৪৪ ধারা জারী করিয়াই সরকার কি এই দুর্ঘটনা ডাকিয়া আনেন নাই। অপর প্রশ্ন যে মুসলিম লীগ ও তাহাদের প্রতিনিধি মন্ত্রীবর্গ যে ষড়যন্ত্রের কথা লইয়া হৈ চৈ করিতেছে সেকথা ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জ্ঞাপন করা হয় নাই কেন। ভাষা আন্দোলন যখন বিভিন্ন স্তরে তখন কি সরকার এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। ২৩শে ওয়ার্কিং কমিটিতে মুসলিম লীগ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটি কথা উচ্চারণ করে নাই। কিন্তু দু'দিন পরে পঁচিশ তারিখে মুসলিম লীগ ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া সরকারের সহিত পো ধরিল। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সহিত কমিউনিষ্টদের কোন সম্পর্ক নেই। সরকার যে ষড়যন্ত্রের কথা বলিতেছেন কর্ম পরিষদ তাহার কিছুই জানে না। স্বভাবতই মনে হয় যে সরকার আপন কুকার্য্যগুলির সাপোর্ট দিবার জন্য এই সব তথাকথিত ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানাইয়া দিতে চাই যে বর্তমান আন্দোলনে বাইরের কোন উস্কানী নাই এবং বিশেষ দালাল দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত নহে। 'ইসলাম বিপন্ন' ধুয়া জনসাধারণ অবগত আছেন। এই ধুয়া তুলিয়া তাহাদিগকে আজকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য ছাত্র ও জনসাধারণ আমরণ সংগ্রাম করিয়া যাইবে।[১]

২৭শে এপ্রিল পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা ও প্রান্ত থেকে প্রায় ৫ শতাধিক প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক আহূত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে সমবেত হন।[২] ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি প্রদান করা হয়। তিনিও ২৭শে এপ্রিলের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।[৩]

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বহু সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। তার পূর্বে আহ্বায়ক হিসেবে আতাউর রহমান খান তাঁর লিখিত ভাষণ, যা উপরে উদ্ধৃত বিবৃতিটির অনুরূপ, পাঠ করা শুরু করার অল্পক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লে কমরুদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করে শোনান।[৪]

সম্মেলনে ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলি হলো,

১। কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে- অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলন যে সকল শহীদ বুলেট, অমানুষিক অত্যাচার, দমননীতি এবং বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে দমাইয়া রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখে চরম ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

www.pathagar.com

এই সম্মেলন জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাসদান করিতেছে যে শহীদদের লোহু বৃথাই প্রবাহিত হয় নাই এবং যতদিন পর্যন্ত না বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে তাহার ন্যায্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন পর্যন্ত দেশের কোন প্রকৃত দেশভক্ত লোকই নিশ্চেষ্ট হইবে না।

২। গণ-পরিষদে কতিপয় ভুয়া যুক্তি সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া সম্মেলন এই মত পোষণ করিতেছে যে ইহা গড়িমসি নীতির দ্বারা জনগণের দাবীকে পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য গদীতে আসীন দলের আর একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

ভাষার দাবীতে সমগ্র জনমত জাগরিত হওয়ার এবং কতিপয় যুবক শাহাদাত বরণ করিবার পরও রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তাড়াহুড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া সরকার যে হাস্যাম্পদ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

৩। সকল বাস্তব প্রয়োজনের জন্যই ইংরেজী অন্তত আরও ২০ বৎসর পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার আসনে আসীন থাকিবে বলিয়া মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ এবং তাহাদের সরকার যে মন্তব্য করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহাতে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে। এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেছে যে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য জনগণের দাবীকে বলি দেবার জন্য ইহা আর একটি অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত চেষ্টা।

৪। এই সম্মেলন মনে করে যে গত ৫ বৎসর কালের মধ্যে গণপরিষদ যে কেবলমাত্র একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, বরঞ্চ জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর একটিরও সমাধান করিতে পারে নাই। কাজেই এই সম্মেলন অবিলম্বে গণ পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের দ্বারা নতুন একটি পরিষদ গঠনের দাবী জানাইতেছে।

৫। ভাষা আন্দোলনের বহু কর্মী ও নেতাকে আটক রাখার জন্য এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করিতেছে। এবং অবিলম্বে তাহাদের বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করিতেছে।

৬। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারসমূহ যে ভাবে নিরাপত্তা আইন, সিকিউরিটি আইনের বলে শাসন কার্য চালাইতেছেন এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ পদদলিত করিতেছেন তাহাতে উদ্বেগ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া এই সম্মেলন সকল অগণতান্ত্রিক অমানুষিক ও গণবিরোধী আইনসমূহের অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী করিতেছে এবং এই সকল কালা-কানুনে ধৃত সকল বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছে।

৭। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও তাহার সরকার অবিরাম যে সকল হীন প্রচারণা চালাইয়া যাইতেছে, এই সম্মেলন তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে।

৮। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট পুলিশ গুলিবর্ষণ এবং অন্যান্য জুলুমের ফলে শহীদদের পরিবারবর্গ ও আহতদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

www.pathagar.com

৯। এই সম্মেলন সকল নিরাপত্তা বন্দীর পরিবার বর্গকে ভাতাদানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে এবং অন্যান্য সভ্য দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের ন্যায় এই সকল রাজনৈতিক বন্দীদেরকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত বন্দী করিবার দাবী জানাইতেছে।

১০। এই সম্মেলন নারায়ণগঞ্জে রাইফেলের গুলিতে নিহত কনস্টেবলের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে যে গুলির আঘাত সংশ্লিষ্ট ঘটনা রহস্যাবৃত থাকিয়া যাওয়ায় দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতি এবং একজন জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত ঘটনার বিস্তৃত ও প্রকাশ্য তদন্ত করা হউক।

১১। এই সম্মেলন মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

১২। এই সম্মেলন পাক প্রধানমন্ত্রীর নিকট আত্মীয়ের সংবাদপত্র মর্নিং নিউজের জনস্বার্থবিরোধী ভিত্তিহীন, মিথ্যা, ঘৃণ্য, দুরভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যমূলক ভূমিকার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।

১৩। কোন প্রামাণ্য যুক্তি ব্যতিরেকেই এবং সকল প্রকার গণতান্ত্রিক নীতির খেলাপ করিয়া সরকার পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে। কোন স্বার্থ প্রণোদিত গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সাধন এবং বিরোধী দলের ও জনসাধারণের কণ্ঠরোধের জন্যই উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্মেলন মনে করে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে।

১৪। এই সম্মেলন পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলসমূহে বাংলাকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সরকারসমূহকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং যতদিন সে পন্থা অবলম্বন করা না যায় ততদিন উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল সমূহে স্বেচ্ছাধীন ভাষা হিসাবে রাখিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

১৫। এই সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে ও বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তকাবলী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে একটি ব্যুরো স্থাপন করার জন্য এবং তজ্জন্য অন্তত সাড়ে চার লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।[৫]

www.pathagar.com

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : এলিস কমিশন

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণ, অজ্ঞাত সংখ্যক ছাত্র ও সাধারণ লোকের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাবলীর তদন্তের জন্য জনগণের সমগ্র অংশ, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, পূর্ব-বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদ এবং ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হতে থাকে। এইসব দাবীর তাগিদে ১৩ই মার্চ, ১৯৫২, তারিখে পূর্ব-বাঙলা সরকার ঢাকা হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। যে গেজেট নোটিফিকেশনে এই কমিশন গঠনের কথা বলা হয় তাতে এই কমিশনের দায়িত্ব কোন্ বিচারপতির উপর অর্পণ করা হবে তা নির্ধারণের ভার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত করা হয়।[১]

এই গেজেট নোটিফিকেশনেই তদন্তের সীমারেখা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তদন্তের বিষয় হবে (১) পুলিশের গুলিবর্ষণ প্রয়োজন ছিলো কিনা এবং (২) সেই পরিস্থিতিতে সেইভাবে পুলিশের বলপ্রয়োগ সঙ্গত ছিলো, না শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিলো। তদন্ত যে গোপনে অনুষ্ঠিত হবে এ বিষয়টিও এই নোটিফিকেশনেই উল্লেখ করা হয়।[২]

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তদন্তের জন্য বিচারপতি টি.এইচ. এলিসকে মনোনীত করার পর তদন্ত কাজ পরিচালনার জন্য পূর্ব বাঙলার গভর্ণর ১৭ই মার্চ, ১৯৫২, তারিখে বিচারপতি এলিসকে নির্দেশ প্রদান করেন।[৩]

এই নির্দেশ পাওয়ার পর বিচারপতি এলিস ২০শে মার্চ সংবাদপত্র এবং ঢাকা রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত একটি নোটিশের দ্বারা জনসাধারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যবৃন্দ, ছাত্র গ্রুপ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনকে লিখিতভাবে বিবৃতি তাঁর কাছে পাঠানোর জন্য বলেন। এইসব রিপোর্ট পাঠানোর শেষ তারিখ ছিলো তদন্ত কমিশন কাজ শুরু করার মাত্র এগারো দিন পর ৩১শে মার্চ।[৪]

www.pathagar.com

২১শে তারিখের গুলিবর্ষণ ছাড়াও তার পূর্বে ২০শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী ইত্যাদি বিষয় তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করা, গোপনে তদন্ত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে প্রকাশ্যে তদন্ত কাজ পরিচালনা করা, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতা ও কর্মীরা যাতে প্রকাশ্যে তদন্তের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেইসব দাবী সরকারের কাছে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক উপস্থিত করা হয়। কিন্তু এইসব দাবীগুলি সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় কমিটি★ এবং ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত সংগঠন ও ব্যক্তিরা তদন্ত কমিশন বয়কট করেন।

১৯শে মার্চ ঢাকায় মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের কার্যকরী সংসদের অধিবেশন শুরু হয় এবং তা তিন দিন স্থায়ী হয়।[৫] সেই অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যেরা তৎকালীন পরিস্থিতির বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ নিরাপত্তা আইনে ৭ই মার্চ গ্রেফতার হওয়ার ফলে কার্যকরী সংসদ মোহাম্মদ এমাদুল্লাহকে অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেন।[৬]

যুবলীগের কার্যনির্বাহী সংসদে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও তদন্তের বিষয়ে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭] এর প্রথমটি হলো, ১লা মার্চ তারিখে নারায়ণগঞ্জে একজন পুলিশ কনস্টেবল হত্যা সম্পর্কিত। এই প্রস্তাবে বলা হয়,

> (৭) কার্যকরী সংসদের এই সভা নারায়ণগঞ্জে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক একজন পুলিশ কনস্টেবলের হত্যার প্রতিবাদ জানাইয়া মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। যে প্রকার রহস্যজনকভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে তাহার বিবেচনা করিয়া কমপক্ষে হাইকোর্টের বিচারপতির মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া প্রকাশ্য তদন্তের দ্বারা এই রহস্য উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত কার্যকরী সংসদ সরকারের নিকট দাবী করিতেছে।

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এলিস তদন্ত কমিশন সম্পর্কে যুবলীগের এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়,

> (৮) ঢাকায় পুলিশ কর্তৃক সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের ব্যাপারে প্রকাশ্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিবার জন্য জনসাধারণ একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিবার জন্য যে সার্বজনীন ও দ্ব্যর্থহীন দাবী জানাইয়াছিল কার্যকরী সংসদ মনে করে যে, পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত দাবীগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে কারণ সরকার উক্ত কমিশনকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য নির্দেশ দেন নাই–
>
> ১। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৪৪ ধারা জারী করা সঠিক হইয়াছে কিনা ২। পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক জনসাধারণকে কি পরিমাণ অত্যাচার করা হইয়াছে। ৩। শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে ছাত্রগণ কর্তৃক নির্মিত শহীদ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কিনা। ইহা ব্যতীত রুদ্ধদ্বার কক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার এবং

★পূর্ববর্তী ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। –ব.উ

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেককেই বন্দী করিয়া রাখার ফলেও এই তদন্ত কমিশন জনসাধারণের দাবী অনুযায়ী গঠিত হয় নাই।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের★ এবং যুবলীগ কার্যকরী সংসদের উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে উভয় কমিটিই সরকার কর্তৃক নিয়োজিত তদন্ত কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই মর্মে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নোতুন আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান এবং যুবলীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এমাদুল্লাহ বিচারপতি এলিসের কাছে তদন্ত কমিশন সম্পর্কিত নিজ নিজ কমিটির প্রস্তাবসহ কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত পত্রযোগে বিচারপতি এলিসের কাছে পাঠিয়ে দেন।[৮] তবে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি আখতারুদ্দীন ২৪, এস.এম.হল, ঢাকা থেকে একটি বিবৃতি কমিশনের কাছে পাঠান।[৯]★★

যাঁদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারপতি এলিস তাঁর রায় প্রদান করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি সরকারী কর্মচারী এবং ২১ ও ২২শে তারিখের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন, কলা অনুষদের ডীন ডক্টর ইতরাত হোসেন জুবেরী প্রভৃতির সাক্ষাৎ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাঁদের সাক্ষ্যের কোন গুরুত্ব এলিস সাহেবের কাছে ছিলো না। কারণ তিনি তাঁর রিপোর্টের এক জায়গায় খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, "যেসব সাক্ষী পুলিশ কর্তৃক গুলি বর্ষণের নিন্দা করে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।"[১০]★★★

কমিশন ৮ই মে, ১৯৫২, তারিখে তদন্তের শুনানী আরম্ভ করেন এবং তা শেষ হয় ৩রা মে তারিখে।[১১] ঢাকা হাইকোর্টের সৈয়দ আবদুল গনিকে বিচারপতি এলিস নিজের তদন্তকার্যে সহায়তার জন্য নিযুক্ত করেন। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে ওকালতি করেন ব্যারিস্টার হামুদুর রহমান। হামুদুর রহমান এই ওকালতির জন্য এলিসের কাছে দরখাস্ত করে সে বিষয়ে অনুমোদন লাভ করলেও ঢাকা হাইকোর্টের অন্য কোন উকিল অথবা ব্যারিস্টার সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে ওকালতির জন্য এই ধরনের কোন দরখাস্ত এলিসের কাছে পেশ করেন নি।[১২]

বিচারপতি এলিস তাঁর পুরো তদন্ত কার্য সম্পন্ন করার পর যে মহা

★ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। –ব.উ

★★এই আখতারউদ্দীনই সেলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভাষা আন্দোলন তহবিলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। –ব.উ.

★★★পুলিশসহ অপরাপর সরকারী কর্মচারীরা ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী নিজেদের সাক্ষ্যপ্রমাণ কমিশনের সামনে উপস্থিত করার সময় যে সব বিষয়ের যতটুকু উল্লেখ ও আলোচনা করেছিলেন সেটা প্রয়োজন মতো ২১শে ফেব্রুয়ারীর উপর লিখিত পরিচ্ছেদে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি অথবা উল্লেখেরও কোন প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান লাভ করেন তা হলো পুলিশ কনস্টেবলরা মাথায় লোহার হেলমেটের পরিবর্তে টুপী পরিহিত ছিলো। এবং এই মহাগুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি যে "ঐতিহাসিক" বক্তব্য তাঁর রায় প্রসঙ্গে প্রদান করেন তা হলো, ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশরা যদি ইস্পাতের হেলমেট মাথায় পরে থাকতো তাহলে তিনি যে তদন্ত কার্য পরিচালনা করলেন তার কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখা দিতো না।[১৩]

বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যে, এই "প্রখর ঐতিহাসিক চেতনা সম্পন্ন" সরকারের ধামাধরা ইংরেজ বিচারপতি কমিশনের একমাত্র সদস্য হিসেবে যে রায় প্রদান করেন তা হলো,

(ক) ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ কর্তৃক গুলি বর্ষণের প্রয়োজন ছিলো এবং (খ) সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুলিশ কর্তৃক বলপ্রয়োগ সঙ্গত ছিলো।[১৪]

www.pathagar.com

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : পর্যালোচনা

পূর্ব-বাঙলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে গেলে সেটা যে শুধু ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ এবং ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা চলে না এই উপলব্ধি থেকেই আমি আমার এই বইটির ক্ষেত্র হিসেবে তৎকালীন পূর্ব-বাঙলার জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছি এবং এর নামকরণ করেছি 'পূর্ব-বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'।

১৯৪৭-৪৮ সালে এবং তার পরবর্তী পর্যায়েও ভাষা আন্দোলন বলতে সাধারণভাবে মনে করা হতো যে, সেই আন্দোলন ছিলো ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের অপরাপর অংশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকই ছিলো, কারণ এই আন্দোলনের সঙ্গে দেশের অন্যান্য মৌলিক সমস্যার সম্পর্ক তখন জনগণের, এমনকি অগ্রসর রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদেরও দৃষ্টিগোচর হয় নি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় এবং বিশেষত তার পরবর্তী পর্যায়ে।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলনের সময় সরকারের সঙ্গে ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের যে সংঘর্ষ হয় তাতে জনগণের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিলো না। কিন্তু ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে যে আন্দোলন হয় সে সম্পর্কে একথা বলা চলে না। ১৯৪৮ সালে আন্দোলনকারী ছাত্রেরা তৎকালীন নবাবপুর রেলক্রসিং পার হলে ঢাকার স্থানীয় লোকদের দ্বারা অনেক সময়ে নিগৃহীত হয়েছেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে আমরা দেখি পুরাতন ঢাকার জনগণকে আন্দোলনে খুব সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে। শুধু তাই নয়, সে সময় সাধারণ মানুষের এই সক্রিয়তা ব্যতীত ২২শে ফেব্রুয়ারী ও তার পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো এবং যেভাবে বিকশিত হয়েছিলো সেটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের বিস্তার যেভাবে ঘটেছিলো তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ১৯৫২ সালে জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে এই আন্দোলনের

www.pathagar.com

একটা গভীর ঐক্যসূত্র ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিলো। এবং এই ঐক্যের সূত্র ধরেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরিগ্রহ করেছিলো এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপকতা।

১৯৪৮ সাল এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের এই পার্থক্যকে বোঝার জন্য লক্ষ্য করা দরকার এই অন্তর্বর্তী চার বৎসরের জনগণের জীবনে কী ঘটেছিলো। বাঙলাদেশের জনগণের নব্বই শতাংশেরও অধিক লোক তখন গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতেন। এই নব্বই শতাংশ মানুষ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় রাজনীতিগতভাবে আলোড়িত না হলেও ১৯৫২ সালে তাঁরা কেন এতো ব্যাপকভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য দেখা দরকার তাঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে শোষণ নিপীড়ন কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো এবং পাকিস্তান সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তা কী ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করেছিলো।

ভাষা আন্দোলনের এই দিকটির গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করলে দেখা যাবে যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নিছক রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলন ছিলো না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ক্রমাগতভাবে জনগণ যেভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে চলেছিলেন তার বিরুদ্ধে অনেক খণ্ড খণ্ড অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৫২ সালের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো এবং ১৯৫২ সালের ব্যাপক গণ-আন্দোলন সেইসব পূর্ববর্তী আন্দোলনের সঙ্গে এক ধারাবাহিক যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিলো।

দুই

মাও সেতুঙ বলেছিলেন যে, একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের দাবানলই আমরা সৃষ্টি হতে দেখি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়। ১৯৫২ সালের পূর্বেও তৎকালীন পূর্ব-বাঙলায় অনেক রাজনৈতিক নির্যাতন, পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছিলো। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিন বৎসরে সিলেটের নানকার আন্দোলন, ময়মনসিংহ-সিলেটের হাজং আন্দোলন, রাজশাহীর সাঁওতাল আন্দোলনসহ অন্যান্য অনেক এলাকার আন্দোলনের সময় সরকারী পরিচালনায় যে নির্যাতন, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিলো তার শিকার হয়েছিলেন অসংখ্য সাধারণ মেহনতি মানুষ। ১৯৪৮ সাল থেকে জেলের মধ্যে বন্দীদের উপরও অনেক অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। সে সময় ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী জেলের মধ্যে অনেককে হত্যা করা হয়। ২৪শে

www.pathagar.com

এপ্রিল, ১৯৫০, তারিখে রাজশাহী জেলের মধ্যে গুলি বর্ষণের ফলে যারা নিহত হন তাঁদের মধ্যে খুলনার আনোয়ার হোসেন ছিলেন ছাত্র। তাঁর মাথার খুলিও ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণে নিহত ছাত্র সালাহুদ্দীনের খুলির মতো চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব-বাঙলায় এই ধরনের নির্যাতন জনগণের মধ্যে কোন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও দাবানল সৃষ্টি করেনি, যদিও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা দেখি ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত একমাত্র উপনির্বাচনের সময়। এই উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো টাঙ্গাইলে এবং সে সময় মুসলিম লীগের প্রার্থী খুররম খান পন্নী বিরোধী পক্ষীয় প্রার্থী শামসুল হকের কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৫২ সালের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড গুলি কোন দাবানল সৃষ্টি করতে না পারলেও ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনা দাবানল সৃষ্টিকারী স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিলো কারণ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এই সময়ের মধ্যে ব্যাপক ও গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, যে কোন অত্যাচার নির্যাতন, তা যতই নির্মম হোক, সব সময়ে দাবানল সৃষ্টিকারী স্ফুলিঙ্গের কাজ করতে পারে না। সেটা সম্ভব হয় তখনই যখন দাবানল সৃষ্টির মতো ক্ষেত্র জনজীবনে তৈরী হয়। এই ক্ষেত্রটিই তৎকালীন পূর্ব-বাঙলায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বে তৈরী হয়ে গিয়েছিলো এবং ঠিক সে কারণেই ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড এমন এক স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করেছিলো যা জনগণের রাজনৈতিক জীবনে প্রজ্বলিত করেছিলো এক অদৃষ্টপূর্ব দাবানল।

তিন

এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব বাঙলার কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও সংগ্রামের উপর তিন শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী আমি যে আলোচনা করেছি সে প্রসঙ্গে কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক সেটা বুঝতে পারেন নি। সেই হিসেবে তাঁদের কাছে বইয়ের ঐ অংশটি মনে হয়েছে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তাঁদের এই ধারণা যে তাঁদের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে সৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রজনতা হত্যার স্ফুলিঙ্গ যে ক্ষেত্রটিতে এই দাবানল সৃষ্টি করেছিলো সেই ক্ষেত্রটিকে ভালভাবে না বুঝলে আন্দোলনের সত্যিকার চরিত্র অনুধাবন এবং তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এজন্য শুধু কৃষক সমস্যা ও কৃষক সংগ্রামের উপরই নয়, তৎকালীন শ্রমিক সমস্যা ও শ্রমিক

www.pathagar.com

আন্দোলনের উপরও আমি এ বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের প্রথমেই কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ছাত্র, শিক্ষক এবং মধ্যবিত্তের বিভিন্ন স্তরে যেসব সমস্যা তৎকালে প্রকট আকার ধারণ করেছিলো এবং যেগুলিকে কেন্দ্র করে তাঁদের অনেক খণ্ড খণ্ড আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিলো সেগুলির বিবরণও যথাসাধ্য বিস্তারিতভাবে আমি এ কারণেই বইটির তিন খণ্ডব্যাপী লিপিবদ্ধ করেছি।

পাকিস্তান দাবীকে কেন্দ্র করে বৃটিশ আমলের বাঙলাদেশের, বিশেষত পূর্ব-বাঙলার, মুসলমান জনগণ অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন পাকিস্তান নামক মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষক জমি পাবেন, শ্রমিক পাবেন কাজ ও বাঁচার মতো মজুরীর নিশ্চয়তা, ছাত্রেরা পাবেন সহজলভ্য সুশিক্ষা, ছাত্রোত্তর জীবনে শিক্ষিত যুবকরা পাবেন উপযুক্ত চাকরি ও জীবিকার নিশ্চয়তা। তাঁরা আরও আশা করেছিলেন যে, পাকিস্তানের তাঁরা গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন এমন এক সুস্থ সংস্কৃতি যা তাঁদের জীবনকে দান করবে পরিপূর্ণতা।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকেই অবশ্য তারা সকলে প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুতগতিতে উপলব্ধি করলেন যে, যে স্বপ্ন পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে তাঁরা দেখেছিলেন সে স্বপ্ন তৎকালীন মুসলিম লীগ শাসনের দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। এই উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই শুরু হলো তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ এবং এই স্বপ্নভঙ্গের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকলো কৃষক শ্রমিকসহ শোষিত শ্রেণীগুলির সকল স্তরে। একের পর এক আন্দোলনের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকলো পূর্ব-বাঙলার শহরে, গ্রামে, গঞ্জে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আমি ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উপর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দুর্ভিক্ষ জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ও প্রভাব বিস্তার করে তার উপর কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা আমাদের দেশে হয় নি। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক বিকাশ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। একথা অপরাপর দেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও তেমনি। এদিক দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বৎসরগুলিতে পূর্ব-বাঙলায় প্রায় একটানা খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষাবস্থার গুরুত্ব খুব বেশী। এই খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ যদি শহর ও গ্রামাঞ্চলের গরীবদের জীবনে না ঘটতো তাহলে মুসলিম লীগ সরকারের জনবিচ্ছিন্নতা যত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছিলো তা হতো না। বেকারত্ব, ফসলের উচিৎ মূল্য না পাওয়া এবং কৃত্রিম খাদ্য ঘাটতির মাধ্যমে অর্ধাহার ও অনাহার মৃত্যু পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছিলো

www.pathagar.com

এবং তাঁদের চেতনার মধ্যে স্বপ্নসৃষ্ট যে স্যাঁতসেঁতেমী ছিলো তা দূর করে তাকে দান করেছিলো এক ধরনের শুষ্কতা যা ছিলো দাবানল সৃষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

চার

জনগণের মধ্যে যে প্রতিরোধ চেতনা দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হচ্ছিলো এবং যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিলো তার কোন সাংবিধানিক প্রতিফলনের পথই মুসলিম লীগ সরকার খোলা রাখে নি। সে পথ খোলা রাখলে বার বার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের বিক্ষোভের কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটতো এবং মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যেভাবে শাসন ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো ঠিক তেমনি ঘটতো না। তারা পরাজিত হতো, তবে উচ্ছেদ হয়ে যেতো না। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার জনগণের উপর একদিকে ক্রমাগত শোষণ নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া এবং অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক প্রতিরোধের সব পথ বন্ধ করে রাখার ফলে শুধু খণ্ড খণ্ড অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণ তাঁদের বিক্ষোভের অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছিলেন এবং প্রতিরোধ সংগঠিত করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ার একদিকে ছিলো, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল ও তাদের শাসনের দ্বারা উপকৃত সুবিধাভোগী শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক–ভূমি মালিক জোতদার মহাজন, ব্যবসায়ী, আমলা টাউট ইত্যাদি। অন্যদিকে ছিলো, কৃষক শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মেহনতি জনগণের সকল অংশ এবং বিপুল অধিকাংশ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এই দুই পক্ষ একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো এবং এই মুখোমুখি সংঘর্ষের একটা পরিণতি ঘটেছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

পাঁচ

তৎকালীন পূর্ব-বাঙলার জনগণ পাকিস্তানী শাসনের "পাকিস্তানী" চরিত্র অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা উপলব্ধি করতে কিছুটা সময় নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তাঁদের ধারণা ছিলো যে, পূর্ব-বাঙলায় যে শোষণ নির্যাতন চলছিলো তার জন্য কিছু সংখ্যক অবাঙালী আমলা এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতারাই মূলত দায়ী। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে যে শোষণ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলো তার ফলে সারা পাকিস্তানের জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছিলো কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার উপর শোষণ শাসনের তীব্রতা তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছিলো বেশী। এখান থেকে

www.pathagar.com

উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ও সম্পদ পাচার ও হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া প্রথম থেকে জারী হয়েছিলো তা ক্রমশ অধিকতর সংগঠিত চরিত্র লাভ করেছিল এবং তার মাধ্যমেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিলো ভারসাম্যের অভাব। এ বিষয়ে উপযুক্ত সচেতনতার বিকাশ প্রথমে মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিলো শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূল নীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের এই চেতনা একটা উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। ব্যাপক জনগণের মধ্যে এই চেতনার সঞ্চার হতে আরও কিছু সময় লাগে এবং ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে মুসলিম লীগ সরকারের সামগ্রিক চরিত্র তাঁদের কাছে অনেক স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

পূর্বে যেখানে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হতো এবং প্রাদেশিক সরকারের পরিচালক আমলাদেরকে গণ্য করা হতো শুধু অবাঙালী হিসেবে সেখানে পরবর্তী পর্যায়ে এদের উভয়কেই তাঁরা দেখতে শিখলেন কেন্দ্রীয় সরকারের এবং পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রীক পাকিস্তানী শোষক শাসকদের এজেন্ট হিসেবে। চেতনার এই পরিবর্তনের ফলেই ১৯৫৪ সালে জনগণ সাধারণভাবে মুসলিম লীগেরই বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতাদের কোন প্রচারণাই তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়।

ছয়

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতার পর ভাষা আন্দোলনের যে নোতুন পর্যায় শুরু হয় সেই পর্যায়ে সাংগঠনিক উদ্যোগের থেকে স্বতঃস্ফূর্ততার দিকটিই ক্রমশ প্রাধান্য আসে। ফেব্রুয়ারীর পূর্বে রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির সাংগঠনিক অবস্থা ঠিক কি ছিলো সে বিষয়ে আমি তৃতীয় খণ্ডের প্রথমদিকে আলোচনা করেছি। সাংগঠনিকভাবে যুবলীগই তখন বিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে সব থেকে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী ছিলো। কারণ ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে এই যুব সংগঠনটির জন্ম হলেও এক বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ঢাকাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় এবং জেলাকেন্দ্রের বাইরের এলাকাতেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রগতিশীল ছাত্র যুবকদের মধ্যে এর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা অধিক সংখ্যায় এই সংগঠনে যোগদান করতে থাকেন।

আওয়ামী মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রধান হলেও তখনো পর্যন্ত তার সাংগঠনিক শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলো না এবং কর্মী সংখ্যাও ছিলো অল্প। মুসলিম ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্র সংগঠন

www.pathagar.com

হলেও যুবলীগের তুলনায় তার সাংগঠনিক শক্তি এবং উদ্যোগও কম ছিলো।

কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে বাস্তবত পূর্ব বাঙলার পরিষদ সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তার বাইরে কংগ্রেসের কোন সংগঠন ও কাজকর্ম ছিলো না বললেই চলে।

কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৪৮-৫০ সালের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পর ১৯৫২ সালেও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নই ছিলো। তবে তাঁরা যুবলীগের মধ্যে নিজেদের কিছু কর্মীকে সক্রিয় করে তাদের মাধ্যমে গণসংযোগ স্থাপনের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে যথেষ্ট সাফল্যও এই পর্যায়ে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ পরিস্থিতিতে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলন যখন নোতুনভাবে শুরু হলো তখন সাংগঠনিকভাবে যুবলীগের প্রভাবই সাধারণ ছাত্র-যুবকদের মধ্যে বেশী দেখা গেলো এবং এই প্রভাব আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরবর্তীকালে যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করলো।

যুবলীগের এই প্রভাবের বিষয়টিকে বুঝতে হলে সেটা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিতে যুবলীগ সদস্যদের সংখ্যার মধ্যে সন্ধান করলে হবে না। কারণ সে কমিটি গঠিত হয়েছিলো সব ধরনের বিদ্যমান রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই প্রভাবকে ঠিকমতো বোঝা যাবে যখন আমরা লক্ষ্য করবো যে, সর্বদলীয় কমিটিতে তাঁদের সংখ্যাল্পতা এবং ভোটে পরাজয় সত্ত্বেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের যে সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছিলেন সেটা আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ প্রভৃতি সংগঠনের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন লাভ করেছিলো। অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখলে বলা যেতে পারে যে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো তার গতিকে তৎকালীন যুবলীগ সঠিকভাবেই অনুধাবন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। যেভাবেই দেখা যাক, একথা অনস্বীকার্য যে ২০শে তারিখে রাত্রি থেকে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র ও যুবলীগ কর্মীরাই সাংগঠনিকভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ছাত্রদের এই সাফল্য দেখে যুবলীগের একাংশের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিকে বাতিল করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির মাধ্যমেই তাঁরা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ এই ছিলো যে, তৎকালীন আন্দোলনের ব্যাপকতা, গভীরতা এবং সমগ্র জনগণের প্রতিরোধ সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন সঠিক উপলব্ধি তাঁদের ছিলো না। কাজেই প্রথম পর্যায়ে তাঁরা মনে করেছিলেন যে ঢাকাতেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

কমিটির নেতৃত্বেই পরিচালিত হতে পারবে।

কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্য প্রথম থেকেই এই ধারণার বিরোধী ছিলো। এবং এই বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে ছাত্রদের সংগ্রামকে তারা জনগণের সামগ্রিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলো। এটাই ছিলো অন্যতম কারণ যার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি শুধু ছাত্রদের উপর নির্ভর করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষপাতি ছিলো না। তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য যখন বদ্ধপরিকর হলো এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী সেই অনুযায়ী একের পর এক পদক্ষেপগুলি নিতে শুরু করলো তখন কমিউনিষ্ট পার্টিও তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে সর্বতোভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলো।

এ সময়ে সর্বদলীয় কমিটিকে শক্তিশালী করার উপর কমিউনিষ্ট পার্টি জোর দেয়। কারণ আন্দোলন ব্যাপকভাবে ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায়, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে, ছড়িয়ে পড়ার ফলে সেই আন্দোলন পরিচালনা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পক্ষে যে সম্ভব ছিলো না সেটা বলাই বাহুল্য। কাজেই কমিউনিষ্ট পার্টি যুবলীগের মধ্যে নিজেদের যোগাযোগের মাধ্যমে এবং ইস্তাহার ছড়িয়ে সর্বদলীয় কমিটির গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং তার ফলে সেই কমিটিকে আবার চালু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

কিন্তু ২২ তারিখ থেকেই আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার দিকটি এমনভাবে প্রাধান্যে এসেছিলো যে, কোন কমিটির পক্ষেই তখন আর আন্দোলনের দিক দৃঢ়ভাবে নির্দেশ করা সম্ভব ছিলো না। তবু এই অবস্থাতেও সর্বদলীয় কমিটির কয়েকটি বৈঠক হয়েছিলো, যদিও ঢাকা শহরে আসল সাংগঠনিক কাজকর্ম যুবলীগের কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন কর্মীদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছিলো।

কিন্তু ঢাকার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এরকম হলেও ঢাকার বাইরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কর্তৃত্ব ছিলো অনস্বীকার্য। সেখানে অনেক এলাকায় যুবলীগের কর্মীরা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা থাকলেও অন্যেরাও সক্রিয় ছিলেন এবং সর্বত্র অন্যদের প্রভাব ও নেতৃত্ব ছিলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, ঢাকায় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিকে কেন্দ্রীয়ভাবে টিকিয়ে রাখা তাই ঢাকার জন্য যত না প্রয়োজন ছিলো তার থেকে অনেক বেশী প্রয়োজন ছিলো ঢাকার বাইরের জন্য।

সাত

মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে এই সময়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তার একদিকে ছিলো ঐ দলটির বিপুল অধিকাংশ সদস্যের বাংলাভাষার দাবীর প্রতি আন্তরিক সমর্থন এবং অপরদিকে ছিলো ক্ষমতায় টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা। এই দ্বন্দ্বের ফলে মুসলিম লীগ থেকে সে সময় অনেকেই পদত্যাগ করেন। কিন্তু যাঁরা পদত্যাগ করেন নি তাঁদের মধ্যেও এ ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য

www.pathagar.com

ছিলো।

মুসলিম লীগের উচ্চতম পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্বের মধ্যে নাজিমুদ্দীন ও ফজলুর রহমান যেভাবে উর্দুর আসল সমর্থক ছিলেন নূরুল আমীন, মোহন মিঞা, তফজ্জল আলী, শাহ্ আজিজুর রহমান প্রভৃতি সেভাবে উর্দুর সমর্থক ছিলেন না। উপরন্তু, তাঁরা সত্যি সত্যিই ছিলেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতি। কিন্তু বাংলার প্রতি এই দরদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ভাষা আন্দোলনের কঠোর ও সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন কারণ তাঁদের বাংলা ভাষার প্রতি দরদের থেকে ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ ছিলো তুলনায় অনেক প্রবল। এই প্রবলতর আকাঙ্ক্ষার কাছে নতি স্বীকারের অর্থ ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি আমলাদের কাছে নতি স্বীকার করা, বিশেষত মুখ্য সচিব বা চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের হুকুম অনুযায়ী সব কিছু করে যাওয়া। এবং তারা সেটাই করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের সময় অবাঙালী আমলাদের যে ভূমিকা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসনের উচ্ছেদের বীজ নিহিত ছিলো। কারণ এই ভূমিকার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিলো যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিজেদের দলীয় বাঙালী প্রতিনিধিদের থেকে অবাঙালী আমলাদেরকেই পূর্ব বাঙলায় তাদের অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি মনে করতো এবং এই মনোভাবের জন্য তারা পূর্ব বাঙলায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার ও মুসলিম লীগ সংগঠনকে পর্যন্ত নানাভাবে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন আমলাদের অধীনস্থ রেখেছিলো। পরিস্থিতির এ দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাদের এই নীতি ছিলো একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের স্বাধীন ভূমিকার পরিপন্থী এবং তার সাংগঠনিক অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। এটাই ছিলো অন্যতম প্রধান কারণ যে জন্য পূর্ব-বাঙলায় মুসলিম লীগ দ্রুতগতিতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর একটি সক্রিয় ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে উচ্ছেদ হয়ে যায়।

আট

ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার জনগণের সাধারণ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সম্পর্ক খুব গভীর ছিলো একথা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমিকসহ মেহনতি জনগণের জীবনে ভাষা নির্যাতনের নিজস্ব কোন তাৎপর্য ছিলো না। তা অবশ্যই ছিলো। কারণ ভাষা নির্যাতন সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের লোকদের শিক্ষাদীক্ষাকে, এমনকি তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে যতখানি

www.pathagar.com

বিপর্যস্ত করে তার থেকে অনেক বেশী বিপর্যস্ত করে নিম্নতর শ্রেণীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে। এই শেষোক্তদের জীবনে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এমনিতেই খুব সঙ্কুচিত। তার উপর তাঁদের নিজেদের মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য একটি ভাষা যদি তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষার সুযোগ হয়ে পড়ে আরও বেশী সঙ্কুচিত। এ কারণে ভাষা নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যে শুধু উচ্চ শ্রেণীর এবং উচ্চ স্তরের মানুষরাই করে থাকেন তা নয়। অন্য যে সব দেশে অল্পবিস্তর ভাষা নির্যাতন হয়েছে সেখানে ভাষার স্বার্থ রক্ষার জন্য উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ কৃষক শ্রমিকরাও অল্প বিস্তর লড়াই করেছেন। পূর্ব-বাঙলাও সেদিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলো না। উপরন্তু, এখানে ভাষা নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিলো তাতে পূর্ব-বাঙলার কৃষক শ্রমিকেরা যতখানি ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন ততখানি অন্য কোথাও আর ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

নয়

পাকিস্তান ছিলো সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি নয়া-উপনিবেশ এবং সেই হিসেবে পাকিস্তান সরকার ছিলো তাদেরই এজেন্ট। এ কারণে পাকিস্তানে যত রকম গণবিরোধী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ নির্যাতন জারী ছিলো সেগুলি সবই সম্পর্কিত ছিলো সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে। পূর্ব-বাঙলার জনগণের উপর নির্যাতনসহ সকল প্রকার নির্যাতন ও শোষণই ছিলো এইভাবে পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ, কিন্তু শক্তিশালী, অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সম্পর্কের কোন চেতনা সাধারণ জনগণ তো বটেই, এমন কি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর মধ্যেও সঠিকভাবে ছিলো না। তাঁদের চেতনার স্তর তখনো সেই পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

একথা অবশ্য ঠিক যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, যা পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান সংগঠনী কমিটি নামে পরিচিত ছিলো, বিভিন্ন ইশতেহারে ও আভ্যন্তরীণ পার্টি সার্কুলারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছিলো। কিন্তু সে বক্তব্যের ভিত্তিতে সাংগঠনিক তৎপরতা ও বাস্তব রাজনীতি সংগঠিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাজেই মাঝে মাঝে যান্ত্রিকভাবে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' ধ্বনি উচ্চারিত হলেও পাকিস্তান সরকারের মুৎসুদ্দী চরিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার ফলে প্রতিরোধ সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম হিসেবেও দেখার কোন স্পষ্ট

www.pathagar.com

প্রবণতা সেই আন্দোলনের মধ্যে ছিলো না। এদিক দিয়ে ১৯১৯ সালে চীনের ছাত্ররা ৪ঠা মে তারিখে যে ব্যাপক সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিলো তার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ চীনের সেই ছাত্র নেতৃত্বাধীন আন্দোলন ছিলো মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। এবং সে কারণে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের সেই আন্দোলন যে নোতুন রাজনৈতিক পটভূমি রচনা করেছিলো তা সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে পালন করেছিলো এক মস্ত সহায়ক ভূমিকা।

পূর্ব-বাঙলার ভাষা আন্দোলনের তেমন কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিক না থাকলেও তার অপর একটি গণতান্ত্রিক দিক ছিলো খুব স্পষ্ট। এবং সে দিকটি হলো তার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার দিক। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল এবং মুসলিম লীগের শীর্ষতম নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান গণ-পরিষদে তাঁর প্রথম ভাষণে–হিন্দুরা আর হিন্দু হিসেবে এবং মুসলমানরা মুসলমান হিসেবে রাজনীতিগতভাবে পৃথক বলে বিবেচিত হবে না, কারণ তারা সকলেই এখন পাকিস্তানী– একথা বলে যে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে এবং বাইরে অনেক শক্তিশালী প্রতিবাদ উপস্থাপিত হয় এবং জিন্নাহ সেই প্রতিরোধের মুখে আবার তাঁর পূর্ব অবস্থানেই ফিরে যান এবং পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেন। কাজেই প্রথম থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি ধর্মীয় ও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবেই সক্রিয় করার চেষ্টা হয়।

এই প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম লীগ পরিচালিত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন জনগণের বিভিন্ন অংশের দ্বারা সংগঠিত হতো তার প্রত্যেকটিকেই রাষ্ট্রবিরোধী, পাকিস্তানবিরোধী এবং সেই সঙ্গে ইসলাম বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এ কারণে প্রথম থেকেই তৎকালীন পূর্ব-বাঙলায় ছোট বড়ো যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পরিণত হতো সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে। এভাবেই এখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলো এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনও ক্রমশ জোরদার হচ্ছিলো।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত দিক উদ্‌ঘাটন না করলেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তার দ্বারা প্রবলভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা এই পর্যায়ে মধ্য শ্রেণীভুক্ত ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক বিকশিত হয় এবং সেজন্যই আমরা দেখি ভাষা আন্দোলনের ঠিক পরেই মার্চ এপ্রিল মাসের দিকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামক একটি নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও তার দ্রুত অগ্রগতি। এ সময়েই দেখা যায় গণতন্ত্রী দল

www.pathagar.com

নামক একটি পেটি বুর্জোয়া অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশ।

এটি ভাষা আন্দোলনের একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু চেতনার এই নোতুন উন্মেষকে সঠিকভাবে দেখা ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টির কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ও লাইন না থাকায় তা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদকে বাতিল করলেও এমন এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে থাকে যার নেতৃত্বে এসে যায় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তাদের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ। পূর্ব-বাঙলার জনগণের উপর কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার যে জাতীয় নির্যাতন জারী রেখেছিলো তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে এবং তার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইন ও কৌশল অবলম্বন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সমন্বিত করা বাস্তব কার্য ক্ষেত্রে কমিউনিষ্টদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ কারণে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা পরিণত হয়েছিলো এক ধরনের ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং তা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে ১৯৭১ সালে একটা পরিণতি লাভ করেছিলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙলাদেশ নামক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্ব বাঙলায় শ্রমিক আন্দোলন

[তথ্য নির্দেশের ক্ষেত্রে যেখানে শুধু এক অথবা একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হলো সেখানে নির্দিষ্ট তথ্য তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গৃহীত]

১. শ্রমিক ফেডারেশনসমূহের উদ্ভব

১. Kamruddin Ahmed-Labour Movement in East Pakistan, Pragoti Publishers, Dacca, December, 1969, P. 34-5
২. ঐ। P.35
৩. ঐ। P.34
৪. ঐ। P.35
৫-৯ঐ। P.36
১০. সাপ্তাহিক সৈনিক। ১২.১২.১৯৪৮
১১. Kamruddin Ahmed, Labour Movement in East Pakistan. P. 36-7
১২-১৪. দৈনিক আজাদ। ১.৫.১৯৪৯
১৫-১৭. নওবেলাল। ১২.৫.১৯৪৯
১৮. K. Ahmed. Labour Movement in East Pakistan. P. 37
১৯. সৈনিক। ২৩.৪.১৯৫০
২০. K. Ahmed. Labour Movement in East Pakistan. P. 37
২১. ঐ। P.38
২২. Kamruddin Ahmed : Presidential Address. Third Annual Session of the East Pakistan Fedaration of Labour. April 14-15, 1951. Paramount Press Limited, Dacca. P.17
২৩. K. Ahmed Labour Movement in East Pakistan. P. 38-9
২৪-২৫. Pakistan Observer 15.4.1951
২৬. K. Ahmed : Third Annual Session of the East Pakistan Federation of Labour P. 17
২৭. ঐ। P. 18-23
২৮. Pakistan Observer. 15.4.1951
২৯. সৈনিক। ১.৭.১৯৫১
৩০. K.Ahmed : Labour Movement in East Pakistan P. 39-40

২. রেল শ্রমিক

১. রণেশ দাশ গুপ্ত (লিখিত নোট) স্মৃতি থেকে এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের সাথে আলাপ করে রণেশ দাশগুপ্ত এই নোটটি আমাকে পাঠান।
২-৩.সাপ্তাহিক সৈনিক। ৪.৩.১৯৪৯
৪-৫. রণেশ দাশগুপ্ত (নোট)
৬. নওবেলাল। ২৮.৪.১৯৪৯
৭. রণেশ দাশগুপ্ত (নোট)
৮. ঐ। K. Ahmed : Labour Movement in East Pakistan. P. 36
৯. K. Ahmed : Labour Movement in East Pakistan P.36

www.pathagar.com

১০. আমিরউদ্দীন আহমেদ, পূর্ব পাকিস্তানের রেল শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার কথা। সৈনিক ১৪.১১.১৯৪৮
১১. সৈনিক। ১২.১২.১৯৪৮
১২. ঐ। ২৫.১২.১৯৪৮
১৩. ঐ। ১.১.১৯৪৯
১৪. ঐ। ২৫.৩.১৯৪৯
১৫-১৮ ঐ। ১৫.৪.১৯৪৯
১৯. সৈনিক। ২০.৯.১৯৪৯; নওবেলাল। ২০.৭.১৯৫০, ২.১১.১৯৫০
২০. সৈনিক। ২৫.৬.১৯৫০
২১. নওবেলাল। ৪.১০.১৯৫১
২২. রণেশ দাশগুপ্ত

৩. ডাক ও তার শ্রমিক

১. সৈনিক। ১১.৩.১৯৪৯
২. নওবেলাল। ২১.৯.১৯৫০
৩. নওবেলাল। ৭.১২.১৯৫০
৪. সৈনিক। ৭.১.১৯৫১
৫. সৈনিক। ১.৪.১৯৫১
৬. সৈনিক। ৮.৪.১৯৫১

৪. চা শ্রমিক

১. K. Ahmed. Labour Movement in East Pakistan, P. 34
২. ঐ। . 48-49
৩. ঐ। P.47
৪. ঐ। P.45
৫-৬. নওবেলাল। ১৭.৬.১৯৪৮
৭-৮. নওবেলাল। ৩.২.১৯৪৯
৯. নওবেলাল। ৩.৩.১৯৪৯
১০. নওবেলাল। ২৬.১০.১৯৪৯
১১. নওবেলাল। ২.৮.১৯৫১

৫. সূতাকল শ্রমিক

১. অনিল মুখার্জী, শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি। প্রকাশক, শহীদুল্লাহ্ কায়সার। অক্টোবর, ১৯৭১। পৃষ্ঠা : ৪৬
২-৫. রণেশ দাশগুপ্ত (লিখিত নোট)
৬. অনিল মুখার্জী, শ্রমিক আন্দোলনে হাতে খড়ি। পৃ: ৪৪-৫
৭-১২. রণেশ দাশগুপ্ত (নোট)
১৩. নওবেলাল। ১০.৫.১৯৫১

৬. সিমেন্ট শ্রমিক

১-৩নওবেলাল। ৩.৬.১৯৪৮
৪. নওবেলাল। ৭.৪.১৯৪৯
৫. নওবেলাল। ২৬.৪.১৯৫১
৬. নওবেলাল। ২১.৬.১৯৫১
৭. নওবেলাল। ১৫.১১.১৯৫১
৮. নওবেলাল। ১০.১.১৯৫২

www.pathagar.com

৭. ডাক শ্রমিক

১. সৈনিক। ২৬.৮.১৯৪৯
২. সৈনিক। ৩.২ ১৯৫০
৩. সৈনিক। ৬.৮.১৯৫০
৪. নওবেলাল। ২৩.১১.১৯৫০
৫-৬. সৈনিক। ৫.৮.১৯৫১

৮. তৈল শ্রমিক

১. সৈনিক। ২৮.১.১৯৫১
২. সৈনিক। ১৮.২.১৯৫১

৯. বাটা শ্রমিক

১-২.সৈনিক। ২৮.১.১৯৫১
৩. Pakistan Observer. 20.4.1951
৪ নওবেলাল। ৮.১১.১৯৫১
৫. ঐ। ২২.১১.১৯৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

২. শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান ও তার প্রতি সমর্থন

১. নওবেলাল। ২৪.৯.১৯৫০
২. Pakistan Observer. 28.8.1950; সত্যযুগ (কলকাতা)। ১.৯.১৯৫০
৩. Pakistan Observer. 28.8.1950; অভ্যর্থনা সমিতির ইস্তাহার।
৪. অভ্যর্থনা সমিতি কর্তৃক প্রচারিত ইস্তাহার
৫. ঐ
৬-৮. নওবেলাল। ৭.৯.১৯৫০
৯-১০. নওবেলাল। ১৪.৯.১৯৫০

৬. নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন

১. দৈনিক ইনসাফ রিপোর্ট। উদ্ধৃত : নওবেলাল। ২৮.৯.১৯৫০ এবং তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৫.৯.১৯৫০
২. সত্যযুগ। ১.৯.১৯৫০
৩. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী। ১৫.৯.১৯৫০ এবং দৈনিক ইনসাফ রিপোর্ট (নওবেলাল উদ্ধৃতি ২৮.৯.১৯৫০)।
৪. ইনসাফ রিপোর্ট।
৫. ইনসাফ রিপোর্ট এবং তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ১৫.৯.১৯৫০
৬-৮.ইনসাফ রিপোর্ট।
৯-১০.নওবেলাল। ৫.১০.১৯৫০
১১. ইনসাফ রিপোর্ট।

৪. গণশিক্ষা পরিষদ

১. নওবেলাল। ৫.১০.১৯৫০
২. নওবেলাল। ১.২.১৯৫০

৫. পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে বুদ্ধিজীবীদের স্মারকলিপি

১-৪. নওবেলাল। ১.৩.১৯৫১

৬. পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন

১. নওবেলাল। ২১.৩.১৯৫১

www.pathagar.com

২-৩. ঐ। ২২.৩.১৯৫১
৪. ঐ। ২২.৩.১৯৫১, ২৯.৩.১৯৫১
৫. পূর্ব বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য–জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী। নওবেলাল। ২৯.৩.১৯৫১
৬. নওবেলাল। ২২.৩.১৯৫১
৭. জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী। নওবেলাল। ২৯.৩.১৯৫১
৮. নওবেলাল। ২২.৩.১৯৫১
৯. জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী। নওবেলাল। ২৯.৩.১৯৫১
১০. নওবেলাল। ২৯.৩.১৯৫১

৭. পূর্ব বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলন
১. নওবেলাল। ২২.৩.১৯৫১

৮. পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি
১-৩. নওবেলাল। ৪.১০.১৯৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট

১. জনৈক প্রাথমিক শিক্ষকের কাহিনী
১. জনৈক প্রাথমিক শিক্ষকের কাহিনী, নওবেলাল। ২৪.৩.১৯৪৯

২. প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন ১৯৪৯
১. উদ্ধৃত। শিক্ষা সম্মেলনে অলি আহাদের ভাষণ, দৈনিক সত্যযুগ। ১.৯.১৯৫০
২. সাপ্তাহিক সৈনিক। ৮.৪.১৯৪৯

৩. ধর্মঘটের পথে প্রাথমিক শিক্ষক
১. নওবেলাল। ২৫.৫.১৯৫০
২. নওবেলাল। ২২.৬.১৯৫০
৩. নওবেলাল। ১৬.১১.১৯৫০
৪. নওবেলাল। ৩০.১১.১৯৫০
৫-৬নওবেলাল। ২২.২.১৯৫১; সৈনিক। ২৮.২.১৯৫১
৭-৮নওবেলাল। ১৫.৩.১৯৫১

৪. ধর্মঘট বানচালের উদ্দেশ্যে সরকারী ঘোষণা
১. নওবেলাল। ২২.৩.১৯৫১
২. সৈনিক। ১.৪.১৯৫১

৫. প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট
১. নওবেলাল। ৫.৪.১৯৫১
২. নওবেলাল। ৩.৫.১৯৫১
৩. Pakistan Observer 31.3.1951; নওবেলাল। ১২.৪.১৯৫১
৪. নওবেলাল। এপ্রিল-৩, ১৭, ২৪, ৩১, মে, ৩, ১৭, ২৪, ৩১ এবং জুন ৭, ১৯৫১
৫. সৈনিক। ২৯.৪.১৯৫১
৬. Pakistan Observer 27.4.1951
৭. Pakistan Observer 25.5.1921
৮-১১. নওবেলাল। ২৪.৫.১৯৫১
১২. নওবেলাল। ৩১.৫.১৯৫১; ৭.৬.১৯৫১; ১৪.৬.১৯৫১

www.pathagar.com

৬. **ধর্মঘটের অবসান**

১. নওবেলাল। ৭.৬.১৯৫১
২. নওবেলাল। ৯.৮.১৯৫১
৩. সৈনিক। ৫.৮.১৯৫১
৪. নওবেলাল। ১৮.১০.১৯৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ছাত্র আন্দোলনের নোতুন পর্যায়

১. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ**

১. Pakistan Observer. 12.3.1951; নওবেলাল ১৫.৩.১৯৫১
২-৩তাজউদ্দীনের ডায়েরী ১১.৩.১৯৫১
৪. Pakistan Observer 12.3.1951
৫. আবদুল মতিন
৬. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ১৩.৩.১৯৫১; ১৭.৪.১৯৫১
৭-৯Pakistan Observer. 12.3.1951
১০. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ১৩.৩.১৯৫১
১১-১২. আব্দুল মতিন
১৩. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৫.৩.১৯৫১। আব্দুল মতিন
১৪. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৫.৩.১৯৫১
১৫. স্মারকলিপি মূল ছাপা কপি থেকে অনূদিত
১৬. স্মারকলিপি মূল ছাপা কপি
১৭-১৮ আব্দুল মতিন
১৯. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ১২.৪.১৯৫১; ১৭.৪.১৯৫১
২০. Pakistan Observer 18.4.1951
২১. Pakistan Observer 17.4.1951
২২. নওবেলাল। ১৩.৯.১৯৫১

২. **মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘট**

১. নওবেলাল। ১.২.১৯৫১
২. এখানে ব্যবহৃত তথ্য উল্লিখিত ইস্তাহার থেকে গৃহীত।
৩. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ১১.২.১৯৫১
৪. ঐ। ১৩.২.১৯৫১
৫. এখানে ব্যবহৃত তথ্য উল্লিখিত ইস্তাহার থেকে গৃহীত।
৬. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ১৫.২.১৯৫১
৭. সাপ্তাহিক সৈনিক। ১৮.২.১৯৫১
৮. নওবেলাল। ২২.২.১৯৫১
৯. নওবেলাল। ১.৩.১৯৫১
১০. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২১.২.১৯৫১
১১. এখানে ব্যবহৃত তথ্য উল্লিখিত ইস্তাহার থেকে গৃহীত।
১২. নওবেলাল। ১২.৩.১৯৫১; তাজউদ্দীনের ডায়েরী ১৮.৩.১৯৫১
১৩. নওবেলাল। ১.৩.১৯৫১
১৪. এখানে ব্যবহৃত তথ্য উল্লিখিত ইস্তাহার থেকে গৃহীত।
১৫-১৬ নওবেলাল। ১০.৫.১৯৫১
১৭. সৈনিক। ১৩.১০.১৯৫১

www.pathagar.com

৩. ছাত্র সংগঠনের অবস্থা

১-২ Pakistan Observer. 10.4.1951

৩-৪ Pakistan Observer 11.4.1951

৫. নওবেলাল। ১৫.১১.১৯৫১

৬-৭ নওবেলাল। ২২.১১.১৯৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ

১. যুবলীগ গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ

১-৩. আবু সাঈদ মহম্মদ আবদুর রউফ (সংক্ষেপে আবদুর রউফ)

৪. মাহমুদ নূরুল হুদা (সংক্ষেপে নূরুল হুদা)

৫-১০. আবদুর রউফ

১১-১২. নূরুল হুদা

১৩. নূরুল হুদা, আবদুর রউফ

১৪-১৫. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ৬.৩.১৯৫১ এবং ১৪.৩.১৯৫১

১৬. আবদুর রউফ

১৭. নওবেলাল। ৫.৪.১৯৫১ এবং তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৬.৩.১৯৫১

২. যুব সম্মেলন

১. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৭.৩.১৯৫১

২-৫. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৭.৩.১৯৫১

৬. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৭.৩.১৯৫১

৭. নওবেলাল। ১২.৪.১৯৫১

৮. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৭.৩.১৯৫১

৯. নওবেলাল। ৫.৪.১৯৫১

১০. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ২৭.৩.১৯৫১

১১. নূরুল হুদা

১২. নওবেলাল। ৫.৪.১৯৫১

১৩. নূরুল হুদা

১৪. নওবেলাল। ৫.৪.১৯৫১

১৫. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৭.৪.১৯৫১

১৬. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৮.৪.১৯৫১

১৭-১৮. নওবেলাল। ১৯.৪.১৯৫১

১৯-২০. নওবেলাল। ৫.৪.১৯৫১

৩. যুবলীগের প্রাথমিক সাংগঠনিক তৎপরতা

১. নওবেলাল। ২৩.৪.১৯৫১

২. নওবেলাল। ১৭.৫.১৯৫১

৩-৮. নওবেলাল। ৭.৬.১৯৫১

৯. নওবেলাল। ২৬.৭.১৯৫১

১০-১১. নওবেলাল। ১.১১.১৯৫১

১২. নওবেলাল। ১২.১১.১৯৫১

৪. যুবলীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

১-৬. নওবেলাল। ১০.১.১৯৫২

www.pathagar.com

৫. সম্মেলনে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট
১-৭. নওবেলাল। ১০.১.১৯৫২
৮. নওবেলাল। ১০.১.১৯৫২ এবং ১৭.১.১৯৫২
৯-১৪. নওবেলাল। ১৭.১.১৯৫২
১৫-১৬. নওবেলাল। ২৪.১.১৯৫২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক অবস্থা

১. মুসলিম লীগ
১. সাপ্তাহিক সৈনিক। ২১.১.১৯৫১
২. নওবেলাল। ১০.৫.১৯৫১
৩-৬Pakistan Observer, 4.5.1951
৭. নওবেলাল। ১০.৫.১৯৫১
৮. নওবেলাল। ২৪.৫.১৯৫১
৯. নওবেলাল। ২৬.৭.১৯৫১
১০. নওবেলাল। ২৩.৮.১৯৫১
১১. নওবেলাল। ১৩.৯.১৯৫১
১২. নওবেলাল। ২০.১২.১৯৫১
১৩. সৈনিক। ১৮.১১.১৯৫১
১৪. নওবেলাল। ২২.১১.১৯৫১

২. আওয়ামী মুসলিম লীগ
১. Pakistan Observer 10.4.1951
২. Pakistan Observer. 29.4.1951
৩. Pakistan Observer. 8.12.1951
৪. নওবেলাল। ২৭.১২.১৯৫১
৫-৬. নওবেলাল। ৬.১২.১৯৫১
৭. নওবেলাল। ২৭.১২.১৯৫১

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতা ও তার প্রতিক্রিয়া

১. খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতা
১. Morning News. 28.1.1952 এবং নওবেলাল। ৩১.১.১৯৫২
২. Morning News. 31.1.1952
৩. Morning News. 28.1.1952
৪. নওবেলাল। ৩১.১.১৯৫২
৫. নূরুল আমীন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমান, কাজী মহম্মদ ইদরিস।
৬. ইউসুফ আলী চৌধুরী
৭. নূরুল আমীন
৮. নওবেলাল। ৭.২.১৯৫২; Morning News, 4.2.1952
৯. শাহ আজিজুর রহমান
১০. আজিজ আহমদ (চীফ সেক্রেটারী)

২. নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া
১. সাপ্তাহিক সৈনিক। ৩.২.১৯৫২
২. আব্দুল মতিন

www.pathagar.com

৩. Pakistan Observer. 30.1.1942
৪. আব্দুল মতিন
৫. গাজীউল হক, একুশের সংকলন, ৮০, স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী। পৃষ্ঠা; ১৩৫
৬. Morning News. 31.1.1952
৭-৮. গাজীউল হক, স্মৃতিচারণ, পৃষ্ঠা ১৩৫ এবং আব্দুল মতিন
৯. Morning News, 31.1.1952

৩. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১. মহম্মদ তোয়াহা
২-৩Morning News. 1.2.1952; দৈনিক আজাদ। ১.২.১৯৫২
৪-৭ দৈনিক আজাদ। ১.২.১৯৫২, এবং নওবেলাল। ৭.২.১৯৫২
৮. দৈনিক আজাদ। ১.২.১৯৫২
৯. আজাদ। ১.২.১৯৫২; কাজী গোলাম মাহবুব, গাজীউল হক, আবদুল মতিন।
১০-১২ Morning News, 1.2.1952
১৩-১৪ আজাদ। ১.২.১৯৫২

৫. ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল

১. গাজীউল হক। একুশের সংকলন পৃঃ ১৩৫
২. ঐ। পৃঃ ১৩৬
৩. নওবেলাল। ১৪.২.১৯৫২
৪. গাজীউল হক। একুশের সংকলন পৃ : ১৩৭
৫. আবদুল মতিন।
৬. ঐ। এবং নওবেলাল। ১৪.২.১৯৫২
৭. নওবেলাল। ১৪.২.১৯৫২
৮-১০. Morning News. 5.2.1952
১১. নওবেলাল। ১৪.২.১৯৫২
১২. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ১০.২.১৯৫২
১৩. Morning News, 5.2.1952
১৪. আব্দুল মতিন
১৫. Morning News, 5.2.1952 এবং কবিরউদ্দীন আহমদ, একুশের ইতিহাস (সম্পাদক, হাসান হাফিজুর রহমান)। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫। পৃষ্ঠা-২২৩
১৬. কবিরউদ্দীন। একুশের ইতিহাস। পৃষ্ঠা : ২২৩
১৭. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ১০.২.১৯৫২
১৮. দৈনিক আজাদ। ৫.২.১৯৫২
১৯. দৈনিক আজাদ। ১৩.২.১৯৫২
২০. দৈনিক আজাদ। ৯.২.১৯৫২
২১. দৈনিক আজাদ। ৫.২.১৯৫২

৬. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

1. Morning News 7.2.1952

৭. পাকিস্তান অবজার্ভারের উপর নিষেধাজ্ঞা

১-২. Morning News. 13.2.1952
৩-৫. Morning News. 14.2.1952
৬. Morning News. 15.2.1952 এবং নওবেলাল। ২১.২.১৯৫২
৭-১১. নওবেলাল। ২১.২.১৯৫২

৮. পতাকা দিবস এবং অন্যান্য ঘটনা

১-২. নওবেলাল ২১.২.১৯৫২

www.pathagar.com

৩. Morning News. 8.2.1952
৪-৫. Morning News. 14.2.1952
৬. গাজীউল হক। একুশের সংকলন পৃ: ১৩৮-৩৯।
৭. Morning News. 14.2.1952
৮. গাজীউল হক : একুশের সংকলন ৮০, পৃষ্ঠা ১৩৯ এবং দৈনিক আজাদ। ২১.২.১৯৫২ (রফিকুল ইসলাম কর্তৃক 'ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার' এ উদ্ধৃত। পৃঃ ১৭)
৯. মোহন মিঞা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ২০শে ফেব্রুয়ারী

২. পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বাজেট অধিবেশন

১-৩. Morning News. 21.2.1952

৩. ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী

১. Morning News. 21.2.1952
২. আজিজ আহমদ (চীফ সেক্রেটারী)
৩-৪. নূরুল আমীন
৫. গাজীউল হক স্মৃতিচারণ, পৃঃ ১৩৯, তোয়াহা, আবদুল মতিন, শহীদুল্লাহ কায়সার এবং হাবিবুর রহমান শেলী, একুশের সংকলন' ৮০, পৃঃ ৫৭

৪. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর বৈঠক

১. তোয়াহা, কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ এবং অলি আহাদ 'জাতীয় রাজনীতি' পৃঃ ১৪৭, খায়রাত হোসেন।
২. অলি আহাদ এবং অলি আহাদ রচিত 'জাতীয় রাজনীতি' ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ পৃঃ ১৪৭-৫০, তোয়াহা, কমরুদ্দীন আহমদ, খায়রাত হোসেন, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুল মতিন, শহীদুল্লাহ কায়সার।
৩. আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ (জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা : ১৪৮)
৪. সাক্ষাৎকার (১৯.৯.৬৯)
৫. অলি আহাদ, আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব, কমরুদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা
৬. কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ (জাতীয় রাজনীতি পৃ: ১৪৮), কাজী গোলাম মাহবুব
৭. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃ: ১৪৮
৮. কাজী গোলাম মাহবুব
৯. আবুল হাশিম, খায়রাত হোসেন, কমরুদ্দীন আহমদ
১০. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃ: ১৪৮-৪৯
১১. আব্দুল মতিন
১২. তোয়াহা, গাজীউল হক (স্মৃতিচারণ পৃঃ ১৪০)
১৩. শহীদুল্লাহ কায়সার
১৪. তোয়াহা
১৫. শহীদুল্লাহ কায়সার
১৬. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ১৪৯
১৭. তোয়াহা
১৮. কমরুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, খায়রাত হোসেন
১৯. কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব
২০. অলি আহাদ, কমরুদ্দীন আহমদ

৫. ছাত্র মহলে ১৪৪ ধারা ও সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া

১.. ঢাকা ডাইজেস্ট। এপ্রিল ১৯৭৮ পৃঃ ১৮
২. ঐ। পৃষ্ঠা-২৭

www.pathagar.com

৩-৪. গাজীউল হক। একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ১৪০
৫. শহীদুল্লাহ্ কায়সার।
৬. গাজীউল হক। একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ১৪১-৪২ এবং হাবিবুর রহমান (শেলী)। একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ৫৭
৭. গাজীউল হক। একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ১৪২
৮. হাবিবুর রহমান (শেলী)। একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ৫৭-৫৮

৬. মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক
১-২. শাহ আজিজুর রহমান

৭. দুটি প্রচার পুস্তিকা
১. বদরুদ্দীন উমর, কাজী গোলাম মাহবুব
২. খোন্দকার মোশতাক আহমদ
৩. আনিসুজ্জামান, বদরুদ্দীন উমর
৪. আনিসুজ্জামান, মহম্মদ তোয়াহা

নবম পরিচ্ছেদ : একুশে ফেব্রুয়ারী

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ও সমাবেশ
১-২. গাজীউল হক। স্মৃতিচারণ, একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৫
৩-৪. আবদুল মতিন।
৫. গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৬; অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫২-৫৩ এবং তোয়াহা
৬-৭. Ellis Commission Report. Para 19.
৮. গাজীউল হক। একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ১৪৬
৯. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫২; গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৬
১০. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৩
১১. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৩, Ellis Commission Report Para-20.
১২. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
১৩. Ellis Commission Report, Para-20
১৪. ভাইস চ্যান্সেলর মোয়াজ্জেম হোসেনের সাক্ষ্য, Ellis Commission Report. Para 20
১৫. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৩; Ellis Commission Report para. 20
১৬. বদরুদ্দীন উমর
১৭. এম. আর. আখতার (মুকুল)
১৮. এম.আর. আখতার; অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৩; গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৭
১৯. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৪; গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৭; আবদুল মতিন
২০. গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৭ মহম্মদ সুলতান। একুশের সংকলন '৮০, পৃঃ ৮২
২১. গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৭; এম. আর. আখতার, আঠাশ বছর পরেও, শহীদ দিবস ১৯৮০ সংখ্যা, প্রেসক্লাব, পৃঃ ৩৩; মহম্মদ তোয়াহা
২২. Ellis Commission Report Para 21; দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২

২. ১৪৪ ধারা ভঙ্গ
১. গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৯
২. একুশের সংকলন '৮০ : হাবিবুর রহমান পৃঃ ৫৮, মহম্মদ সুলতান পৃঃ ৮২, গাজীউল হক পৃঃ ১৪৭
৩. হাবিবুর রহমান। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ৫৮

www.pathagar.com

৪. হাবিবুর রহমান। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ৫৯
৫. হাবিবুর রহমান। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ৫৮-৫৯
৬. একুশের সংকলন ৮০ : গাজীউল হক পৃঃ ১৪৮; হাবিবুর রহমান শেলী পৃঃ ৫৯; মহম্মদ সুলতান পৃঃ ৮২
৭. গাজীউল হক। একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ১৪৮
৮. মহম্মদ সুলতান, একুশের সংকলন ৮০ পৃঃ ৮২
৯. Ellis Commission Report. Para 21
১০. শাফিয়া খাতুন। ঢাকা ডাইজেস্ট, এপ্রিল ১৯৭৮ পৃঃ ১৯
১১. সুফিয়া আহমেদ। ঢাকা ডাইজেস্ট, এপ্রিল ১৯৭৮ পৃঃ ২৪
১২. শামসুন্নাহার আহসান, ঢাকা ডাইজেস্ট, এপ্রিল ১৯৭৮ পৃঃ ২৮
১৩-১৪. Ellis Commission Report. Para-21

৩. ইট পাটকেল, কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠিচার্জ

১. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৫
২. Ellis Commission Report. Para 22
৩. একুশের সংকলন '৮০ : গাজীউল হক পৃঃ ১৪৮ ও মহম্মদ সুলতান পৃঃ ৮২; অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ১৫৫
৪. বদরুদ্দীন উমর; মহম্মদ সুলতান। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ৮২
৫. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২; অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৬
৬. সাপ্তাহিক গণশক্তি। একুশের বিশেষ সংখ্যা, ২৪.২.১৯৭০
৭. হাসান হাফিজুর রহমান। একুশের সংকলন '৮০, পৃঃ ৪৬
৮. গাজীউল হক। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ১৪৯
৯. ঢাকা ডাইজেস্ট। এপ্রিল ১৯৭৮ পৃঃ ১৯-২০
১০. ঐ। পৃঃ ২৫
১১. ঐ । পৃঃ ২৮-২৯

৪. মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ

১. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৫৫; আবদুল মতিন; মহম্মদ তোয়াহা
২. Ellis Commission Report. Para-22
৩. এম.আর. আখতার
৪. মহম্মদ সুলতান। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ৮৪, এম, আর আখতার
৫. Ellis Commission Report. Para. 22
৬. পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বিবৃতি, East Bengal Assembly Proceedings, Feb. 22. 1952.
৭. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
৮. The Statesman 22.2.1952
৯. Ellis Commission Report Para-23
১০. সাপ্তাহিক গণশক্তি। একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
১১. রফিকুল ইসলাম। ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার পৃঃ ২২৩; মহম্মদ সুলতান। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ৮৪, দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
১২. একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ পুঁথিঘর সংস্করণ : খোন্দকার গোলাম মোস্তফা, পৃঃ ২১৬ এবং কবির উদ্দীন আহমদ পৃঃ ২২৫;

৫. ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ

১. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
২. বদরুদ্দীন উমর

www.pathagar.com

৩. রফিকুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার, পৃঃ ২৪-২৬
৪. আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ব.উ.
৫. Ellis Commission Report. Para-24
৬. Morning News. 22.2.1952
৭. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
৮. সাপ্তাহিক গণশক্তি, একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ২৪.২.১৯৭০

৬. গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে

১. আবদুল মতিন, মাহবুব জামাল জাহেদী
২-৩. আবদুল মতিন
৪. রফিকুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মীনার পৃঃ ২৪; আবদুল মতিন
৫-৬. East Bengal Legislative Assembly Proceedings. 21.2.1952
৭. এম.আর. আখতার
৮-৯. আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার

৭. পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অভ্যন্তরে

১. আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ৩০.৪.১৯৬৯
এই অংশের বাকী সব তথ্য East Bengal Legislative Assembly Proceedings 21.2.1952 থেকে গৃহীত।

৮. গুলিবর্ষণের পর বিভিন্ন এলাকার তৎপরতা

১. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ১৬০
২. আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
৩. বদরুদ্দীন উমর
৪. আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
৫. এম. আর. আখতার।
৬. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
৭. রফিকুল ইসলাম। শহীদ মিনার, পৃঃ ৩০
৮-৯. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ১৬০
১০. আবদুল মতিন
১১. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
১২-১৩. হাসান হাফিজুর রহমান। একুশের সংকলন '৮০, পৃঃ ৪৭
১৪. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
১৫. রফিকুল ইসলাম; শহীদ মিনার পৃঃ ৩০
১৬. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
১৭. কমরুদ্দীন আহমদ
১৮. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী ২১.২.১৯৫২

৯. দৈনিক সংবাদ অফিস ও বর্ধমান হাউসের অভ্যন্তরে

১-২. খায়রুল কবির
৩. কাজী ইদরিস
৪. খায়রুল কবীর
৫. জহুর হোসেন চৌধুরী
৬. সৈয়দ নূরুদ্দীন
৭. জহুর হোসেন চৌধুরী
৮. সৈয়দ নূরুদ্দীন
৯-১০. খায়রুল কবীর

www.pathagar.com

১০. ঢাকার বাইরে একুশে ফেব্রুয়ারী

১. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
২. আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া (ট্যাক্সি মালিক সমিতির সদস্য)
৩-৪. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
৫. নওবেলাল। বিশেষ সংখ্যা। ২৩.২.১৯৫২

দশম পরিচ্ছেদ : ২২শে ফেব্রুয়ারী

১. 'দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদকীয়

১. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২

৩. ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদদের গায়েবী জানাজা

১-২ আবদুল মতিন
৩. একুশের ইতিহাস, কবির উদ্দীন আহমদ। একুশের সংকলন, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত। পুঁথিপত্র প্রকাশনী। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫, পৃঃ ২২৭।
৪. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৬৯-৭২; আবদুল মতিন
৫. আবদুল মতিন।
৬. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২

৪. মিছিল

১. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৬২-৬৩; কবির উদ্দীন আহমদ, একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন (হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত) পৃঃ ২২৮; মহম্মদ সুলতান। একুশের সংকলন '৮০, পৃঃ ৮৭।
২. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
৩. আবদুল মতিন।
৪. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২, অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৬৩: কবির উদ্দীন আহমদ, একুশে ফেব্রুয়ারী (সংকলন) পৃঃ ২২৮
৫. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
৬. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৬৪

৫. 'মর্নিং নিউজ' প্রেসে অগ্নিসংযোগ

১. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
২. আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া

৬. নবাবপুর রোডের অবস্থা ও 'সংবাদ' অফিসের কাছে পুলিশের গুলিবর্ষণ

১. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
২. আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া।

৭. ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও পুলিশি নির্যাতন

১-২. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
৩-৪. আনিসুজ্জামানের চিঠি
৫. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ২২.২.১৯৫২; তোয়াহা,

৮. যানবাহন ধর্মঘট

১. কবির উদ্দীন আহমদ 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন, পৃঃ ২২৮
২. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৭২; মহম্মদ সুলতান। একুশের সংকলন '৮০ পৃঃ ৮৬

www.pathagar.com

৯. ২১শের গুলিবর্ষণ সম্পর্কে ভাইস চ্যান্সেলরের বিবৃতি ও আইনজীবীদের প্রস্তাব
১. দৈনিক আজাদ। ২২.২.১৯৫২
২-৬. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২

১০. সরকারী মহলের তৎপরতা
১. জহুর হোসেন চৌধুরী
২. শাহ আজিজুর রহমান
৩. সৈয়দ নুরুদ্দীন

১১. পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন
এই অংশের তথ্যাবলী East Pakistan Legislative Assembly Procecdings, 22.2.1952 থেকে গৃহীত

১২. ঢাকা শহরের বাইরের পরিস্থিতি
১. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
২. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ২৩.২.১৯৫২
৩. আসহাবউদ্দীন আহমদ
৪. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
৫. কাসেদ আলী।
৬. সাপ্তাহিক গণশক্তি। ২১.২.১৯৭৭

একাদশ পরিচ্ছেদ : ২৩শে ফেব্রুয়ারী

১. সংবাদপত্র সম্পাদকীয় ও বিবৃতি
১. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২
২. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২; সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ২৪.২.১৯৫২

২. পূর্ব বঙ্গ সরকারের প্রেস নোট ও অন্যান্য বক্তব্য ১-২. দৈনিক আজাদ। ২৩.২.১৯৫২

৩. ঢাকায় হরতাল ও মিছিল
১-৬. দৈনিক আজাদ। ২৪.২.১৯৫২

৪. বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সভা ও প্রস্তাব
১-১৩. দৈনিক আজাদ। ২৪.২.১৯৫২

৫. পরিবহন মালিকদের সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বৈঠক
১-৩. আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া

৬. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠক
১. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৭২-৭৩
২. আবদুল মতিন
৩. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৭২-৭৩; আবুল হাশিম
৪. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৭৩; কাজী গোলাম মাহবুব।

www.pathagar.com

৭. ছাত্রাবাস পরিস্থিতি ও শহীদ মিনার

১. আবদুল মতিন, বদরুদ্দীন উমর
২. হেদায়েত হোসেন চৌধুরী
৩. আবদুল মতিন
৪. একুশে ফেব্রুয়ারী (হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত) পৃঃ ২৩০
৫. আনিসুজ্জামান (পত্র)
৬. ঐ। এবং তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৫.২.১৯৫২
৭. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৫.২.১৯৫২
৮. রফিকুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার। পৃঃ ৭০-৭১

৮. মুসলিম লীগ সংগঠন ও সরকারের তৎপরতা

১. ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা)
২. সৈয়দ নুরুদ্দীন
৩. জহুর হোসেন চৌধুরী
৪. তফজ্জল আলী
৫. শাহ আজিজুর রহমান
৬. নূরুল আমীন
৭-৮. মোহন মিঞা
৯. দৈনিক আজাদ। ২৬.২.১৯৫২
১০. মোহন মিঞা
১১. শাহ আজিজুর রহমান
১২-১৪ মোহন মিঞা

৯. ঢাকার বাইরের পরিস্থিতি

১-৩. দৈনিক আজাদ। ২৪.২.১৯৫২
৪-৫. ঐ । ২৫.২.১৯৫২
৬-৮. ঐ ২৪.২.১৯৫২

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়

১. সংবাদপত্র সম্পাদকীয়

১-২. সাপ্তাহিক 'সংগ্রাম' ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ থেকে উদ্ধৃত
৩-৪দৈনিক আজাদ। ২৪.২.১৯৫২

২. প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির প্রস্তাব ও নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা।

১. দৈনিক আজাদ। ২৫.২.১৯৫২
২. দৈনিক আজাদ। ২৬.২.১৯৫২

৩. শহীদ সুহরাওয়ার্দীর বিবৃতি

১. Dawn. 25.2.1952
২. নওবেলাল। ২৮.২.১৯৫২
৩. শেখ মুজিবুর রহমান (সাক্ষাৎকার)
৪. আতাউর রহমান সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও কর্মচারীদের সভা

১. আবদুর রাজ্জাক
২. মোজাফফর আহমদ কর্তৃক প্রদত্ত কপি ও দৈনিক আজাদ ২৫.২.১৯৫২

৫. বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদ

১-৫. দৈনিক আজাদ। ২৫.২.১৯৫২

৬. ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের অবস্থা

১. দৈনিক আজাদ। ২৬.২.১৯৫২; Statesman 26.2.1952.
২. দৈনিক আজাদ। ২৬.২.১৯৫২ এবং নওবেলাল। ১৩.৩.১৯৫২
৩-৬. দৈনিক আজাদ। ২৬.২.১৯৫২

৭. প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

১-২. দৈনিক আজাদ। ২৬.২.১৯৫২

৮. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রস্তাব ও নির্দেশ

১-২. তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২৫.২.১৯৫২
৩. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ২৮.২.১৯৫২

৯. ২৬শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী

১. Statesman. 27.2.1952
২. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ৫.৩.১৯৫২
৩. Statesman 27.2.1952
৪. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ৫.৩.১৯৫২
৫. হেদায়েত হোসেন চৌধুরী
৬. আজিজ আহমদ (চীফ সেক্রেটারী)
৭. নূরুল আমীন
৮. আজিজ আহমদ (চীফ সেক্রেটারী)
৯-১০. দৈনিক আজাদ। ২৬.২.১৯৫২
১১. Statesman. 28.2.1952
১২. Statesman. 27.2.1952
১৩. আনিসুজ্জামানের চিঠি
১৪. Statesman. 27.2.1952
১৫. Statesman 28.2.1952

১০. বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির তহবিল

১. আবদুল মতিন
২. হেদায়েত হোসেন চৌধুরী

১১. মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও পদত্যাগ

১-২. দৈনিক আজাদ। ২৫.২.১৯৫২
৩. দৈনিক আজাদ। ২৭.২.১৯৫২
৪-৭. দৈনিক আজাদ। ২৭.২.১৯৫২
৮-১০. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ২৮.২.১৯৫২

www.pathagar.com

১২. নারায়ণগঞ্জের ঘটনাবলী

১. Morning News. 1.3.1952
২. নওবেলাল। ৬.৩.১৯৫২
৩-৪. নওবেলাল। ৬.৩.১৯৫২; মহম্মদ আওয়াল
৫. মহম্মদ আওয়াল
৬. শামসুজ্জোহা; মহম্মদ আওয়াল এবং নওবেলাল। ৬.৩.১৯৫২
৭. শামসুজ্জোহা, মহম্মদ আওয়াল
৮. নওবেলাল। ৬.৩.১৯৫২; Morning News. 2.3.1952; অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৭৮।
৯. মহম্মদ আওয়াল
১০. নূরুল আমীন
১১. আজিজ আহমদ (চীফ সেক্রেটারী)

১৩. ঢাকার বাইরে অন্যান্য এলাকার পরিস্থিতি

১-২. দৈনিক আজাদ; ২৬.২.১৯৫২
৩. নওবেলাল। ১৩.৩.১৯৫২

১৪. গ্রেফতার ও গ্রেফতারী পরোয়ানা

১. নওবেলাল। ১৩.৩.১৯৫২
২. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ১৭.৩.১৯৫২
৩. নওবেলাল। ৩.৪.১৯৫২
৪. নওবেলাল। ২৪.৪.১৯৫২
৫. Morning News. 3.3.1952; দৈনিক আজাদ ৪.৩.১৯৫২

১৫. নিহতদের সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য

১. সাপ্তাহিক সংগ্রাম। ১৫.৩.১৯৫২

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মার্চ এপ্রিলের ঘটনাবলী

১. নূরুল আমীনের ৩রা মার্চের বেতার বক্তৃতা

১. কাজী মহম্মদ ইদরিস (সাক্ষাৎকার)
২. দৈনিক আজাদ। ৫.৩.১৯৫২

২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের গ্রেফতার

১. তোয়াহা
২. অলি আহাদ। সাক্ষাৎকার এবং জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৮১; খোন্দকার গোলাম মোস্তফা।
৩. তোয়াহা
৪. খোন্দকার গোলাম মোস্তফা
৫. তোয়াহা
৬. আনিসুজ্জামান (চিঠি)
৭. শহীদুল্লাহ কায়সার
৮. জাহেদী
৯. সাদেক খান
১০. হেদায়েত হোসেন চৌধুরী
১১. মহম্মদ তোয়াহা

www.pathagar.com

১২. কাজী গোলাম মাহবুব
১৩. হেদায়েত হোসেন চৌধুরী
১৪. মুজিবুল হক
১৫. অলি আহাদ। জাতীয় রাজনীতি পৃঃ ১৮১-৮২
১৬. অলি আহাদ (সাক্ষাৎকার)
১৭. আনিসুজ্জামান (চিঠি)

৩. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পুনর্গঠন

১. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ১৭ই মার্চ ১৯৫২; নওবেলাল। ২১শে মার্চ ১৯৫২
২. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ২১.৩.১৯৫২
৩. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ৩.৪.১৯৫২
৪. ঐ। ২৪.৪.১৯৫২
৫. ঐ। ২৭.৩.১৯৫২

৪. নূরুল আমীনের পরিষদ বিবৃতি

১. East Bengal Assembly Proceedings Official Report of the Eighth Session. Vol. VIII. March 24, 1952 Pages 6-13
২. মুজিবুল হক
৩. East Bengal Assembly Procceedings. Vol VIII. P. 13-14

৫. শহীদ বরকত ও রফিকের মামলা

১. নওবেলাল। ৩.৪.১৯৫২
২. সাপ্তাহিক সংগ্রাম। ২৯.৩.১৯৫২

৬. এপ্রিল কনভেনশন

১. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ৭.৪.১৯৫২
২. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ৮.৫.১৯৫২; The Statesman. 30.4.1952
৩-৪. বদরুদ্দীন উমর
৫. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। ৫.৫.১৯৫২; সাপ্তাহিক নওবেলাল। ৮.৫.১৯৫২

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : এলিস কমিশন

১-২. Dacca Gazette Notification dated 13th March, 1952. Notification No 943-PI. (Quoted from Ellis Commission Report. Para-2.)
৩. ঐ। Para-3
৪. ঐ। Para-4
৫-৭. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ২৭.৩.১৯৫২
৮-৯. Ellis Commission Report. Para-5
১০. ঐ। Para-44
১১. সাপ্তাহিক নওবেলাল। ৫.৬.১৯৫২
১২. Ellis Commission Report. Para-9
১৩. ঐ। Para-50
১৪. ঐ। Para-51

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অ

অজিত গুহ, অধ্যাপক, ৩২৭
অনিল বসাক, ১৮
অনিল মুখার্জী, ১৮, ৪৯, ১৩৭
অমর ব্যানার্জী, ২০
অমৃতেন্দু মুখার্জী, ১৮
অর্থনৈতিক সঙ্কট, ১৪৬
অলি আহাদ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, ৬৩, ৬৬, ৭০, ১০৭, ১১৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬৪, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৯, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৭, ২১৮, ২২০, ২২৯, ২৪১, ২৪২, ২৫১, ২৫২, ২৬৪, ২৬৬, ২৭১, ২৯৯, ৩৪০, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৮১
–বক্তৃতা, ২৬৩
–বিবৃতি, ৬৩, ১৯৫
–শিক্ষা সম্পর্কে, অভিভাষণ, ৭০, ৭২, ৭৩, ৮৭
–শিক্ষা সম্পর্কে, রিপোর্ট (১৯৫১), ১৬০, ১৬১, ১৬২
অশ্বিনীদেব, ১৮

আ

আইন পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান, ১৪৩, ৩১৬,
আইয়ুব খান, ১৯৯
আওয়ামী মুসলিম লীগ (আওয়ামী লীগ), ১৩০, ১৭০, ১৭৮, ১৮৪, ২১৮, ২২০, ২৯২, ৩১৯, ৩৩৯, ৩৬৭, ৩৮৯, ৩৯০
–এর অফিস (৯৪ নবাবপুর রোড), ২০৮
–এর ছাত্রফ্রন্ট ১৮৪,
–এর সমর্থক পত্রিকা ৩১২
–এর সহ-সভাপতি ৬৭
– এর সাধারণ সম্পাদক, ২১০, ২১২, ৩২৬
–চট্টগ্রাম, ৬১
-নারায়ণগঞ্জ সিটি ১৭৭, ৩৩৬
–পূর্ব বঙ্গের, ১৬৬
–পূর্ব পাকিস্তান, ১০৭, ১৭৬, ১৭৭, ২৯৭
–সিলেট জেলা ৩১৮
–জিন্নাহ ১৭৬, ১৭৭
আওলাদ হোসেন, ১৩২, ২৩৩
আউয়াল, ১৮৬
আকরাম খান, মৌলানা মহম্মদ, চেয়ারম্যান, 'পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি', এবং সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১২০, ১২১, ২৪৫, ২৬০
–এর পত্রিকা ২৭০
–বিবৃতি ৯৩
আখতার ৩৯
আখতারউদ্দিন আহমদ, ১৯৮, ২০৯, ৩৩৩, ৩৮২
আখতারউজ্জামান ২৪১
আজফার, সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ২১৬, ২৫৩, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৭৩
আজমল আলী চৌধুরী (মুসলিম লীগ), ১৭৩
আজমল হোসেন, ২৯৮
আজহার ২২৩
আজাদ, দৈনিক ১২৫, ২৪১, ২৪৫, ২৬০, ৩১১, ৩১৪
–এর রিপোর্ট, ২৪০, ২৬৮, ২৭০
–এর সম্পাদক, ২৪৪
–এর সম্পাদকীয়, ২৬১, ২৯০
আজিজ আহমদ ২৭৫, ২৭৬, ৩০১, ৩০২, ৩৪০, ৩৪৭
আজিজ আহমদ, চীফ সেক্রেটারী, পূর্ব বাঙলা সরকার, ১৮১, ১৮২, ১৯৯, ২০০, ২০৭, ২০৮, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৮, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৭, ৩৭৩, ৩৯২
প্রশ্নোত্তর
আজিজ, এম এ, ৬১
আজিজুল ইসলাম ৩১
আজিজুর রহমান এ্যাডভোকেট ১৭১
আজিজুর রহমান (তমদ্দুন মজলিশ) ৬১, ১৯৭,
আজিজুর রহমান (মুসলিম লীগ) ৩১০
আতাউর রহমান খান, ৬৭, ২০৯, ৩২৬, ৩৬২, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৮২
আতিয়ার রহমান, ২৯, ৩০
আনিসুজ্জামান, ২১৭, ২৭১, ৩০০, ৩৩০, ৩৫৩, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১,
আনোয়ার হোসেন ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮
আনোয়ারা খাতুন ৬৭, ২০৮, ২৫০, ২৮০, ২৮১, ২৮৫
আনোয়ারুল আজিম ২২৩
আনোয়ারুল ইসলাম ৩৩৯

www.pathagar.com

আনোয়ারুল এসলাম ২৪১
আনোয়ারুল হক ১১৪, ১১৫
আনোয়ারুল হক খান ২১৫, ২২৩
আনোয়ারুল হোসেন ১৫৬
আফতাব আলী ১৮, ২১, ২২
আবদুর রউফ ৩১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯
আবদুর রব চৌধুরী ১৭২
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ২৪৬, ২৪৯, ২৫০, ২৭৭, ৩১৪, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩৫, ৩৬৮
আবদুর রহমান ১০২, ৩৩৯
আবদুর রহমান খান ৯৭, ৩৩৯
আবদুর রহিম, ১৭৩, ৩৩৫
আবদুর রাজ্জাক ৩২০
আবদুল আউয়াল ২২, ৩৩৭, ৩৪০
আবদুল আউয়াল (প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি) ১০৯
আবদুল আওয়াল ভূঁইয়া ২৬৮, ২৬৯, ২৯৭
আবদুল আহাদ ২৫২,
আবদুল ওদুদ ৭৩, ১১৪, ১১৫, ১৫১, ১৫৬
আবদুল ওয়াহাব ২২৬, ২৩২, ২৪০
আবদুল করিম, স্পীকার, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ ২০৭, ২৪৬, ২৭৭, ৩০৭, ৩৭৩
আবদুল করিম, ডক্টর, ৩৫৫
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ৮২, ৮৭, ৯৫,
আবদুল কাদের ১৫৬
আবদুল গণি, ১০০, ১০৯, ৩১০
আবদুল গণি মিঞা, ১১১
আবদুল গফুর, ১৮৫, ২০৯, ২৫২
আবদুল জব্বার, ২৯, ৩০, ২৪১, ৩৪০, ৩৪৩
আবদুল বারী (মুসলিম লীগ) ৩২২
আবদুল বারী (যুবলীগ) ১৬৫, ৩৩৯
আবদুল বারী, রেল শ্রমিক নেতা, ২৭, ২৮
আবদুল বারী চৌধুরী, ৫৪
আবদুল মজিদ, ১৫১
আবদুল মতিন (পাবনা), আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২০, ২০৯, ২১১, ২৪১, ২৪২, ৩৪০, ৩৫৩, ৩৬০
–এবং যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান, ১৫১, ১৫৬, ১৮৫, ১৮৬
–এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, ২০৮, ২১২, ২১৩, ২৫১
–বক্তৃতা, ১৯০
আবদুল মালেক, ৩৫৫
আবদুল মোমিন, ২১৫
আবদুল মোনায়েম খান, ৯৯, ১১০, ১১১,
আবদুল লতিফ, ১৭২, ৩৫৩, ৩৬০
আবদুল লতিফ চৌধুরী
আবদুল লতিফ বিশ্বাস, ২৭৩
আবদুল হাই (রেল কর্মচারী লীগ), ২৫, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২,
আবদুল হাই (বার্মা অয়েল শ্রমিক ইউনিয়ন), ৬০, ৬১
আবদুল হাই (যুবলীগ), ১৩৫,
আবদুল হাকিম, ১৩২,
আবদুল হাদি, ১৭৩
আবদুল হাদি তালুকদার, ৩২৭, ৩২৮
আবদুল হাফিজ ৩৩৯
আবদুল হামিদ খান ভাসানী,
ভাসানী, মওলানা আবদুল হামিদ খান দ্রষ্টব্য
আবদুল হামিদ (শিক্ষামন্ত্রী) ৯৯, ১০৮
আবদুল হামিদ (রেল শ্রমিক লীগ) ৩১
আবদুল হালিম (যুবলীগ), ১৫১, ১৫৬
আবদুল হায়াত, ১৩২
আবদুল্লাহেল বাকী, ১৭১, ১৭৪, ২১৬, ২২৯, ২৩২, ৩০৪
আবদুস সবুর খান, ৩৩৪
আবদুস সামাদ (মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান), ৬৭, ১৩২, ১৪২, ১৫১, ১৫৬, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৮, ২২১, ২২৩
আবদুস সালাম ১৩০, ১৯৩, ১৯৭, ২৮০, ৩৬৪, ৩৬৫
আবদুস সালাম (সম্পাদক পাকিস্তান অবজারভার) ৬৬, ১৩৮, ১৪০, ১৫৪, ২৪১
আবদুস সালাম চৌধুরী, ২৩৪
আবদুস সোবহান, ১৬৬
আবু জাফর ওবায়েদুল্লাহ ২২৩
আবু তাহের (পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ), ১৫৬, ১৬৫
আবু তাহের (সম্পাদক, ডাক ও তার শ্রমিক ইউনিয়ন), ৩৮
আবু বকর সিদ্দিকী, ১০৯,
আবু সিদ্দিকী, ১২৪
আবু হেনা মোহসীন, ৭২
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ২৪৪, ২৬১, ৩০১
আবুল কাশেম খান, ২৮৭

www.pathagar.com

আবুল কাসেম, ১১২
আবুল খায়ের, অধ্যাপক, ৩১০
আবুল বরকত, ২৩৪, ২৩৫, ২৪১, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৭৪
আবুল ফজল (অধ্যাপক), ৮২
আবুল ফজল (প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি),৯৭, ৯৮, ৯৯, ১১০
আবুল মনসুর আহমদ, ১০২
আবুল হাশিম, ১৮৪, ১৯১, ২০৮, ২৫২
আবুল হাশিম, সাধারণ সম্পাদক, অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম লীগ, ১৩৪, ১৩৫, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২৬৪, ২৭০, ২৯২, ২৯৯, ৩২৩, ৩২৪
আবুল হাসনাত, ৩৭৪
আবুল হোসেন (কলেজ শিক্ষক সমিতি) ৩১০
আমানুল হক, ২৪৪
আমিনুল ইসলাম, ৮৮
আমিনুর রহমান, ৮৮
আমীর আলী, ২৫১
আমীর হোসেন, ১৯৭
আয়ার, প্রফেসার ২৪৩, ৩২০
আলমাস আলী, ৬৭, ৩৩৬
আলতাফ উদ্দিন তালুকদার, ৩০৯
আলতাফ হোসেন, ১৯৬
আল হেলাল প্রেস, ১৯৪
আলাউদ্দীন আল আজাদ, ৮২
আলিম, ৩০১
আলিয়া মাদ্রাসা, ২৯৫
আলী আকসাদ, ৩৫৩
আলী আশরাফ, ১৫৬, ১৬৫
আলী আহমদ, ৬৭, ২৮১, ২৮৫
আলী আহমদ খান, ১৭৫, ২৫০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৪
আলী আহমদ চৌধুরী, ১৭৫
আলী তাহের, ৬৭
আসলাম, ২৫০
আসলেহুদ্দীন আহমদ, ৩৩৯
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, ৫১, ৫৩,
আহমেদ কবীর চৌধুরী, ১৭৫
আহমেদ হুসেন, ৯৬
আহমদ হোসেন, ৩২২, ৩৩৩, ৩৩৫
আহসানউল্লাহ, ৭২

ই

ইউসুফ (চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সদস্য) ৩২৮
ইউসুফ আলী চৌধুরী : মোহন মিয়া দ্রষ্টব্য, ১৭১, ১৭৪, ১৮১
ইকবাল মোহাম্মদ ডক্টর (কবি) , ১৫
ইকরামুল হক, ৮৮
ইকরামুল্লা (বেগম), ১২১
ইতরাত হোসেন জুবেরী, অধ্যাপক ৩২০, ৩৮২,
ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক ২৬৬, ৩১২,
ইনসাফ, সাপ্তাহিক, ৬৬, ১৫৩, ২৯৩
ইভনিং টাইমস, দৈনিক, ৩২৮
ইব্রাহীম খাঁ, অধ্যক্ষ, ৮০, ৯৯, ১২০
ইব্রাহীম তাহা, ২০৯, ২১৩, ২২৩
ইমাদুল্লাহ, এমাদুল্লাহ দ্রষ্টব্য ১৩৫, ১৫৬, ২৭১, ৩৩০
ইমতিয়াজী, এসডিও, নারায়ণগঞ্জ, ৩৩৬
ইয়ার মোহাম্মদ, ১৫১,১৫৪
ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, ১৮৪, ১৮৫, ২০৯, ২৯৬
ইসহাক ৩১
ইস্পাহানী ৪৪, ৭২

উ

উর্দু সম্মেলন, পাকিস্তান, ১২০, ১২১

এ

এ আর ফৈয়াজ, ২৪১
এ এম আবদুল হামিদ, ৩৩৪
এ এম এম নূরুল আলম, ৩৪০
এ এসএম মোহসিন, ২৪৪
একরামুর রহমান, ১৭৩
একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন, ২৬৬
এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ, প্রিন্সিপাল, মেডিকেল কলেজ, ২৭৪
এ গফুর চৌধুরী ১৫১
এ জেড আবদুল্লাহ ৩৩৫
এ জেড ওবায়েদউল্লাহ, ডিআইজি, ২২৯
এ টিএম মাসুদ, ১৭৩
এন আহমদ, মহকুমা হাকিম, ৩৭৪
এন এ লস্কর, ২৯৭
এনামুল হক (সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক) ২৯, ৩০

www.pathagar.com

এ বি এম মূসা, ১৫৬
এম আর আখতার (মুকুল), ১৮৯, ২০৮, ২১৫, ২২০
এম এ আজিজ, ১৯৭
এম এ ওয়াদুদ, ১২৪
এম এ বারী, ১৭২
এম এ মোতালেব, ২৪১
এম এ সামাদ, ১২৪
এম এ রহিম, ৩২৬
এম এ গণি, ডক্টর, ২২৮
এম রহমান, ডক্টর,
এমাদুল্লাহ, মোহাম্মদ, ২৫১,২৬৩, ৩৮১, ৩৮২
এ রশিদ, ২৪১,
এ রহমান সিদ্দিকী, ১৫৬
এ রেজ্জাক, ২৪১
এলাহী বখস ২৪১
এলিংসন, ডক্টর, ২৪৩,২৭৪
এলিস কমিশন, ২২০, ২২৪, ২২৯, ২৩২, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ৩৬৪, ৩৮১
এস এম হক ৩২৬
এস এ বারী এটি, ২১৫, ২১৮, ২২৩
ওদুদ, ৬৭, ১৮৬
ওবায়েদউল্লাহ ম্যাজিস্ট্রেট, ৩৪০, ৩৭১, ৩৭৩
ওমেন্স স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ২১৪
ওসমান আলী এম এল এ, ৩৩৫, ৩৩৬
ওসমান গণি, ডক্টর, ২২০, ৩২৩, ৩২৭

ক

কনফেডারেশন অব লেবার নিখিল পাকিস্তান APCOL ২২, ২৩
কমরুদ্দীন আহমদ ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৬৭, ১৭১, ২১০, ২১৩, ২৫২, ৩২৬, ৩৬২, ৩৭৭,
কমরুদ্দীন শহুদ, ১৯০, ২১৫, ২২১
কমিউনিষ্ট পার্টি, পাকিস্তানের, পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি ১৮৭, ১৮৯, ২০৫, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫
–সার্কুলার রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন ৩৪৫
–ইস্তেহার,
কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) ১৮, ২৭, ২৮, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ১৩০, ১৩৭, ১৭৮, ২০০, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৯১, ৩৯৩
কমিউনিষ্ট পার্টি, ভারতের ১৮, ২৪, ১৭৮
–দ্বিতীয় কংগ্রেস ২৭
কবির আহমদ ১৫১
কবির আহমদ চৌধুরী ১৭৫
কবির উদ্দিন আহমদ ২৫২, ২৬৬
কায়সার রশীদ চৌধুরী ৪৪
করাচী টাইমস ৩২৮
কলেজ শিক্ষক সম্মেলন ৯১
কাজী আজিজুর রহমান ২৭১
কাজী আবদুল কাদের ৩২২
কাজী গোলাম মাহবুব ১৮৬, ১৯০, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২২০, ২২১, ২৪২, ২৫২, ২৯৮, ৩১৭, ৩৪০, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১
কাজী মহম্মদ ইদ্রিস ৬৬, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ৩৪৭
কাজী মোতাহার হোসেন ৮০
কাজী শামসুল হুদা ৩৩৯
কামরুদ্দীন আহমদ, আহ্বায়ক সিভিল লিবার্টি কমিটি ৩২২
কামরুন্নেসা স্কুল ২১৪
কামরুল আহসান
কামিনী কুমার দত্ত ১৭৯
কাসেদ আলী (কিউ কিউ এম জহুর) ২৮৯
কুটি সি কে ২৯
কুমিল্লা টাউন হল ১৯১, ২৮৮
কৃপা সিন্ধু রায় চৌধুরী ৫৪
কৃষক মজদুর লীগ
কৃষক সংঘ পূর্ব পাকিস্তান ৬৭
কেরানী সাহেব (ঢাকা স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কমিউনিষ্ট নেতা) ২৮
কোবাদ আহমদ ১০৯
কোরেশী, সিএসপি (ঢাকা রেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ১৯৯, ২০০, ২০৭, ২০৮, ২২০, ২৯৭, ২৯৮, ৩১০, ৩৭৩
কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় ৪৯

খ

খন্দকার আবদুল হাই ৩৩
খন্দকার গোলাম মোস্তফা ১৪২, ১৪৩, ১৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৬, ৩৫৪
খন্দকার মুশতাক আহমদ ২১৭, ৩৩৯, ৩৫২,

www.pathagar.com

খায়রাত হোসেন ৬৭, ১৯৭, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২৫০, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ৩২৪, ৩৬৮
খলিফা ওসমান ১৯৩, ১৯৫
খলিল আহমদ ৩৩৬
খাজা খায়ের উদ্দিন ২৭৬
খাজা নসরুল্লাহ ৪৫
খাজা নাজিমউদ্দিন ৮০, ৮৯, ১৪৮, ১৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯৩, ২৫৮, ২৬০, ২৮১, ২৮২, ২৮৫, ৩২৮, ৩৭৫, ৩৮৯, ৩৯২
খাজা সেলিম ২৭৫
খাতিব ২২
খাদেম এম আর ২৯, ৩৫
খাদ্য আন্দোলন ১৭৬
খান, এম ই ২৯, ৩৩
খান এ সবুর (মুসলিম লীগ)
খান সাহেব ওসমান আলী ১৭৫
খায়রুল কবির (সম্পাদক, সংবাদ) ১৩৪, ১৩৫, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৭৪, ২৭৫, ৩০০
খায়রুল বাশার ১৮৫
খায়েজ আহমেদ ১৪৪, ১৫১, ৩৩৯
খালেক নেওয়াজ খান ১১৩, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ২০৯, ২১৩, ২২১, ৩৩৩, ৩৪০
খেলাফাত পার্টি ২০৮
খোকা রায় ৩৫৪
খোন্দকার ওয়ালীউল্লাহ ৩৬৩
খোন্দকার গোলাম মোস্তফা : খন্দকার গোলাম মোস্তফা দ্রষ্টব্য
খোন্দকার মুশতাক আহমদ : খন্দকার মুশতাক আহমদ দ্রষ্টব্য ১৮৬
খোরশেদ আহমদ ৩০৯

গ

গণতন্ত্রী ছাত্র ফেডারেশন ২৯৭
গণতান্ত্রিক যুব লীগ ১৩৬, ১৩৭
গণপরিষদ পাকিস্তান, : গণপরিষদ দ্রষ্টব্য ৩০৫
গণশিক্ষা পরিষদ ৭৩, ৭৯
গাঙ্গুলী ৩১
গাজীউল হক ১৮৯, ১৯০, ২০৮, ২১৩, ২১৫, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২৭, ২৬৪
গুরমানী ৩২৮
গোপাল বসাক ৪৬
গোপীকৃষ্ণ চৌধুরী ৩৮, ৩৯
গোবিন্দলাল চৌধুরী ৩৬৮
গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, ২৬২, ৩২৩, ৩২৪
গোলাম জিলানী, ডক্টর ২১৯
গোলাম মওলা ২১২, ২৫১, ২৫২
গোলাম মহীউদ্দীন ৩৩৯
গোলাম মহম্মদ ৩২৮
গোলাম মুর্তজা ৩৯
গোলাম রসুল, অধ্যাপক ৭১
গোস্বামী ৫৪, ৫৫
গৌর বর্মন ১৮
গ্যানসিলিভিস, সি, ৩৭
গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশন ১৩১, ১৪৩
গ্লাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ৩১

চ

চা শিল্প ১৪৩
চা শ্রমিক ইউনিয়ন (শ্রীহট্ট জেলা) ৪৩, ৪৫, ৪৬
চীনা ছাত্র ফেডারেশন, নিখিল ৩৬৫
চেরাগ আলী খান ৩২, ৩৪, ৩৭
চৌধুরী আরেফ ১৭৫
চৌধুরী খালেকুজ্জামান ১৯৬
চৌধুরী নাজির আহমদ খান ১৯২
চৌধুরী মহম্মদ আলী ৩২৮
চৌধুরী হারুনুর রশীদ ৩৭

ছ

ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তান ১৩৫, ৩৯৪
ছাত্র এসোসিয়েশন, পাকিস্তান ৬৭
ছাত্র ফেডারেশন, পাকিস্তান ৬৭, ৬৮, ১৩০
ছাত্র ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান ৬৮, ১৭৮, ৩৬৫
ছাত্রলীগ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ৬৮, ১৮৪,
ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান, মুসলিম ৬৭, ১৯১, ৩২৩
ছাত্র সম্মেলন, সিলেট জেলা ১৩৪, ১৩৫

জ

জর্জ রীড ২১
জনশিক্ষা ৮৯

www.pathagar.com

জমিদারী উচ্ছেদ ১৪৪
জসিমুদ্দীন ৩৭
জহিরুল হক ২৮৮
জহুর আহমদ চৌধুরী ৫৯, ৬০, ৬২
জহুর হোসেন চৌধুরী ২২, ৬৬, ১৩৮, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৬৬, ২৭৪, ২৭৬, ৩০৩
জাকিউল আলম ১৯৭
জাকির হোসেন (আইজি পুলিশ) ৩০৮
জাতীয় সমস্যা ১৪০
জাতীয় সংহতি ১৮৭
জাবেদ ইকবাল ৩২০
জামান, এ ৬৭
জামাল আখতার ৮৮
জালালউদ্দীন ১৯৭
জাহানারা লাইজু ২১৮
জাহেদ ৩০১
জাহেদুল আবেদীন ৩৩৯
জিন্নাহ (আওয়ামী মুসলিম লীগ) ১৭৬, ১৭৭
জিয়া ৩০১
জিল্লুর রহমান ১৯৯, ২১৫
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ১১৫
জুবিলী প্রেস ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮
জুবেরী এইচ আই (ডক্টর) ২২০, ৩২১
জেড এ সুলেরী ৩২৮, ৩২৯
জ্যোতি বসু ২৬

ট

টাইপ রাইটার, বাংলা ২৭১
টি এ্যাসোসিয়েশন পাকিস্তান ৪৩
টি এ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় ৪৩
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিখিল ভারত (AITUC) ১৭, ১৮
ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, নিখিল পাকিস্তান (APTUF), ২২, ৩৮, ৪৩
ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন পাকিস্তান (TUFP) ২১, ২৫, ২৯, ৩০, ৬৭
ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান ১৮, ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ৪৯, ৫০, ১৭৮

ড

ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন, লোয়ার গ্রেড ২১
ডাক ও তার ইউনিয়ন, নিখিল পাকিস্তান ২২, ৩৮
ডক শ্রমিক ধর্মঘট ৫৬
ডন, দৈনিক (করাচী) ১৯১, ১৯২, ১৯৬, ২৯০. ২৯২

ঢ

ঢাকা বণিক সমিতি ২৯৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ইউনিয়ন ২৯৫
ঢাকা হাইকোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশন ২৭৩
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ১৯৮
ঢাকা সরকারী কলেজ ১৯০
ঢাকা বার লাইব্রেরী ৩৮, ১৮৪, ২১০, ২৭৩, ২৭৮, ২৮১, ২৮৩, ২৮৭, ৩৭৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১৫৩, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ১৯০, ২০৯, ২১৬, ২১৭, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৬
ঢাকেশ্বরী মিল ৪৬, ৪৭, ৪৯

ত

তকিউল্লাহ ২১২
তফজ্জল আলী ৩০৩, ৩০৪, ৩১০, ৩৯২,
তমদ্দুন মজলিশ ১৮৫, ১৯৭, ২০৯, ২৯৬
তসদ্দুক আহমদ ১৩৮, ২৪০, ২৫৩
তাজউদ্দীন আহমদ ১১৪, ১১৫, ১২০, ১৫৬, ১৫২, ২৫৩, ২৭১, ৩২৬
তাজুল ইসলাম ২৪১,
তালুকদার, দারোগা ৩৩৬
তাহমিদুদ্দীন ১৩২
তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ ২৯৫
তৈমুর রেজা চৌধুরী ১৭২, ১৭৩, ২৮৮,
তোলারাম কলেজ ৩০৯

দ

দবীরউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ৩৯
দীনেন সেন ১৭, ১৮
দুর্ভিক্ষ, খুলনা ১৫৪, ১৬৪
দেওয়ান মাহবুব আলী ১৫৬, ২১১, ২১২
দেবেন সেন ২০
দোকান কর্মচারী ফেডারেশন, পূর্ব বাংলা ২১
দোকান কর্মচারী সমিতি ২৪, ৩১
দোহা, খাদ্যমন্ত্রী ৩৩৭

www.pathagar.com

দৌলতুন্নেসা ১৫১
দ্বিজেন সোম ৫২

ধ

ধর্মীয় স্বাধীনতা ৯২
ধর্মঘট, ছাত্র ১৮৩, ১৮৪
ধর্মঘট, যানবাহন ২৬৫, ২৭১
ধর্মঘট, সাধারণ ১৮৬, ২০১
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কংগ্রেস) ১৭৯, ২৩১, ২৪৩, ২৪৫

ন

নওবেলাল, সাপ্তাহিক ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৮২, ৯৯, ১০৩, ১০৮, ১১৯, ১২৯, ১৫১, ১৭৩, ১৯৬, ২৪১, ৩৩৮, ৩৬৩
নওয়া-ই-ওয়াকত ১৫৩,
নজরুল ইসলাম ৯০
নবীউল হক চৌধুরী ৩৩৬
নর্মদা ব্যানার্জী ২৩
নাগরিক কমিটি ২৬৪
নাদিরা বেগম ১১৪, ১৯৮, ১৯৯
নাজির উদ্দীন আহমদ ৩৩৪
নাজিমুদ্দীন, খাজা (প্রধানমন্ত্রী) ১৮, ১১৬, ১২০, ১৮০, ১৮৩, ১৮৫, ১৯২
নাজিমুদ্দীন (প্রাথমিক শিক্ষক) ৯৭, ১৮১, ১৯৯, ২০১
নাজির মুস্তফা ২৪,
নানকার আন্দোলন ২৭
নারায়ণ দাস বেচার ১৭
নারী-যুবক সম্পর্ক ১৪৫
নিউম্যান, ডক্টর ২২০
নিত্যানন্দ চৌধুরী ৪৭
নিযামুল হক ২১৮
নিয়াজ মোহাম্মদ খান ৮৭, ৮৮
নিরক্ষরতা দূরীকরণ ৭৯, ৯২, ১৪৬, ১৪৯
নিরাপত্তা আইন ১৩৩, ১৬৭
নিশতার, সরদার আবদুর রব ৩২, ৩৪, ৩৫
নূর আহম্মদ ৩৩৪
নুরুর রহমান (সিলেট জেলা, আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি) ৫৪, ১৫৬, ১৬৫, ১৭২, ৩১৮
নূরুল আমীন ৮১, ১১০, ১১১, ১২০, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৯০, ১৯৪, ১৯৯, ২০০, ২০৭, ২০৮, ২১৬, ২২১, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ৩০১, ৩০২, ৩০৭, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৫৭, ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৯২
–এবং মোহন মিয়া
–এবং পার্লামেন্টারী পার্টি ৩০৩, ৩০৪,
–সরকার ২৫৮, ২৬১, ২৬০, ২৬৪, ৩০৯, ৩২৪, ৩৩৩, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৬
–এবং পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ ৩১১, ৩৬৫, ৩৬৭
–এবং সংবাদ (দৈনিক)
–মন্ত্রীসভা ২৭০, ২৭৩, ২৭৪, ৩০৫, ৩১২, ৩৪৩
রেডিও বক্তৃতা ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩৪৭
নূরুল আমীন, সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ
নূরুল আলম ১১৪, ১১৫, ১৭৭, ২০৯, ২২১
নূরুল হক সরকার, ডক্টর ৩৭৪
নূরুল হুদা কাদের বক্স ৩৩৯
নূরুল হুদা মোহাম্মদ ২২, ২৪, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৬৭, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৫১, ১৫৬,
নূর আহাম্মদ ১২০,
নূর মোহাম্মদ খান (দায়রা জজ, ঢাকা) ১৭১
নেপাল নাগ- ১৭, ১৮
নেলী সেন গুপ্তা ২৪৩, ২৬২
ন্যাশনাল কটন মিলস, চট্টগ্রাম ৪৯, ৫০

প

পাকিস্তান অবজারভার (দৈনিক) ৬৬, ১০৮ ১১৯, ১২১, ১২২,১২৫,১৩৮, ১৪০, ১৪৩, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫,১৯৬, ১৯৭, ২০৭, ৩২৯,
পাকিস্তান, গঠনতন্ত্র ১৪৮
পাকিস্তান গণপরিষদ ১৭৯, ১৮২
পাকিস্তান ছাত্র এ্যাসোসিয়েশন
পাকিস্তান টাইমস ১১৯
পাকিস্তান রেডিও ৭৭
পাকিস্তান সম্পাদক পরিষদ ৩২৯

www.pathagar.com

পাকিস্তান সরকার ২৮, ৬১, ৬২, ১৩৩
পাট চাষী সমিতি ১৬৩
পিওন ইউনিয়ন ৩৮
পুর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত (কংগ্রেস) ৪৩, ৪৫, ৪৬
পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী ২৩৯
পূর্ব বঙ্গ পরিষদ (পূর্ব বাংলা পরিষদ) ২৩৩
পূর্ব বাংলা জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স, ১৯৩, ১৯৪
পে-কমিশন (শিক্ষক, প্রাথমিক) ৯৭, ৯৯,
পে কমিশন, রেলশ্রমিক ৩৫. ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫৯
পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম
প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় ১৭৯
প্রাদেশিকতা ১৯২
প্রভাষচন্দ্র লাহিড়ী ১৭৯, ২৩১, ২৮১
প্রাদেশিক তথ্য বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান ১৫৯, ১৮২
প্রাণেশ সমাদ্দার ১৫১, ১৫৬
প্রেসনোট (প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট সম্পর্কে) ১০০, ১০৪
প্রহলাদ চন্দ্র দাস ৩১
প্রি. সেঙ্গরশীপ ১২৮, ১৪৩

ফ

ফকির আবদুল মান্নান ৩০৩
ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদ ২১৫
ফজল এলাহী কুরবান ৯৭
ফজলুর রহমান ৪৪, ১২১, ৩২৮, ৩৯২
ফজলুর করিম চৌধুরী (মুন্সেফ) ১৭১
ফজলুল হক ১২০, ২৫২, ২৬৪, ২৭২, ৩৩৯
ফখরুদ্দীন আহমদ ৩০৯
ফজলুল বারী ৩২২
ফরিদ আহমদ চৌধুরী ১৭৫
ফরিদা হাসান ৮৮
ফয়েজ আহমদ (প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি) ১০৯
ফয়েজ আহমদ (ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন পূর্ব পাকিস্তান) ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ৪৯, ৫০, ৩০৯
ফররুখ আহমদ ২৫২
ফরমান উল্লাহ ২২৮
ফজলে আহমেদ করিম ফজলী (শিক্ষা সেক্রেটারী) ৩৪৭, ৩৭৩
ফাতেমা জিন্নাহ ১৩৬
ফাত্তাহ খান ১০০
ফেডারেশন অব লেবার, পশ্চিম পাকিস্তান ২২
ফেডারেশন অব লেবার, পূর্ব পাকিস্তান ২২, ২৩, ২৪

ব

বছিরউদ্দিন আহমদ
বজলুর রহমান ১১৪
বদরুদ্দীন উমর ২১৭
বদরুদ্দীন হোসেন ৩৩৯
বদরুল আমিন ২২৩
বদরুল আলম ৩০১
বদিউর রহমান ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১৩৮, ১৩৯
বর্ধমান হাউজ ২৭৬, ৩০৩, ৩০৫,
বশীর আহমদ ২৪১,
বসন্ত কুমার দাস ১৭৯, ২৪৩, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৮২, ২৮৩, ৩৭৩
বাংলা বাজার গার্লস স্কুল ২১৪
বজল মিয়া ৬২
বাটা কোম্পানী ৬২, ৬৩
বার্মা অয়েল কোম্পানী (BOC) ৫৯, ৬০
বার্মা অয়েল কোম্পানী শ্রমিক ইউনিয়ন ৬০,
বাস ও ট্যাক্সী মালিক এ্যাসোসিয়েশন ২৬৮
বুলবুল চৌধুরী (নৃত্যশিল্পী) ১৩৬
বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন বরিশাল ১৯, ২৮, ১৭৮
বিদেশী মূলধন ১৫০
বিনয় রায় ৩৩৬
বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী ২৮১, ২৮৬
বিদ্যাপতি ৮৫
বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (RSP) ৪৮
বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন ৭১
বুদ্ধিজীবীদের স্মারকলিপি ৮০,
বৃটিশ কমনওয়েলথ ১৩৩
বেঙ্গল টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়ন ৪৭, ৫৪
বেকারত্ব ৭৪,
বেগম সুফিয়া কামাল ৮২, ৮৩
বোখারী কে ১৭
ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগ ১৬৭
ব্যবস্থা পরিষদ পূর্ব বাংলা ২৫৩, ২৭৩,২৭৬, ২৮৮, ৩০৭, ৩১৪, ৩২২, ৩৬৫

www.pathagar.com

ব্যাংক কর্মচারী ২৯৬
ব্রাবন্ট, মি. (এবং রিপোর্ট) ১৪৩

ভ

ভুঁইয়া সাহেব, হাউসটিউটর, এসএম হল
ভাষা সমস্যা ১৬১

ম

মওলানা আকরাম খান : আকরাম খান ১৯৩
মৌলানা মহম্মদ, দ্রষ্টব্য
মওলানা আবদুল গফুর ১৯৩, ৩৭১
মওলানা আব্দুল্লাহেল এমএল ১৭০,
মওলানা দীন মোহাম্মদ ওসমান ১৯৩
মওলানা ভাসানী, আবদুল হামিদ খান ১৭৬, ১৮৪, ১৯১, ২০৯, ২৬৪, ২৯২, ৩৩৯, ৩৬৭, ৩৭৫
মওলানা শামসুল হক ১৯৩
মকসুদুর রহমান ৬১
মখলজ রহমান ৫০
মখলেসুর রহমান ১১৩, ৩৩৯
মজিউদ্দীন আহমদ
মতসির আলী ৫৪, ৫৫, ১৭২, ৩৩৫
মতিউর রহমান তালুকদার
মতি সরদার ২৯৭, ২৯৮
মধুর রেস্তরাঁ ২১৮, ২১৯, ২২৮
মধ্যবিত্ত যুবক
মনজুরুল হক ১৯৮
মনসুর আলী ২৪১
মনু প্রেস ২৬৭
মনোরঞ্জন ধর ১৭৯, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৬২, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৫, ২৮৭, ৩২৩, ৩২৪
মঞ্জুর ২১৮
মণ্বন্তর ১৫৬
মফিজউদ্দীন
মফিজউদ্দীন (মন্ত্রী) ২৫১
মফিজুল ইসলাম ১৫৬
মর্নিং নিউজ, দৈনিক ১৫৭, ১৯৩, ১৯৪, ২৫৫, ২৬১, ২৬২, ২৬৬, ২৬৭, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৯২, ২৯৩, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৫০, ৩৭৭
মফিজউদ্দীন আহম্মদ ৬৭, ১৯৭, ৩২৮
মমতাজ বেগম ৩৩৬, ৩৬৯
মহম্মদ আওয়াল ৩৩৬
মহম্মদ আক্রাম ৩১
মহম্মদ আলী চৌধুরী ৩১
মহম্মদ ইউসুফ ৩৭১
মহম্মদ ইসমাইল ১৭, ১৮
মহম্মদ তোয়াহা ১১৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৫১, ১৫৬, ২০৮, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২৫১, ২৫২, ২৭৪. ৩৪০, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৯
মহম্মদ নাসিম খান ২৯
মহম্মদ মুজিবুল হক ১৯৮
মহম্মদ সুলতান ১৫৬, ২০৮, ২১৩, ২১৫, ২১৮, ২২২, ২২৩, ২৬৪, ২৭১
মহিউদ্দীন আহমেদ ৬৬, ১৯৮, ১৯৯
মাওলা ৩০১
মাকসুদ আহমেদ ১১৪, ১১৫, ১২৯, ১৫১,
মাজেদ খাঁ ২৪৪, ২৪৫
মাদারীপুর ১৯৭
মাদারবক্স এম এল এ ৩৩৯
মামদোতের খান ১৭৭
মারুফ হোসেন ১৮
মালেক, ডক্টর এ এম ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ১৩০
মাহমুদ ইদরিস ২১৯, ২৪৩
মাহবুব আলম
মাহবুব আলী
মাহবুব জামাল জাহেদী ১৫৬, ২৪১, ২৫২, ৩৩৯,৩৫৫, ৩৫৬
মাহবুবা খাতুন ১৮৫
মাহবুবুল হক ২০, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭
মাহমুদ আলী ৩৯, ৫২, ৫৪, ৫৫, ১৪২, ১৫৪, ১৭৩, ৩৩৫
মাহমুদ নুরুল হুদা ১৩৬
মাসুদ মাহমুদ, পুলিশ সুপার ২১৯, ২২৪, ২২৯, ৩৭৩
মাসুদুর রহমান ২৪১
মাহে নও ৭২
মুঈনুদ্দীন আহমদ চৌধুরী ১৭২
মুখলেসুর রহমান ১৯৯
মুজিবর রহমান ১১৪
মুজিবুল হক ২০৯, ৩২৮, ৩৩১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৯

www.pathagar.com

মুতাহার হোসেন ১৫৬
মুত্তালিব, ডক্টর ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৯
মুদাব্বির হোসেন
মুনিরউদ্দীন আহমদ, ৫৫, ১৭২
মুনীর চৌধুরী ৩২০, ৩২৭
মুফিজউদ্দীন আহমদ, সংসদ সদস্য, ত্রিপুরা ৩১০
মুণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৮১, ২৮২, ২৮৬
মুসলিম ছাত্রলীগ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ৬৭, ৭২, ১৩১, ১৩২, ১৪২, ২০৯, ৩৮২
মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ৫৪, ৫৬, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৯, ২০৯
মুসলিম লীগ, ৬১, ৬২, ১১২, ১৩৬, ১৩৭, ১৬১, ১৬২, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৯১, ১৯৪, ১৯৭, ২০৮, ২১৬, ২৩০, ২৪৫, ২৫৩, ২৫৬, ২৬০, ২৮৮, ৩০১, ৩৩৩, ৩৬৪, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২
মুসলিম ছাত্রলীগ ২২০, ৩৯০
মুসলেহউদ্দীন ৩৩৬
মুস্তফা নুরুল ইসলাম ৬৭
মুশতাক আহমদ ১৭৬, ৩২৬
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর ৮০, ৯১, ৯২, ১২১, ২৪৩
মূলনীতি নির্ধারক কমিটি ৮৯, ১৩৩, ১৪৩, ২৮১
মিজানুর রহমান ১৮১, ১৮২,
মিঞা ইফতেখার উদ্দীন ১২০
মিঞা কে. বি. ৯৩
মিল্লাত, দৈনিক ২৯৩, ৩১৩
মির্জা গোলাম হাফিজ ১৫৪, ২০৯, ২১৩, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১
মীর্জা ইব্রাহীম ১৭,
মেজবাহউদ্দীন ১৭১
মেডিকেল এসোসিয়েশন, পূর্ব পাকিস্তান
মেডিকেল ছাত্র এসোসিয়েশন, পূর্ব পাকিস্তান ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৮
মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘট ১২৩, ১২৬
মোজাফফর আহমদ ২৫৯
মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, প্রক্টর ২২০, ৩২০, ৩২১, ৩২৭
মোজাম্মেল হক ২৪১,
মোরশেদ নেওয়াজ ৩৭৪
মোতাসিম আলী ১৬৫
মোতাহের উদ্দীন ১০২
মোদাব্বের হোসেন চৌধুরী ৪৪
মোফাজ্জল হোসেন (ছাত্রলীগ, ময়মনসিংহ) ৩০৯, ৩৩৯
মোবারক আলী এমএলএ ৩৩৫
মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন, প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী, অবিভক্ত বাংলা ৩৩৪
মোয়াজ্জেম হোসেন, সৈয়দ (ভাইস চ্যান্সেলর) ২৭২, ৩৮২
মোয়াজ্জেম হোসেন
মোশাররফ হোসেন ১১৪, ১১৫
মোশাররফ হোসেন চৌধুরী ১৩৩
মোসাহেব আলী খান ৩৩৩
মোস্তফা কামাল ১৯৮
মোহন জমাদার ২১৮
মোহন মিয়া ১৮১, ১৯৯, ২৪২, ৩০২, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৪, ৩৭৩, ৩৯২
মোহাজের যুবক ১৪৫
মোহাজের সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান ১৮৪
মোহাম্মদ ২৪১
মোহাম্মদ আজিমুদ্দীন ৯৯, ১০০, ১০৫, ১০৭, ১০৯
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ২৮৮
মোহাম্মদ আবুল মজহার খান ৯৫
মোহাম্মদ আমীর হোসেন ১৯১
মোহাম্মদ আবুল হোসেন ৬৭
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১২৮, ১৪১, ১৬৬, ১৭৪, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৯৪
মোহাম্মদ আহমদ হোসেন ১০০
মোহাম্মদ শমশের আলী ৩৬৩
মোহাম্মদ সাখাওয়াত আলী ১০০
মৌলানা আকরাম খান ৯২, ৯৩, ৯৭, ১২০, ১২১, ১৭০

য

যুব সম্মেলন, পূর্ব পাকিস্তান ১০৬
যুব সম্মেলন, পাকিস্তান ১৩১, ১৫১, ২৯০
যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ৬৩, ৯৩, ১০৭, ১৩০, ১৩৪, ১৩৬, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৬২, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৯, ১৮২, ১৮৪, ১৯৫, ১৯৭, ২১৬,

www.pathagar.com

২১৭, ৩০৬, ৩৩০
যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯, ২১, ২২

র

রইস মিয়া ৫৪,
রওশন আরা বাচ্চু ২২৩, ২২৮
রফিউদ্দীন সিদ্দিকী ২৮৭
রফিকউদ্দিন ২৪১, ৩৪০, ৩৪৩,,
রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া ১৩৪, ১১১, ৩০৯, ৩৭৪
রফিকুল ইসলাম ২৪২,
রবিউদ্দিন আহমদ ৮২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি ৮১
রমেশ চন্দ্র ১৭
রমেশ শীল ৮৮
রাজকুমার চক্রবর্তী ১৭৯
রাধা গোবিন্দ সরকার ১৮
রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ (সংগ্রাম পরিষদ)
সর্বদলীয় ১১৪, ১৮৪, ১৯১, ১৯৭, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২৪২, ২৫১, ২৫৮, ২৫৯, ২৯৮, ৩২৭, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৮২, ৩৯০
রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত স্মারকলিপি
রুহুল আমিন ৬৬, ১৫১, ৩৬৯,
রুহুল আমিন চৌধুরী ১১৪, ১২০
রুহুল কুদ্দুস ১৩৬
রহমতউল্লাহ ইনস্টিটিউট ১১৪, ১৯১
রহিমুদ্দীন আহমদ ৩৩৯
রহিম চৌধুরী
রিক্সাচালক ইউনিয়ন, ঢাকা ১৯, ২৮, ১৭৮,
রেজাই করিম, এডভোকেট ১৭১, ৩০০, ৩৫২, ৩৫৩
রেডিও পাকিস্তান ২৫৯
রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ (রেল শ্রমিক লীগ) ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৭
পূর্ব পাকিস্তান রেল কমিশন ২৯
রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তান ১৯, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৭
রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ভারত ২৫, ১৭৮
রেল শ্রমিক ধর্মঘট, পূর্ব বাংলা ২৭
রেল শ্রমিক ধর্মঘট, ভারত ২৭, ১৭৮
রোকেয়া খাতুন ১২৪, ১৩৯

ল

লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিল ৪৬, ৪৭
লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিল শ্রমিক ইউনিয়ন ৪৭
লঞ্চ (নৌযান) শ্রমিক ইউনিয়ন, অভ্যন্তরীণ ১৯, ২৮
লবণ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, পূর্ববঙ্গ ১৫৪
লবণ সঙ্কট ১৫৭, ১৬৪
লেবার পার্টি, ইংল্যাণ্ডের ২১
লিয়াকত আলী খান (প্রধানমন্ত্রী) ২০, ১২০, ১৩৬, ১৬৭, ১৯৮

শ

শওকত আলী ২০৯, ৩৩৯
শওকত আলী, অধ্যাপক ৩১০
শওকত হায়াত খান ১২০
শওকত ওসমান ৮১
শফিউদ্দিন আহমেদ ৮৮
শফিউর রহমান ৩০১
শফিকুর রহমান ২৩৪, ২৩৫, ৩৪০,
শফি হোসেন খান ১৯৯, ৩০৯
শরফুদ্দীন ৩০১
শহীদ সুহরাওয়ার্দী : সুহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, দ্রষ্টব্য ১৭৭,১৯২
শহীদুল্লাহ কায়সার ২১২, ২৫০, ২৫২, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭,
শান্তি স্কোয়াড ৩০৯
শাফিয়া খাতুন ১৯৮, ২১৪, ২২৩, ২২৮, ২৯৫
শামসুদ্দীন আহমদ ২৪৯, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫
শামসুদ্দীন আহমদ, এলএমএ ৬৭, ১৭৫, ৩২৬
শামসুন্নাহার আহসান ২১৪, ২২৩, ২২৪, ২২৮
শামসুজ্জোহা ১৫১, ১৫৬, ১৯৭, ১৯৯, ৩৩৬
শামসুর রহমান ৩০৪, ৩২২
শামসুল আলম ২০৯, ২১৩

www.pathagar.com

শামসুল বারী (মিয়া মোহন) ২৩৪
শামসুল হক ৬৭, ১৭৬, ১৭৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৫, ২৭৪, ৩৪০, ৩৮৬
শামসুল হক (সম্পাদক, ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগ) ১৮৫, ২১২, ২২৩, ৩০৯, ৩২৬
শামসুল হক চৌধুরী ১৩৩, ১৯৯, ২০৯
শামসুল হুদা ১১৪, ১৯৮
শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ ১২২
শাহ আজিজুর রহমান ১৮২, ১৯৩, ২৭৬, ৩০৪, ৩০৭, ৩৯২
শাহেদ আলী ৬৬,
শিক্ষক প্রাথমিক ১০০, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১১২, ১৩৩, ১৪৩, ১৬১,
শিক্ষক, প্রাথমিক ধর্মঘট ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২, ১৩২
শিক্ষক সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান কলেজ
শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক সমিতি, প্রাথমিক পূর্ব পাকিস্তান ৯৭, ৯৮, ১০৭
শিক্ষক সম্মেলন, প্রাথমিক ৯৯, ১০২, ১০৯, ১১০
শিক্ষা দিবস ৭৯, ১০৭
শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি, পূর্ববঙ্গ ৯২, ৯৩
শিক্ষা সম্মেলন, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ৬৭, ৭৩, ৭৮, ৩৪৩, ৩৬৭
শিক্ষা সম্মেলন, পূর্ব পাকিস্তান ৬৬, ১৩৪
শিক্ষা সংকোচন নীতি ৭৩, ৭৪,
শিবদাস গাঙ্গুলী, অধ্যাপক ১৮
শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩০
শেখ নুরুল্লা চৌধুরী ১৭১
শেখ মুজিবুর রহমান ১৩৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৬, ১৯৮, ১৯৯, ৩৬২, ৩৭৭
শ্রম সম্মেলন ত্রিপক্ষীয় ১৯, ২০
শ্রমিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক (ILO) ১৮, ২১
শ্রমিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক ১৮

স

সতীন সেন ৩২৭, ৩৬৮
সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার ৮২, ৮৮
সত্যযুগ, দৈনিক (কলকাতা) ৮২, ৮৮
সদরুল আলম খান (খলিল মিয়া) ২৪৫
সন্তোষ কুমার বসু (পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার) ২০
সন্ত্রাসবাদ ১৭৮
সফিক আহম ī ৮৮
সমর ঘোষ ১ r
সমরু মিয়া ৫৪, ৫৫
সরকারী প্রেসনোট ১৫৩, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৯৩, ৩৪৩,
সরকারী সার্কুলার (গোপনীয়) ৭০, ৭৮, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬
সরদার জয়েন উদ্দীন ২৫৩, ২৭৪
সয়ীদুল হাসান ৮১
সাইদ হায়দার ৩০১
সাইদুল হক
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ২২৩, ২২৭
সাংবাদিক সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান ৬৬
সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৬৫
সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম ৮১, ৮৮, ৯৩
সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা ৯০
সাজ্জাদ আলি চৌধুরী
সাদেক খান ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬০
সামন্তবাদী সংস্কৃতি ৯৩,
সামরিক শিক্ষা ১৫০
সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ৮৯
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ১৪৭, ১৪৮
সায়িদ সিদ্দিকী ২৫২
সারা তাইফুর ২২৪, ২২৮
সার্জেন্ট স্কীম, প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ৯৭
সালাহউদ্দীন ১১৪, ২৩৪, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ৩৪৩, ৩৬৭
সালেক ১৩৯
সালেহউদ্দীন ১২০, ১৫৬
সাহেবে আলম ১৯৩
স্বাধীনতা, দৈনিক ৩৭১
সিকান্দার আবু জাফর ২৫২
সিদ্দিক আহমেদ ১১৩
সিদ্দিক দেওয়ান ২১৯
সিদ্দিকী, বি এ ২২, ৩১, ৩২, ৩৮
সিদ্দিকুর রহমান ১০৯
সিভিল লিবার্টি কমিটি ২০৯, ৩২২
সিমেন্ট কোম্পানী শ্রমিক ইউনিয়ন, আসাম বেঙ্গল ৫১

www.pathagar.com

সিমেন্ট কোম্পানী শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাতক ৫২, ৫৫
সিরাজ আলী ৩০
সিরাজুল ইসলাম ৫০
সিলেট বার এসোসিয়েশন ২৮৮
সিলেট রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ ২৮৮
সিলেট লোকাল বোর্ড ১৭২
সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম ৫০
সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা জেলা ১৯, ২৮, ৪৭, ৪৮, ৪৯
সুন্নামাত, এ.আর. ২৪
সুনীল বসু ১৬৫
সুফিয়া ইব্রাহীম ২২৩, ২২৪, ২২৮
সুফী খান ১৫৬
সুবোধ লাহিড়ী
সুরেন্দ্র কুমার চৌধুরী ৫৪
সুরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত ২৮৬
সুলতান আহমদ ১৮, ১১৪, ১৩২, ২৪১
সুলতান আহমদ চৌধুরী
সুলতান হোসেন খান
সুশীল সরকার ১৮
সুহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ ১৩৬, ১৬৬, ১৭৬, ৩১৮, ৩১৯
সেরাজউদ্দীন খান ২৪১
স্টেট ব্যাংক-অব-পাকিস্তান ২৬৮
স্টেটসম্যান, দি (কলকাতা) ২২৬, ২৩২, ২৪৬, ৩০২
সৈনিক ২৯, ১১১, ২০৯
সৈফুদ্দীন ১৮৫
সৈয়দ আবদুর রহিম ২০৯, ৩৬২,
সৈয়দ আবদুল গনি ৩৮২
সৈয়দ আবুল ফজল ১৮৫
সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ১৮৫, ২০৯, ২১৩
সৈয়দ জাকির ২৩৫,
সৈয়দ জোবায়েদ ৩৩৬
সৈয়দ নুরুদ্দীন ৬৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৭৪, ২৭৬, ৩০৩
সৈয়দ ফজলে আলি
সৈয়দ মহম্মদ আলী ৬৮, ১৩৯
সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডঃ ভাইস চ্যান্সেলর ২২০, ৩২৭, ৩৩০
সৈয়দ সাহেবে আলম ৩৩৪
সৈয়দ সুলতান আহমদ ৩০৯
সৈয়দ সুলতান হাজি ১০০
সৈয়দুর রহমান ৩২২
সোলায়মান, এফ. রহমান ৩০৯
সোশালিষ্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান ৩২২
সংগ্রাম, দৈনিক ১৪৩, ১৫৩, ৩৭৪
সংবাদ, দৈনিক ১৩৪, ১৫৩, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৬৯, ২৭০, ২৭৪, ২৭৬, ৩১৩

ষ

ষোল দফা দাবী, শিক্ষা সম্মেলন

হ

হক এমএস ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৭
হাতেম আলী খান ১০৯
হাতেম আলী তালুকদার ৩৩৯
হাফিজ উদ্দীন (গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান) ৩০৮
হাফিজ সোলায়মান ১৯৩
হাবিবুর রহমান ৫৪
হাবিবুর রহমান (বগুড়া মুসলিম লীগ, সভাপতি) ৩২২
হাবিবুর রহমান (যুবনেতা) ১৬৫, ২২৩
হাবিবুর রহমান শেলী ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৩৯, ২১৫, ২২২
হাবিবুল হক ২৭৫
হাবিবুল্লাহ বাহার ১২০, ১৩৬, ২৪৪, ২৫৭, ২৮০
হামিদুল হক চৌধুরী ১৭০, ১৮৫, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ২০৯
হারুনর রশীদ ৩৩৯
হালিম
হালিমা ২৪৩, ২৪৪
হালিমা খাতুন ১৪৪
হাশিমউদ্দীন আহমদ ৩৩৯
হাশেম ৩০১
হামুদুর রহমান, ব্যারিস্টার ৩৮২
হাসান আলী ৫৪, ২৩২, ২৩৮
হাসান ইমাম (কলেজ শিক্ষক সমিতি) ৩১০
হাসান পারভেজ ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৬০, ৩৬১
হাসান হাফিজুর রহমান ২৯৯, ২২৩, ২৫১, ২৫২, ২৬৬
হেদায়েত হোসেন চৌধুরী ১৯৮, ২০৯, ৩০০, ৩২৮, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১,

www.pathagar.com

যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ হয়েছে

অজয় ভট্টাচার্য
মনি সিং
অলি আহাদ
মহম্মদ তোয়াহা
আজহার হোসেন
মহীউদ্দীন আহমেদ
আজিজ আহমদ (চীফ সেক্রেটারী)
মাহবুব জামাল জাহেদী
আতাউর রহমান খান
মাহমুদ আলী
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
মুজিবুল হক
আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক
মোহন মিঞা
আবদুল আওয়াল
রমেন মিত্র
আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া
রণেশ দাশ গুপ্ত
আবদুল মতিন
শওকত আলী
আবদুল হক
শরদিন্দু দে, লালা
আবদুস শহীদ
শামসুদ্দীন আহমেদ
আবুল হাশিম
শামসুদ্দোহা
ইমতিয়াজউদ্দীন খান
শাহ আজিজুর রহমান
ইশতিয়াক আহমদ, সৈয়দ
শান্তি সেন
এম আর আখতার (মুকুল)
শেখ মুজিবুর রহমান
কমরুদ্দীন আহমদ
সইফ-উদ-দাহার
কাজী গোলাম মাহবুব
সমর সেন (ফরিদপুর)
কাজী মহম্মদ ইদরিস
সরদার ফজলুল করিম
কিউ কিউ এম জহুর (কাসেদ আলী)
সফিউদ্দীন আহমেদ
ক্যাপ্টেন শাহজাহান
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ
খায়রুল কবির
সাদেক খান
খোন্দকার গোলাম মোস্তফা
সুখেন্দু দস্তিদার
খোন্দকার মোশতাক আহমেদ
সুফিয়া আহমদ
গাজীউল হক
সুধাংশু বিমল দত্ত
জহুর হোসেন চৌধুরী
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ডক্টর মালেক
সৈয়দ নূরুদ্দীন
তফজ্জল আলী
হাজী মহম্মদ দানেশ
তাজউদ্দীন আহমদ
হাবিবুর রহমান (শেলী)
নগেন সরকার
হামিদা রহমান
নূরুল আমিন
হাশিমুদ্দীন আহমেদ
বদরুল আমীন
হেদায়েত হোসেন চৌধুরী

যাঁদের লিখিত নোট ও চিঠি পেয়েছি

অজয় ভট্টাচার্য
জসিমউদ্দীন কবি
আনিসুজ্জামান
আসহাবউদ্দীন আহমদ
কামাখ্যা রায় চৌধুরী
প্রমোদ দাস
কিউ কিউ এম জহুর (কাসেদ আলী)
সইফ-উদ-দাহার
গাজীউল হক
সুষমা দে

---

www.pathagar.com

বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর করার পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র মূখপত্র সাপ্তাহিক 'গণশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮০ সালে তিনি কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হন। ট্রেড ইউনিয়নের কাজও করেন। ১৯৮১ সালে তিনি বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি।

বাংলাদেশে পলিটিক্যাল লিটারেচার বা রাজনৈতিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বদরুদ্দীন উমরের আসনটি বিশিষ্ট।

বাংলাভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার মতো বড় মাপের একটি কাজ তিনি একক দায়িত্বে সম্পন্ন করেন। একজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক লেখক হিসেবে প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তিনি প্রচুর গবেষণামূলক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আলোকচিত্র : শফিউল আলম সুমন